নিজেকে নিয়ে

নিজেকে নিয়ে

[The Future That Was-এর বঙ্গানুবাদ]

ঊর্মিলা হাকসার

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

মুখবন্ধ

কলম হাতে বসে আছি। ভাবছি, ঠিক কোথা থেকে আমার এই কাহিনী শুরু করা যায়। কোন্ তারিখ, কোন্ মাস, কোন্ সন থেকে। কিন্তু আমার দ্বিধা কিছুতেই কাটতে চায় না। যা আমি হতে চেয়েছিলুম, তার ছবিটা তো হঠাৎ কোনও বিশেষ দিনে এক লহমায় আমার সামনে ফোটেনি, তা আমার গোটা অস্তিত্বেরই একটা অংশ। সেক্ষেত্রে, হয়ত, শুরুর থেকেই শুরু করা ভাল।

ছোট্ট একটি মেয়েকে আমি দেখতে পাচ্ছি। নেহাতই মামুলি একটি মেয়ে। সে ইশকুলে যায়; অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে; বাচ্চাদের পার্টি আর মজলিসেও যোগ দেয় বই কী। অর্থাৎ আর-পাঁচটা শিশু যা করে, সেও ঠিক তা-ই করে। পরক্ষণেই কিন্তু ছোট্ট সেই মেয়েটির চেহারা আমার চোখের সামনে থেকে মুছে যায়, তার বদলে ফুটে ওঠে তেজী, বিদ্রোহিণী এক তরুণীর ছবি। অর্থাৎ আমার জীবনটাকে আমি টুকরো-টুকরোভাবে দেখতে পাই। অন্যদিকে, সেই জীবনের মধ্যে অন্তর্ভূত একটা ধারাবাহিকতাও তো রয়েছে। নিশ্চয়ই অনেক ছোট-ছোট অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আমাকে এগোতে হয়েছে। কোথাও একটা শব্দ শুনেছি, কোথাও একটা চাপা স্বর; এখানে কোনও বইয়ের একটা লাইন পড়েছি তো ওখানে কিছু দেখেছি; কিংবা হয়ত পেয়েছি কোনও গন্ধ। ছোট-ছোট এই যে সব ঘটনা, এর কোনওটার হয়ত তাৎপর্য আছে, কোনওটার হয়ত নেই; কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে রূপান্তরিত হতে-হতে ছোট্ট একটি মেয়ে, একটু-একটু করে সেই তরুণী হয়ে উঠেছিল। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, এই ঘটনাগুলিই তো তাকে গড়েছে। কিন্তু, পারম্পর্য রক্ষা করে, তাদের কি আর একসূত্রে গেঁথে তোলা যাবে? অসম্ভব। ঘটনা তো নয়, যেন অসংখ্য বর্ণের বিচ্ছুরণ। সেই বর্ণগুলো আমার চোখের সামনে দ্রুত ঘুরছে। আমি জানি যে, প্রতিটি বর্ণই পৃথক; কিন্তু একসঙ্গে ঘুরছে বলেই পরস্পরের সঙ্গে তারা মিশে যাচ্ছে, তাদের আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। ঘটনার টুকরোগুলোকে তবু একবার পরপর সাজিয়ে তুলবার চেষ্টা করা যাক; দেখা যাক, তার থেকে একটা ছবি ফুটে ওঠে কি না।

আমাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "কিছু ভাবতে গেলে কি তোমার সামনে ছবি ফোটে, না শব্দ?" উত্তরে, একটুও দ্বিধা না করে, আমি বলেছিলুম, "ছবি।" প্রশ্নকর্তা আমার উত্তর শুনে বলেছিলেন, "লেখার কাজটা তা হলে তোমার পক্ষে সহজ হবে।" শুনে আমি আশ্বস্ত হয়েছিলুম। এখন লিখতে বসে সেই ছবিগুলোকে আমার মনশ্চক্ষে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ছবিকে তো শব্দ দিয়ে ফোটাতে হবে, সেই শব্দ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে বর্ণ-সংকরের মতো। এক ভাষায় আমি কথা বলি, এবং আর-এক ভাষায় ভাবি; এর জন্যে দায়ী আমার শিক্ষা। দুই নৌকোয় পা রেখে আমাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে, এ-ই আমার নিয়তি,—ঠিকমতো কোথাও যে একটু টান হয়ে দাঁড়াব, এমন জায়গা আমি পাচ্ছি না। হিন্দী আমার মাতৃভাষা। গড়গড় করে আমি হিন্দী বলি, এবং এমন অসংখ্য ব্যাপার রয়েছে, যার কথা একমাত্র হিন্দীতেই আমার পক্ষে বুঝিয়ে বলা সম্ভব। কিন্তু আমি শিক্ষা পেয়েছি ইংরেজীর মাধ্যমে।

ইংরেজীতেই সবকিছু আমি শিখেছি; চিন্তাও করেছি ইংরেজীতে। অথচ ইংরেজী আমার কাছে বরাবর একটা বিদেশী ভাষাই থেকে যাবে, তাতে আমার মর্মকথাকে ব্যক্ত করা তো সম্ভব নয়। যে সামাজিক পরিবেশে, যে সাংস্কৃতিক বিন্যাসের মধ্যে আমার জন্ম, ইংরেজী তাকে ব্যক্ত করতে পারে না। অন্যদিকে এও তো আমি অস্বীকার করতে পারি না যে, মাতৃভাষার চাইতে ইংরেজীতেই আমি বেশী স্বচ্ছন্দ।

অভিশপ্ত শিশু! এমন এক দুঃসময়ে জন্মেছি যে, নিজেকে ব্যক্ত করবার ক্ষমতাও আমার নেই। গলা নেই, তবু গান গাইতে চায়, আমার অবস্থা যেন সেই গায়কের মতো; কিংবা সেই শিল্পীর মতো, আঙুল নেই বলে যে তুলি ধরতে পারছে না। অথচ, লিখবার একটা আন্তরিক তাগিদ যে আমার রয়েছে, তাও তো ঠিক।

নিজেকে নিয়ে

ছোট্ট একটি চটি-বইয়ে আমাদের বংশ-পরিচয় ধরা আছে। অনেকদিন আগে এটি ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। পড়লে বোঝা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষরা যে খুব রাজভক্ত ছিলেন, এইটি প্রমাণ করাই এর উদ্দেশ্য। মোটা-মাইনের একটা সরকারী চাকরির জোগাড় করবার জন্যেই যে কেউ এটি সংকলন করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তবে চাকরিটা তিনি পাননি। যাই হোক, এই বংশ-পরিচয় থেকে জানা যাচ্ছে যে, সিপাহী মহাবিদ্রোহের সময় (১৮৫৭) আমাদের এক পূর্বপুরুষ ইংরেজদের খুব সাহায্য করেছিলেন। খুবসম্ভব তাঁর বাড়িতে কিছু ইংরেজকে তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন। এই উপকারের বিনিময়ে মহামান্য ঈস্ট ইনডিয়া কোমপানি তাঁর কাছে প্রস্তাব করলেন যে, হয় কিছু ভূসম্পত্তি আর নয়ত রায়বাহাদুর খেতাব, এ দুটি উপঢৌকনের যেটা ইচ্ছে তিনি নিতে পারেন। রায়বাহাদুর খেতাবের প্রতি সেকালে অনেকেরই খুব লোভ ছিল। আমাদের সেই পূর্বপুরুষও, স্বভাবতই, জমিজমা না-নিয়ে খেতাবটাকেই শিরোধার্য করলেন। তাই বলে যে তাঁর অর্থভাগ্য নেহাত মন্দ ছিল, তা নয়। শুনতে পাই, মৃত্যুকালে তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি বিস্তর টাকাকড়ি দিয়ে গিয়েছিলেন। পুত্রটিও আর কালক্ষেপ না-করে চটপট সেই টাকাকড়ি খরচ করতে লেগে গেলেন। তখন তিনি এক কন্যা আর দুই পুত্রের পিতা। ছোট সংসার; পৈতৃক সূত্রে যে অর্থ তিনি পেয়েছিলেন, সংসারটা তাতে হেসেখেলে চলে যেতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর স্ত্রী এইসময়ে মারা গেলেন, এবং আবার তিনি বিয়ে করলেন। দ্বিতীয় পক্ষে তাঁর আরও চারটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছিল। এর কিছুকাল বাদেই তিনি মারা যান।

তাঁর জ্যেষ্ঠ দুই পুত্র ইতিমধ্যে সুরা, নারী এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য নানা দ্রব্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন। দিব্যি ফুর্তিতে তাঁরা দিন কাটাতে লাগলেন। তার ফল যা হবার তা-ই হল। কনিষ্ঠেরা বড় হয়ে উঠবার পরে দেখা গেল যে, পারিবারিক সম্পত্তির আর বিশেষ-কিছু বাকী নেই, প্রায় সবটাই ফুঁকে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয় সন্তান আমার পিতামহ। নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে চেষ্টা করা ছাড়া কোনও গত্যন্তর তাঁর রইল না।

আমার বাবার প্রথম জীবন কেটেছে একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে। এই পারিবারিক প্রথার যে স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল, তা খুব মধুর। বাড়ির মধ্যে এক গাদা ছেলেপুলে, আমার বাবাই ছিলেন তাদের সর্দার, সারাক্ষণ তারা দুষ্টুমি করে বেড়াত। চাকরির বাজারে আজকাল বিষম প্রতিযোগিতা, সবাই ভাবে যে, অন্য-সবাইকে টপকে গিয়ে চাকরিটিকে দখল করতে হবে, আর তারই জন্যে সবাই চেষ্টা চালায়। সেকালের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেদের মধ্যে কিন্তু এই প্রতিযোগিতার ভাবটা ছিল না। বাবা তো আমাদের তাঁর ছেলেবেলার গল্প শোনাতেন। কিন্তু তাঁর কাছে পড়াশুনোর গল্প যত শুনেছি, তার চাইতে ঢের বেশী শুনেছি তাঁর ঘুড়ি ওড়াবার গল্প। পড়াশুনোয় আসলে বাবার খুব মনোযোগও ছিল না, ধীরেসুস্থে পড়তে-পড়তে তেইশ বছর বয়সে তিনি বি.এ. পাশ করেছিলেন। বয়স আর ডিগরীর বিচারে তক্ষুনি সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, এবারে তিনি বিয়ের যুগ্যিটি হয়েছেন। ১৯১৯ সনে আমার বাবার বিয়ে হয়। তার আগে আমার মায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না, কখনও তাঁকে তিনি দেখেননি পর্যন্ত। বাড়িতে যখনই 'লাভ ম্যারেজ' অর্থাৎ ভালবেসে বিয়ে করার প্রসঙ্গ উঠত, বাবা তখনই বলতেন, তাঁর ভাগ্যি ভাল যে, তাঁদের কালে ও-সব ব্যাপার চালু হয়নি, ভালবেসে বিয়ে

করতে হলে কস্মিনকালেও তার ন্যাক বিয়ে হত না।

বিয়ের আঠারো মাস বাদে তাঁদের একটি মেয়ে হয়। বিয়ে হল, সন্তান হল, কিন্তু বাবার জীবনধারা তাতে পালটাল না, সেই আগের মতই ধীরেসুস্থে তিনি তাঁর পড়াশুনো চালিয়ে যেতে লাগলেন। পড়াশুনোর পাট শেষ হবার পরে আইনজীবীর বৃত্তি নিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর মনে বসেনি। ইতিমধ্যে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে বললেন যে, কলকাতায় গেলে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায়। সেই রোমাঞ্চকর গল্প শুনে বাবা আর স্থির থাকতে পারলেন না,. ঠাকুর্দার অনুমতি নিয়ে, কলকাতায় গিয়ে শেয়ার-বাজারে ঢুকলেন।

ইংরেজীতে "বিগীনার'স লাক্" বলে একটা কথা আছে। বাবার ক্ষেত্রেও সূচনা বেশ শুভই হয়েছিল। কিন্তু কোথাও কিছু-একটা বিভ্রাট তিনি ঘটিয়ে থাকবেন, তাই আর এগোতে পারলেন না, হঠাৎ একদিন এই সত্যটা তিনি আবিষ্কার করে বসলেন যে, তাঁর হাতে আর ঠিক এক মাস সময় আছে, তার মধ্যে যদি না কুড়ি হাজার টাকার ঘাটতি মেটাতে পারেন, তা হলে তাঁকে জেলে যেতে হবে। এই রকমের অবস্থায় পড়লে মাথায় নানা উদ্ভট পরিকল্পনা গজিয়ে উঠতে থাকে। বাবার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। ঝোঁকের মাথায় তিনি ঠিক করলেন যে, বর্মা কিংবা অন্য-কোথাও পালিয়ে যাবেন। হয়ত যেতেনও, কিন্তু ঠাকুর্দা যে ভীষণ অসুস্থ, এই টেলিগ্রাম পেয়ে সেইসময়ে তাঁকে বাড়িতে ফিরে আসতে হয়। ঠাকুর্দাকে তাঁর আর্থিক সংকটের কথা জানাতে নিশ্চয় বাবার খুব কষ্ট হত; কিন্তু সেই কষ্ট আর তাঁকে ভোগ করতে হয়নি, বাবা যেদিন বাড়ি ফিরলেন, ঠিক সেইদিনই আমার ঠাকুর্দা মারা যান, ফলে ঠাকুর্দাকে কিছু জানাবার কোনও অবকাশই তিনি পেলেন না। ঠাকুর্দা মারা যাওয়ায় বাবা যে বীমার টাকা হাতে পেলেন, তার অংকটাও ঠিক কুড়ি হাজার। বাবা তাই দিয়ে শেয়ার-বাজারের দায় মেটালেন।

সংসার এতদিন ঠাকুর্দাই চালাচ্ছিলেন। এবারে বাবার উপরে তার ভার পড়ল। মা, তিন ভাই (তাঁদের প্রত্যেকেরই তখন ছাত্র-জীবন চলছে), স্ত্রী, কন্যা—সংসারের আয়তন তখন নেহাত ছোট নয়, অনেক দায়দায়িত্ব, দেনাও বিস্তর।

ঠাকুর্দা তাঁর বৈষয়িক জীবনে খুব উন্নতি করতে পারেননি। তবে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কেউ-কেউ ছিলেন বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মানুষ। অধুনালুপ্ত লিব্র্যাল পার্টির সঙ্গে আমার ঠাকুর্দার যোগাযোগ ছিল তো, খুবসম্ভব সেই সূত্রেই তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়ে থাকবে। বাবার তখন সরকারী চাকরিতে যোগ দেবার বয়স নেই। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, সেই যোগ্যতার বলে—বয়স পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও—তাঁর একটা সরকারী চাকরি জুটে গেল। ঠাকুর্দার সেই বন্ধুরাই বস্তুত চাকরিটা তাঁকে জুটিয়ে দিলেন। চাকরিটা নেহাত খারাপও নয়। উন্নতির আশা ছিল। তবে শুরুতে মাইনে কম। আমাদের সংসারে তখন টাকাকড়ির খুব টানাটানি চলছে। সেই সময়ে—১৯২২ সনে—আমার জন্ম। কোন্ মাসে, কোন্ তারিখে—সে-সব কেউ মনে রাখেনি। বাড়ির সবাই ভেবেচিন্তে সাব্যস্ত করলেন যে, এটা একটা এমন-কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। আমার মামাবাড়িতে তাই আর টেলিগ্রাম করা হল না; এক লাইনের একটা পোস্টকার্ড লিখে দিদিমাকে আমার জন্ম-সংবাদটা জানিয়ে দেওয়া হল।

*   *   *

আমার দিদিমা যখন ইন্দোরে থাকতেন, তখন সেইখানে আমার দিদির জন্ম। তার কিছুদিন বাদেই আমার মা কাশ্মীরে তাঁর কাকার বাড়িতে চলে যান। কাকা ছিলেন কাশ্মীরের মহারাজার ব্যক্তিগত চিকিৎসক। অবস্থাপন্ন মানুষ তো, তাই তাঁর বাড়িতে খাবার-দাবার থাকত অঢেল। বিশেষ করে ফল থাকত সব রকমের। তার উপরে আবার সেখানকার জলবাতাস খুব ভাল। দিদির স্বাস্থ্য সেখানে তাই ফিরে গেল। আমাদের

বাড়ির লোকরা দিদিকে যখন প্রথম দেখে, তার বয়েস তখন মাস-ছয়েক। ফর্সা, গোলগাল বাচ্চা, গালে যেন রক্ত ফেটে পড়ছে, বড় বড় বাদামী রঙের চোখ। গোলাপী পোশাকে দিদিকে নাকি দারুণ দেখাচ্ছিল। তার সেদিনকার সেই চেহারাই আজ অব্দি সকলের চোখে লেগে আছে।

আমার জন্ম লখনউয়ে। রোগা টিংটিঙে প্যাঁচকে একটা মেয়ে, রঙও ময়লা; কারও ভাল লাগতে পারে, এমন কোনও গুণই আমার ছিল না। একই মায়ের মেয়ে, তবু আমি এত রোগা হলুম কেন? আমাকে যখন পেটে ধরেছিলেন, আমার মায়ের কি তখন খাবার জুটত না? তা নিশ্চয় নয়, তবে—অনুমান করতে পারি—আমাদের সংসারে তখন পুষ্টিকর খাদ্যের, এই যেমন দুধ ফল এইসবের, টানাটানি যাচ্ছিল। অন্তঃসত্ত্বা হবার দিন পাঁচেক বাদে আমার মায়ের হঠাৎ খুব রক্তস্রাব হয়, তাতে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। তার পরেও তাঁর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল যায়নি। তাঁর অবচেতনায় এইসব ঘটনা হয়ত একটা গভীর দাগ কেটে গিয়েছিল; আমার প্রতি তাঁর মনোভাব থেকে অন্তত এইরকমটাই মনে হয়।

খুব ছেলেবেলাকার কথা আমার মনে পড়ে না। ছোটখাটো যে-সব ঘটনা কিংবা গল্পের কথা এখানে বলব, আসলে তা অন্যের কাছে শোনা। নিজের অভিজ্ঞতার কথা আমার মনে নেই। কবে কী করেছিলুম, অন্যের কাছে তার যে বিবরণ শুনতে পাই, সেই-টুকুই আমার স্মৃতি। কেন যে অন্যেরা সে-সব মনে রেখেছিলেন! আমি তো আমার শৈশবের কথা দিব্যি ভুলে গিয়েছিলুম, অন্যেরাও যদি সে-সব কথা আমাকে মনে পড়িয়ে না দিতেন, তা হলে হয়ত আমার উত্তর-জীবন আর-একটু কম যন্ত্রণাকর হত।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, ভারতীয় পরিবারে কন্যার জন্ম আদৌ আনন্দের ব্যাপার নয়। প্রথম কন্যাটিকে যদি-বা ক্ষমাঘেন্না করে মেনে নেওয়া হয়, দ্বিতীয় কন্যাটিকে হয় না। আমি যে মেয়ে হয়ে জন্মেছি, এই ব্যাপারটিকে আমার ঠাকুমা কখনও ক্ষমা করতে পারেননি। আমার প্রতি ঠাকুমার এই বিরূপতাকে মা মোটেই পছন্দ করতেন না; অন্যদিকে তিনি নিজেই যে আমাকে খুব পছন্দ করতেন, তাও নয়। আমার সম্পর্কে বরাবরই তিনি খুব উদাসীন। সংসারকে একটি পুত্রসন্তান উপহার দিতে পারলেন না, তাঁর জীবনে এ যেন একটা কলঙ্ক হয়ে রইল। বাবা সেক্ষেত্রে উদার ঐতিহ্যের মানুষ; তিনি বলতেন, ছেলেও যা মেয়েও তাই। নারী আর পুরুষের সমানতায় তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর এই বিশ্বাসই আমাকে ভুলিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল যে, আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি। বস্তুত, আমার চালচলন ছিল ছেলেদেরই মতো।

ছেলেবেলায় আমার দিদিই ছিল সকলের চোখের মণি। আমি তার আড়ালে পড়ে গিয়েছিলুম। সবাই তাকে আদর করত, প্রত্যেকে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বড় সংসারে তো আর সকলের সব আব্দার মেটানো যায় না; দিদির ক্ষেত্রে কিন্তু বারবার এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেখেছি। যে-সব খাবার দিদির পছন্দ, তার জন্যে খুব যত্ন করে সেগুলি বানানো হত। দিদি ছিল খুব একগুঁয়ে আর জেদী, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে দিয়ে কিছু করানো যেত না।

দিদির উপরে রেগে গিয়ে মা একদিন একটা ঘরের মধ্যে তাকে আটকে রেখেছিলেন; বলেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার কাজের জন্যে ক্ষমা চাইছে, ততক্ষণ তাকে ঘর থেকে বাইরে আসতে দেওয়া হবে না। এ হল দুপুরের খাওয়ার ঠিক পরের কথা। ক্রমে-মে চা খাবার সময় হল, দিনের আলো মিলিয়ে গেল, তারপর একসময় দেখা গেল রাত্তিরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। দিদি কিন্তু তখনও ক্ষমা চায়নি। শেষ পর্যন্ত র থাকতে না পেরে মা গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বললেন যে, এবারে সে বাইরে আসতে র। দিদি তার উত্তরে বলল, "কেন আমাকে আটকে রেখেছিলে? এই ঘরের মধ্যেই

আমি থাকব, কিছুতেই আমি বাইরে যাব না।" বাইরে আসবার জন্যে মা-ই তখন তাকে অনেক করে সাধাসাধি করতে লাগলেন। একবেলা খেতে না-দিলেই জব্দ হবে, দিদি এমন পাত্রীই নয়। দুদিন অভুক্ত থাকবে, তাতেও সে রাজী, তবু অন্যের কাছে কিছুতেই সে মাথা নোয়াবে না।

আমার ব্যাপার ঠিক এর উলটো। আমার বয়স যখন আট মাস, তখনই আমাকে মায়ের বুকের দুধ ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, আর তার পর থেকেই ক্রমাগত আমার হজমের গোলমাল চলতে থাকে। শুনেছি, ডিমের কুসুম বাদ দিয়ে সাদা অংশটুকু কিংবা অ্যান-জিয়ার'স ইমালসন খাওয়ালেই অমনি যেন মন্ত্রবলে আমার শরীর ভাল হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের সংসারের তখন যা আর্থিক অবস্থা, তাতে এ-সব বস্তুর খরচা জোগানো সম্ভব হত না, আর তাই আমার স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি হবামাত্র এ-সবে ছেদ পড়ে যেত। হয় জলে-সেদ্ধ সাবু, আর নয়ত জলেরই মতন তরল খিচুড়ি, জীবনের প্রথম পাঁচটা বছর বলতে গেলে এ-ই ছিল আমার খাদ্য। মাসের পর মাস শুধু এই বিস্বাদ বস্তু খেয়ে আমাকে বাঁচতে হয়েছে। অথচ আশ্চর্য, আমার আত্মীয়স্বজনদের মনের মধ্যে আমার তখনকার যে ছবি আঁকা রয়েছে, তা কিন্তু নির্জীব রুগ্‌ণ শিশুর ছবি নয়। তাঁরা বলেন, শৈশবে আমি যেমন টগবগে, তেমনি প্রাণবন্ত ছিলুম। তবে কিনা, উৎসাহে-উদ্যমে এত ভরপুর হলে কী হয়, একবেলা না খেয়ে থাকতে হবে, এমন কথা আমি ভাবতেই পারতুম না। দিদির আব্দাব কেন মেটানো হয়, এবং আমার আব্দার কেন মেটে না, পরে এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছি; বুঝতে পেরেছি, আমি যে খিদে সইতে পারতুম না, এই ব্যাপারটার সুযোগ নিয়েছেন আমার আত্মীয়স্বজনরা, তাঁদের ইচ্ছার কাছে আমাকে নতিস্বীকারে বাধ্য করতে পেরেছেন।

সুখী, হাসিখুশী শিশু ছিলুম আমি। কিন্তু যতই বড় হতে লাগলুম, ততই এই ব্যাপারটা আমার চোখে ধরা পড়ে যেতে লাগল যে, দিদির প্রতি সকলের একটা পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। হঠাৎ একদিন রাত্তিরে আমার ঘুম ভেঙে যায়। দেখতে পাই যে, ঘরের মধ্যে আমি একা। পাশের ঘরে গিয়ে দেখি, আমাদের পরিবারের সবাই সেখানে কালো-রঙের ছোট্ট একটা বাক্স ঘিরে বসে আছে। উঁকি মেরে দেখলুম যে, বাক্সটা গয়নায় ভর্তি। ছোটদেব অনেক গয়নাও তার মধ্যে ছিল। হাত বাড়িয়ে আমি সেগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগলুম। খুব ছোট্ট একজোড়া বালা। এ-বালা কার? দিদির। দিদির জন্মের সময় ঠাকুমা তাকে এই বালাজোড়া দিয়েছিলেন। সোনার একজোড়া দুল, নকশাটা প্রজাপতির মতো। এই দুলও আমার দিদির। তার যখন কান বেঁধানো হয়, তখন দিদিমা তাকে দিয়েছিলেন। আর এই সোনার তাবিজ, সোনার হার? আর এই সোনার বোতাম আর বাজুবন্ধ? এও নাকি দিদির। কোনওটা কাকীমা কিংবা মাসীমা দিয়েছেন, কোনওটা আর-কেউ। সবই তার জন্মের সময়ে দেওয়া। এইসব শুনে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হল। আমিও তো এই বাড়িরই মেয়ে, তাহলে আমার জন্মের সময় কে আমাকে কী দিয়েছিল? প্রথম সন্তানকেই সবাই নাকি উপহার দেয়। সেইটেই নাকি প্রথা। পরে যারা জন্ম নেয়, তাদের যে কিছু দিতে নেই, তা অবশ্য নয়, তবে কিনা না-দিলেও তাতে নাকি দোষ হয় না। কী অন্যায়! বাইরের আত্মীয়স্বজনদের না হয় ক্ষমা করা গেল, কিন্তু যাঁরা এই বাড়িরই লোক? তাঁরা কেন আমাকে কোনও উপহার দেননি? ঠাকুমা আমার সামনেই বসে ছিলেন। সরাসরি তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, দিদিকে তো এত-সব সুন্দর-সুন্দর গয়নাগাটি দিয়েছিলে, আমাকে কিছু দাওনি কেন? তিনি কোনও উত্তর দিলেন না।

ঘটনা এই একটিমাত্র নয়, অনেক। আলাদা আলাদাভাবে তাদের একটিও হয়ত খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু তাদের যোগ করলে অবিচারের ছবিটা খুব প্রকট হয়ে দাঁড়ায়।

আমার মনে হতে লাগল, এদের কাছে আমি সুবিচার পাইনি। আমার চিত্তের মর্মমূলে একটা ক্ষতের সৃষ্টি হল। কিন্তু একই সঙ্গে বলব যে, দিদিকে কখনও আমি হিংসে করিনি, এই অবিচারের জন্য তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আমার ছিল না।

* * *

দিদি খুব সুন্দরী। তার স্বভাবও খুব ভাল। সে বাধ্য। সে পড়াশুনোয় মনোযোগী। তার সঙ্গে আমার কোনও তুলনাই হয় না। সেজন্যে যে আমার কোনও ক্ষোভ ছিল, তা কিন্তু নয়। এই ব্যবধানকে আমি শান্ত চিত্তে মেনে নিয়েছিলুম, দিদিকে নকল করবার কোনও ইচ্ছেই আমার ছিল না। দিদির বয়স যখন তিন বছর, কি তারও কম, তখনই তার বর্ণ-পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। চার-বছর বয়সের সময়, তাকে ইংরেজী শেখাবার জন্যে কিছুদিনের জন্যে এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণীকে শিক্ষিকা হিসেবে নিযোগ করা হয়েছিল, কিন্তু দিদিই তাকে উলটে হিন্দী শেখাতে শুরু করে দেয়। আর আমি? চার পাশের জীবনকে আমার এতই উত্তেজনাময় বলে মনে হত, তার মধ্যে ডুব দিয়ে তাকে জানবার বুঝবার জন্যে আমি এত আগ্রহ বোধ করতুম যে, বর্ণমালা আর নামতায় আমার মনই বসত না।

সৌন্দর্যচর্চায় কোনও আগ্রহই আমার ছিল না। আর তাই. আমার দিদি যে সুন্দরী আর আমি যে তা নই, এর জন্যে আদৌ কোনও কষ্ট কখনও পাইনি। তবে হ্যাঁ, গায়ের রঙ ময়লা বলে আমার একটু অস্বস্তি ছিল, তাও তাই নিয়ে লোকে আমাকে খ্যাপাত বলে। বড্ড বেশী খ্যাপাত বলেই এ ব্যাপারে আমি একটু স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিলুম, নয়ত—সত্যি বলতে কী—নিজে আমি এ নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। অন্যদিকে, প্রশংসা, মনোযোগ, স্বীকৃতি, এ-সব কি আর চাইতুম না? খুব চাইতুম। কিন্তু আমাদের পরিবারের লোকজনেরা এর কোনওটিই আমাকে দেননি। শিগগিরই আমি বুঝতে পেরে গেলুম যে, বাড়ির লোকেরা আমার সম্পর্কে যতই উদাসীন হোক, বাইরের লোকেরা সবাই আমাকে চালাক ভাবে। তারা আমাকে 'বুদ্ধিমতী' বলে। কথাটা আমার কানে যেত। 'বুদ্ধিমতী' বলতে যে ঠিক কী বোঝায়, তা না-ই বুঝি, এটুকু বুঝতুম যে, কথাটা প্রশংসাবাচক। তাই আমার খুব আনন্দ হত, মুখে হাসি ফুটত। আমি চাইতুম, লোকে আমাকে ভালবাসুক, আমাকে নিয়ে আলোচনা করুক, আমাকে লক্ষ্য করুক। খুব অল্প বয়সেই আবছাভাবে এই একটা ব্যাপার আমি বুঝে গিয়েছিলুম যে, রূপ জিনিসটার এমন-কিছু মূল্য নেই। রূপ তো মানুষের আগ্রহ কাড়ে না; যা কাড়ে, তা হল ঝাঁজ, তেজ, উচ্ছলতা। তা দিনে-দিনে আমার ভঙ্গিতে একটা বেপরোয়া ভাব ফুটছিল তো, তার উপরে বয়সের তুলনায় একটু পাকা-পাকা কথা বলতুম। তাই দেখা গেল, দিব্যি আমি সকলের নজর কেড়ে নিচ্ছি। আমার মা আর ঠাকুমার জগৎটা ছিল খুব ছোট। দিদি যা কিছু প্রশংসা আর মনোযোগ পেত, তা এই ছোট্ট জগৎটার মধ্যে। বাইরে আমিই সর্বেসর্বা; সেখানে সকলের নজর আমার দিকে, দিদি তাই আড়ালে পড়ে যেত। দিদিকে আমি হিংসে করব কেন, এই অবস্থায় দিদি যদি আমাকে হিংসে করত, তবে সেটাই হত স্বাভাবিক। আমার এক মামাতো বোনের বিয়ে উপলক্ষে আমরা দিল্লি গিয়েছিলুম; সেখানে এই ব্যাপারটা খুব প্রকট হয়ে পড়ে।

সেকেলে-ধাঁচের এইসব বিয়েতে কয়েক সপ্তাহ তো বটেই, অনেকক্ষেত্রে কয়েক মাস আগে থাকতেই আত্মীয়স্বজনরা বিয়েবাড়িতে এসে জমায়েত হতে শুরু করেন। আমরাও বিয়ের তারিখের তা প্রায় মাস দুয়েক আগেই দিল্লিতে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম। বিয়ের উদ্যোগ-আয়োজনের জন্যে যে আমাদের যাবার দরকার ছিল, তা কিন্তু নয়। গিয়েছিলুম, তার কারণ, আমার দিদিমা তখন দিল্লিতে, আর মা-ও ভাবলেন যে, যাক, এই উপলক্ষে বেশ-কিছুদিন দিদিমার কাছে গিয়ে থাকা যাবে।

যে-বাড়িতে আমরা ছিল্ম, সেটা অনেক কালের প্রনো। বাড়ির নামটাও বেশ গালভরা। এই ধরনের বাড়ি যে সেই প্রথম দেখল্ম, তা নয়, তবে সেই প্রথম আমার পারিপার্শ্বিক সবকিছ্ আমার মনের উপরে খ্ব স্পষ্ট করে একটা ছাপ ফেলেছিল।

মোগল-আমলে এ-সব বাড়ি তৈরী হয়েছিল; হাকসার পরিবারের গোটা ইতিহাস এর ইঁট-কাঠের মধ্যে ধরা রয়েছে। আমরা যে-বাড়িতে ছিল্ম, এককালে তার আয়তন ছিল বিশাল। অনেক অংশে ভাগ করা। অন্দর-মহল, সদর-মহল, ঠাকুর-মহল, এমনি কত যে মহল ছিল, তার অন্ত নেই। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারের দিন তো আর নেই, দিন-বদলের সংগে-সংগে হাকসার-বংশের হরেক শরিকের মধ্যে বাড়িটা ভাগ হয়ে গেছে, এখানে-ওখানে দেওয়াল তুলে যে যার সীমানা নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। তবে কিনা বাড়িতে এখন বিয়ে হবে, প্রচ্র আত্মীয়স্বজন আসবে; তাদের থাকবার যাতে স্ববিধে হয়, তার জন্যে সেই শরিকানী দেওয়ালগ্লোকে এখন ভেঙে ফেলা হচ্ছিল।

জরাজীর্ণ বাড়ি, ঘরগ্লো নোংরা আর ঘ্পচিমতো। তব্ তারই মধ্যে যে একটা রহস্য, রোমাঞ্চ আর উত্তেজনার ব্যাপার ছিল, তাও ঠিক।

বছর কয়েক আগে এই বাড়িতে একবার মেরামতির কাজ হচ্ছিল, তখন এক জায়গায় মেঝে খ্ঁড়তে-খ্ঁড়তে একটা মাটির ঘড়া বেরিয়ে পড়ে। তাতে মোহর বোঝাই। এটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। লোকে বলে, সিপাহী মহাবিদ্রোহের সময়, দিল্লির রাষ্ট্রনৈতিক অনিশ্চয়তার দর্ন, হাকসাররা তাদের যাবতীয় ধনরত্ন এই বাড়ির মধ্যে প্ঁতে রেখে চটপট এখান থেকে সরে পড়েন। তারপর আবার তাঁরা ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু ধনরত্ন যে ঠিক কোথায় কোথায় প্ঁতে রেখেছেন, তার একটা নকশা ছিল তো, তা কেউ-কেউ বলে যে, ডামাডোলের মধ্যে সেই নকশাটা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিলেন, তাই আর সে-সব খ্ঁজে পাননি। তাঁদের ধনরত্ন তাই এই বাড়ির তলাতেই রয়ে গেছে। আবার এমন কথাও অনেকে বলে যে, না, তা নয়, হাকসাররা এখান থেকে চলে যাবার পরে অন্য-কেউ এই বাড়ি খ্ঁড়ে গ্প্তধন হাতিয়ে নিয়ে চলে যায়। এখন এই যে দ্টো কাহিনী, এর মধ্যে কোন্‌টা সত্যি? লোকে যে শ্ধ্ গ্প্তধনের কথা বলে, তা নয়। এমন কথাও বলে যে, এই বাড়িতে একটা ভ্ত আছে। প্রনো এই বাড়ির মধ্যে অনেকগ্লো চোরকুঠরি আছে, তারই একটায় সে থাকে, মাঝে-মাঝে তাকে দেখতেও পাওয়া যায়, তখন নানান রকমের জিনিসপত্র দিয়ে তাকে তুষ্ট করতে হয়। প্রনো ইতিহাস, রোমাঞ্চকর নানা কাহিনী আর কিংবদন্তী—এত সব ব্যাপারের মধ্যে থাকার একটা মজা আছে। সেবারে সেই মজা একেবারে প্রোমাত্রায় পাওয়া গিয়েছিল।

একে-একে আত্মীয়স্বজনরা এসে পড়তে লাগলেন। কেউ এলে স্টেশনে গিয়ে তাকে নিয়ে আসতে হয়। যে-ই স্টেশনে যাক, আমি তার সংগ নিতুম। এমনও হয়েছে যে, দিনের মধ্যে তিন-চার বার আমি স্টেশনে গিয়েছি। ছ্টোছ্টি, হট্টগোল—স্টেশনের পরিবেশের মধ্যে দার্ণ একটা উত্তেজনা আছে তো, সেটা আমার খ্ব ভাল লাগত। নতুন নাম, নতুন ম্খ; এমন সমস্ত আত্মীয়, যাঁদের অনেককে সেই আমি প্রথম দেখল্ম। অপরিচিত মান্ষদের সামনে অনেকে একট্ সংকোচ বোধ করে, কিন্তু আমার তো আর লজ্জা-সংকোচের বালাই ছিল না, আমি মান্ষ ভালবাসি, সংগ ভালবাসি, সক্কলকেই আমার খ্ব ভাল লাগত। সত্যি বলতে কী, দিল্লির সেই বিয়েবাড়িতেই আমার ভিতরকার আমিত্বটা যেন ম্ক্তি পেয়েছিল। কখনও এর কোলে বসছি, কখনও ওর কোলে, সারাক্ষণ বকর-বকর করে কথা বলছি, হরেক রকমের মজার-মজার টিপ্পনী কাটছি, লাফ দিয়ে একটা টেবিলে উঠে ছড়া আওড়াচ্ছি, বড়দের নকল করে বক্তৃতা দিচ্ছি, কিংবা হয়ত ইঙ্গিতে-ভরা এমন সব গান গাইছি, যার অর্থ আমি জানি না, কিন্তু অন্যেরা যা শ্নে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। অর্থাৎ ছ' বছরের একটা প্ঁচকে মেয়ের পক্ষে যতটা পাকামি করা

সম্ভব, তা করতে অন্তত আমার দিক থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি হয়নি। আত্মীয়-স্বজনদের মুখশ্রী কিংবা চেহারা সম্পর্কে আমি মজার-মজার সব মন্তব্য করতুম, একটুও ভয় পেতুম না। একজন তাঁর মুখ সম্পর্কে আমার মন্তব্য শুনতে চেয়েছিলেন। তাতে আমি বলেছিলুম, "তোমার মুখ তো আমি দেখতেই পাচ্ছি না, দাড়ি আর গোঁফেই তো সব ঢাকা পড়ে গেছে। যাও, আগে তোমার গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে এসো।" তাই শুনে তাঁর সে কী হাসি! হাসেন, আর সবাইকে ডেকে-ডেকে শোনান। সবাই হাসছিল। সবাই বলছিল যে, আমি দারুণ মজার কথা বলেছি। সেই বিয়েবাড়িতে আমিই সকলকে মাতিয়ে রেখেছিলুম। একজন তো আমাকে একটা রুপোর মেডেলও দিলেন। তার উপরে আমার নাম খোদাই করা। আমারই বয়সী আর-একটা মেয়েও সেই বিয়েবাড়িতে ছিল। তার গলা খুব মিষ্টি। সুন্দর গান গাইতে পারত। কিন্তু আমার আড়ালে সে যেন একেবারে ঢাকা পড়ে গেল। আমার উচ্ছলতা, আমার বেপরোয়া চালচলন, আমার পাকা-পাকা কথা, এরই জোরে আর-সবাইকে পিছনে ফেলে বিয়েবাড়িব আসরকে আমি জয় করে নিলুম। আমার যে একজন দিদি আছে, আর সে যে খুব সুন্দরী, অর্ধেক লোক সে-কথা জানতে পর্যন্ত পারল না।

স্বীকৃতি পেলুম। অন্যের মনোযোগ, তাও পাওয়া গেল। বাইরে সবাই আমার প্রশংসা করে, অথচ ঘরে আমি অবহেলার পাত্রী, এর জন্যে আমি বেদনা বোধ করতুম, এর অর্থ আমি বুঝে উঠতে পারতুম না। এমন একটা ভাব দেখাতুম যে, তা নিয়ে কোনও দুঃখ আমার নেই, অথচ ভিতরে-ভিতরে যে আমাদের পরিবারের স্বীকৃতি আমি চাইতুম, তাও তো অস্বীকাব করতে পারি না। যেটা চাই, সেটা মুখ ফুটে বলি না, একটা দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমার দিন কাটতে লাগল। খানিকটা দেখ্যানেপনা, খানিকটা বিদ্রোহ, এই নিয়েই তখনকার আমি।

* * *

প্রথম যখন ইশকুলে যাই, আমার বয়স তখন পাঁচ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। দিদির বয়স তখন সাত। সরাসরি তাকে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করে নেওয়া হল, আর আমাকে দেওয়া হল কিনডারগার্টেনে। আয়ারল্যানডের বিপ্লবী-নারী মিসেস অ্যানি বেসান্টের নাম কে না জানে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্ব-পূর্ণ। অন্যদিকে, তিনি ছিলেন একজন থিঅসফিস্ট বা দিব্যজ্ঞান-সন্ধানী। বারাণসীর যে ইশকুলে আমরা ভর্তি হলুম, সেটি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। এ-দেশের যে-ক'টি ইশকুলে প্রথম মন্তেসরি শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্তন করা হয়েছিল, এটি তারই একটি। ইশকুলে যেতে আমার আগ্রহের অন্ত ছিল না; তবে কিনা সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার পক্ষে খুব সুখের হয়নি। ব্যাপারটা আমার মনের উপরে গভীর রেখাপাত করে থাকবে। পরে আমার নোটবইয়ে রীতিমত নাটুকে ভাষায় এ সম্পর্কে কিছু লিখেওছিলুম। তারই কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি:

ইশকুল থেকে মেয়েটি বাড়িতে ফিরল। তার মনে তখন দারুণ উত্তেজনা। তার চোখ দুটি বিস্ফারিত। কে. জি. ইশকুলে আজই তার প্রথম দিন। এক টুকরো কাগজ বার করে তার মায়ের সামনে সে মেলে ধরল। দ্যাখো কী করেছি। কাগজের উপরে একটি বর্গক্ষেত্র আঁকা। বর্গক্ষেত্রের মধ্যে একটি বৃত্ত। আর সেই বৃত্তের মধ্যে একটি ত্রিভুজ। দারুণ জটিল ব্যাপার। আলাদা আলাদা রঙ দিয়ে ওগুলো ভরাট করতে হবে। এমন-ভাবে করা চাই, যাতে রঙ একটুও থেবড়ে না যায়। কঠিন কাজ। খুব কঠিন! উত্তেজনায় ওষ্ঠ দুটি অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে, অন্য আর কোনওদিকে মন নেই, একাগ্র চিত্তে, ঠিকমতো রঙ দিয়ে, সবকিছু সে ভরাট করেছিল। এখন সেই শিল্পকীর্তি সে তার মাকে দেখাচ্ছে। মা নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন। খুব তারিফ করবেন। কিন্তু কই, কোনও

প্রশংসার কথা তো শোনা গেল না। মা শুধু হাসলেন। তারপর বললেন, আজকালকার ইশকুলে বাচ্চাদের সব ছাইভস্ম শেখানো হচ্ছে! ইশকুলের দিদিমণি কিন্তু অন্য কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, চমৎকার রঙের কাজ হয়েছে, ক্লাসের মধ্যে তারটাই সেরা। সেই মুহূর্তেই তার বিশ্ব যেন দ্বি-ধা হয়ে গেল! তখন থেকেই সে দুই বিশ্বের বাসিন্দা!

* * *

আজ এখানে, কাল সেখানে, কী যে যাযাবরের জীবন তখন কাটিয়েছি! সদ্য ইশকুলে ভর্তি হয়েছি, এমন সময় বাবা হঠাৎ সাজাহানপুরে বদলী হয়ে গেলেন। নিরুত্তেজ ছোট্ট শহর, সেখানকার জীবন যেন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে চলত। মেয়েদের জন্যে ভাল কোনও ইশকুল সেখানে ছিল না। স্থানীয় কোনও মিশন একটা প্রাইমারী ইশকুল চালাতেন। কিন্তু বাবার সে-ইশকুল পছন্দ হল না। ঠিক করা হল, মাস্টার রেখে বাড়িতেই আমাদের পড়ানো হবে।

আমার তিন কাকার মধ্যে বড় দুজন লখনউয়ে তাঁদের মামাবাড়িতে থেকে পড়াশুনো করছিলেন। ছোটকাকা আমার চাইতে মাত্র আট বছরের বড়। তিনি থাকতেন আমাদেরই সঙ্গে। আগের বছর তাঁর টাইফয়েড হয়েছিল। তাতে ইশকুলে তাঁর একটা বছর কি তারও বেশী নষ্ট হয়ে যায়। তাই ঠিক হয়েছিল যে, বাড়িতে একটু বাড়তি লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে সেই ক্ষতিটাকে পূরণ করে দেওয়া হবে। ফল দাঁড়াল এই যে, মাস্টারমশাইয়ের উপরে মোট তিনজনের দায়িত্ব পড়ল। ছোটকাকার বয়স তখন চোদ্দ। তিনি তখন ক্লাস নাইনে পড়েন। দিদির বয়স আট। তার তখন ক্লাস ফোরে পড়বার কথা। আর আমার বয়স ছয়। আমার তখন অক্ষর-পরিচয়ও হয়নি।

একজন মাস্টারমশাই তিনজনকে পড়ান; সেই তিনজনের বয়স এক নয়, মেজাজও আলাদা, তার উপর আবার পাঠ্যক্রমও তিন রকমের। ফলে মাস্টারমশাইয়ের প্রাণ দুদিনেই ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। দিদি একেবারে আদর্শ ছাত্রী; কিন্তু আমার এই কাকাটি ছিলেন দারুণ চঞ্চল। বুদ্ধিমান হলে কী হয়, পড়াশুনায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। অন্যদিকে, আমি তো একদণ্ড চুপটি করে বসে থাকতে পারি না, সারাক্ষণ খালি বকর-বকর করতুম। মাস্টারমশাই তো অতিষ্ঠ। শেষে আমার বকবকানি থামাবার জন্যে তিনি একটা উপায় বার করলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি আমাকে দিয়ে শুধু বানান মুখস্থ করাতেন আর হাতের লেখা মকসো করাতেন। আসলে এটা আমার বকবকানির শাস্তি। কিন্তু তার ফল হল এই যে, না শিখলুম বানান, না হল হাতের লেখা মুক্তোর মতো। সাধারণ অনেক শব্দেরও আমি বানান ভুল করি, আর হস্তাক্ষরের কথা না-বলাই ভাল, নিজের হাতের লেখা নিজেই সর্বদা বুঝে উঠতে পারি না।

মাস ছয়েক বাদে মা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, আমার পড়াশুনো আদৌ এগোয়নি। মাস্টারমশাইকে তাই নিয়ে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন, "আপনার এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শেখানো আমার কর্ম নয়। আমার ধারণা, স্বয়ং ভগবান যদি একে লেখাপড়া শেখাবার ভার নেন, তো তাঁকেও হার মানতে হবে।"

মা অবশ্য ভগবানের হাতে আমাকে ছেড়ে দেননি; আমার জন্যে আলাদা করে তিনি একজন মাস্টারমশাইয়ের ব্যবস্থা করলেন। আমি তাঁকে 'পণ্ডিতজী' বলতুম। তিনি আমাকে হিন্দী আর অঙ্ক শেখাতেন। ইংরিজী তিনি আদপেই জানতেন না। তা না-ই জানুন, দিদি আর কাকার কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে এনে এই যে আলাদা করে শেখাবার ব্যবস্থা করা হল, এতে কাজ হল অনেকখানি। আমার বকবকানি থামল না বটে, তবে পড়াশুনায় উন্নতি হতে থাকল।

সংসারের নানান ঘটনায় আমার পড়াশুনায় অনেকবার ছেদ পড়েছে। এবারে আমার মেজকাকা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সন্দেহ করা হল, তাঁর যক্ষ্মা হয়েছে। ডাক্তাররা বললেন,

একটু ঠাণ্ডা জায়গায় যেতে পারলে ভাল হয়। তাই আমরা তাঁকে নিয়ে মুসৌরীতে চলে গেলুম। হিমালয়ের পাদদেশে এই শৈলাবাসের উচ্চতা হবে তা প্রায় সাত হাজার ফুট। সেখানে আমার দিদিকে এক ইংরিজী ইশকুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। আমি বাড়িতেই রইলুম। ছেলেভুলোনো ছড়ার মোটা একটা বইয়ের কথা আমার মনে পড়ে। মা সেই বইয়ের থেকে আমাকে কিছু ছড়া শেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দু-চার পাতা উলটে তাঁর নিজেরই মনে হল যে, এ অতি বাজে বই। আমারও সেইরকমটাই মনে হয়েছিল। যাই হোক, তখনকার মতো পড়াশুনোর ওইখানেই ইতি হয়ে গেল। মুসৌরীতে আমরা মাস পাঁচেক ছিলুম। কাকার স্বাস্থ্যের কোনও উন্নতি সেখানে হল না। ওদিকে খুব শীতও পড়ে গেল, ফলে মুসৌরী থেকে আমরা সাজাহানপুরে ফিরে আসি। যতদূর মনে পড়ছে, সেখানে ফিরবার পর মাসখানেকের জন্য আমাকে আর-একজন মাস্টারমশাই রেখে দেওয়া হয়েছিল। তারপরে এক বিয়ে উপলক্ষে আমরা দিল্লি চলে যাই। সেই বিয়েবাড়ির কথা আমি আগেই বলেছি। সেবারে দু'মাসেরও বেশী আমরা বাইরে ছিলুম। আমরা ফিরে আসবার অল্প কয়েক দিন বাদেই আমার কাকা মারা যান।

আমার বয়স তখন খুব কম বলেই হোক, কিংবা অন্য-সকলের, বিশেষ করে ছেলে-পুলেদের কাছ থেকে কাকাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যেই হোক, এই মৃত্যু আমার মনের উপরে বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি। শুধু মনে পড়ে যে, বাড়িতে তখন অনেক লোক এসেছিল। তাদের মধ্যে বেশির ভাগই এসেছিল ফৈজাবাদ থেকে। এই ফৈজাবাদেই আমাদের পৈতৃক ভিটে। বাড়িতে অনেক অনুষ্ঠান হয়েছিল, মনে পড়ে। তবে বাচ্চাদের সে-সবের কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হয়নি। বারো দিন ধরে অনুষ্ঠান চলল। সেই সময়ে বাড়িতে এক 'গুরুজী' এসেছিলেন। তিনি বেশ পণ্ডিত লোক। তার উপরে আবার পাকা জ্যোতিষী। আমার বাবা-মা তাঁর কাছে জ্যোতিষের পাঠ নিয়েছিলেন। মনে হয়, এ-ব্যাপারে মায়ের বিদ্যে কিছুটা এগিয়েছিলও।

কাকা যখন মারা যান, তাঁর বয়স তখন মাত্র বাইশ। এই মৃত্যুশোক আমার ঠাকুমার বুকে শেলের মতো বিঁধেছিল। কাকার জন্যে নার্স রাখব, এমন সামর্থ্য আমাদের ছিল না। সামর্থ্য থাকলেও নার্স রাখা হত কিনা, সেটা সন্দেহের বিষয়। তার কারণ, নার্স রেখে শুশ্রূষা করাবার চল তখনও হয়নি। বাইরের লোকের হাতে শুশ্রূষার ভার ছেড়ে দেবার কথা সেকালে ভাবাই যেত না; কেউ ছেড়ে দিলে সেটাকে মায়া-মমতার অভাব বলে গণ্য করা হত। কাকার শুশ্রূষার ভার নিয়েছিলেন আমার ঠাকুমা। শুকনো কর্তব্য-বোধের থেকে নয়। এইজন্যে নিয়েছিলেন যে, এটাই স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন ধরে কাকার তিনি সেবাযত্ন করেছেন। রীতিমত কঠিন কাজ। এই কাজের ভার তিনি একাই বইতেন। যক্ষ্মা তো খুব ছোঁয়াচে রোগ, কাকাকে তাই, অন্য-সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে ঠাকুমাও বাদবাকী সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতেন। সমস্ত সেবাযত্ন তাঁকে একাই করতে হত; এ-ব্যাপারে বাড়ির আর-কারও কাছ থেকে কোনও সাহায্য তিনি পাননি। কাকার মৃত্যুর পরে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন। বাবার মনে হল, দিন কয়েকের জন্যে ঠাকুমাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া দরকার।

* * *

ছুটি নিয়ে বাইরে যাওয়া বলতে এতদিন আমরা কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে—সাধারণত কোনও মামা কি কাকার বাড়িতে—যাওয়া বুঝতুম। তা বাবা এবারে ঠিক করলেন যে, কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে নয়, কাশ্মীরে গিয়ে আমরা ছুটি কাটাব।

প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য আমাকে বিশেষ টানত না। রাওয়লপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর অব্দি রাস্তাটা খুব খাড়াই আর ঘোরানো, এইটুকু মাত্র মনে আছে। আর মনে

পড়ে যে, সারাটা পথ আমার গা ভীষণ গোলাচ্ছিল।

কাশ্মীরে আমাদের এক আত্মীয়ের একটা ফলের বাগান ছিল। সেই বাগানের একেবারে মধ্যিখানে আমাদের আস্তানা। চারদিকে ফুলের গাছ। তাতে রসালো ফল ধরে আছে। কিন্তু মা আমাকে ফল ছিঁড়তে বারণ করে দিয়েছিলেন। তাই খুব কষ্ট হত। নয়ত জায়গাটা ছিল খুব সুন্দর। এই প্রথম আমি আঙুর-বাগান দেখলুম। বেঁটে বেঁটে আঙুর-লতা। তার থেকে থোকায় থোকায় একেবারে মাটি পর্যন্ত আঙুর নেমেছে। সাদা আঙুর, বেগনী আঙুর। দেখে আমার সে কী উত্তেজনা!

আমরা যখন কাশ্মীরে, সেইসময়ে সেখানে প্রবল বর্ষা নামে। তার সঙ্গে নামল জলের ঢল। অমন প্লাবন নাকি স্মরণকালের মধ্যে কাশ্মীরে আর দেখা যায়নি। শ্রীনগর তো বিতস্তার তীরে। ওই নদীর উপরে সাতটা সেতু। তার মধ্যে ছটাই হয় ভাঙল, নয় জলের নীচে তলিয়ে গেল। ফলে বাগানের মধ্যে সেবারে আমরা বন্দী হয়ে পড়ি। সেই সময়ে একদিন রাত্রে হঠাৎ কান্নার শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। শত শত মানুষ, সমস্বরে আর্তনাদ করছিল। শুনলুম, সরকার ঠিক করেছেন, শ্রীনগরের জলাধারের ফটক তাঁরা খুলে দেবেন। তা ছাড়া নাকি শহরটাকে বাঁচাবার উপায় নেই। কিন্তু শহরটাকে বাঁচাতে গেলে জলাধারের চারদিকের সব জমি যে ডুবে যাবে, তাও ঠিক। গরিব চাষীদের জমি, অনেক কষ্টে তারা ফসল ফলিয়েছে। ফটক খুলবার আগে সরকার তাঁদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দেবেন, কিন্তু তাদের মাঠের ফসল ডুববে। অর্থাৎ গরিব চাষীরা একেবারে সর্বহারা হয়ে যাবে। আসন্ন সেই সর্বনাশের কথা ভেবেই তারা কাঁদছিল। রাত্রির স্তব্ধতা তাদের কান্নার শব্দে ফালাফালা হয়ে যাচ্ছিল। এখনও সেই বিলাপ আমার কানে বাজে।

বন্যার জল শেষ পর্যন্ত সরে গেল। আমরাও তখন দ্রষ্টব্য কয়েকটা জায়গা দেখতে পারলুম। একদিন আমরা গুলমার্গে যাই। সেখানকার একটা ঘটনার কথা এখনও ভুলিনি। গুলমার্গের খ্যাতি তার সবুজ তৃণভূমির জন্যে। অনেকে এই তৃণভূমিকে ডেভনশায়ারের সবুজ চারণভূমির সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। আমার কিন্তু গুলমার্গের কথা ভাবতে গেলেই ছোট্ট একটি ইংরেজ ছেলের কথা মনে পড়ে যায়; আমার স্মৃতিতে গুলমার্গের সঙ্গে সেই ছেলেটি একেবারে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে।

চমৎকার রোদ্দুর উঠেছিল। টাট্টুঘোড়ায় চড়ে আমরা তন্‌মার্গ থেকে গুলমার্গে এলুম। দারুণ মজা লাগছিল। গুলমার্গে এসে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে চা খাওয়া হল। বাইরে গিয়ে চা খাবার রেওয়াজ আমাদের বড়-একটা ছিল না। সেদিক থেকে এও একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বই কী। হোটেলের সামনে একটা চিলড্রেন'স পার্ক। বিস্তর ছেলেমেয়ে সেখানে খেলছিল। তাদের প্রায় সকলেই ইংরেজ। দেখে আমারও খুব খেলতে ইচ্ছে হল। দিদি তো লাজুক, সে তাই গেল না। ফলে আমি একলাই সেই পার্কে গিয়ে ঢুকলুম। পার্কের মধ্যে একটা 'স্লিপ'। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে সবাই সরসর করে সেই স্লিপ দিয়ে নেমে আসছে। সিঁড়ির কাছে বেজায় ভিড়। ভিড় ঠেলে সিঁড়ি বেয়ে খানিক উঠেছি, এমন সময় উপরের ধাপ থেকে একটা ছেলে চেঁচিয়ে বলল, "উপরে আসতে চাও, কেমন?" নির্দোষ প্রশ্ন, এর মধ্যে যে কোনও দুষ্টুমি থাকতে পারে, তা আমি বুঝিনি, কিন্তু যেই না পরের ধাপে পা রেখেছি, ছেলেটা অমনি আমাকে তাক করে লাথি ছুঁড়ল। আমিও অমনি এক হাতে রেলিং ধরে অন্য হাতে তার পা চেপে ধরলুম। ছেলেটা টাল সামলাতে পারল না, হুড়মুড় করে নীচে এসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমি দমাদম ঘুঁষি মারতে লাগলুম তাকে। তারপর কাঁদতে কাঁদতে যে যার বাবা-মার দিকে দৌড় লাগালুম। তাঁরা তো হেসেই বাঁচেন না। আমার বাবা বললেন, ছেলেটার উদ্দেশ্য যা-ই হোক, সত্যি তো আর সে আমাকে মারতে পারেনি, বরং আমিই তাকে ঠ্যাং

ধরে ফেলে দিয়েছি, তার উপরে আবার ঘুষিও মেরেছি; সুতরাং আমার কাঁদবার কোনও কারণ নেই। কথাটা মিথ্যে নয়। লড়াইয়ে সেদিন আমিই জিতেছিলুম। তবু আমার কষ্ট হচ্ছিল এইজন্যে যে, ইংরেজ-বাচ্চার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না, এর আগে আর কেউই আমাকে লাথি মারতে সাহস পায়নি।

বাবা চাইতেন, যতক্ষণ পারা যায়, নিরিবিলি একটা জায়গায় বসে বসে বই পড়বেন। তাতেই তাঁর আনন্দ। অন্যদিকে, মায়ের আনন্দ বেড়াতে। ঘুরে ঘুরে তিনি সব দেখতে চান। মা বলতেন, বাবা আসলে বিভিন্ন জায়গার বর্ণনা পড়েই খুশী, জায়গাগুলোকে স্বচক্ষে দেখবার কোনও আগ্রহই তাঁর নেই। কথাটা একেবারে মিথ্যেও নয়। কোথায় নিজে দেখে আনন্দ পাবেন, তা নয়, লেখকদের বর্ণনার রঙই তাঁর মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করত। তাতেই তিনি মশগুল। এর মধ্যে একদিন ভোরবেলায় ঠাকুমা হঠাৎ পাহাড়ে আছাড় খেয়ে পা ভাঙলেন। বাস্, আমাদের ভ্রমণেরও অমনি ইতি হয়ে গেল। অন্য কোথাও যাওয়া হল না, শ্রীনগর ছাড়া অন্য কোথাও তো ভাল ডাক্তার পাবার উপায় নেই, তাই ঠাকুমাকে ডাক্তার দেখাবার জন্যে চটপট আমরা শ্রীনগরে ফিরে এলুম। এবারে আমরা হাউস-বোটে উঠলুম; অপেক্ষায় রইলুম, ঠাকুমা কবে ভাল হয়ে ওঠেন।

দুই দিকে শ্রীনগর শহর, মাঝখান দিয়ে নদী বয়ে গেছে। শহরের এক এলাকা থেকে আর-এক এলাকায় যেতে হলে তাই নৌকোর শরণ না নিয়ে উপায় নেই। বাবা একদিন জিনিসপত্র কিনে হাউস-বোটে ফিরেছেন, আর শিকারা অর্থাৎ ডিঙি-নৌকোটাকে হাউস-বোটের সঙ্গে কাছি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, এমন সময় কী খেয়াল হল, হাউস-বোটের জানালা দিয়ে আমি আর দিদি সেই শিকারায় গিয়ে নামলুম। নদীর স্রোত যেদিকে বইছে, শিকারাটার মুখও সেইদিকেই ফেরানো। স্রোতের উল্টোদিকে তার মুখটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া যে সম্ভব নয় তা তো আর আমি জানতুম না, তাই উল্টোদিকে মুখ ঘোরাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিছুতেই সেটা পারা যাচ্ছে না দেখে ঠিক করলুম যে, হাউস-বোটে উঠে শিকারার কাছি টেনে তার মুখটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেব। দিদি তো কাছি টেনে-টেনে শিকারাটাকে হাউস-বোটের প্রায় পাশাপাশি এনে ফেলেছে, হাউস-বোট আর শিকারার মধ্যে ব্যবধানও কমে এসেছে, এমন সময় হল কী, এক পা তুলে যেই হাউস-বোটের জানালায় রেখেছি, অমনি কাছিটা দিদির হাত ফসকে পড়ে গেল, আর আমিও অমনি জলের মধ্যে ঝপাং। দিদি তখুনি হাত বাড়িয়ে আমার একটা হাত ধরে ফেলেছিল, তাই রক্ষে, নয়ত নির্ঘাৎ ডুবে যেতুম। যাই হোক্, যে-ভাবে ভেসে রইলুম, তাও খুব স্বস্তিকর নয়। নদীতে দারুণ স্রোতের টান, দিদিও আমাকে টেনে তুলতে পারছে না, কোনক্রমে তো মাথাটাকে জলের উপরে ভাসিয়ে রেখেছি। কিছুক্ষণ এইভাবেই কাটল। না পারছি চেঁচাতে, বাবাকেও ডাকতে সাহস হচ্ছে না। কিন্তু ভিতর থেকেই বাবা আমার জলে পড়বার শব্দ শুনেছিলেন। বেরিয়ে এসে আমাদের তিনি ওই অবস্থায় দেখতে পেলেন। অবস্থাটা একদিকে যেমন ভয়াবহ, অন্যদিকে তেমনি হাস্যকর। বাবা তখুনি হাত বাড়িয়ে আমাকে জলের থেকে টেনে তুললেন। সবাই ভাবল, আতঙ্কে আমার বাক্য একেবারে লোপ পেয়েছে। নয়ত আমি নিশ্চয় চেঁচাতুম। আসলে আমি বকুনির ভয়ে চেঁচাইনি। কেউ অবশ্য আমাকে একটুও বকাবকি করল না। বরং খুব আদর করতে লাগল। দেখে তো আমি অবাক।

বাবার ছুটি ওদিকে ফুরিয়ে এসেছিল। ঠাকুমার ভাঙা-পা ঠিক হয়ে যেতেই আমরা সাজাহানপুরে ফিরে এলুম। কিন্তু সাজাহানপুরে সেবারে আমরা মাস-খানেকের বেশী থাকিনি, আর-একটা বিয়ে উপলক্ষে আর-এক জায়গায় আমাদের চলে যেতে হল। যাঁর বিয়ে, সম্পর্কে তিনি বাবার ভাই। ১৯২৯ সনটা ঐসব করতে-করতেই কেটে গেল; বলতে গেলে সে-বছর কোনও লেখাপড়াই আমার হল না।

কিন্তু পরের বছরে ঢুকবার আগে একটা ঘটনার কথা বলে নেওয়া দরকার। আমাদের জীবনে সে-এক দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার। সাজাহানপুরে সেই প্রথম বিজলি-বাতি এল, এবং প্রথম যে-ক'টা বাড়ি বিজলি বাতির আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, তার একটি হচ্ছে আমাদের বাড়ি। ওঃ সেদিন কী আনন্দ আমাদের। মাঝে-মাঝে আমরা লখনউ যেতুম। তখন পর্যন্ত লখনউই ছিল আমার কাছে সবচাইতে আধুনিক, সবচাইতে জমকালো আর সবচাইতে ঝলমলে শহর। লখনউ শহরে কেনাকাটার কেন্দ্র হচ্ছে হজরতগঞ্জ বলে ছোট্ট একটি এলাকা। সেখানে গেলে আমার চোখ যেন ধাঁধিয়ে যেত। লখনউয়ের নতুন রেল-স্টেশন তখন সদ্য তৈরী হয়েছে। লাল পাথরের বাড়ি, আলোয় যেন ঝলমল করছে, আমার মনে হত, সারা বছরই সেখানে যেন 'দেওয়ালী' চলছে। এবারে আমাদের নিজেদের বাড়িতেই সেই বিজলি বাতির ছটা। বোতাম টিপলেই সমস্ত ঘর আলোয় ভরে যায়; ফ্যানের রেগুলেটার ঘোরালেই ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। সে যে কী আনন্দের ব্যাপার। যেন জাদুর খেলা। রহস্য আর আনন্দে ঠাসা ভোজবাজি!

* * *

পরের বছরটার কথা আমার বিশেষ করে এইজন্যে মনে আছে যে, সেবারে আমাদের জন্যে পর-পর বেশ কয়েকজন মাস্টারমশাই রাখা হয়েছিল। একজনের পর একজন আসেন, আর চলে যান। যখন কোনও মাস্টারমশাই থাকতেন না, তখন বাবা নিজেই আমাদের পড়াতে বসতেন। বাবার ভয়ে আমি আর কাকা একেবারে কাঁটা হয়ে থাকতুম। বাবার পড়ানো, সে যেন অতর্কিতে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। সৌভাগ্যবশত বেশীক্ষণ তিনি পড়াতে পারতেন না। সারাদিন অফিস করে খুব ক্লান্ত হয়ে থাকতেন তো, তাই পড়াতে-পড়াতেই অনেক সময় ঘুমিয়ে পড়তেন। আমরাও তক্কে তক্কে থাকতুম। বাবার নাক-ডাকানি শুরু হলেই পা টিপে টিপে ঘরের থেকে বেরিয়ে যেতুম আমরা। তারপর দে ছুট। আমাদের বানান শেখাবার জন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। কমলা-রঙের একখানা বইয়ের কথা এখনও আমাব স্পষ্ট মনে আছে। এ. এল. ব্রাইটের গল্পমালা। বইখানার প্রথম পৃষ্ঠা সব সময়ে খোলা থাকত। ওই প্রথম পৃষ্ঠার বানানগুলিই আমি রপ্ত করে উঠতে পারিনি; ওদিকে বাবারও ধনুর্ভঙ্গ পণ, প্রথম পৃষ্টার বানান ভাল করে না-শেখা পর্যন্ত তিনি পাতা উলটে এগোবেন না। বাবা এইসময়ে শিশুপাঠ্য অনেক বই আমাদের এনে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে যে-বইখানার কথা আমার সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে, সেটি হল 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'। বিচিত্র ব্যাপার, শিশুপাঠ্য বই আমার একদম ভাল লাগত না। কেউ যখন পড়ে শোনাত, তখনও না। বানানও আমাকে আর শিখতে হয়নি।

প্রথম যে মাস্টারমশাই আমাদের পড়াতে এলেন, তাঁর উচ্চারণ ছিল ভয়াবহ। এল্, এম্, এন্, এস্ না বলে তিনি বলতেন ইয়াল, ইয়াম, ইয়ান, ইয়াস। শুনে যে আমার কী হাসি পেত, সে আর কী বলব! উচ্চারণ নকল করে সামনাসামনি তাঁকে ঠাট্টা করতেও ছাড়তুম না। বেচারা মাস্টারমশাই! চাকরি ছেড়ে তাঁকে বিদায় নিতে হল। অন্যেরা যে কেন এলেন, আর গেলেনই বা কেন, তা আর এখন আমার মনে পড়ে না। একজনের কথা এখনও মনে আছে। পরাগের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, প্রজাপতিরা এক ফুলের থেকে অন্য ফুলে পরাগ নিয়ে যায়। তাঁর কথা বিশ্বাস করতে হলে মানতে হয় যে, পেঁপেগাছেরও স্ত্রী-পুরুষ ভেদ রয়েছে; কোনও-কোনও পেঁপেগাছ পুরুষ, এবং কোনও-কোনও পেঁপেগাছ মেয়ে। কথাটা আমার এতই উদ্ভট লেগেছিল যে, মুখের উপরেই তাঁকে আমি 'বোকা' বলে দিয়েছিলুম। সম্ভবত পরে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন; এর পরে আর কখনও তিনি প্রসঙ্গটা উত্থাপন করেননি।

ভাবতে এখন অবাক লাগে যে, কী করে বাচ্চা হয়, তা নিয়ে কোনও কৌতূহলই

আমার ছিল না। গর্ভবতী স্ফীতোদরা অনেক নারী আমি দেখেছি। আমি জানতুম যে, পেটের মধ্যে বাচ্চা রয়েছে বলেই তাদের পেট অমন ফুলে উঠেছে। কিন্তু তাদের পেটের মধ্যে বাচ্চা এল কী করে, আমার মনের মধ্যে কখনও এই প্রশ্নের উদয় হয়নি। অন্যদিকে, পেটের থেকে বাচ্চা কী করে বার হয়, তা জানতে আমার কৌতূহল হত। এ নিয়ে আমার আয়াকে আমি প্রশ্নও করেছিলুম। কিন্তু আয়া দেখলুম আমার মায়ের দিকে তাকাচ্ছে। মা তাকে ইশারায় বললেন যে, প্রশ্নটার সে যেন কোনও উত্তর না দেয়। আয়া তাই চুপ করে রইল। এমন একটা সহজ প্রশ্ন, বুঝতে পারলুম না, এর উত্তর দিতে এদের এত দ্বিধা কেন। যাই হোক, আমার সেদিন ধাঁধা লেগেছিল ঠিকই, তবে ব্যাপারটা নিয়ে খুব-একটা ভাবিতও হইনি। উত্তরের জন্য পীড়াপীড়িও করিনি। আসলে যৌন সম্পর্কের ব্যাপারটা নিয়ে আমার কৌতূহল ছিল খুব কম। এত কম যে, সে-কথা ভাবতে গিয়ে এখন অবাক লাগে।

*　　*　　*

আমাদের ছবি আঁকা শেখাবার জন্যে বাবা একজন মাস্টারমশাই রেখে দিয়েছিলেন। তিনি শুধু রবিবারে আসতেন। বাবা আর তিনি এককালে একই ইশকুলে—সম্ভবত একই ক্লাসে—পড়তেন। মাস্টারমশাইয়ের যে তখন খুব টাকাকড়ির টানাটানি যাচ্ছিল, তা আমি জানতুম না। বাবা আসলে তাঁকে সাহায্য করতে চাইছিলেন। কিন্তু এমনিতে তাঁকে সাহায্য করতে গেলে তাঁর আত্মসম্মানে লাগতে পারে, তাই আমাদের ছবি আঁকা শেখাবার অছিলায় তাঁকে গৃহশিক্ষকের চাকরি দেওয়া হল। নয়তো আমাদের আঁকিয়ে করে তুলবাব জন্যে যে বাবার খুব-একটা গরজ ছিল, তা নয়। মাস্টারমশাইয়ের আসবার কোনও নির্দিষ্ট সময় ছিল না। দুপুরের খাওয়ার পরে, অর্থাৎ বেলা এগারোটার পরে, যে-কোনও সময়ে তিনি এসে পড়তে পারতেন। থাকতেনও তাঁর যতক্ষণ খুশি। অনেক দিন তো বিকেলের চা খেয়ে তারপর তিনি ফিরতেন।

কোনও-কিছু দেখে একেবারে হুবহু সেইটাকে আঁকায় আমার আদৌ উৎসাহ ছিল না; ব্যাপারটাকে খুব বিরক্তিকর বলে মনে হত। অন্যদিকে, জলরঙের কাজ আমাকে দারুণ টানত। যেমন অন্যান্য ব্যাপারে, তেমনি আঁকার ব্যাপারেও প্রশংসা পেত দিদি। বাড়ির সবাই যেন ধরেই নিয়েছিল যে, এ-কাজটাও দিদি আমার চাইতে ভাল পারে। তা মাস্টারমশাই একদিন আমাদের জ্যামিতির নকশা কেটে একটা প্যানেল করতে বললেন। কাজটা দুজনকেই করতে বললেন বটে, কিন্তু যেমন মাস্টারমশাইয়ের তেমনি বাবারও নজর রইল দিদির দিকে। মাঝে-মাঝেই তাকে তাঁরা উৎসাহ দিচ্ছিলেন। আমার দিকে কেউ একবার ফিরেও তাকালেন না।

আমি তো দিদির আগেই প্যানেল তৈরী করে হুটোপাটি শুরু করে দিলুম। তারপর দিদির আঁকা শেষ হবার পরে দুজনের কাজ মিলিয়ে দেখা হল। তখন কিন্তু দুজনকেই স্বীকার করতে হল যে, আমার কাজটাই ভাল হয়েছে। শুনে তো আমার আনন্দ ধরে না।

মাস্টারমশাই একদিন এক গেলাস জল চেয়েছিলেন। ধাতুর তৈরী যে-সব গেলাস আমাদের বাড়িতে ব্যবহার করা হত, তারই একটায় তাঁকে জল এনে দিলুম। তাতে তিনি যেন একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন; তারপর বললেন, রুপো কিংবা কাঁচের গেলাসে জল এনে দাও। ব্যাপারটার অর্থ আমি বুঝতে পারলুম না। বাড়িতে যে কাঁচ কিংবা রুপোর গেলাস ছিল না, তা নয়, কিন্তু বিশেষ-বিশেষ দিনে কিংবা বাড়িতে কোনও অতিথি-অভ্যাগত এলে সেগুলি ব্যবহার করা হত। নিত্য যে সাধারণ গেলাস ব্যবহার করা হয়, মাস্টারমশাই তাতে জল খেতে চাইছেন না দেখে বিস্ময়বোধ করেছিলুম। আমরা যাতে জল খাই, তিনি তাতে জল খেতে পারেন না? কেন, কী এমন অসাধারণ

ব্যক্তি তিনি? ব্যাপারটাকে আমার ঔদ্ধত্য বলে মনে হয়েছিল। মাস্টারমশাই চলে যাবার পরে সন্ধ্যায় আমার বাবা-মাকে এই অদ্ভুত ব্যাপারের কথা বলেওছিলুম আমি। শুনে বাবা তো হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন যে, মাস্টারমশাই মুসলমান। এও বললেন যে, গোঁড়া হিন্দু-পরিবারের লোকেরা তাদের নিজেদের ব্যবহারের বাসনপত্র সাধারণত মুসলমানদের ব্যবহার করতে দেয় না। যারা হিন্দু নয়, তাদের জন্য অনেকক্ষেত্রে তারা আলাদা এক সেট বাসনপত্র রাখে। মাস্টারমশাই সেটা জানেন বলেই আমাদের গেলাসে তিনি জল খেতে চাননি। কিন্তু বাবার এই ব্যাখ্যাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। তাঁকে তাই নানান রকমের প্রশ্ন করতে লাগলুম। মাস্টারমশাই যদি মুসলমান, তো আমরা কী? কে মুসলমান, আর কে মুসলমান নয়, সেটা বোঝা যাবে কী করে? মাস্টারমশাইয়ের চেহারা তো আমাদেরই মতো। তফাতটা তাহলে কোথায়? কিসের তফাত? কাঁসা কিংবা পিতলের গেলাসের সঙ্গেই বা রুপো কিংবা কাঁচের গেলাসের তফাত কী? আমার মনের মধ্যে সেদিন অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। কিছু প্রশ্নের জবাব পেয়েছিলুম; কিছু প্রশ্নের পাইনি।

*   *   *

এই সময়ে আমাদের শহরে এক গায়ক এসেছিলেন। শোনা গেল, ভারতীয় রাগ-সংগীতে তাঁর খুব দখল। জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি তখন ছাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বাবার সঙ্গে একদিন তাঁর গান শুনতে গিয়েছিলুম। এতকাল আমি জানতুম যে, বাণী আর সুর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, পরস্পরের থেকে তাদের আলাদা করবার উপায় নেই। কথা ছাড়া কি গান হয়? অথচ এই মানুষটি দেখলুম, প্রায় 'বিনাবাক্যে' গান গাইছেন, সেইসঙ্গে বিচিত্রভাবে তাঁর হাত, মুখ আর ঘাড়ের নানারকম ভঙ্গি করছেন। আমার বয়স তখন খুব কম। ভদ্রলোকের গান গাইবার ভঙ্গি দেখে আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। আমার বাবাও গান সম্পর্কে কিছু জানতেন না। তবে তিনি বললেন যে, এতে হাসির কিছু নেই, ভারতীয় রাগ-সঙ্গীত এইভাবেই গাইতে হয়, প্রথমটায় ঠিক বোঝা যায় না বটে, কিন্তু শুনতে-শুনতে কান তৈরী হয়ে যায়, তখন ভাল লাগতে থাকে। আমার সন্দেহ কিন্তু গেল না। ওদিকে, আমার মায়ের পীড়াপীড়িতে, আমাদের গান শেখাবার জন্যে তাঁকে নিযুক্ত করা হল। ঠিক হল, সপ্তাহে দুদিন তিনি আমাদের তালিম দেবেন। আমাদের শিক্ষা অবশ্য আদৌ এগোল না। মাস্টারমশাই সৎ মানুষ। মাকে তিনি খোলাখুলি জানালেন যে, গানের কানই আমাদের নেই, সুতরাং আমাদের গান শেখাবার চেষ্টা নেহাতই পণ্ডশ্রমের ব্যাপার হবে, তাতে দু পক্ষেরই সময় নষ্ট। মায়ের কিন্তু দিব্যি সুরজ্ঞান ছিল। শেষপর্যন্ত ঠিক হল, তিনিই গান শিখবেন। ধরে নেওয়া হল যে, মায়ের মুখে গান শুনলে এবং বাড়ির মধ্যে মোটামুটি একটা গানের আবহাওয়া গড়ে উঠলে, কালক্রমে আমরাও হয়ত গানের দিকে আকৃষ্ট হতে পারি। হারমনিয়ম বাজিয়ে মা গান গাইছেন, এই দৃশ্য আজও আমার চোখে ভাসে। তবে দৃশ্যটা আমার খুবই হাস্যকর লাগত।

*   *   *

আমরা কখনও জীবজন্তু পুষিনি। আমাদের বাড়ির পিছন-দিককার উঠোনে মস্ত একটা বুগনভিলিয়ার ঝাড় ছিল। দেওয়াল থেকে দেওয়ালে চলে গিয়েছিল তার লতা। তাতে বেগনী রঙের ফুল ফুটত। ঝাড়ের মধ্যে পাখির বাসাও ছিল অনেক। অধিকাংশই চড়ুই। আমাদের একজন চাকর ছিল, সে ফাঁদ পেতে চড়ুই ধরে এনে আমাদের দিত, তারপর রঙের বালতিতে সেই চড়ুইগুলিকে চুবিয়ে আমরা ছেড়ে দিতুম। লাল, নীল, হলুদ—হরেক রঙের চড়ুই। পরে ওই রঙ দেখেই বুঝতে পারতুম, ওরা 'আমাদের' পাখি।

ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে একদিন অনেকগুলো বেড়াল-ছানা দেখতে পাই। বেড়ালটা তখন

সেখানে ছিল না। একটা বাচ্চা দেখলুম ধপধপে সাদা। সেটিকে আমাদের খুব ভাল লাগল। বাইরে নিয়ে এসে অনেকক্ষণ তার সঙ্গে খেলা করলুম আমরা, তারপর—তাদের মা ফিরে আসবার আগেই—তাকে আবার ভাঁড়ার-ঘরের মধ্যে রেখে এলুম। পরদিন সকালে মিউ-মিউ ডাক শুনে ছুটে গিয়ে দেখি, বেড়ালটা তার অন্য বাচ্চাগুলোকে নিয়ে সরে পড়েছে, ফেলে রেখে গেছে শুধু সাদা বাচ্চাটাকে। মিউ-মিউ করে সেটা তার মাকে খুঁজছিল। সেই কান্না শুনে আমিও কাঁদতে লাগলুম। আমাকে কাঁদতে দেখে বাড়ির সবাই তো হেসেই বাঁচে না। সবচেয়ে বেশী হাসছিলেন মা। আমাকে তিনি ঠাণ্ডা করতে লাগলেন। বললেন যে, আমার ধাত বড্ড নরম। যাই হোক, বাচ্চাটাকে তো এখন একটু যত্ন-আত্তি করা দরকার। কে করে? আমি দেখলুম, আমার দ্বারা হবার নয়। দিদি তখন সেটাকে খাওয়াল-দাওয়াল, তার যত্ন-আত্তির ভার নিল। আর আমি শুধু কেঁদে বেড়াতে লাগলুম। সারাক্ষণ আমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে; বাড়ির সবাই তখন এই নিয়ে আমাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ নেহাত কম করেনি।

গার্ল গাইডের খাতায় নাম লিখিয়েছিলুম কেন, জানি না। তবে লিখিয়েছিলুম এটা ঠিক। বয় স্কাউট আর গার্ল গাইডদের সম্মিলিত প্রাদেশিক সমাবেশের উদ্যোগ চলছে তখন, হাতে আর মাত্র দু সপ্তাহ সময়, আমরাও তাই সিগন্যালিং, দড়ির নানারকম ফাঁস বানানো, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি সব ব্যাপারের কায়দা-কৌশলগুলো চটপট শিখে নিচ্ছি। দিদি সেগুলো যত্ন করে শিখল, ফলে তার পরীক্ষার ফলও খুব ভাল হল। আমি কিন্তু একটা পরীক্ষাতেও পাশ করতে পারলুম না। ঠিক হয়েছিল, আমরা সবাই খুচরো কিছু-কিছু হাতের কাজ করে স্কাউট আর গাইডদের তহবিলের জন্যে যতটা পারি টাকা তুলে দেব। কাকা ঠিক করলেন, তিনি জুতো পালিশ করে টাকা তুলবেন। আর আমি সেখানে বাটনহোল বেচে টাকা তুলব ঠিক করলুম। দিদি তো ভারী লাজুক, সে তাই কিছু করল না। তা দেখলুম যে, ও-সব দড়ির ফাঁস-টাস লাগানোর চাইতে বাটনহোল বিক্রি করা অনেক মজার ব্যাপার। সমাবেশ যেদিন শেষ হয়, জেলার কমিশনার সেদিন সমাপ্তি-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক ইংরেজ। আমি তো একগাল হেসে তাঁর দিকে একটি বাটনহোল এগিয়ে ধরলুম। তিনি সেটি নিয়ে আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু আমি অকুতোভয়ে তাঁকে বললুম, "শুধু ধন্যবাদ দিলে হবে না, দামটাও দিতে হবে, বাটনহোলের দাম দিন।" সবাই হেসে উঠল। ভদ্রলোকও খুব অপ্রস্তুত হয়ে আমাকে একটা টাকা দিলেন।

রাত্তিরে আগুন জ্বালা হল। অনেকে গান গাইল; বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে-সব দল এসেছিল, তাদের বিচিত্র-অনুষ্ঠান দেখলুম। তারপর হঠাৎ একজন আমাকে একটা টেবিলের উপরে তুলে দিল। কী না আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। বিরাট সমাবেশ। হাজারের বেশী লোক এসেছে। আমি কিন্তু একটুও ঘাবড়ালুম না। অসংকোচে বক্তৃতা দিতে শুরু করলুম। কী যে সেদিন বলেছিলুম, আজ আর তা মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে যে, বক্তৃতা শেষ করে টেবিল থেকে নামবামাত্র হাততালির ঝড় উঠেছিল। সেদিন যে সার্টিফিকেট আমাকে দেওয়া হয়েছিল, তার ফিতেটা ছিল উজ্জ্বল-নীল। সেক্ষেত্রে আমার দিদির সার্টিফিকেটের ফিতে ছিল ফিকে-লাল। গার্ল গাইডদের যা জানতেই হয়, মামুলী সেই ফাঁস সিগন্যালিং ইত্যাদির জন্য সে সার্টিফিকেট পেল। আর আমি পেলুম 'মিষ্টি আবৃত্তি'র জন্য।

বাড়িতে সেদিন সবাই আমার পিছনে লেগেছিল। বলছিল যে, আমাকে যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে, সেটা আসল নয়, জাল। আবৃত্তির জন্যে গার্ল গাইডকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, এমন কথা কেউ শুনেছে নাকি? কেন যে এসব কথা বলা হয়েছিল, আমি জানি। আমার যোগ্যতায় তো আমাদের বাড়ির কেউ কখনও আস্থা রাখেনি;

অন্যদিকে, আমাকে খেপিয়ে দিদিকে তারা সান্ত্বনা দিতে চাইছিল। দিদি যে খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আর আমি? যখন দেখলুম, আমার সাফল্যে কেউ খুশী নয়, সমস্ত আনন্দ তখন নিমেষে নিবে গিয়েছিল।

* * *

১৯৩০ সাল। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে তখন আগুন জ্বলছে। সর্বত্র চলছে আইন অমান্য আন্দোলন। অথচ আমাদের ঘুমন্ত ছোট্ট শহরে যেন তার কোনও তরঙ্গ এসে পৌঁছত না। আগের গ্রীষ্মে, খাদি প্রচারের জন্য গান্ধীজী সাজাহানপুর এসেছিলেন। আবছা-মতন মনে পড়ে যে, আমি তাঁর একটি সভায় গিয়েছিলুম। গান্ধীজী চাইতেন, মেয়ে পুরুষ সবাই তাঁর সভায় আসুক। সেই সভাতেও নিশ্চয় মেয়ে পুরুষ সবাই এসেছিলেন। আমার কিন্তু পুরুষদের কথা মনে পড়ে না। শুধু নারী আর শিশুদের কথাই মনে পড়ে। সভা হয়েছিল খোলা মাঠে। মাটির উপরে বসে সবাই তাঁর কথা শুনেছিলেন। এখানে-ওখানে গ্যাস-বাতির উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল। উঁচুমতন একটা মঞ্চে হ্রস্ববসন একজন মানুষ বসে আছেন, চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা. এই ছবিটা আজও ভুলিনি। অল্প দু-চার কথা তিনি বলেছিলেন, তার মধ্যে 'দরিদ্রনারায়ণ'-এর উল্লেখ ছিল, কিন্তু সে-সব কথার তাৎপর্য আমি তখন বুঝতে পারিনি। ডাকসাঁইটে বক্তা তিনি ছিলেন না। মা চাননি যে, সভার মধ্যে কেউ আমাদের চিনে ফেলুক; আমরা তাই পিছন দিকে, অন্ধকারের মধ্যে বসে ছিলুম। হঠাৎ দেখলুম, মেয়েরা তাঁদের বালা, দুল, হার ইত্যাদি সব গয়না খুলে নিয়ে গান্ধীজীর হাতে তুলে দিচ্ছেন। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। আমার মনের উপরে এই ব্যাপারটা খুব ছাপ রেখে গিয়েছিল। আমার তো তখন গয়না বলতে কিছু ছিল না; থাকলে আমি যে স্বেচ্ছায় সব গান্ধীজীকে সেদিন দিয়ে দিতুম, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

গান্ধীজীর আগমন উপলক্ষে আমাদের শহরে সেবারে ছোট্ট একটা ঘটনা ঘটেছিল, এবং সেটা সকলের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। গান্ধীজী যেদিন আসেন, পুলিশ-সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট সেদিন ডিউটিতে ছিলেন। তিনি আমার বাবার বন্ধু। ট্রেন থেকে গান্ধীজী প্ল্যাটফর্মে নেমেছেন, এমন সময় ইউনিফর্ম-পরা অবস্থাতেই তিনি নিচু হয়ে গান্ধীজীর পায়ের ধুলো নেন। এই খবর শুনে ব্রিটিশ সরকারের বড়কর্তারা তো রেগে আগুন। পুলিস-সুপারিণ্টেন্ডেণ্টের কাছে তাঁর আচরণের কৈফিয়ত চাইলেন তাঁরা। উত্তরে তিনি জানালেন যে, কোনও হাঙ্গামা না হয় এবং শান্তি-শৃঙ্খলা কোনরকমে ক্ষুণ্ণ না হয়, এইটে দেখবার জন্যই তিনি ডিউটি দিচ্ছিলেন। সেইটেই তাঁর কাজ, এবং তাতে কোনও ত্রুটি ঘটেনি। অন্যদিকে, যাঁকে তিনি একজন মহামানব ও দেশপ্রেমিক বলে মনে করেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার ব্যাপারে তাঁর ডিউটি নিশ্চয় বাধা হতে পারে না। এ যে-সময়কার কথা বলছি, তখন এই রকমের কাজ করতে হলে প্রচুর সাহসের দরকার হত। সন্দেহ নেই, এই পুলিস-সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট একজন অসমসাহসী মানুষ।

লবণ-সত্যাগ্রহের জন্য গান্ধীজীকে যেদিন গ্রেপ্তার করা হয়, এমন কী সাজাহানপুরও সেদিন প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সর্বত্র হরতাল। কাকা দিদি আর আমিও সেদিন দারুণ উত্তেজিত। দেশ জুড়ে যে আন্দোলন হচ্ছে, কোনও-না-কোনওভাবে আমরাও তার সামিল হতে চাইছিলুম। কিন্তু ঠিক কী যে করা যায়, তা বুঝে উঠতে পারছিলুম না। শেষ পর্যন্ত বড়রাস্তায় গিয়ে, যা-কিছু রাজনৈতিক স্লোগান মাথায় আসে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগলুম। নির্জন রাস্তা, আমাদের স্লোগান শুনবার মতো একটিও মানুষ সেখানে নেই, কিন্তু তা না-ই থাক, খুব খানিকটা চেঁচিয়ে যেন ভিতরকার একটা আবেগকে খানিক মুক্তি দেওয়া গেল, বেশ হাল্কা হয়ে খুশী মনে সেদিন বাড়ি ফিরেছিলুম।

এইসময়ে একদিন কাগজে একটা ছবি আমার চোখে পড়ে। ছোট্ট তিনটি শিশু, আর আমার দিদির চেয়ে সামান্য বড় একটি মেয়ের ছবি। দেশ জুড়ে যে আন্দোলন চলছে, তারাও নাকি তার সঙ্গে জড়িত। এতটুকু মেয়ে, অথচ লবণ বানাবার আন্দোলনে যোগ দেবার সুযোগ এরা পেয়েছে, আর সেইজন্যে কাগজে এদের ছবিও ছাপা হয়েছে; অপরিচিত সেই শিশুদের সম্পর্কে সেদিন খুব ঈর্ষান্বিত হয়েছিলুম।

ছবিটা দেখেই মা বলে উঠলেন, "আরে, এ তিনটি নিশ্চয়ই স্বরূপের মেয়ে, আর এই মেয়েটি নিশ্চয়ই কমলার।" আমি তো অবাক। মা কি এদের চেনেন নাকি? কী করে চিনলেন? নেহরু-পরিবারের কথা সেই আমি প্রথম শুনলুম। টুকরো-টুকরো কত কথা যে মনে রেখেছি।

আমার ঠাকুমার এক বোনের বিয়ে হয়েছিল নেহরু-পরিবারে। সেকালে কোনও পরিবারে কারও বিয়ে হবার সঙ্গে-সঙ্গে গোটা পরিবারের সঙ্গেই একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হত। মতিলালজীর সঙ্গে ঠাকুর্দার পরিচয় ছিল খুব ঘনিষ্ঠ, ঠাকুর্দার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তিনি উপস্থিত ছিলেন। মোতিলালজীর সম্পর্কে গল্প শোনা যেত যে, তাঁর জামাকাপড় প্যারি থেকে ধোলাই হয়ে আসে। তা ছাড়া শুনেছিলাম, আনন্দ-ভবনে এমন সব চেয়ার আছে, যাতে কেউ বসলেই অমনি টুংটাং করে বাজনা শুরু হয়ে যায়। সেই মোতিলালজী তো ফিনফিনে জামাকাপড় ছেড়ে দিয়ে খাদি ধরলেন। শুনে আমার ঠাকুমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। মোতিলালজীর মতো শৌখিন মানুষ হাতে-বোনা চটের-মতো-মোটা কাপড় পরবেন, ঠাকুমার এ-কথা ভাবতে ভীষণ-খারাপ লেগেছিল: তাঁর ভাবনা হয়েছিল, মোতিলালজীকে এর ফলে ঘামাচিতে না কষ্ট পেতে হয়। আমার বাবার যখন বিয়ে হয়, কমলা স্বরূপ আর কৃষ্ণা তখন দিল্লিতে। স্বরূপরাণীজী বিশেষ করে তাঁদের বলে পাঠিয়েছিলেন যে, দুই পরিবারের বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে এই বিয়েতে তাঁরা যেন অবশ্যই উপস্থিত থাকেন। শুনেছি, বিয়েবাড়ির ভোজের আসরে তাঁদের নিয়ে সেদিন এক মস্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়।

ব্যাপারটার মূলে হচ্ছে এই। আমাদের সমাজের বিষণ নারায়ণ দার নামে এক ভদ্রলোক বিদেশে গিয়েছিলেন। স্বদেশে ফিরে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন। তার ফলে অনেকে তাঁকে সমাজে গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু আরও অনেকে করলেন না। সমাজ তখন দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল। যাঁরা তাকে গ্রহণ করলেন, তাঁদের নিয়ে গড়ে উঠল বিষণ-সভা; আর যাঁরা করলেন না, তাঁদের নিয়ে গড়ে উঠল ধর্ম-সভা। এ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রেষারেষির ভাবটা ছিল খুব তীব্র। দুই গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিয়ে হবার উপায় ছিল না; এমন কী, এক গোষ্ঠীর ভোজের আসরকে পর্যন্ত অন্য গোষ্ঠীর লোকেরা এড়িয়ে চলত। মোতিলালজীও বিদেশে গিয়েছিলেন; কিন্তু স্বদেশে ফিরে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতেও রাজী হলেন না। বললেন, এ-সব নেহাতই বুজরুকির ব্যাপার। ফলে বিষণ-সভাও দু ভাগ হয়ে গেল। মোতিলালজীর সমর্থকরা দূরে সরে গেলেন; নিজেদের গোষ্ঠীকে তাঁরা বলতেন সত্য-সভা। অনুমান করি, আমার মাতুলবংশের (খুবসম্ভব পিতৃবংশেরও) সবাই ছিলেন ধর্ম-সভাপন্থী। নেহরু-পরিবারের মেয়েরা তো সংস্কার মেনে চলেন না; তাঁরা এসে ভোজের আসরে অন্য সকলের সঙ্গে খাবেন, প্রাচীনপন্থীরা এটা চাননি। তাই পংক্তিভোজ শুরু হবার আগেই নেহরু-পরিবারের মেয়েদের আলাদা বসিয়ে খাইয়ে দেবার জন্যে নানান ভাবে চেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁরাও সম্ভবত আঁচ করেছিলেন যে, কেন তাঁদের আলাদা বসিয়ে খাওয়াতে চাওয়া হচ্ছে। তাঁরা তাতে তাই রাজী হলেন না; বললেন, একসঙ্গে খাবেন। সমস্যাটা শেষপর্যন্ত কীভাবে মেটানো হয়েছিল, বড়দের কাছে তার গল্প শুনেছিলুম; কিন্তু গল্পটা আজ আর মনে নেই।

মা ইতিমধ্যে খান-দুই খদ্দরের শাড়ি কিনেছিলেন। কোত্থেকে একটা চরকাও যেন জুটে

গিয়েছিল। মনে পড়ে, মা সেই চরকা চালাতেন, আর মাঝেমধ্যে বেপরোয়া ভঙ্গিতে বাবার দিকে তাকাতেন। আমাদের দুই বোনকেও দুটো তকলি দেওয়া হয়েছিল। তবে সুতো তো আর কাটা হত না, তকলি দুটো আমাদের খেলনা হয়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের এইটুকুই মাত্র ছায়া পড়েছিল আমাদের জীবনে; তা ছাড়া আর সবই যথাপূর্ব।

* * *

সরকারী চাকরিতে 'জাতিভেদ-প্রথা' ছিল খুবই তীব্র। বাল্যবয়সেই এই প্রথা সম্পর্কে আমি সচেতন হয়ে উঠি। আমার বাবা ছিলেন প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের লোক। পি-সি-এস চাকুরেদের সম্পর্কে আই-সি-এসদের মনোভাব সম্পর্কে টুকরো-টুকরো নানারকম গল্প আমি শুনতে পেতুম। ছোট-ছোট জেলা-শহরে অফিসারদের সংখ্যা তো খুব বেশী নয়, তাই পরস্পরের সংস্পর্শে তাঁদের আসতেই হত। আই-সি-এস অফিসারদের কারও কারও আচরণ ছিল অতিশয় উদ্ধত। ফলে মন-কষাকষির ঘটনাও নেহাত কম ঘটত না। আমার বাবার বন্ধু যে পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্টের কথা ইতিপূর্বে বলেছি, সাজাহানপুরে এক আই-সি-এস কালেক্টর আসবার পরে তিনি সেই কালেক্টর-সাহেবের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি। তাঁকে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। তাই বললেন যে, একতরফা যাওয়ায় তাঁর বিশ্বাস নেই, কালেক্টর-সাহেব যদি তাঁর বাড়িতে আসতে রাজী থাকেন, তাহলে তিনি যাবেন। কালেক্টর-সাহেবের যে তাতে আপত্তি নেই, এই আশ্বাস পেয়ে তবেই তিনি তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। এর দিন কয়েক বাদে ঘোড়ায় চেপে কালেক্টর-সাহেব একদিন পুলিশ-সুপারিন্টেন্ডেন্টের বাড়ির কম্পাউন্ডে এসে ঢুকলেন। মালী তখন বাগানের কাজ করছিল। কালেক্টর-সাহেব তার হাতে একখানা ভিজিটিং কার্ড ধরিয়ে দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। মালী তাঁকে বারবার বলেছিল যে, সুপারিন্টেন্ডেন্ট-সাহেব বাড়িতেই আছেন, এক্ষুনি সে তাঁকে খবর দিচ্ছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে, কালেক্টর-সাহেব ততক্ষণে হাওয়া। পরে তিনি বলেছিলেন যে, পুলিস-সুপারিন্টেন্ডেন্টের বাড়িতে যাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, সেই কথা তিনি রেখেছেন। কিন্তু এর নাম যাওয়া? আসলে এভে করে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া হল। তাই এই অবস্থায় পি-সি-এস অফিসাররা আর কী করেন, প্রতিবাদে তাঁদের অনেকেই অফিসার্স' ক্লাবে যাওয়া বন্ধ করলেন। আমার বাবাও তাঁদের একজন।

আমাদের প্রতিবেশী উকিল-সাহেবের কথা মনে পড়ে। তিনি তাঁর বাড়ির লাগায়ো আর-একখানা বাড়ি করেছিলেন। তরুণ এক আই-সি-এস অফিসার সেটি ভাড়া নেন। উকিল-সাহেবের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমরা খেলতে যেতুম; তখন দেখতে পেতুম যে, তরুণ সেই আই-সি-এস অফিসার আর তাঁর স্ত্রী তাঁদের বাংলোর সামনে বসে আছেন। ইশারা করে তাঁরা আমাদের ডাকতেন। আমাদের সঙ্গে গল্প করতেন, লেমোনেড খাওয়াতেন। আমি ছিলুম স্পষ্টবক্তা; যাকে যা বলবার মুখের উপরে বলে দিতুম। তাতে বোধহয় তাঁরা মজা পেতেন, তাই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমাকে নানান কথা জিজ্ঞেস করতেন। ভদ্রমহিলা একদিন আমাকে বললেন যে, আমি যেন আমার মাকে তাঁদের বাড়িতে যেতে বলি। তা মাকে আমি সে-কথা বলেছিলুমও। তাতে দেখলুম মুচকি হেসে বাবা আমাকে বললেন যে, ভদ্রমহিলা ফের যদি ও-কথা বলেন, তো আমি যেন তাঁকেই আমাদের বাড়িতে আসতে বলি। সেই অনুযায়ী, ভদ্রমহিলা তাঁদের বাড়িতে যাবার কথা আর-একদিন তুলতেই আমি তাঁকে বললুম যে, আগে বরং তিনিই আমাদের বাড়িতে একদিন আসুন। মনে আছে, বেশ-কিছুদিন তখন নেমন্তন্ন আর পাল্টা-নেমন্তন্নের পালা চলেছিল।

তাঁরাও আমাদের বাড়িতে আসেন না, আমার মাও তাঁদের বাড়িতে যান না। শেষে ভদ্রমহিলার স্বামী একদিন হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আমার বাবার মাইনে কত। প্রশ্ন শুনে আমি তো হতভম্ব। বললুম যে, বাবা কত মাইনে পান, তা আমি জানি না। তিনি তাতে আরও নানা প্রশ্ন আমাকে করতে লাগলেন। ঠিক কী তিনি বলেছিলেন, তা আমার মনে নেই, কিন্তু যেভাবে বলছিলেন, তাতে আমরা খুবই অপমানিত বোধ করেছিলুম। দলে আমরা চারজন, বয়স এগারো থেকে আটের মধ্যে। কাঁদতে কাঁদতে সেই আই-সি-এস অফিসারের বাড়ি থেকে আমরা ছুটে চলে আসি, এবং চেঁচিয়ে প্রতিজ্ঞা করি যে, আর কখনও ওই বাড়িতে আমরা যাব না। যাইওনি।

* * *

আমাদের ইশকুলে পাঠাবার জন্যে মায়ের আগ্রহের অন্ত ছিল না। শিশু-বয়সে তিনিও ইশকুলে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কাকা তাঁকে যেতে দেননি। কাকাই তখন তাঁর অভিভাবক। তিনি বলতেন, ইশকুলে গেলে তো আজেবাজে বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়, তাই ভাল পরিবারের মেয়েরা কখনও ইশকুলে যায় না। একটা বিদেশী ভাষা শিখবার দরকারই বা তাদের কী? তা সেই কাকার আপত্তিতে বাড়ির মেয়েদের একজনেরও ইশকুলে যাওয়া হল না; বাড়িতে বসে এক পণ্ডিতজীর কাছে তারা সংস্কৃত আর অঙ্কের তালিম নিতে লাগলেন। মায়ের কিন্তু ইংরেজী শিখবার একটা তীব্র ইচ্ছা ছিল। গোপনে গোপনে তাঁর জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাইদের কাছে তিনি ইংরেজীর পাঠও নিতেন। এইভাবে যখন থার্ড প্রাইমার পর্যন্ত এগিয়েছেন, তখন আঠারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। মায়ের ইংরেজী শেখার ব্যাপারে বাবা খুব উৎসাহ দিতেন, কিন্তু নিজে বিশেষ সাহায্য করতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, কষ্ট করে ইংরেজী শেখবার দরকার নেই, দরকার শুধু ক্রমাগত ইংরেজী বই পড়ে যাওয়া, ভাষাটা তাতেই দখলে এসে যায়। না জানেন ব্যাকরণ, না বোঝেন সব শব্দের অর্থ, তবু বাবার কথা শুনে মা তো মেরি করেলি আর টমাস হার্ডির বই টেনে নিয়ে পড়তে লেগে গেলেন। তাঁর প্রিয় বই ছিল কিটি দি র‍্যাগ, উয়োম্যান ইন হোয়াইট আর টেস্। মায়ের ধৈর্য, উৎসাহ আর উদ্যম ছিল অপরিসীম। যা পড়ছেন, তার চার-ভাগের একভাগ শব্দেরও অর্থ বুঝতে পারছেন না, তবু হাল না-ছেড়ে একটার-পর-একটা বই তিনি পড়েই যেতে লাগলেন। উদ্যমের এ এক নিদারুণ অপচয়, এবং এর মূলে রয়েছে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব। যাই হোক, মায়ের সেই অফুরন্ত উৎসাহে আর চেষ্টায় যে আদৌ কোনও সুফল মেলেনি, তাও নয়। ইংরেজী খবরের কাগজ আর বই পড়ে তিনি মোটামুটি বুঝতে পারতেন। তবে ইংরেজী তিনি বলতে পারতেন না। তার জন্যে তাঁর দুঃখও নেহাত কম ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন, মেয়েদের যেন কখনও তাঁর অবস্থা না হয়।

এবারে আমার মাতুল-বংশের কথায় আসি। তাঁরা সব বিচিত্র লোক! খ্যাপাটে! ছিটেল! বাতিকগ্রস্ত! আসলে তাঁরা কেউই মামুলী মানুষ ছিলেন না। আমার মায়ের ঠাকুর্দা খুব উন্নতি করেছিলেন। মধ্যভারতের রাজ্যগুলির জন্য বড়লাটের একজন এজেন্ট থাকতেন তো, তা আমার মায়ের ঠাকুর্দার বয়স যখন মাত্র বত্রিশ, তখনই তাঁকে বড়লাটের সেই এজেন্টের সেক্রেটারি পদে নিয়োগ করা হয়। ইণ্ডিয়ান পোলিটিক্যাল সার্ভিসের ওই পদটিতে তাঁর আগে অন্য কোনও ভারতীয়কে নিয়োগ করা হয়নি। তিনি ছিলেন অতি জাঁদরেল মানুষ; তাঁর মাথাটি ছিল নানা বিচিত্র খেয়ালে ঠাসা। বিয়ে দিয়ে মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি পাঠাতে হবে, এই ব্যবস্থাটিতে তাঁর একদম সায় ছিল না। সেটা যদি-বা মেনে নিলেন, ছেলেদের ক্ষেত্রে একেবারে গোঁ ধরে বসলেন যে, তাঁদের সবাইকে তাঁর সঙ্গে একই বাড়িতে বসবাস করতে হবে। তাঁর তো টাকার অভাব নেই, অঢেল টাকা রোজগার

করেছেন, ছেলেদের তবে আর—মামুলী মানুষদের ছেলেপুলেদের মত—এখানে-ওখানে চাকরির খুঁজে বেড়াবার দরকার কী? জ্যেষ্ঠ পুত্রটি অবশ্য তাঁর কাছে থাকেননি। তিনিও ছিলেন কড়া ধাতের মানুষ, বাড়ির বন্ধন থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিয়ে, মধ্যপ্রদেশে তিনি একটি উঁচু পদের সরকারী চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, কিডনির রোগে, মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। দ্বিতীয় পুত্র আমার দাদামশাই। তিনি ছিলেন অতি শান্ত ও নিরীহ স্বভাবের মানুষ। শুনেছি তিনি বুদ্ধিমান ছিলেন, অনেক পড়াশুনো করেছিলেন, স্নাতকোত্তর একটা ডিগ্রীও তাঁর ছিল। খুব সহজেই তিনি ভাল একটা চাকরির যোগাড় করে নিতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি নেননি। বাবাকে অমান্য করে কিংবা কোনও ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে দ্বিমত হয়ে তাঁকে তিনি দুঃখ দিতে চাননি। ফলে সারাটা জীবন তাঁকে বেকার হয়ে পিতৃগৃহে কাটাতে হল। তাঁর পরের ভাইটিও তাঁরই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন। চতুর্থ পুত্রটি ডাক্তার হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন কাশ্মীরের মহারাজার ব্যক্তিগত চিকিৎসক। পঞ্চম ও কনিষ্ঠ পুত্র ইনজিনীয়ার। তিনি একটি চাকরিতেও ঢুকেছিলেন, তবে কিছুদিনের মধ্যেই উপরওয়ালার সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড ঝগড়া বেধে গেল, ফলে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে আসেন। বাস্, সেই আসাই আসা, জীবনে তিনি আর চাকরি করেননি। তাঁর চাকরি ছাড়ার কারণটা খুব মজার। উপরওয়ালা তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে নাকি বলেছিলেন যে, তাঁকে একটা প্রোমোশান দেওয়া হচ্ছে। তাই শুনে আমার এই কনিষ্ঠ দাদামশাইটি বললেন যে, তাঁর চেয়ে সিনিয়র আরও দুজন অফিসার রয়েছেন, কর্মী হিসেবে তাঁরা বেশ যোগ্যও, সুতরাং তাঁদের ডিঙিয়ে তাঁকে প্রোমোশান দেওয়াটা অন্যায় হবে, এবং এই অন্যায়টা তিনি মেনে নিতে পারবেন না। বলে, প্রোমোশান না-নিয়ে চাকরি ছেড়ে তিনি চলে এলেন।

আমার দিদিমার কয়েকটি সন্তান গর্ভেই মারা গিয়েছিল। অন্য কয়েকটিও শৈশবে মারা যায়। মাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তাই চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, 'শনির দৃষ্টি' থেকে তাঁকে আগলে রাখবার জন্যে নানানভাবে সতর্ক থাকা হয়েছিল। নাম না-রাখলে তো তার কথা কেউ জানতে পারবে না, ফলে কেউ তার কোনও অনিষ্টও করতে পারবে না, এই বিশ্বাসে ছেলেবেলায় মায়ের কোনও নামই রাখা হয়নি। সবাই তাকে 'চুন্নি' বলে ডাকত। চুন্নি মানেই শিশু, ওটা ঠিক নাম নয়। তা ছাড়া ছেলেবেলায় আমার মাকে কখনও নতুন পোশাক কিনে দেওয়া হয়নি; পরিবারের মধ্যে যাঁরা বেশ দীর্ঘজীবী মানুষ, তাঁদেরই পরনের পুরনো জামাকাপড় কেটে তাই দিয়ে আমার মায়ের পোশাক বানিয়ে দেওয়া হত। হেতুটা যা-ই হোক, মা তো দিব্যি বেঁচেবর্তে রইলেন। মায়ের জন্মের দু' বছর বাদে আমার দিদিমার আরও একটি মেয়ে হয়েছিল।

১৯১০ সনে ইন্দোরে খুব প্লেগের প্রকোপ দেখা দেয়। তাতে এত লোক মারা যেতে লাগল যে, যাঁদের সাধ্য ছিল, যথাসম্ভব দ্রুত তাঁরা শহর ছেড়ে পালালেন। হাকসার-পরিবারের অনেকেই পালিয়েছিলেন মথুরায়। আমার প্রমাতামহের দানের টাকায় কিছুকাল আগে সেখানে ছোট একটা বাড়ি বানানো হয়েছিল। তার সামনের অংশটা মন্দির, কৃষ্ণের নামে উৎসর্গ-করা। আর পিছনের অংশে খানকয় ঘর। ভাবা হয়েছিল যে, আমাদের পরিবার কিংবা সমাজের বিধবা কিংবা দুঃস্থ ব্যক্তিরা দরকার হলে সেখানে থাকতে পারবে। তা হাকসার-পরিবারের অনেকেই তো ইতিমধ্যে ইন্দোর থেকে পালিয়েছিলেন। ঠিক ছিল যে, বাড়ির একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে তবেই দাদামশাইও তাঁর স্ত্রী, কন্যা আর এক ভাইকে নিয়ে ইন্দোর ছাড়বেন। কিন্তু তা আর হল না। দাদামশাইকে প্লেগে ধরল। তিনি মারা গেলেন। তাঁর ছোট মেয়েটিরও মৃত্যু হল। মানুষ তখন মশামাছির মতন মারা পড়ছে। বাড়িতে রোজ মরা ইঁদুর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আমার দাদামশাইয়ের ভাইয়ের তবু ইন্দোর ছেড়ে নড়বার নাম নেই। আসলে তাঁর এক বন্ধুকে ইতিমধ্যে

প্লেগে ধরেছিল, এবং বন্ধুকে এই দুঃসময়ে ছেড়ে যেতে তাঁর বিবেকে বাধছিল। দিদিমার অবস্থা তখন শোকাবহ। স্বামীকে হারিয়েছেন, দুই মেয়ের এক মেয়েকে হারিয়েছেন, এই অবস্থায় তিনি আর ইন্দোরে থাকতে চাইছিলেন না। কিন্তু ইন্দোর তিনি ছাড়বেনই বা কী করে? যখনই তিনি অন্য-কোথাও চলে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন, তখনই তাঁর দেওর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "ভাবী, তোমার কি ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই?" এ-প্রশ্নের কী জবাব দেবেন তিনি? উত্তর দিতে পারেন না, ফলে ইন্দোরও ছাড়া হয় না। শেষপর্যন্ত দাদামশাইয়ের সেই ভাইটিকেও প্লেগে ধরল এবং তাতেই তিনি মারা গেলেন। দিদিমার ভাই তখন ইন্দোরে এসে অভিশপ্ত সেই শহর থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যান। তাঁর বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ হয়নি, তাঁর পেটে তখন বাচ্চা। দাদামশাইয়ের মৃত্যুর পরে আমার এই মাসীমার জন্ম হয়েছিল।

দাদামশাই যখন মারা যান, আমার মায়ের বয়স তখন দশ বছর। এই দশ বছরে আমার মা তিন-চার বারের বেশী তাঁর বাবার সঙ্গে কথা বলেননি। এ-সব শুনে আমার বড় বিস্ময়বোধ হয়। অথচ তখনকার দিনে এটাই ছিল স্বাভাবিক। পুরুষরা তো সদর-মহলেই দিন কাটাতেন, আর মেয়েরা থাকতেন অন্দরে। শিশুরা থাকত মায়েদের কাছে। দিনের বেলায় কোনও যুবক অন্দর-মহলে এসে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে, এমনটা খুব অশোভন ব্যাপার বলে গণ্য হত। নিশুত রাতে বাচ্চারা যখন ঘুমোচ্ছে, সেই তখন স্বামীবা স্ত্রীর কাছে আসতেন। একান্নবর্তী পরিবারে অনেকক্ষেত্রে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন মানুষ একই বাড়িতে বসবাস করত। মেয়েরা ব্যস্ত থাকত রান্না, সেলাই এবং অন্যান্য সব ঘরকন্নার কাজে। তৈরী পোশাকেব চল তখনও হয়নি। দর্জি ছিল বটে, কিন্তু বাড়ির মেয়েদের কিংবা বাচ্চাদের পোশাক দর্জিকে দিয়ে বানানো হত না। মেয়েদেরই সে-সব বানিয়ে নিতে হত। তা ছাড়া ছিল অসংখ্য উৎসব, অনুষ্ঠান, বিয়ে ইত্যাদির ধকল। আঁতুড়ঘরের ঝামেলা। প্রসবের জন্য কেউ হাসপাতালে যেত না। বাড়ির আঁতুড়েই কয়েকটা দিন কাটাতে হত। দিদিমার কাছে শুনেছি, বাড়িতে অনেকসময় পোয়াতীর সংখ্যা এত বেড়ে যেত যে, শুধু আঁতুড়ের জন্যেই একটা ঘরকে আলাদা না রেখে উপায় থাকত না। শুনে মনে হয়, এ যেন মান্ধাতার আমলের কথা। অথচ আমার জন্মেব খুব বেশী কাল আগের কথা তো নয়। মাত্র দু' পুরুষ আগেকার ব্যাপার। কিন্তু মনে হয় যেন সেই কোন্ আদ্যিকালের ভারতবর্ষের কথা শুনছি।

দাদামশায়ের বড় ভাই তো আগেই মারা গিয়েছিলেন; এবারে পরের ভাইটিও মারা গেলেন। তাঁরও পরের ভাইটি থাকতেন কাশ্মীরে। ফলে আমার বিধবা দিদিমার দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ল ছোট-দাদামশাইয়ের উপর। আগেই বলেছি যে, তিনি ছিলেন ইনজিনীয়ার। দাদামশাইদের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই আমি দেখেছি। ভাইদের মধ্যে একমাত্র তিনিই ছিলেন দীর্ঘজীবী, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাত্তর। খ্রীষ্টানদের তিনি পছন্দ করতেন না। মুসলমানদেরও না। অন্যদিকে গোঁড়া হিন্দুয়ানি সম্পর্কেও তাঁর সমান আপত্তি ছিল। অজ্ঞাবাদেও তাঁর সায় ছিল না। নিজে একজন গোঁড়া হিন্দু, অথচ সেই গোঁড়ামির সম্পর্কেই তাঁর আপত্তি—ছোট-দাদামশাইয়ের স্বভাব ছিল এই রকমের উল্টোপাল্টা। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ-আন্দোলন শুরু হবার পরে তিনি কংগ্রেসে যোগ দেন ও প্রবল জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠেন। নিজে তো খদ্দর ধরলেনই, স্ত্রী ও ছেলেপুলে-দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদেরও খদ্দর ধরালেন। একদিকে তিনি গান্ধীজীর শিষ্য, অন্যদিকে তিনি খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের বিরোধী। একইসঙ্গে এই পরস্পরবিরোধী ব্যাপার কী করে সম্ভব হয়, তা বুঝি না। গান্ধীজী তো যুক্তি দিয়ে অন্যদের জয় করতে চাইতেন; আমার ছোট-দাদামশাই সেক্ষেত্রে ছিলেন বলপ্রয়োগের পক্ষপাতী। আসলে তাঁর চরিত্রে এই রকমের অসংখ্য সব উল্টোপাল্টা ব্যাপার ছিল, এবং পরিবারের লোকজনদের

সেজন্য খুব ভুগতে হয়েছে। জবরদস্ত মানুষ, তিনি যা বলতেন, বিনাবাক্যে সবাইকে তা মেনে চলতে হত। তাঁর দ্বারা আমার মায়ের চরিত্র যতটা প্রভাবিত হয়েছিল, এমন আর কারও দ্বারা নয়।

সেকালে হিন্দু বিধবাদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। ঐতিহ্য, প্রথা, আর্থিক ব্যাপারে পরনির্ভরতা, এই সবের ফলে, বিধবাদের তো কথাই নেই, নারীমাত্রেরই আসলে স্বাধীন-ভাবে জীবনধারণের উপায় ছিল না। বিধবারা শুধু ভরণপোষণটাই দাবি করতে পারতেন; তা ছাড়া একান্নবর্তী পরিবারের কর্তার পক্ষে এটা বাধ্যতামূলক ছিল যে, বিধবাদের কারও কোনও অনূঢ়া কন্যা থাকলে তিনিই তাকে একটা বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন। বিধবাদের দাবি কিংবা অধিকার বলতে এইটুকুই। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র ছাড়া অন্য কোনও সম্পত্তিতে তাঁদের কোনও অধিকার ছিল না। ব্যক্তিগত জিনিসপত্র মানে তাঁদের গয়নাগাটি। আমার প্রমাতামহ তাঁর জীবদ্দশাতেই পাঁচ পুত্রের প্রত্যেককে কুড়ি হাজার টাকা দিয়েছিলেন। দিদিমা সেই কুড়ি হাজার টাকা পেয়েছিলেন। তবে তাতেও তাঁর কোনও আইনগত অধিকার ছিল না। অন্যের উপরে নির্ভরশীল হয়ে তাঁকে জীবন কাটাতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মনোবল তাতে নষ্ট হয়নি; ভিতরে-ভিতরে তিনি ছিলেন খুবই স্বাধীনচেতা। তাঁর ধর্মবিশ্বাসও ছিল খুব গভীর। তবে সেটা তাঁর উদার ভাবনাচিন্তার প্রতিবন্ধক হয়নি। শিক্ষার, বিশেষ করে স্ত্রী-শিক্ষার, তিনি খুব পক্ষপাতী ছিলেন। সামাজিক নানা অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন, এমন উপায় তো তাঁর ছিল না। কিন্তু তা না-ই থাক, নিজের গণ্ডিটুকুর মধ্যে যতটা করা সম্ভব, তা তিনি করতেন। পড়াশুনোর ব্যাপারে আমার মাকে তিনি নিরংকুশ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। ফলে যে-কোন বই তাঁর হাতে আসুক, মা তা-ই পড়ে ফেলতেন। শুনেছি, রাত্তিরে সবাই যখন ঘুমোত, মা আর তাঁর জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো বোনেরা তখন খাটের তলায় ঢুকে, কেরোসিনের লণ্ঠন জেবলে যত রাজ্যের নিষিদ্ধ বই পড়তেন। দিদিমার তাতে আপত্তি ছিল না। হরেক রকমের রোমহর্ষক আর যৌন-উত্তেজনাপূর্ণ বই, তার মধ্যে রগরগে সব ইংরেজী উপন্যাসের শস্তা তর্জমাও থাকত। হিন্দী তর্জমায় 'লণ্ডন-রহস্যে'র কুড়িটি খণ্ডই তাঁরা পড়ে ফেলেছিলেন। অতিশয় গোঁড়া পরিবারের মেয়ে আমার মা। অথচ পড়তেন এইসব নিষিদ্ধ প্রেম-ভালবাসার কাহিনী। ফলে সাধারণভাবে জীবন সম্পর্কে, এবং বিশেষ করে প্রেমের বিষয়ে তাঁর ধারণায় নানা ত্রুটি থেকে যায়। যে-পরিবেশে তিনি জীবন যাপন করতেন, এ-সব বইয়ের সঙ্গে তার কোনও সঙ্গতি ছিল না। দিনের বেলায় আমার মা পড়তেন রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি সব ধর্মগ্রন্থ। মজার ব্যাপার এই যে, গীতাকে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের পড়বার যোগ্য বই বলে মনে করা হত না। বড়রা বলতেন যে, গীতার বাণী হল ত্যাগের বাণী। তা, যে-সব মেয়েকে বিয়ের যুগ্যি করে তোলা হচ্ছে, ত্যাগের বাণী থেকে তাঁরা তাঁদের দূরে সরিয়ে রাখতে চাইবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। যাই হোক, যে-কথা বলছিলুম, মা ইশকুলে যাননি বটে, কিন্তু তাঁর পড়া তাতে বন্ধ থাকেনি। যা তিনি পড়তে চাইতেন, তা-ই পড়তেন।

* * *

বাচ্চাদের ইশকুলে পাঠানো নিয়ে আমাদের বাড়িতে বেশ-একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। মেয়েদের ইশকুলে ভর্তি করায় বাবার যে কোনও আপত্তি ছিল, তা নয়, তবে কিনা বাবার ধাতটাই ছিল এমনি যে, অন্যের কথা তিনি সহজে মানতে চাইতেন না। তাই মা যতই আমাদের ইশকুলে পাঠাবার জন্যে তাঁর উপরে চাপ দিতে লাগলেন, বাবাও ততই ইশকুলে যাবার বিরুদ্ধে একটার-পর-একটা যুক্তি খুঁজে বার করতে লাগলেন। বাবা বলতেন, আমাদের পড়াশুনো তো আর আটকে থাকছে না, বাড়িতে এসে রোজ

আমাদের পড়াবার জন্যে তিনি মাস্টার রেখে দিয়েছেন, তার উপরে রবিবারও একজন মাস্টারমশাই এসে আমাদের ছবি আঁকা শেখান, তবে আবার ইশকুলে পাঠাবার জন্যে এত বায়নাক্কা কেন? শহরে তখন একটাই মাত্র মেয়েদের ইশকুল। সেই ইশকুলের বিশেষ সুখ্যাতিও ছিল না। তাই বাবা বলতেন, যেমনটা চলছে, তেমনিই চলুক। শেষ পর্যন্ত মা-ই অবশ্য জিতলেন। ১৯৩১ সনের জুলাই মাসে আমরা ইশকুলে যেতে শুরু করলুম। ভর্তি হলুম সেই মিশন-ইশকুলে, আগে অনেকবার যাকে খারাপ ইশকুল বলে খারিজ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সেটা প্রাইমারী থেকে লোয়ার সেকেন্ডারি ইশকুল হয়ে গিয়েছিল।

পড়াশুনায় আমি কিছুটা পিছিয়ে ছিলুম, কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ক্ষতির পূরণ হয়ে যায়। এগারো বছর বয়সে দিদি ভর্তি হল ক্লাস সেভেনে; আমি তার চেয়ে দু বছরের ছোট, আমাকে ক্লাস ফাইভে ভর্তি করে দেওয়া হল। পড়াশুনায় আমার অনাগ্রহ ছিল না। পরীক্ষার ফলও বেশ ভালই হত। কিন্তু কেন জানি না, ইশকুলে যেতে খুব খারাপ লাগত আমার। মনে আছে, সেই প্রথম আমি সচেতন হয়ে উঠলুম যে, আমি ঠিক অন্যদের মতো নই। কিন্তু কোথায় পার্থক্য, কেন পার্থক্য, তা আমি বুঝতে পারতুম না। ফলে কেমন যেন বিষণ্ণ বোধ করতুম। ইশকুলের মেয়েদের মধ্যে একটা পার্থক্যের বোধ ছিল। 'আমরা' আর 'ওরা'। কিন্তু 'আমাদের' সঙ্গে 'ওদের' পার্থক্যটা কিসের, এই ধাঁধার কোনও জবাব আমি খুঁজে পেতুম না। জবাব যে কার কাছে মিলবে, তাও জানতুম না। •

একদিনের কথা বলি। অন্যান্য দিনের চাইতে বেশ-কিছুটা আগেই সেদিন ইশকুলে পৌঁছেছিলুম। ভেবেছিলুম ক্লাসরুম একেবারে ফাঁকা থাকবে। কিন্তু গিয়ে দেখি, পুরোদস্তুর ক্লাস চলছে। এখন আবার কিসের ক্লাস? আমি অবাক হয়ে উঁকি মারি, এবং দেখতে পাই যে, দিদিমণি তাঁর রুলার দিয়ে একটা মেয়েকে পিটছেন। দেখে আমি ভীষণ ভয় পাই। কই, আমরা যখন ক্লাস করি, তখন তো এইভাবে কাউকে মারা হয় না। একটু বাদেই মেয়েরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে এল, এবং লাইন বেঁধে বোর্ডিংয়ের দিকে চলে গেল। এই বোর্ডিংও ছিল আমাদের কাছে এক মস্ত রহস্য। রুলার দিয়ে যে-মেয়েটিকে মারা হয়েছিল, তাকে আটকাবার চেষ্টা করলুম। ভেবেছিলুম, তাকে জিজ্ঞেস করব যে, ব্যাপারটা কী। কিন্তু আমাকে সে যেন চিনতেই পারল না, তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল। আমরা ইশকুলে এসে পৌঁছবার আগেই এই যে 'ওদের' ক্লাস নেওয়া হয়, এটা কিসের ক্লাস? কী শেখানো হয় 'ওদের'? সবটাই যেন আমার কাছে একটা ধাঁধার মতো লাগছিল। একে-ওকে-তাকে জিজ্ঞেস করে শেষপর্যন্ত জানতে পারলুম যে, এটা হচ্ছে নীতিশিক্ষার ক্লাশ। তা এ-ক্লাশ শুধু ওদের জন্যে নেওয়া হয় কেন? বাঃ, ওরা যে খ্রীষ্টান। অনেক চেষ্টা করেও এর বেশী আমি জানতে পারিনি।

অনেক ব্যাপারেই অন্য অনেকের সঙ্গে যে আমাদের পার্থক্য রয়েছে, তা আমি জানতুম। মস্ত কম্পাউন্ডওয়ালা বিরাট বাংলো-বাড়িতে আমরা থাকি। সবচাইতে আগে আমরা বিজলি-বাতি পেয়েছি। আমাদের অনেক চাকর-বাকর। তা ছাড়া, শুধু আমাদের দু' বোনের দেখাশুনো করবার জন্যে একজন আয়াও রয়েছে। অন্যদের তুলনায় আমাদের জামাকাপড় অনেক ভাল। আমরা কেতাদুরস্তভাবে ডাইনিং টেবিলে খাই। আমার বাবা এখানকার 'ডেপুটি সাহেব'। ফি বছর আমরা যখন খোলামাঠে রাসলীলা-উৎসব দেখতে যাই, তখন সেখানে আমাদের বসবার জন্যে চেয়ার এগিয়ে দেওয়া হয়, অথচ অন্য সবাই মাঠের উপরেই বসে পড়ে। এইরকম আরও অনেক ব্যাপারে অন্যদের থেকে আমরা আলাদা। অন্যদের থেকে একটু উঁচু স্তরের মানুষ। আমাদের প্রতিবেশী ভকিল সাহেবের কথাই ধরা যাক। আমাদের মতো পরিপাটি একটা ড্রইংরুম তাঁর নেই। আছে শুধু খানকয় বেতের চেয়ার আর একটা টেবিল। ওদের বাড়িতে একগাদা ছেলে-

বছরে প্রায়ই ওদের মায়ের বাচ্চা হয়। কী বিচ্ছিরি ব্যাপার। ও-বাড়ির ছেলেমেয়েদের পোশাকও খুব নোংরা, বাচ্চাদের নাক দিয়ে প্রায়ই সর্দি গড়ায়, আর যে মেয়ে দুটোর সঙ্গে আমরা খেলা করি, প্রায়ই তাদের চোখ ওঠে, চোখের পাতায় পিচুটি লেগে থাকে। যে-উচ্চারণে ওরা কথা বলে, আমাদের বাড়িতে সেটাকে নির্ভুল মনে করা হয় না। ওদের খাবার ব্যবস্থাও এলোমেলো। খাবার একটা জায়গা থাকবে, সেখানে বসে খাওয়া হবে, তা নয়, ওদের বাড়ির বাচ্চারা দেখেছি যেখানে-সেখানে খেতে বসে যায়। অনেক সময় তো থালা কি রেকাবি পর্যন্ত দেখি না; স্রেফ হাতের মধ্যে পরোটা আর একটু আচার নিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই ওদের বাচ্চারা অনেক সময় খেয়ে নেয়। তা ছাড়া, বাচ্চাগুলো প্রায়ই উদোম হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই রকমের অসংখ্য ব্যাপারে ওদের সঙ্গে আমাদের অমিল রয়েছে। তবু এমন কথা মনে হয় না যে, ওরা আমাদের থেকে আলাদা। বরং মনে হয়, আসলে আমরা একই রকমের মানুষ। কিন্তু খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে তা বলবার উপায় নেই। খ্রীষ্টানরা হচ্ছে আলাদা। ওদের রঙ কালো; বড় হয়েও ওদের মেয়েরা অনেকেই ফ্রক পরে। আমরা বাচ্চারা ফ্রক পরি, কিন্তু আমাদের মায়েরা কখনো ফ্রক পরে না। আর তা ছাড়া, ফ্রক পরলেও তার উপরে আমরা দোপাট্টা পরি কি? কক্ষনো না। ওরা কিন্তু পরে। বিশেষ করে পরে রবিবারে, সেই যখন দল বেঁধে ওরা একটা বাড়িতে যায়। বাড়িটাকে ওরা বলে গির্জা। এই গির্জা জিনিসটা আসলে কী? ফি রবিবারে ওরা সেখানে যায় কেন? আমরাই বা কেন যাই না? মনে হত, ওদের আর আমাদের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান রয়েছে। সেই ব্যবধানের রহস্যের কোনও কূলকিনারা খুঁজে পেতুম না। তাই ভিতরে-ভিতরে খুব অস্বস্তি বোধ করতুম।

যে দিদিমণি আমাদের হিন্দী পড়াতেন, তাঁকে ঠিক বুঝে উঠতে পারতুম না। নিজেকে তিনি বলতেন মিসেস আর্য। বিধবাদের মতন সাদা জামাকাপড় পড়তেন, আর খুব জোর দিয়ে বলতেন যে, আমরা যারা হিন্দী পড়ি, তারা সবাই আর্য। 'ওরা' পড়ত উর্দু। ইতিহাসের বইয়ে আর্যদের কথা পড়েছিলুম। হাজার-হাজার বছর আগে এ-দেশে এসে সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতটে তাঁরা বসতি স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু আমিও যে সেই প্রাচীন ইতিহাসের অংশ, এমন আমার মনে হত না। মিসেস আর্য নিজেকে আর্য বলতে হয় বলুন, কিন্তু 'আমরা' সবাই আর্য, এই কথাটা এত জোর দিয়ে তিনি বলেন কেন? আর-একটা কথাও তিনি খুব জোর দিয়ে বলতেন: ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান। বাড়িতে ঠাকুমা জপ-তপ করেন, তা ছাড়া মাঝেমধ্যে পুজোআচ্চা হয়, বাস, এর বাইরে ঈশ্বরের কোনও অস্তিত্ব আমার কাছে ছিল না। ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উঠলেই আমার ঠাকুমার পুজো-ঘরের কথা মনে পড়ে যেত। মিসেস আর্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, যখনই আমরা কোনও বিষয়ে কিছু লিখব, তার উপসংহারে যেন ঈশ্বরের একটা উল্লেখ থাকে। একবার তো আমাদের বসন্তকালের উপরে একটা প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া হয়েছে। তা আমি খুব বিজ্ঞের মতো বললুম যে, এই প্রবন্ধের শেষে তো আর ঈশ্বরকে টানা যায় না। তাতে, অবজ্ঞাভরে আমার দিকে তাকিয়ে, মিসেস আর্য বললেন, "কেন যাবে না? বসন্তের মতো এমন সুন্দর একটা ঋতু তিনি আমাদের দিয়েছেন, প্রবন্ধের উপসংহারে তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।" আমি তো ভীষণ জব্দ। হিন্দী ক্লাসে এমন লজ্জায় আর কখনও পড়তে হয়নি।

ছেলেপুলে মানুষ করবার ব্যাপারে আমার মায়ের কতকগুলো নির্দিষ্ট ধারণা ছিল। তাতে আমি খুব মুশকিলে পড়তুম। এই যেমন মা কখনও বাড়িতে আমাদের 'গিট্টা' খেলতে দিতেন না। বলতেন যে, এটা বাজে খেলা, এ-সব খেলা শুধু চাকর-বাকরদের ছেলেপুলেদেরই সাজে। ইশকুলে টিফিন-পিরিয়ডে 'ওরা' বোর্ডিংয়ে চলে যেত, অন্য মেয়েরা সেই সময়ে, চটপট টিফিন খেয়ে শুরু করত 'গিট্টা' খেলতে। দুই

দলের দুই নেতা পর্যায়ক্রমে একটির-পর-একটি মেয়ের নাম ডেকে তাদের দল তৈরী করে ফেলত। বলা বাহুল্য এমন মেয়েদেরই তারা দলে নিত, যারা গিট্টা খেলায় ওস্তাদ। আমাদের কেউ দলে নিতে চাইত না। তার কারণ, এ-খেলায় আমরা মোটেই পটু ছিলুম না। শেষ পর্যন্ত দেখা যেত, অন্য-সব মেয়েরা একটা-না-একটা দলের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে, শুধু আমরা দু বোন বাকী। তখন আমাদের নেওয়া হত। প্রয়োজনে নয়, খানিকটা ভদ্রতার খাতিরে। আমার মনে হত, এর জন্য আমার মা-ই দায়ী। আমাদের অতি-ভদ্র কেতাদুরস্ত জীবনই অন্য মেয়েদের সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্কের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতুম আমি। কিন্তু ঠিক যেন পেরে উঠতুম না।

ঠিক দু বছর সেই ইশকুলে আমরা পড়েছিলুম। বাবা হঠাৎ আবার বারাণসীতে বদলি হয়ে যান। কিন্তু সেখানে তখনই বাড়ি পাওয়া গেল না, ওদিকে হোটেলে উঠবারও প্রশ্ন ওঠে না, ফলে জিনিসপত্র গোছগাছ করে মা, দিদি আর আমি দিল্লিতে আমাদের দিদিমার কাছে চলে গেলুম। বাবা গেলেন বারাণসীতে।

* * *

দিল্লিতে এসে নানীর কাছে ছুটি কাটাতে আমার খুব ভাল লাগত। ছোটদের আর বড়দের মাঝখানে অদৃশ্য একটা পাঁচিল থাকে তো, তা নানীর বাড়িতে সেই পাঁচিলটা যেন ধসে পড়ত। তাই বলে কি আর আমাদের সেখানে বয়স্ক বলে গণ্য করা হত? তা মোটেই নয়। আসলে সেখানে আমাদের নিয়ে খুব হৈ-হৈ করা হত; আদরও অনেক বেশী পেতুম। বয়সে ছোট বলেই যেন আমাদের প্রশ্রয়ও দেওয়া হত অনেক বেশী মাত্রায়। বয়স্ক বলে গণ্য না হই, বড়দের সঙ্গে মিলেমিশে দিনটা বেশ আনন্দে কাটত, আমাদের নিজেদের বাড়িতে যা হবার কোনও উপায় ছিল না।

মেয়ে হয়ে জন্মেছিলুম বলে প্রথম থেকেই ঠাকুমা আমার উপরে অপ্রসন্ন। তারপর আমার বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমে যখন ব্যাপারটা তাঁর সয়ে এল, তখন তিনি আমাকে একেবারে দিদির ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু আমার ধাত তো একেবারেই আলাদা, তাই যতই তিনি আমাকে শান্ত, লাজুক, সভ্যভব্য করতে লেগে গেলেন, ততই আমি আরও দস্যিমেয়ে হয়ে উঠতে লাগলুম। ব্যাপারটা যে আমার ইচ্ছাকৃত তা নয়, আসলে তিনি যা আমাকে বানিয়ে তুলতে চাইছিলেন, তা হবার কোনও প্রবণতাই আমার ছিল না। বার্ধক্য তাঁর ব্যক্তিত্বকে স্নিগ্ধ করেনি, তিনি ছিলেন কর্তৃত্বপরায়ণ, কড়া মেজাজের মহিলা। আমি কিন্তু তাঁর প্রতিটি নির্দেশ বিনা দ্বিধায় লঙ্ঘন করে চলতুম। এমন নয় যে, তাঁর প্রতি আমার ব্যবহার ছিল রূঢ় কিংবা অশালীন; অন্যদিকে, আমার প্রতি তাঁর আচরণ যে খুব কঠোর ছিল, তাও নয়। আসলে, ঠাকুমা আর নাতিনাতনীদের মধ্যে যে একটা সুন্দর মধুর সম্পর্ক থাকে, সেটাই এক্ষেত্রে ছিল না।

নানী কিন্তু অন্যরকম। দাদীর মতো কঠিন তিনি নন। তিনি মধুর, তিনি শান্ত, তিনি আনন্দে আর উৎসাহে একেবারে ভরপুর। আচারে-আচরণে দাদীর চাইতেও সেকেলে হলে কী হয়, আমি দুষ্টুমি করলে তিনি কখনও বকতেন না, বরং তাতেই যেন মজা পেতেন। এমন এক-একজন মানুষ থাকেন তো, যাঁদের কাছে গেলে ভাল লাগে; মনে হয়, বসে-বসে আদর খাই। নানী ছিলেন সেই রকমের মানুষ। এবারে কিন্তু মনে হল, তিনি একটু পালটে গেছেন। দৃশ্যত সেইরকমই আছেন, তবু যেন কোথাও একটু অন্যরকম। আগের মতই তিনি মধুর, স্নেহশীলা; অথচ তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা নতুন জানালা যেন খুলে গেছে। তাঁর স্বভাবের সেই নম্রতা এতটুকু নষ্ট হয়নি, অথচ ভিতরে-

ভিতরে কোথাও যে একটু কাঠিন্যের ছোঁয়া লেগেছে, তাও ঠিক। এমন একটা কাঠিন্য, কিংবা বলতে পারি শক্তি, যা তাঁর মধ্যে আগে কখনও দেখিনি।

এখানে তাঁকে খুব আগ্রহভরে খবরের কাগজ পড়তে দেখলুম। আগেও অনেকবার এখানে এসেছি, কিন্তু এই বাড়িতে আগে কখনও হিন্দী খবরের কাগজ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। নানীকে তখন সদাসর্বদা সংসারের কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকতে দেখতুম। [illegible] তিনি নিজেই করে নিতেন, সেলাই-ফোঁড়াইয়ের যাবতীয় কাজও [illegible] হত। আত্মীয় কিংবা প্রতিবেশীদের সাহায্যে তিনি পিছ-পা ছিলেন [illegible] হোক, অসুখ-বিসুখ হোক, কিংবা কোনও বিপর্যয় ঘটুক, নানীকে সবসময়েই [illegible] সাহায্য করবার জন্যে ছুটে যেতে দেখেছি। টাকাকড়ি দিয়ে কাউকে সাহায্য করবেন, এতটা সচ্ছলতা তাঁর ছিল না; কিন্তু দরাজ হাতে অন্যকে তিনি তাঁর সময় দিতেন, শ্রম দিতেন। ফলে আমরা দেখতুম, সকাল থেকে অনেক রাত্রি অবধি একটা না-একটা কাজে তিনি ব্যস্ত। সেই ব্যস্ততা তাঁর এতটুকু কমেনি; অথচ তারই মধ্যে দেখলুম, আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিনি কাগজ পড়ছেন। ভারতবর্ষে তখন মেয়েদের মধ্যে, বিশেষ করে বৃদ্ধাদের মধ্যে, খুব বেশীজন কাগজ পড়তেন না। আদৌ কিছু পড়তে হলে ধর্মগ্রন্থ পড়তেন। খবরের কাগজ ছিল পুরুষদের পড়বার জিনিস। নানীকে তাই খবরের কাগজে মগ্ন দেখে অবাক হয়েছিলুম। আরও দেখলুম, মাঝে-মাঝেই এমন অনেক মহিলা নানীর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, যাঁরা ঠিক তাঁর মতো নন। আমাদের সমাজের নন, এমন কোনও মহিলাকে এর আগে এই বাড়িতে আমি আসতে দেখিনি।

রহস্য ধীরে-ধীরে উন্মোচিত হতে লাগল। ১৯২৭ সাল থেকেই নানী দিল্লির বাজার সীতারাম এলাকায় থাকতেন। ওই একই এলাকায়, গোটা দুই রাস্তার পরে, থাকতেন আর-এক মহিলা। তাঁকে আমরা সবাই রাজপতি-দিদ্দা বলতুম। নানীর সঙ্গে এর আগে কয়েকবার আমি রাজপতি-দিদ্দার বাড়িতে গিয়েছি। এমনিতে হয়ত তাঁর কথা আমার মনে থাকত না। এইজন্যে মনে আছে যে, তাঁর একটি সুন্দরী মেয়ে ছিলেন, এবং সেই মেয়ের একটা অদ্ভুত অসুখ ছিল। দু-এক মিনিট বাদে-বাদেই তাঁর হিক্কা উঠত, এবং তার জের চলত প্রায় ছ-সাত ঘণ্টা ধরে। রাজপতি-দিদ্দার মেয়ে তার ফলে খুব অবসন্ন হয়ে পড়তেন। অসুখটা নাকি কিছুতেই সারছিল না। এই অসুখের জন্যেই রাজপতি-দিদ্দার কথা আমি ভুলতে পারিনি।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করা নানীর পক্ষে খুব সহজ ছিল না। একা কোথাও যাওয়া চলত না। বাড়ির থেকে বেরোতে হলেই একজন সঙ্গীর দরকার হত। যানবাহনও এক মস্ত সমস্যা। রাজপতি-দিদ্দার কথা অবশ্য আলাদা। তাঁর বাড়ি তো নানীর বাড়ির খুব কাছেই। যানবাহনের তাই দরকার হত না। সঙ্গীরও না। দরকার হলে হেঁটেই নানী সেখানে যেতে পারতেন। যেতেনও। সংসারের কাজকর্ম চুকিয়ে তারপর বিকেলে তাঁরা প্রায়ই পরস্পরের বাড়িতে গিয়ে দেখা করতেন। রাজপতি-দিদ্দা আর নানীর বন্ধুত্ব এইভাবে দিনে-দিনে গভীর হয়ে উঠেছিল।

গ্রীষ্মের এক বিকেলে হঠাৎ রাজপতি-দিদ্দা খুব উত্তেজিত অবস্থায় নানীর কাছে এসে হাজির। কী হয়েছে? না এইমাত্র তিনি খবর পেয়েছেন যে, তাঁর জামাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তা এই অবস্থায় কী করা উচিত, রাজপতি-দিদ্দা তা বুঝতে পারছেন না, তাই সরাসরি তিনি নানীর সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছেন। দুই বন্ধু তো অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলেন, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেন না। উত্তেজিত অবস্থায় দুজনেই শেষপর্যন্ত বাড়ির থেকে বেরিয়ে পড়লেন। কী করে যে তারা কংগ্রেসের সদর-দফতরে গিয়ে পৌঁছেছিলেন, তা আর তাঁদের মনে নেই।

দেশের সর্বত্র তখন ধরপাকড় চলছে। তার প্রতিবাদে সেই সময়ে একটা মিছিল বার করবার উদ্যোগ চলছিল। তা এই দুই মহিলা সেই মিছিলে যোগ দিয়ে, জনতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগোতে লাগলেন। যে নানী একজন সঙ্গী না নিয়ে কখনও বাড়ির থেকে বার হতেন না, তিনি কিনা মিছিলে যোগ দিয়েছেন! ভাবতেই অবাক লাগে। যাই হোক, নানীর বয়স তখন পঞ্চাশ, সেই বয়সে হঠাৎ তিনি সভাসমিতিতে যেতে শুরু করলেন। যোগ দিলেন সেই রাজনৈতিক আন্দোলনেও, সারা দেশে যা তখন ছড়িয়ে পড়েছিল। যখন জানা গেল যে, রাজপতি-দিদ্দার জামাতা আর কেউ নন, স্বয়ং জওহরলাল নেহরু, কংগ্রেসের দফতরে দুই মহিলার তো তখন দারুণ খাতির। সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগ দেবার জন্যে তাঁদের অনুরোধ করলেন সবাই। তা মিছিলে যোগ দিয়ে একদিন তাঁরা এগোচ্ছেন, এমন সময় পুলিস সেই মিছিলের উপরে লাঠি চালায়। অনেকেই তাতে ভীষণভাবে আহত হলেন। নানীর মাথায় অবশ্য লাঠি পড়েনি, তবে দৌড়াদৌড়ি হুড়োহুড়ি হয়েছিল তো, তাতে তাঁর শরীরের নানান জায়গায় ছড়ে যায়। তাঁর মনের উপরেও মস্ত একটা ধাক্কা লেগেছিল। নানী তাঁর এক ভাইপোর বাড়িতে থাকতেন। ভাইপো তাঁকে অনেক করে বলেন যে, রাজনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত হওয়া তাঁর উচিত নয়। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, তাঁর দেখাশোনা করবার মতো কেউ নেই, এই অবস্থায় যদি একদিন মিছিলে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙে তিনি পঙ্গু হয়ে বাড়ি ফেরেন, তবে তাঁর অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? অনিচ্ছাসত্ত্বেও নানীকে অগত্যা রাজনৈতিক সভা আর মিছিলে যাওয়া বন্ধ করতে হল। নানীর এই একটা মস্ত গুণ ছিল যে, দৈনন্দিন জীবনের গতানুগতিকতার সঙ্গেও বৃহত্তর জীবনের উত্তেজনায় ছন্দকে তিনি মেলাতে পারতেন। ঘরের কাজকে অবহেলা না-করেও বাইরের জীবন সম্পর্কে তাঁর আগ্রহকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। বাড়ির থেকে বিশেষ তিনি বার হতেন না। তবু মনে-মনে সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সর্বদাই তিনি যুক্ত ছিলেন।

* * *

আমাদের জীবনবিন্যাসে এইসময়ে ছোট্ট একটা পরিবর্তন ঘটে। আমাদের দুই বোনকে বাড়িতে রেখেই বাবা আর মা এখানে-ওখানে যেতে শুরু করলেন। ইতিপূর্বে সর্বদাই যে আমরা সবাই একত্রে বার হতুম, তা অবশ্য নয়। আমরা ছোটরা আয়ার সঙ্গে বেড়াতে বার হতুম, আর বাবা বার হতেন একা। তবে মা যখন কোথাও যেতেন, তখন আমরা তাঁর সঙ্গ নিতে ছাড়তুম না। ঠাকুমাও সঙ্গে যেতেন। এখন সেক্ষেত্রে শুধু বাবা আর মা একত্রে বার হতে লাগলেন। আমাদের বাড়িতে রেখেই তাঁরা ডিনারে আর লান্‌চে যান। তা ছাড়া যান ক্লাব বলে একটা জায়গায়। আমাদের বাড়িতেও তো ডিনার কিংবা লান্‌চ পার্টি থাকে, তাতেও কাউকে বাচ্চাদের নিয়ে আসতে দেখি না। শুধু স্বামী-স্ত্রীরাই জোড়ায়-জোড়ায় আসেন। তখন আমাদের অর্থাৎ ছোটদের ড্রইং-রুমে যেতে দেওয়া হয় না। কী হয় ওখানে, জানবার জন্যে আমার খুব কৌতূহল হত। বাবা আর মা'র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি যে খুব কষ্ট পেতুম, তা কিন্তু নয়। আসলে দুই পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সেই প্রথম আমি একটু-একটু করে সচেতন হয়ে উঠছিলুম। মনে হত, বাবা আর মায়ের পৃথিবী যেন আলাদা, তার থেকে আমি নির্বাসিত হয়েছি। অন্যদিকে যে-পৃথিবীতে আমরা থাকি, তার রূপরেখা আমার কাছে তখনও বিশেষ স্পষ্ট নয়। তাতে আমরা থাকি, ঠাকুমা থাকেন, আর থাকে দাসদাসীরা। বাবা-মায়ের পৃথিবীটাকে খুব চটকদার বলে মনে হত। আর আমাদের পৃথিবী কেমন যেন বিবর্ণ, গতানুগতিক।

মধ্যবয়সিনী এক মহিলাকে আমরা চিনতুম। অভিজাত পরিবারের মহিলা, পয়সা-

কড়িও প্রচুর, ফরাসী সালঁ'র কায়দায় সাজাহানপুরে তিনি একটা কেতাদুরস্ত সম্মিলনী গড়ে তুলতে খুব চেষ্টা করেছিলেন। মধুর স্বভাবের মহিলা, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, সবাই তাঁকে খুব 'মডার্ন' বলে মনে করত। তাঁর রুচি ছিল মার্জিত। ঘোমটা দিতেন না। উপরন্তু সাজাহানপুরের মহিলাদের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই আমরা নিজের হাতে গাড়ি চালাতে দেখেছি। ছোট্ট শহর, তার পরিবেশ ছিল সংকীর্ণ, বিধিনিষেধে ভরা, তার মধ্যে নিশ্বাস নিতে ভদ্রমহিলার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হত, তাই অনেককে তিনি তাঁর সামাজিক বৃত্তের মধ্যে টানবার চেষ্টা করতেন। বাবা আর মাকেও তিনি টানতে চেয়েছিলেন। মা নিশ্চয় সেই বৃত্তের মধ্যে যেতেও চাইতেন। কিন্তু বাবার তাতে সায় ছিল না। বাবা যে-সব আই-সি-এস অফিসারের বাড়ি গিয়েছেন, ভদ্রতা করে তাঁদেরও তো আমাদের বাড়িতে একবার আসা উচিত, কিন্তু তা তাঁরা আসেননি বলে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারটা বড্ড জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অন্য-একটা বাধাও ছিল। আমাদের সমাজে পর্দাপ্রথার চল ছিল না; ঘোমটা না-দিয়েই মেয়েরা বাইরে বার হতেন; সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে মেলামেশাও ছিল অবাধ। এ-সবই ঠিক; কিন্তু অন্য সমাজের মানুষদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে নিয়মকানুন ছিল আলাদা। বাবা এক্ষেত্রে নিজেই কিছু কানুন তৈরী করে নিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য: কেউ যদি তাঁর স্ত্রীকে বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন, তাহলে আমার মাকেও তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে; আর কেউ যদি তাঁর স্ত্রীকে পর্দার আড়ালে রাখেন, তাহলে অন্তত তাঁর ক্ষেত্রে আমার মা-ও থাকবেন পর্দানশীনা। ফলে অনেক সময় হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হত। আমাদের বাড়িতে না হয় বাবার নিয়ম চলল, অন্যের বাড়ির বেলায় কী হবে? সেখানে তো এমন সব লোক উপস্থিত থাকতে পারেন, যাঁদের স্ত্রীরা পর্দানশীনা, সুতরাং—বাবার কানুন অনুযায়ী—মাকে তো তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া চলে না। অন্যের বাড়ির পার্টিতে সেইসব লোকের সঙ্গে মায়ের সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা কীভাবে ঠেকানো যাবে? আর এইজন্যেই হয়তো অতি-আধুনিকা সেই মহিলার বাড়িতে আমার বাবা আর মা মাত্রই দু-চারবার গিয়েছিলেন, তাঁর 'সালঁ' কিংবা অন্তরঙ্গ বন্ধুগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবার চেষ্টা করেননি। ভদ্রমহিলাকে আমি বারকয়েক দেখেছিলুম। তার বাড়ির মধ্যে যে পরিমার্জিত রুচি আর আধুনিকতার ছোঁয়া ছিল, তাতে মুগ্ধও হয়েছিলুম। বারবার সেখানে যেতে ইচ্ছে হত।

বারাণসীর পরিবেশ একেবারে অন্যরকম। বেশ বড়সড় শহর তো, তাই নিজেই সেখানে আলাদা করে একটা বন্ধুগোষ্ঠী গড়ে নেওয়া সম্ভব। আমার বাবা-মা'র বয়সী এক দম্পতিকে সেখানে দেখতুম। দুজনেই বেশ উৎসাহী। ছোট্ট একটা ক্লাব তাঁরা গড়ে নিয়েছিলেন। সেখানে টেনিস আর ব্যাডমিণ্টন খেলা হত। তাস আর 'মাজং'-এরও আসর বসত। মাঝে-মাঝেই তাঁরা পার্টি, পিকনিক, সম্মিলনী ইত্যাদির আয়োজন করতেন। ভদ্রমহিলা খাটো করে চুল রাখতেন, পোশাক পরতেন পরিপাটি, সব মিলিয়ে বেশ একটা বাহার খেলত। বয়সে তিনি মায়ের চাইতে ছোট নন, অথচ দেখাত অনেক কমবয়সী আর উচ্ছল। বেশ চোখে পড়বার মতো চেহারা। তিনটি ছেলেমেয়ে ছিল তাঁদের। বড়টি ছেলে, আমারই বয়সী, তার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকেই বেশ সভ্যিভব্যি। তাদের বাড়িতে যেতে আমার খুব ভাল লাগত। যেটা আমায় সবচাইতে টানত, তা হচ্ছে আধুনিকতার ছোঁয়া। ইঙ্গ-ফ্যাশনের নকলনবিশ না হয়েও ও-বাড়ির সবাই ছিলেন আচার-ব্যবহারে খুব আধুনিক। আর সেইজন্যে স্বভাবতই আমি তাঁদের পছন্দ করতুম। বাড়ির ছেলেমেয়েরা সময়ের কাজ সময়ে করত। প্রত্যেকেই ছিল নিয়মশৃঙ্খলার অনুরক্ত। দেখে আমি বিস্ময়বোধ করতুম। তবে সে-সব নিয়ম যদি আমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হত, তা হলে আমি মেনে চলতুম

কিনা, তাতে সন্দেহ আছে।

শহরের কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে, শহরতলির এক নির্জন এলাকায় আমাদের বাড়ি। মাইল দুয়েকের মধ্যে এমন কোনও বাড়ি নেই, যেখানে বেড়াতে যাওয়া যায়। ইশকুলে পৌঁছতে আমাদের দেড় ঘণ্টারও বেশী সময় লাগত। ইশকুলের বাস সবচাইতে আগে আমাদের তুলত, আর সকলের শেষে নামাত। সকাল সাড়ে আটটায় ইশকুলে রওনা হতুম আমরা, আর ইশকুল থেকে বাড়িতে ফিরতে সন্ধ্যে ছটা হয়ে যেত। দিনের শেষে আমরা তখন দারুণ ক্লান্ত। তবে হ্যাঁ, রোজ তো আর ইশকুলে যেতুম না। রবিবার ছিল, অন্যান্য ছুটির দিন ছিল, তার উপরে ছিল একটানা গ্রীষ্মের ছুটি। সেই প্রথম আমি কেমন যেন নিঃসঙ্গ বোধ করতে শুরু করি।

দিদি আর আমি, দুয়ে মিলে এতদিন আমরা যেন একই ছিলুম। বাড়ির লোকদের কাছ থেকে যে আমরা একই রকমের ব্যবহার পাই না, তা আমি জানতুম বটে, তবে তাই নিয়ে কখনও দিদির উপরে আমি অভিমান করিনি। দিদির সঙ্গে যেমন খেলাতুম, তেমনি মারামারিও করতুম খুব। রেগে গেলেই দিদির লম্বা বিনুনি ধরে আমি টান লাগাতুম, দিদিও অমনি দশ আঙুলে আমার চুলের ঘুঁটি খামচে ধরত, তারপর এমন জোরে টান লাগাত যে, যন্ত্রণায় আমি অস্থির হয়ে উঠতুম, দিদির বিনুনি ছেড়ে না দিয়ে তখন আর উপায় থাকত না। কখনও কখনও পরস্পরের সঙ্গে আমরা আড়ি করতুম; প্রতিজ্ঞা করতুম যে, কক্ষনো আর কেউ কারও সঙ্গে কথা বলব না। কিন্তু আমিই শেষপর্যন্ত কথা না বলে থাকতে পারতুম না, সাধাসাধি করে দিদির সঙ্গে আবার ভাব করে ফেলতুম। মেকী কোনও সম্মানবোধ আমার ছিল না। উত্তেজনা কেটে যাবার পরেই আমার দোষ আমি স্বীকার করে নিতুম। দিদির ন্যায়ান্যায়-বোধ ছিল খুব তীব্র। কোনও ব্যাপারে আমার প্রতি কোনও অন্যায় করেছে বুঝতে পারলে মনে-মনে তার জন্যে সে খুব গ্লানি বোধ করত, তবে আমি যেমন সরাসরি আমার দোষ স্বীকার করতুম, দিদি তা করত না। তার বদলে সে মায়ের কাছে গিয়ে আমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিতে বলত। মাকে অনেকবার মধ্যস্থ হয়ে আমাদের ভাব করিয়ে দিতে হয়েছে।

দিদির আর আমার যা কিছু ছিল, যৌথভাবেই ছিল। একেবারে আলাদা করে নিজের বলতে কারও কিছু ছিল না। আলাদা-আলাদা বিছানায় আমরা ঘুমিয়ে পড়তুম, কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙার পরে দেখতুম যে, একই বিছানায় শুয়ে আছি। মাঝরাতে কে যে উঠে গুটিসুটি অন্যের বিছানায় শুয়ে পড়ত, দিদি না আমি, তা আর এখন মনে পড়ে না। গোটাকয়েক খেলনা ছিল আমাদের; তার বেশির ভাগই পুতুল। একটা পুতুল ছিল দারুণ দেখতে। মাথায় সত্যিকারের চুল, চোখে সত্যিকারের পল্লব। পুতুলটাকে শুইয়ে দিলে তার চোখ দুটো বুজে যেত, আবার দাঁড় করালেই সে অমনি চোখ মেলে তাকাত। কী যে প্রিয় ছিল সেই পুতুলটা। পুতুলকে আমরা নির্জীব ভাবতুম না। ভাবতুম যে—আমাদেরই মতো—তাদেরও প্রাণ আছে, আলাদা অস্তিত্ব আছে। একবার আমরা পুতুলের বিয়ে দিয়েছিলুম। আমাদের পুতুল হল বর, আর আমাদের এক প্রতিবেশীর পুতুল হল কনে। সেই বিয়েতে খুব ঘটা হয়েছিল, বড়রাও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। বিয়ের কিছুকাল বাদে সব বউয়েরই তো বাচ্চা হয়, তা আমরা ঠিক করলুম যে, আমাদের পুতুল-বউয়েরও একটা বাচ্চা হবে। সেই অনুযায়ী করলুম কী, খুদে একটা পুতুল যোগাড় করে আমাদের পুতুল-বউয়ের পোশাকের ভাঁজে সেটাকে লুকিয়ে রাখলুম। বাস্, যথাসময়ে এবারে বাচ্চা হলেই হয়। মা তো আমাদের খেলাধুলোর কোন খোঁজ রাখতেন না, কিন্তু এই ব্যাপারটা তিনি জেনে গিয়েছিলেন। এই নিয়ে খুব বকুনিও দিয়েছিলেন আমাদের। বকুনি খেয়ে আমি আর

দিদি তো হতভম্ব। কী দোষ করেছি আমরা? দুজনেই খুব আহত বোধ করেছিলুম।

দিদির সঙ্গে একদিন খুব ঝগড়া হয়েছিল আমার। রাগের মাথায় দিদিকে একটা চড় মেরেছিলুম। জানতুম যে, দিদিও এবারে পাল্টা-চড় মারবে, তাই তৎক্ষণাৎ আমার মুখ আমি সরিয়ে নিই। দিদি কিন্তু চড় মারল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, গম্ভীর মুখে স্তব্ধ হয়ে দিদি বসে আছে। তাতে যেন আমার আরও খারাপ লাগল। মনে হল, এর চাইতে বরং দিদি আমাকে একটা পাল্টা-চড় মারলেই ছিল ভাল। দিদি যখন আমাকে আর মারবে না বলে ঠিক করেছে, তখন আমিই বা মারি কী করে? তার পরে আর দিদিকে কখনও মারিনি। অর্থাৎ আমাদের শৈশবের মারামারি সেখানেই শেষ হয়ে গেল। তারই সঙ্গে যেন দিদিও আমার জীবন থেকে সরে দাঁড়াল। দিদি আমাকে ছাড়িয়ে গেছে। দিদি বড় হয়ে উঠেছে। অথচ আমি সেই ছোটটিই রয়ে গেলুম। কিন্তু দিদি নিশ্চয় হঠাৎ একদিনে বড় হয়নি, দিনের-পর-দিন একটু-একটু করে সে বড় হয়ে উঠছিল। কিন্তু তার এত কাছাকাছি আছি বলেই সেই বড় হয়ে ওঠা আমি লক্ষ করিনি। কবে যে দিদি ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরল, তাও সেদিন আমি মনে করতে পারলুম না। শাড়িটা যেন সেদিনই প্রথম আমার চোখে পড়ল। আর সেদিন থেকেই যেন, নিজেদেরই অলক্ষ্যে, একটু-একটু করে পরস্পরের থেকে আরও দূরে সরে যেতে লাগলুম আমরা। দুজনে দুজনের এত কাছে রয়েছি, তবু আমাদের ব্যবধান ক্রমেই বাড়তে লাগল।

* * *

পুতুল খেলার বয়স আমারও শেষ হল। বাবা আর মা এখানে-ওখানে বেড়াতে যান। আমার কোথাও যাবার মতো জায়গা নেই। অগত্যা বই পড়ে আমার সময় কাটে। ইংরেজী ভাষাটা তখনও আমি ভাল করে বুঝতে পারি না। ইংরেজী বইয়ের থেকে কেউ যখন কিছু পড়ে শোনায়, তখন যতটা ভাল লাগে, নিজে পড়ে ততটা আনন্দ পাই না। তাই আমাকে কিছু পড়ে শোনাবার জন্যে দিদিকে তখন জ্বালিয়ে মারতুম। কিন্তু এমনিতেই দিদির পড়তে বিশেষ ভাল লাগে না, তার উপরে আবার চেঁচিয়ে পড়তে আরও খারাপ লাগে। ফলে আমি হিন্দী পড়তে আরম্ভ করলুম। বাড়িতে হিন্দী বইয়ের সংখ্যা খুব কম; ইশকুল-লাইব্রেরিতে যেগুলো আছে, সেগুলি নেহাতই শিশুসেব্য। বাবা আমার মাথার মধ্যে এই একটা ধারণা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে, শিশুপাঠ্য বই কিংবা পত্রিকা পড়বার বয়স আর আমার নেই, ফলে ও-সব বই আর কাগজ সম্পর্কে আমার আগ্রহ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিল। যে-সব হিন্দী বই আসলে বড়দের জন্য লেখা, তা-ই পড়তে থাকি। কী পড়ছি, তা কেউ দেখতে আসত না; এ-ব্যাপারে কারও কোনও আগ্রহও ছিল না। সেই সময়ে একটা বই পড়েছিলুম, মনে পড়ে। তাতে একটা ভূতের কথা ছিল রাত্তিরে যার দেখা মিলত। রক্তের অক্ষরে দেয়ালে একটা লেখা ফুটে উঠবার কথাও তার মধ্যে ছিল। যদ্দুর মনে হয়, হ্যামলেট-এর একটা শস্তা তর্জমা। তবে আমি নিশ্চিত নই। যাই হোক, বইটা পড়ে আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলুম। অন্ধকারকে ভয় পাই, একা-একা পাশের ঘরেও যেতে পারি না, বাথরুমে যেতে হলেও দিদিকে আমার সঙ্গে যেতে বলি। কেন যে যেতে বলি, দিদি তা বুঝতে পারে না, আমার উপরে রেগে যায়। আর লজ্জায় আমিও কাউকে কিছু খুলে বলতে পারি না। দিদিকেও বলতে সংকোচ হয় যে, আসলে আমি একটা মস্ত ভিতু, অন্ধকার দেখলেই আমি ভয় পাই। বেশ-কিছুদিন তখন ভয়ে-ভয়ে কেটেছিল।

আমাদের বাংলোর কম্পাউন্ড খুব বড়। তাতে অনেক ফলের গাছ আর ঝোপঝাড় ছিল। কেউ তার কোনও যত্ন নিত না। ফলে জায়গাটা একেবারে জংলা হয়ে থাকত,

সেখানে একটু খেলব তার জো ছিল না। উঠোনের ঠিক বাইরেই ছিল একটা হরশিঙ্গার গাছ। তার তলাটা ফুলে-ফুলে ঢেকে যেত। ছোট সাদা ফুল, লাল্‌চে বোঁটা। সকালে গিয়ে, সাজি বোঝাই করে, ফুলগুলি আমি নিয়ে আসতুম। পরে সেগুলো রোদ্দুরে শুকিয়ে নেওয়া হত। খুব সুন্দর জাফরানী রঙ তৈরী হত তার থেকে। সেই রঙে একটা মিষ্টি নম্র গন্ধ লেগে থাকত। বাড়ির সামনে ছিল একটা চন্দন-গাছ। অন্তত চন্দন বলেই শুনেছিলুম। আসলে অবশ্য, চন্দন কেন, কোনও গন্ধই তাতে ছিল না। তার একটা ডাল কেটে কে যেন একটা বসবার জায়গা বানিয়ে দিয়েছিল। তার উপরে দিব্যি বসা চলত। অনেক সময় তাতে বসে আমি সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতুম। আমাদের বাড়ির ঠিক সামনে আর একটা বাড়ি। তার গেটের দু দিকে মস্ত দুটো ময়ূর। গেট আর বাড়ির মাঝ-বরাবর অনেকটা জায়গা ফাঁকা। ময়ূরের উপর থেকে আমার দৃষ্টি এক সময়ে সেই ফাঁকা জায়গাটার উপরে গিয়ে পড়ত। কী জানি কেন, নিজের মধ্যে তখন অদ্ভুত একটা শূন্যতার বোধ জেগে উঠত। মনে হত, গ্রীষ্মের এই দীর্ঘ ছুটি শেষ হলে, ইশকুল খুললে বাঁচি।

ইশকুলে আমি খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করতুম। তার কারণ হয়ত সেখানকার জাতীয়তাবাদী পরিবেশ। কিংবা তার উদ্দেশ্যের সেই একাগ্রতা, সেখানকার আবহাওয়ায় যা খুব স্পষ্ট করে অনুভব করা যেত। কিংবা সেই বলিষ্ঠতা আর উদ্যম, ইশকুলটির পরিবেশে শ্রীমতী বেসান্ত যার ছোঁয়া লাগিয়ে দিয়েছিলেন। হেতুটা যা-ই হোক, ইশকুলে গিয়ে আমি স্বস্তি পেতুম। আমার লেখাপড়ায়, আমার কাজেকর্মে তার প্রভাব পড়েছিল। কাদামাটি দিয়ে হরেক রকমের জিনিস গড়তে আমার ভাল লাগত। ব্যাপারটাকে এখানে যে একটা নোংরা খেলা বলে মনে করা হয় না, পক্ষান্তরে এটা যে এখানে একটা শিক্ষণীয় বিষয়, এইটে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। ভাল লাগত বিজ্ঞানের ক্লাস। ভাল লাগত হাতে-কলমে বৈজ্ঞানিক ব্যাপারগুলোকে পরীক্ষা করে দেখতে। মনে আছে, এমন একটা কাগজের পেয়ালায় আমরা জল ফোটাতুম, যা আগুনে পুড়ত না। ভাল লাগত সাপ্তাহিক বিতর্ক আর আলোচনা-সভা। মাঝেমধ্যে, ছোট এক-একটা নাটক বেছে নিয়ে আমরা অভিনয় করতুম। গান গাইতুম। সবচাইতে ভাল লাগত 'অন্ত্যাক্ষরী' খেলা। এ-খেলা দুটি দলের মধ্যে চলে। অনেকটা শব্দ বানাবার খেলার মতো। একদলের একজন একটা কবিতা বলল; তার শেষ লাইনের শেষ অক্ষর দিয়ে অন্য দলের কাউকে আর-একটা কবিতা বলতে হবে। ফী মাসে গোটা ইশকুলের একটা সম্মিলনী হত। তাতে প্রতিটি ক্লাসের উপরে একটা-না-একটা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পড়ত। আমাদের ক্লাস থেকে দু'বার আমি কবিতা আবৃত্তির জন্যে নির্বাচিত হয়েছিলুম।

*   *   *

বাবাকে এর আগে আর কখনও এত উত্তেজিত দেখিনি। তাঁকে টপকে তাঁর চাইতে জুনিয়ার একজন অফিসারকে প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে। বাবা তাঁর অধীনে কাজ করতে রাজী হলেন না; বললেন, অবিলম্বে তাঁকে অন্য-কোথাও বদলি করা হোক। কাউকে ডিঙিয়ে কাউকে প্রোমোশন দেওয়ার ব্যাপারটা যে কী, তাও ঠিক বুঝতে পারিনি; তবে এইটুকু মনে আছে যে, বাবার প্রতি এই অসম্মানটা আমারও খুব বেজেছিল। যাই হোক, বারাণসীতে যাবার পরে মাস-দশেকের মধ্যেই আবার আমাদের তল্পিতল্পা গোটাতে হল।

বারাণসীকে লোকে বলে মৃত্যুঞ্জয় শহর। বলে, মর্ত্যভূমিতে স্বর্গধামের অংশ। কোনও বিপর্যয় বারাণসীকে কাবু করতে পারেনি। কেউ একে ধ্বংস করতে পারেনি। বলতে গেলে, কিছু না দেখেই সেই পুণ্যনগর আমি ছেড়ে এলুম। না দেখলুম তার

বেড়ানো, না গেলুম তার মন্দিরে। না বুঝলুম তার পাণ্ডিত্যের মহিমা। তার আবর্জনাও আমার দেখা হল না। এমন কী, দেখলুম না সেই শ্মশান-ঘাটগুলিকেও, সবাই যার কথা জানে।

* * *

এলাহাবাদে এসে প্রথমেই আমরা স্বরূপরানীজীকে প্রণাম করতে আনন্দ-ভবনে যাই। সেখানে যাবার কথা শুনে খুব উত্তেজনা বোধ করেছিলুম; তার কারণ, বিখ্যাত এই বাড়ি সম্পর্কে ইতিপূর্বে দারুণ-দারুণ সব গল্প শুনেছি। আমাদের তো ড্রইংরুমে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে চেয়ারগুলোকে খুব নজর করে দেখলুম। শুনেছিলুম, এ-সব চেয়ারে কেউ বসলেই অমনি গানের গৎ বেজে ওঠে। আমি তো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চেয়ারগুলোকে দেখতে লাগলুম, কিন্তু তার চেহারায় যে কোনও বৈশিষ্ট্য আছে, এমন মনে হল না। তারপর খুব সন্তর্পণে তো তার একটায় বসা গেল। কিন্তু, কই, কোনও গান-বাজনা তো বেজে উঠল না। তাতে হতাশ হয়েছিলুম ঠিকই, কিন্তু—এই বাড়িটা তো আর-পাঁচটা মামুলী বাড়ির মতো নয়, কত ইতিহাস এর মধ্যে ধরা রয়েছে—তাই রাজ্যের উত্তেজনা আমার মনের মধ্যে তখনও টগবগ করে ফুটছিল।

স্বরূপরানীজীকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। দেখেই মনে হয়, খুব শান্ত আর দয়ালু মহিলা। চেহারায় বেশ একটা ঠাকুমা-ঠাকুমা ভাব রয়েছে। ভয়ে-ভয়ে আনন্দ-ভবনে ঢুকেছিলাম, কিন্তু তাঁকে দেখে সেই ভয়টা একদম কেটে গেল। কথাবার্তায় খুব অমায়িক; সেইসঙ্গে তিনি চেষ্টা করছিলেন, যাতে আমাদের সঙ্কোচের ভাবটা কেটে যায়।

খানিক বাদে বাবা তাঁর কাছে বিদায় চাইতে স্বরূপরানীজী বললেন, "সে কী, মেয়েদের সঙ্গে তো তোমাদের এখনও দেখা হয়নি, তাদের সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবে, তাও কি হয় নাকি?" একজন ভৃত্যকে ডেকে তিনি বাড়ির মধ্যে গিয়ে মেয়েদের পাঠিয়ে দিতে বললেন।

তিনটি মেয়ে ঘরে এসে ঢুকল। দৈর্ঘ্য সকলের সমান নয়, বয়সও আলাদা। পোশাকে কোনও জাঁক নেই, তিনজনেরই পরনে সাদা শাড়ি। কিন্তু সেই সারল্যের মধ্যেও এমন একটা ব্যাপার ছিল, যাতে করে—এতকাল যে-সব মেয়ে আমি দেখেছি, তাদের থেকে—এই মেয়ে তিনটিকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যের মূলে পারিবারিক শিক্ষা না সূক্ষ্ম রুচি, তা জানি না; আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, এদের ও আমাদের মধ্যে একটা মস্ত ব্যবধান আমি আঁচ করতে পারছিলুম। স্বরূপরানীজী ও আমাদের মধ্যে কিন্তু সেই ব্যবধানটা ছিল না।

'নমস্কার' বলে মেয়ে তিনটি দাঁড়িয়ে রইল। তাদের ভঙ্গিতে একটা মৃদু অস্বস্তি ফুটে উঠেছিল। বাড়িতে লোক এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে তাদের আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাস্, আর তাদের দাঁড় করিয়ে রাখা কেন। বুঝতে পারছিলুম যে, তারা এখন চলে যেতে চাইছে। এইরকম অবস্থায় আমিও ঠিক এই রকমের অস্বস্তিই তো বোধ করি। শান্ত, মধুর গলায় স্বরূপরানীজী বললেন, "আর বোলো না, এই মেয়েগুলিকে নিয়ে আমি একেবারে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। এদের প্রত্যেকেরই ধারণা যে, সে আর ছোট্টটি নেই, বড় হয়ে গেছে, চলনে-বলনে সেইটে প্রমাণ করতেই এরা দারুণ ব্যস্ত। ইন্দুর বিশ্বাস, সে এখন কৃষ্ণার সমবয়সী। এদিকে চাঁদের ধারণা, সেও কিছু পিছিয়ে নেই; অন্য দুজনের সঙ্গে যেভাবে কথা বলি, ওর সঙ্গেও ঠিক সেইভাবেই কথা বলতে হবে।" মেয়েদের মধ্যে সবচাইতে যে বড়, মাকে দেখিয়ে স্বরূপরানীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন—একে চেন? মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "বাঃ, উনি তো চন্নী-ভাবী, দিল্লিতে

ওঁর বিয়েতে আমি গিয়েছিলুম।" আর-কোনও কথা ছিল না, তাই খানিকক্ষণ বসে থেকে আমরা বিদায় নিলুম।

আনন্দ-ভবন সম্পর্কে আমার ধারণা সেদিন পালটে গিয়েছিল। বাড়িতে একটিও পুরুষ নেই। থাকবার মধ্যে রয়েছেন একজন বর্ষীয়সী মহিলা, আর অল্পবয়সী তিনটি মেয়ে। আনন্দ-ভবনের জলুস আর ঐশ্বর্যের কথা শুনেছিলুম; স্বচক্ষে দেখে সেই বাড়িটিকে কিন্তু ভারী নিঃসঙ্গ মনে হল। মনে হচ্ছিল, বাড়ির আবহে একটা নিঃসঙ্গতার বেদনা ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

স্বরূপরানীজী খুব আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। আবার তাঁদের বাড়িতে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু তার পরেও তো সাড়ে তিন বছর আমরা এলাহাবাদে ছিলুম, কিন্তু তার মধ্যে আমাদের আর-কখনও ও-বাড়িতে যাওয়া হয়নি।

* * *

আমরা যে কাশ্মীরী, এলাহাবাদে থাকতে সেই প্রথম এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি স্পষ্ট করে অবহিত হই। বুঝতে পারি যে, অন্যান্য ভারতীয়দের থেকে আমরা একটু স্বতন্ত্র। আমরা "কাশ্মীরী", আর বাদবাকী প্রত্যেকেই হচ্ছে "ওরা"। আমরা যা করি, সেটাই হচ্ছে রীতিসম্মত; তার কোনও বিচ্যুতি ঘটলে সেটা আমাদের চোখে, খারাপ না হোক, অদ্ভুত তো বটেই। এলাহাবাদে একটা মস্ত বড় কাশ্মীরী সমাজ ছিল, ক্রমে আমরা তার সঙ্গে মিশে গেলুম। বাবা অবশ্য অন্যদের সঙ্গেও মেলামেশা করতেন, কিন্তু সে তাঁর আপন এলাকায়। আমাদের বাড়িতে যাঁরা বেড়াতে আসতেন, তাঁরা সবাই কাশ্মীরী। আমরাও কাশ্মীরী ছাড়া অন্য কারও বাড়িতে বড়-একটা যেতুম না। ইশকুলে অবশ্য সব সমাজের মেয়েরাই পড়তে আসত, কিন্তু ইশকুলের বাইরে অন্য সমাজের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের বিশেষ দেখা-সাক্ষাৎ হত না। আমরা দেখা-সাক্ষাৎ করতে যেতুম আমাদের সমাজের বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে; আমাদের বাড়িতেও আসতেন সাধারণত তাঁরাই। ফলে, যা স্বাভাবিক, আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল আমাদেরই সমাজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে।

আমাদের বাড়িতে এইসময়ে সেই পুরনো সামাজিক আবহটা আবার ফিরে আসে। বাবা একাই ক্লাবে যান, মা থাকেন বাড়িতে। তবে এলাহাবাদে আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন ছিল তো, কেউ-না-কেউ রোজই আমাদের বাড়িতে আসত; ফলে বারাণসীর সেই নিঃসঙ্গ ভাবটা আর ছিল না।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরকমের একটা খ্যাতি আছে যে, সেখানকার ছাত্রদের মধ্যে থেকেই সবচাইতে বেশী-সংখ্যক আই-সি-এস অফিসার বার হয়েছে। ভারতবর্ষের সমস্ত অঞ্চল থেকে ছেলেরা সেখানে পড়তে যেত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যারা থাকত, তাদের মধ্যে আমাদের মাসতুতো-পিসতুতো ভাইয়ের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না; মাঝে-মাঝেই আমাদের বাড়িতে তারা বেড়াতে আসত। এমনিতেই তো বাড়িতে কেউ এলে আমার খুব ভাল লাগে, তার উপরে আবার এইসব তুতো-ভাইদের সঙ্গ ছিল খুব উত্তেজনাময়। ইশকুলের বন্ধুদের কথা বাদ দিচ্ছি, এমনিতে কিন্তু মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সঙ্গই আমার ভাল লাগত। আমার এই তুতো-ভাইয়েরা যেন অন্য-একটা পরিবেশের বার্তা বয়ে আনত। সেই পরিবেশের পরিচয় স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলতে না-ই পারি, তার প্রতি আমি যে খুব আকৃষ্ট বোধ করতুম, সেটা ঠিক। পুরুষরা যে-জগতের বাসিন্দা, মেয়েরা সেখানে কেন পৌঁছতে পারে না, অনেক সময়েই আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হত। মেয়েদের চতুর্দিকে যেন একটা গণ্ডী টানা রয়েছে। কেন

সেই গণ্ডী ভেঙে তারা বেরিয়ে পড়ে না, এই কথা ভেবেও অনেক সময় আমার অবাক লাগত। গণ্ডীর মধ্যেই জীবন কাটাতে হবে, এমন কথা আমি কখনও মেনে নিতে পারিনি। বাবা বলতেন, ছেলেতে মেয়েতে কোনও তফাত নেই। বলতেন, "বড় হয়ে ঊর্মিলা চাকরি করবে, নিজের জীবিকার ব্যবস্থা ও নিজেই করে নেবে।" শুনে আমার মনে নিশ্চয় এই প্রশ্ন জাগতে পারত যে, ছেলেতে-মেয়েতে যদি কোনও তফাত না-ই থাকবে, তাহলে শুধু ঊর্মিলাকে চাকরি করতে হবে কেন, কেন কমলাও চাকরি করবে না? কিন্তু এই প্রশ্নটা আমার মনে কখনও উঁকি দেয়নি। ঊর্মিলাকে যে চাকরি করতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, এই কথাটাই আমার মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। ঠিক করেছিলুম, আমি বিয়ে করব না। মনে পড়ে, আমার বয়স যখন মাত্র ছ বছর, তখন একদিন আমার এক পিসীকে বলেছিলুম যে, বিয়ে করা ঠিক নয়, কেননা বিয়ে করলে অশান্তি ছাড়া আর কিছুই মেলে না। আমি যে চাকরি করব, এটাই ছিল নিশ্চিত। কী রকমের চাকরি করব, সেটা অবশ্য তখনও পর্যন্ত ভেবে দেখা হয়নি। ভাববার দরকারও হয়নি। একটা-কিছু চাকরি যে করব, এইটুকু জেনেই আমি তখন নিশ্চিন্ত।

সামাজিক সম্পর্করক্ষার জন্য নানান জায়গায় তো আমরা যেতুম, তারই সূত্রে একদিন এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। বয়স তা এই বছর তিরিশেক, মাথার চুল বব্ করে ছাঁটা, পরনে সাদাসিধে একখানা খাদি শাড়ি। বাবার কাছে শুনলুম, উনি একজন আইনজীবী, আদালতে প্র্যাকটিস করেন। সেই প্রথম আমি একজন বৃত্তিজীবী মহিলা দেখলুম। শিক্ষয়িত্রীরাও বৃত্তিজীবী, কিন্তু আমার হিসেবে তাঁদের আমি ধরিনি, তার কারণ শিক্ষকতা এতই মামুলী পেশা যে, আমাকে আদৌ আকর্ষণ করত না। সেদিক থেকে এই প্রথম একজন মহিলাকে দেখলুম তিরিশ পেরিয়েও যিনি বিয়ে করেননি। তাও আবার এই স্বাবলম্বী মহিলা কিনা আমাদের কাশ্মীরী সমাজেরই মেয়ে! আমার বাবা মাঝেমধ্যেই তাঁদের বাড়িতে যেতেন। তখন আমিও তাঁর সঙ্গ নিতুম। তাঁদের বসবার ঘরটা সবসময়েই দেখতুম লোকে ঠাসা। নানান ব্যাপারে তাঁরা তর্ক কিংবা আলোচনা করতেন। সে-সব তর্ক-আলোচনার ধারা আমি অনেক সময়েই বুঝতে পারতুম না বটে, কিন্তু সেই পরিবেশের যে একটা বিশেষ সৌরভ ছিল, সেটা আমার খুব ভাল লাগত।

আইনজীবী এই মহিলা ছিলেন এক সংগ্রামী কংগ্রেসী পরিবারের মেয়ে। নিজেও ছিলেন স্বদেশী লীগের একজন সক্রিয় সদস্যা। এই স্বদেশী লীগের উদ্যোগে তখন ফী বছর একটা মেলা বসত, আর তাতে এ-দেশে তৈরী নানান রকমের পণ্য প্রদর্শিত হত। আমি তো তখন মেলার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে দারুণ উৎসুক। আরও কয়েকটি বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমি আর দিদি তখন কংগ্রেস দলের জাতীয় সংগীত শিখতে শুরু করে দিলুম। মেলার উদ্বোধনী দিবসে পতাকা-দণ্ডকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আমরা 'বন্দেমাতরম্' গেয়েছিলুম। যতই বেসুরো গাই না কেন, আমার উত্তেজনার সেদিন অন্ত ছিল না। পতাকা উত্তোলন করা হচ্ছে, জনতা জয়ধ্বনি দিচ্ছে, আর আমরা সবাই মিলে জাতীয় সংগীত গাইছি,—সে এক দারুণ উত্তেজনার মুহূর্ত। আমাকে একটি ব্যাজ দেওয়া হয়েছিল। আমার কাছে তার অসীম তাৎপর্য। একে তো সেটি স্বাধীন ভারতের প্রতীক, তার উপরে আবার সেই ব্যাজের জোরে যখন-তখন আমি মেলার মাঠে ঢুকতে পারতুম।

মেলার একটা দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে অনেক জিনিসপত্র বিক্রি করেছিলুম আমরা। ক্রেতাদের হাতে কীভাবে কোন্ জিনিসটা গছিয়ে দিতে হয়, সেটা শিখে নিতে আমার বিশেষ সময় লাগেনি। আমাদের এই দোকানটায় অন্যতম পণ্য ছিল নারকোল-

দড়ির পা-পোষ। দেখতে দিব্যি, তবে দাম একটু বেশী। ফলে ক্রেতাদের অনেকেই তার রঙ নকশা ইত্যাদির প্রশংসা করতেন, কিন্তু কিনতেন না। পা-পোষের পাহাড় জমে গেছে, অথচ দাম কমিয়ে বিক্রি করব তার উপায় নেই, আমরা তো মহা মুশকিলে পড়লুম। সেই সময়ে আমাদের দোকানে একজন খদ্দের এসে হাজির। ভদ্রলোকের চেহারায় বেশ বৈশিষ্ট্য ছিল, কথাবার্তাও বেশ নম্র। আমি তো মুখে হাসি টেনে তাঁকে পা-পোষ বিক্রির চেষ্টায় লেগে গেলুম। আশ্চর্য, এক কথায় তিনি সমস্ত পা-পোষ কিনে নিলেন, দামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, আমার নাম কী। নাম বলতে তিনি হেসে বললেন যে, তাঁর আর আমার পদবী একই। খদ্দেরটি আর কেউ নন, সার্ তেজবাহাদুর সপ্রু। এলাহাবাদের বিখ্যাত আইনজীবী তিনি, দেশজোড়া তাঁর নামডাক। তবে, আমি তো আর তখন অতশত জানতুম না, সবগুলি পা-পোষ যে তাঁকে গছানো গেছে, তাতেই আমি তখন দারুণ খুশী।

* * *

আমার মামাতো ভাইবোনদের মধ্যে দুজন আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসত। সেবার আমরা ঠিক করলুম যে, গ্রীষ্মের ছুটিটা মা, দিদি আর আমি গিয়ে তাদের বাড়িতে কাটাব।

আমার এই মামার বাড়িতে সমস্ত-কিছু গুনে গুনে খরচ করা হত, সমস্ত কিছু তালাচাবি দিয়ে আটকে রাখা হত। মামা যখন দফতরে বেরোতেন, মামীমা তখন আলমারি থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করতেন ও গোনাগুনতি কয়েকটা সিগারেট মামার হাতে তুলে দিতেন। দোফালা কিংবা কুচিকুচি করে কাটবার আগে সুপুরিগুলিও গুনে নেওয়া হত। অথচ মামীমা যে খুব কিপটে ছিলেন, তা নয়। এমনও নয় যে, আমাদের খেতে দেবার ব্যাপারে কোনও কার্পণ্য করা হত। তবে মিষ্টিই দেওয়া হোক কিংবা চায়ের সঙ্গে কেক-বিস্কুটই দেওয়া হোক, সবই দেওয়া হত গুনে গুনে। আসলে এদের গেরস্থালি চালাবার ধরনটাই ছিল একটু আলাদা। এই ধরনটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারতুম না। মনের মধ্যে নানা রকমের প্রশ্নের উদয় হত, কিন্তু মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখতুম, তিনি মুখে আঙুল রেখে ইশারায় আমাকে চুপ করে থাকতে বলছেন। ফলে আর কিছু জিজ্ঞেস করা হত না।

রাত্তিরের খাওয়া চুকে যাবার পরে সাধারণত সবাই মিলে গ্রামোফোনে গান শোনা হত। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখলুম বেশ কড়া রকমের নিয়ম-কানুন রয়েছে। আসরের শুরুতে একটা প্রার্থনা-সংগীত শোনা হবে, তারপর শেষেও সেই প্রার্থনা-সংগীত। বাড়ির শোফার ছাড়া আর-কেউ গ্রামোফোন চালাতে পারবে না। এমন কী, আর-কারও ওটা ছোঁয়াও নিষেধ। গ্রামোফোন যখন চলবে, তখন মুখ খোলা চলবে না, একেবারে যাকে বলে স্পিক্‌টি নট্। কেউ একবার মুখ খুললেই সর্বনাশ। সাধারণত আমিই মুখ খুলতুম, এবং মামাও অমনি—আমাকে একটুও বকাঝকা না করে—শোফারকে বলতেন সেই প্রার্থনা-সংগীতের রেকর্ডটা চালিয়ে যেতে। অর্থাৎ গানের আসর সেদিনকার মতন ওইখানেই শেষ হয়ে গেল। মামা কখনও কথা বলে তাঁর বিরক্ত প্রকাশ করতেন না। তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করেও কিছুমাত্র লাভ হত না। গ্রামোফোনটিকে সরিয়ে রাখা হত ও আমরা ঘুমোতে যেতুম।

মামা কখনও সরাসরি তাঁর ছেলেমেয়েদের কিছু বলতেন না। যা বলবার, স্ত্রীর মারফতে বলতেন। এতে আমার খুব অবাক লাগত। আমাদের কাউকে কখনও তিনি বকেননি, কাউকে কোনও কটু কথা বলেননি। তবু স্বীকার করি, তিনি যখন বাড়িতে থাকতেন না, তখনই যেন আমি স্বস্তি বোধ করতুম।

[illegible] খুব ভালবাসতুম। আমাদের [illegible] বয়সের বড়। তার সঙ্গে আমাদের কী নিয়ে কথাবার্তা [illegible] এখন মনে নেই। তবে এইটুকু মনে পড়ে যে, সে খুব নম্র আর শান্ত ছিল। অন্যেরা যে-সব কথা আমাদের বুঝিয়ে বলবার দরকার বোধ করত না, সে-সব সে আমাদের বুঝিয়ে বলত। নানান বিষয়ে আমরা যে-সব প্রশ্ন করতুম, সে খুব ধৈর্য ধরে তার উত্তর দিত। তিনজনে মিলে একই চেয়ারে বসতুম আমরা। সে বসত চেয়ারের মাঝখানে, আর আমরা দুজনে বসতুম দু' দিকের দুই হাতলে। কখনও-কখনও আমার এই দাদার কোলেও বসতুম আমি। মামার একটা আলাদা চেয়ার ছিল। এমনভাবে সেটা বানানো হয়েছিল, যাতে বেশ-কিছুটা হেলান দিয়ে বেশ আরাম করে বসা যায়। তা একদিন আমরা তিনজনে একসঙ্গে সেই নতুন চেয়ারটায় বসতেই সেটা মচ্ করে ভেঙে গেল। তাই দেখে তো আমরা ভয়ে অস্থির। আমরা ধরেই নিয়েছিলুম যে, দফতর থেকে ফিরে ব্যাপার দেখে মামা একেবারে রেগে ফেটে পড়বেন। কিন্তু তা তিনি ফেটে পড়লেন না। শুধু চেয়ারটার অবস্থা দেখে বললেন, "হুঁ, একসঙ্গে তিনজনে মিলে এটায় বসেছিলে, কেমন?" আমরা ভেবেছিলুম, মামা খুব বকবেন। কিন্তু তা তিনি বকলেন না দেখে আমরা এতই হতভম্ব হয়ে গেলুম যে, মুখ ফুটে ক্ষমাটা পর্যন্ত চাইতে পারলুম না।

* * *

এলাহাবাদের মেয়েদের দেখলুম দু' দলে ভাগ করা যায়। এক দল পড়ে সেন্ট মেরি'জ কনভেন্টে, আর অন্যদল পড়ে ক্রসথোয়েট গার্লস' কলেজে। এই দু' দলের মেয়ে ছাড়াও বিস্তর মেয়ে এলাহাবাদে ছিল নিশ্চয়, কিন্তু তাদের যে এই হিসেবের মধ্যে ধরিনি, তার কারণ, তারা আমাদের সামাজিক বৃত্তের অন্তর্ভূত নয়। আমরা পড়তুম ক্রসথোয়েটে, এবং 'কনভেন্টের মেয়ে'দের আমরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখতুম। আসলে ওই শব্দটাই যেন সেকালে একটু অবজ্ঞাসূচক ছিল। অন্যদিকে, তারাও যে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখত, তা নয়। আমাদের আচরণে নাগরিক সূক্ষ্মতার অভাব ছিল, তা ছাড়া তাদের মতো আমরা ইংরিজী বলতে পারতুম না। এই কারণে তারা আমাদের একটু তাচ্ছিল্য করত। যাই হোক, সব মিলিয়ে আমাদের ইশকুলটা আমার ভালই লাগত। তার একটা কারণ এই যে, উঁচু ক্লাসের ছাত্রী বলে আমি তখন মূল ইশকুলের লাইব্রেরি থেকে বই নিতে পারছি। জুনিয়র ইশকুলের লাইব্রেরিতে যে-সব বই ছিল, সেগুলি নেহাতই শিশুপাঠ্য, তাতে কোনও রসই আমি পেতুম না। এর আগে দিদি যখন উঁচু ক্লাসে পড়ত তখন মূল ইশকুলের লাইব্রেরি থেকে বই এনে দেবার জন্য তাকে আমি জ্বালিয়ে মারতুম। তবে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্য বই পড়তে দিদির বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ফলে আমার অনুরোধও বড়-একটা সে রক্ষা করত না। এবারে আর দিদিকে অনুরোধ করবার দরকার নেই, ইচ্ছেমতন সব বই আমি নিজেই নিতে পারছি। সাধ মিটিয়ে আমি বই পড়তে লাগলুম।

সেকালে ভারতীয় সমস্ত-কিছুকেই অবজ্ঞার চোখে দেখবার একটা প্রবণতা ছিল। হিন্দী সাহিত্যকেও অনেকে খুব অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। সাহিত্যের ভাষা হিসেবে হিন্দী যে খুব ঐশ্বর্যশালিনী, এমন অবশ্যই নয়, এ-ব্যাপারে ইংরিজীর সঙ্গে তার তুলনাই চলে না। তবে, ইংরিজীতে লেখা বলেই যে-কোনও বই অমনি হিন্দীর চাইতে ভাল হবে, এই মনোভাবটা আমার অসহ্য ঠেকত। আমার বাবা তখন সেকালের রেওয়াজ-মাফিক ইংরিজীর অনুরাগী। আমাকে তিনি প্রায়ই খুব ঠাট্টা করতেন। উত্তেজিত হয়ে এই নিয়ে মাঝে-মাঝে তাঁর সঙ্গে তর্ক করতুম। তর্কে আমি তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে

পারতুম না। ফলে, আমি আরও রেগে যেতুম। আমার জেদই যে ঠিক, [illegible] সংশয় ছিল না। অথচ, সেই কথাটাকে ঠিকমতো করে গুছিয়ে বলতে পারছি না, [illegible] এই অক্ষমতায় ভীষণ গ্লানি বোধ করতুম আমি, মাঝে-মাঝে কেঁদেও ফেলতুম। বাবা তাতে খুব মজা পেতেন। হিন্দী উপন্যাস নিয়ে বাড়িতে ফিরলে আর রক্ষা ছিল না। ঠাট্টায়-বিদ্রূপে-সমালোচনায় বাবা প্রমাণ করে ছাড়তেন যে, বইটা একেবারে বাজে। বড়দের এই স্বৈরাচারী মনোভাব আমার একটুও ভাল লাগত না। বাবার আর কী, তাঁর যা ইচ্ছে তিনি বলতে পারেন। কিন্তু আমি তো তা পারি না। অন্যান্য অনেক ভারতীয় পরিবারের তুলনায় আমাদের পরিবারে ছেলেপুলেদের বাক্-স্বাধীনতা একটু বেশীই ছিল বটে, কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে, যা ইচ্ছে তা-ই আমি বলতে পারব। বাবা আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে পারেন। কিন্তু আমি তাঁকে তা করতে পারি না। কথা বলবার সময়ে আমাকে সতর্ক থাকতে হয়। লক্ষ করতে হয়, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার না অভাব ঘটে।

ছেলেবেলা থেকেই এই ইচ্ছে আমি পালন করেছি যে, গড্ডলিকা-প্রবাহে কখনও আমি গা ভাসিয়ে দেব না, আর-পাঁচজনের থেকে আমি একটু আলাদা হব। আর তারই জন্যে, আমাদের ক্লাসের অধিকাংশ মেয়ে যখন ইতিহাসকে তাদের ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে বেছে নিল, তখন—ভূগোলের প্রতি বিশেষ আসক্তি না থাকা সত্ত্বেও—আমি ঠিক করে ফেললুম যে, আমার ঐচ্ছিক বিষয় হবে ভূগোল। গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের বেলায় কী ঘটল, বলি। আর-পাঁচজনেব থেকে আলাদা হব, নিতান্ত এরই জন্যে যে আমি গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পড়িনি তা নয়; পড়িনি এই জন্যে যে, এমনকী পরোক্ষভাবেও যার মধ্যে ওই গার্হস্থ্য-গন্ধ লেগে আছে, এমন সমস্ত-কিছুর সম্পর্কেই আমার আপত্তি ছিল তীব্র। মেয়েদের তো শেষপর্যন্ত সংসার-ধর্ম করতেই হবে, তাই ছেলেদের থেকে মেয়েদের শিক্ষা একটু আলাদা হওয়া দরকার,—প্রায়ই এই ধরনের একটা বস্তাপচা কথা শোনা যেত। কথাটা আমি সহ্য করতে পাবতুম না। বেশ তো, পববর্তী জীবনে মেয়েদের যদি ওই সংসারের জাঁতাকলে পড়তেই হয়, তবে সেইজন্যেই তো আরও ইশকুল-জীবনে তাদের একটু রেহাই দেওয়া ভাল—আমার যুক্তিটা ছিল এইরকমের। আমার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগত, এতকাল যে-সব বিষয় শুধু ছেলেরাই পড়েছে, মেয়েরা সেগুলো পড়লে ক্ষতি কী? হিন্দু সনাতনীরা বলতেন, প্রতিটি ইশকুলে সংস্কৃত পড়া বাধ্যতা-মূলক হওয়া দরকার। প্রসঙ্গত তাঁরা লাতিনের যুক্তি দিতেন। বলতেন, ইংরেজী ইশকুলে লাতিন যেমন অবশ্যক বিষয়, স্বদেশী ইশকুলে সংস্কৃতকেও তেমনি অবশ্যক করা চাই। আমি যে সংস্কৃতকে আমার পাঠ্য বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলুম, তার কারণ অবশ্য আলাদা। আসলে সংস্কৃত না-নিয়ে আমার উপায় ছিল না। বিশ্বাস করুন চাই না-করুন, আমাদের ইশকুলে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের একমাত্র বিকল্প ছিল সংস্কৃত।

অল্প বয়সে সব মেয়েরই কান বেঁধানো হয়। তা এই ব্যাপাবে, গোটা ইশকুলে না হোক, অন্তত আমাদের ক্লাসে একমাত্র আমিই ছিলুম ব্যতিক্রম। ছেলেবেলায় আমার কান বেঁধানো হয়নি। তাই নিয়ে আমার একটু গর্বও ছিল। মনে হত, এ-ব্যাপারেও আর-সব মেয়ের থেকে আমি আলাদা। তবে, আমার কান যে বেঁধানো হয়নি, তাতে—বলাই বাহুল্য—আমার কোনও কৃতিত্ব ছিল না। খুবই বাচ্চা-বয়সে তো কান বেঁধানো হয়, তা আমারও যদি তখন কান বিঁধিয়ে দেওয়া হত, তবে কীই-বা করতে পারতুম আমি? বড় হবার পরে অবশ্য আপত্তি তুলেছি, তর্ক করেছি বাবার কথাটাকেই জোরগলায় সবাইকে শুনিয়ে দিয়ে বলেছি যে, ছেলে আর মেয়ে একই। আর তা-ই যদি হয়, তবে ছেলেদের কান বেঁধানোর নিয়ম যখন নেই, তখন মেয়েদেরই বা কান বেঁধানো হবে কেন? মেয়েদের গয়না পরার ব্যাপারটা বাবা পছন্দ করতেন না; বলতেন, মেয়েরা যত

সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাতামাতি করে, এই গয়নাটাও তেমনি একটা তুচ্ছ জিনিস। বড় হয়ে অবশ্য একটা কথা ভেবে একটু অবাক বোধ করি। আমাদের বাড়িতে যে-সব গয়নাগাঁটি কেনা হত, তার বেশির ভাগ—মা নন—বাবাই কিনতেন।

উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ আমরা। আমাদের সমাজে দামী গয়নাগাঁটি পরা হত; কমদামী কিংবা ঝুটো জিনিসকে সুনজরে দেখা হত না। অল্পবয়সী মেয়েদের মধ্যে সেইসময়ে রুপোর গয়না পরার ফ্যাশনটা খুব চালু হয়েছিল। আর-সকলের দেখাদেখি দিদিও তখন বায়না ধরে বসেছিল যে, সে রুপোর দুল পরবে। তাই শুনে বাবা তো হেসেই অস্থির। দিদিকে তিনি ঠাট্টা করতে শুরু করে দিলেন। এ ব্যাপারে আমার সমর্থন ছিল বাবার দিকে। মা যে এ-সব শস্তা গয়না পছন্দ করতেন, তা নয়। তবে বন্ধুদের দেখাদেখি একটা অল্পবয়সী মেয়ের রুপোর দুল পরবার শখ হয়েছে, এটা তাঁর কাছে খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। তিনি দিদির পক্ষ নিলেন। দিদি অবশ্য এ নিয়ে আর বিশেষ জেদ করেনি। ফলে শেষপর্যন্ত দেখা গেল, মা আর বাবার মধ্যেই এই নিয়ে একটা তর্ক বেধে গেছে।

গয়নাগাঁটির শখ আমার কোনওকালেই ছিল না। কিন্তু শস্তা দামের চুড়ি পরবার ফ্যাশনটা যখন খুব চালু হয়েছিল, তখন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারিনি। চুড়ি, চুড়ি আর চুড়ি। কত রকম-রঙ, কত রকম নকশা। মোটা চুড়ি, সরু চুড়ি। কাঁচের চুড়ি, গালার চুড়ি। রুপোলী কিংবা সোনালী গুঁড়ো ছড়ানো চুড়ি। চুমকি কিংবা টুকরো-টুকরো কাঁচ বসানো চুড়ি। কাঁচ তো নয়, আয়না। রোদ্দুর লেগে সেই আয়না-বসানো চুড়ি ঝকমক করতে থাকে, ইন্দ্রধনুর সাত-সাতটা রঙ ফুটে ওঠে তার মধ্যে। চুড়ি আর চুড়ি। শাড়ির রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে কত চুড়ি যে তখন কিনেছি। পোশাক পালটাবার মতো ঘনঘন পালটেছি চুড়ির নকশা। আর-পাঁচজনের থেকে আলাদা হবার মধ্যে গর্ব আছে ঠিকই, কিন্তু অনেক সময়ে আবার সবার রঙে রঙ মেলাতেও ইচ্ছে করে, আলাদা থাকাটাই তখন দুঃখের ব্যাপার। হয়তো সেইজন্যেই, আর-পাঁচজনেরই মতো, আমাকেও তখন চুড়ির নেশায় পেয়ে বসেছিল। চুড়ি দেখলেই তখন কিনতে ইচ্ছে হত। অথচ, তার জন্যে পয়সা চাই, এবং ও-বস্তুটা আমাদের বাড়িতে বড় সহজে মিলত না।

আমার বাবা ও মা'র চরিত্রে একটা স্ববিরোধী ব্যাপার ছিল। একটু-একটু করে আমি তখন সেটা বুঝতে পারছি। আমাকে দিয়ে যখন তাঁরা কিছু করিয়ে নিতে চাইতেন, তখন আর-পাঁচটা মেয়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতেন যে এ-কাজ সবাই করে, সুতরাং আমারও করা উচিত। পক্ষান্তরে, আর-পাঁচটা মেয়েব যা আছে, আমিও যখন তা-ই চেয়ে বসতুম, তখন তাঁরা বলতেন যে, আর-পাঁচজনের নকলনবিশি করা খুবই বোকামির ব্যাপার। বুঝতে পারতুম, আমি আর-পাঁচজনের মতো হব কি হব না, কোনও নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী সেটা তাঁরা ঠিক করছেন না, ঠিক করছেন নিতান্তই নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী। বাবা আর মা বলতেন যে, তাঁরা যুক্তিবাদী। অথচ 'যুক্তি' বলতে আমি যা বুঝতুম, তা তাঁরা বড়-একটা মেনে চলতেন না। হঠাৎ একদিন এই ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট করে বুঝতে পারি। মায়ের কাছে সেদিন আমি বাড়তি কিছু পয়সা চেয়েছিলুম। কিন্তু যুক্তি দিয়ে যতই তাঁকে বোঝাই যে, পয়সাটা আমার সত্যি খুব দরকার, মা আমার কথা কানেই তুলতে চান না।

ব্যাপারটা খুলে বলি। ইশকুলে যখন টিফিনের ঘণ্টা পড়ত, মেয়েরা তখন ছোট-ছোট কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে যেত। দল বেঁধে আমরা খাবারের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াতুম, তারপর যে-যার রুচি আর সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু খাবার কিনে, লনে বসে, খেতে-খেতে নিজেদের মধ্যে গল্প করতুম। টিফিনের জন্যে বাড়ি থেকে আমাকে

যে পয়সা দেওয়া হত, অন্যদের তুলনায় তা কম, কিন্তু তাই নিয়ে আমার আদৌ অস্বস্তি ছিল না। কিন্তু মেয়েদের এই দলগুলি একটু-একটু করে বড় হতে থাকে। তারপর ধীরে-ধীরে একটা নতুন রীতিও দেখা দিল। নিতান্ত নিজের জন্যে খাবার না-কিনে গোটা দলের জন্যে খাবার কেনার রীতি। দলের কেউ-একজন একাই খাবারের দোকানে গিয়ে গোটা দলের জন্যে খাবার কিনে আনত। প্রথম-প্রথম আমরা যে-যার খাবারের দাম দিয়ে দিতে চাইতুম, কিন্তু পরে দেখলুম, পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকেই গিয়ে সকলের জন্য খাবার কিনছে। এইরকম কিছুদিন চলবার পরে হুঁশ হল যে, দলের প্রত্যেকেই এই নতুন রীতি অনুযায়ী একদিন-না-একদিন গোটা দলের জন্যে খাবার কিনেছে—ব্যতিক্রম শুধু আমি। দলের অন্যান্য মেয়েরা আমার দিকে তাকাচ্ছে, কী করে আমি এখন 'না' বলব? পয়সা নেই, এই কৈফিয়তটা তো আর গ্রাহ্য হবে না, তার কারণ, ইশকুলের এই দোকানটায় ধারেও খাবার কেনা যায়। মনের অস্বস্তি মনের মধ্যেই চেপে রেখে দলের মেয়েদের জিজ্ঞেস করলুম, কে কী খাবে। সেই অনুযায়ী বাকীতে খাবার কিনে আনলুম। সব মিলিয়ে দাম পড়ল এক টাকা ছ' আনা।

পরদিন ইশকুলে রওনা হবার সময় মা যখন রোজকার মতো আমাকে টিফিনের পয়সা দিচ্ছেন, ভয়ে-ভয়ে মাকে বললুম যে, এত কম পয়সায় হবে না, আরও বেশী কিছু চাই। শুনে মা আমার হাতের মধ্যে আর-একটু পয়সা ফেলে দিয়ে বললেন, "বেশী মানে কত বেশী?" বললুম, "আরও অনেক অনেক বেশী। অন্তত আরও পাঁচ সিকে।" মা তো ফেটে পড়লেন। টিফিন খেতে এত পয়সা লাগবে কেন শুনি?

ব্যাপারটা তাঁকে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিলুম। জানিয়েছিলুম যে, পয়সা না-থাকা সত্ত্বেও দলের সকলের জন্যে খাবার না-কিনে আমার উপায় ছিল না।

কিন্তু সব কথা তিনি কানে তুললেন বলেও মনে হল না। জোর দিয়ে বারবার শুধু এই কথাটাই বলতে লাগলেন যে, ধার করা খুব অন্যায় ব্যাপার, ধারে খাবার কিনে আমি দারুণ খারাপ কাজ করেছি। অথচ, বাবাই কি ধারে কিছু কেনেন না? কতকিছুই তো তাঁকে বাকীতে কিনতে দেখি, মাসের শেষে দোকান থেকে বিল আসে, তখন তিনি দাম মিটিয়ে দেন। তা হলে? আমার বেলায় যেটা ধার, বাবার বেলায় সেটা কি ধার নয়? বাবা তো মাসান্তে টাকা শোধ করেন, আমি সেক্ষেত্রে পরদিনই দাম চুকিয়ে দিচ্ছি। তাহলে আমার অন্যায়টা কোথায় হল? এ-সব কথা অবশ্য বলা হয়নি; মা যেরকম তোড়ে আমাকে বকছিলেন, তাতে কথা বলার কোনও সুযোগই আমি পেলুম না। শেষপর্যন্ত অবশ্য পয়সাটা তিনি আমাকে দিলেন, তবে একইসঙ্গে বলে দিলেন যে, আর কখনো আমি ধারে কিছু কিনতে পারব না। বলে, তিনি তাঁর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, "কই, কমলা কি কখনও এমন কাজ করে?" সত্যিই তো, কমলা কখনও এমন কাজ করে না। কেন করে না? মা বললেন, ব্যাপারটা তিনি বাবার কানে তুলবেন না, তবে আর কখনও যেন এমন কাজ আমি না করি। ছেলেবেলা থেকে আমাদের শেখানো হয়েছে, বড়দের মুখে-মুখে কখনো কিছু বলতে নেই। তাই কিছু বললুম না। বিষণ্ণ চিত্তে, নীরবে সেখান থেকে চলে এলুম। তবে এ-বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না যে, আমার অসুবিধেটা কোথায়, বাবা সেটা ঠিক বুঝতে পারতেন। এ তো ধারের প্রশ্ন নয়। বন্ধুদের মধ্যে—সৌহার্দ্যের প্রতীক হিসেবে—নিছক দেওয়া-নেওয়ার একটা ব্যাপার। মনে-মনে মায়ের উদ্দেশে বললুম, "মা, তুমি কী করে এ-সব কথা বুঝবে, তুমি তো কখনও ইশকুলের চৌকাঠ পার হওনি!"

*　　*　　*

গোলাপী সিল্কের আস্তর দেওয়া আর নানান রঙের মোমবাতি দিয়ে সুন্দর করে

সাজানো, অর্ধচন্দ্রের আকারে গড়া মস্ত একটা কেক দেখেই যে হঠাৎ একদিন জীবনবিন্যাস সম্পর্কে আমার উপলব্ধি একেবারে পালটে গিয়েছিল, এমন কথা বললে নিশ্চয় বাড়িয়ে বলা হবে। তবু এটা ঠিক যে, সেই প্রথম আমি স্পষ্ট করে বুঝতে পারি, এমন ভারতবাসীও অনেক আছেন, যাঁদের জীবনবিন্যাস আমাদের থেকে একেবারে আলাদা। আমাদের জন্মদিনে পরমান্ন পরিবেষণ করা হত। জন্মদিনের কেক-এর কথা বইয়ে পড়তুম; তবে ধরেই নিয়েছিলুম যে, ওটা নেহাতই ইংরেজদের ব্যাপার। এখন দেখলুম, তা নয়। তার চাইতেও অবাক হলুম এইটে দেখে যে, জন্মদিন উপলক্ষে, শুধুই বাচ্চাদের জন্য আলাদা করে, এই পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। ঠিক এই ধরনের পার্টি এর আগে আমি বিশেষ দেখিনি। আমাদের জন্মদিনে তো গোটা পরিবারকেই নেমন্তন্ন করা হয়; তিন পুরুষ—কখনও-কখনও চার পুরুষ—একসঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসে। বাচ্চা বুড়ো সবাই মিলে আনন্দ করে।

চাঁদের কথা মনে পড়লেই পরিপাটি সাদা স্পোর্টস ফ্রক পরা তার চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু ওই পোশাকে নিশ্চয়ই তার জন্মদিনে আমি দেখিনি। নিশ্চয়ই অন্য কোনও উপলক্ষে চাঁদ ওই পোশাক পরেছিল। তবু যে ওই পোশাকটাই বিশেষ করে আমার মনে পড়ে, তার কারণ হয়ত এই যে, আমার স্মৃতির মধ্যে দুটো আলাদা ব্যাপার একাকার হয়ে গিয়েছে। আরও স্পষ্ট করে মনে পড়ে রিতা আর তারার কথা। পরনে দামী কাপড়ের প্যাস্টেল-রঙা ফ্রক তার কটিদেশ থেকে থাকে-থাকে কুঁচি নেমেছে, ছোট্ট দুই দেবশিশুর মতো তারা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল।

কোথায় যেন মিসেস পণ্ডিতের সঙ্গে আমাব মায়ের দেখা হয়ে গিয়েছিল। তখন মাকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আমরা খেলাধুলো কবতে পারি কিনা। কী অদ্ভুত প্রশ্ন! মনে আছে, আমার কাছে এই প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করতে আমি একটু চটেই গিয়েছিলুম। কিছুটা ক্ষোভ, কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে নেমন্তন্নটা গ্রহণ করেছিলুম আমরা। এসে যখন দেখলুম যে, নিমন্ত্রিত ছেলেমেয়েদের মধ্যে বেশির ভাগই আমাদের মতো বাড়ির থেকে এসেছে, তখন একটু স্বস্তি পাই। তবে এমন-কিছু শিশুও সেখানে ছিল, যাদের পোশাক আর চালচলন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তারা ঠিক আমাদের মতো নয়। ঠিক কোন্ ব্যাপারে যে তারা আলাদা, অনেক চেষ্টা করেও তা অবশ্য বুঝতে পারলুম না। বুঝতে পারছিলুম যে, তারা বড়লোক। কিন্তু শুধু তাই দিয়েই যেন পার্থক্যটার ব্যাখ্যা হয় না। যে-সব ছেলেমেয়েকে আমরা চিনি, তাদের মধ্যেও কেউ-কেউ তো একই রকমের, কিংবা আরও বেশী, ধনী পরিবারের সন্তান। কিন্তু কই, তাদের তো এমন পৃথক জগতের মানুষ বলে মনে হয় না। এই পার্থক্যটা তাহলে কিসের?

মিউজিক্যাল চেয়ার্স খেলছি, কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওদের গভর্নেস, সবকিছুর তিনি তত্ত্বাবধান করছেন, এমন সময়, খেলতে খেলতে প্রায় বিদ্যুচ্চমকের মতো আমার মনে পড়ল যে, এরাই সেই ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে, অনেক দিন আগে, সেই লবণ সত্যাগ্রহের সময়, খবরের কাগজে আমি যাদের ছবি দেখেছিলুম। তখন এদের যেরকম দেখাচ্ছিল, আজ মোটেই সেরকম দেখাচ্ছে না। বৈসাদৃশ্যটা এতই প্রকট যে, সেই কথা ভাবতে গিয়ে খেলার মাঝখানেই আমি থমকে থেমে দাঁড়ালুম; ফলে চেয়ারটা আমার হাতছাড়া হয়ে গেল।

সন্দেহ নেই, সেদিনকার সেই পার্টিতে ওদের পোশাক, ওদের চালচলন, ওদের মার্জিত কথাবার্তা, এই সবই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সন্দেহ নেই, আমার জন্মদিনেও যদি এমনি একটা পার্টির আয়োজন করা হত, তাহলে আমার আনন্দের সীমা থাকত না। এই সবই সত্যি কথা। তবু এও ঠিক যে, লবণ সত্যাগ্রহের সময়ে কাগজে ওদের

ছবি দেখে তো একটু ঈর্ষা বোধ করেছিলুম, সেই ঈর্ষাটা আজ আর ছিল না।

পরবর্তী জন্মদিনে বড্ড ইচ্ছে করছিল যে, আমার বেলাতেও ঠিক এইরকমের, অর্থাৎ শুধু অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে, একটা পার্টি হোক। মায়ের সঙ্গে এই নিয়ে আমার একটু ঝগড়াও হয়েছিল। কেন যে আমি শুধুই অল্পবয়সীদের নেমন্তন্ন করতে বলছি, মা সেটা বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর বক্তব্য, বড়দেরও নেমন্তন্ন করতে হবে, তাতে তো কোনও ক্ষতি নেই। বাচ্চারা বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প করবে, বড়রা বড়দের সঙ্গে, ব্যস্।

* * *

আমার মাসীর বিয়ের কথাবার্তা ইতিমধ্যে পাকা হয়ে গিয়েছিল। গ্রীষ্মকালে বিয়ে হবে, তার উদ্যোগ-আয়োজন করতে মা দিল্লি চলে গেলেন। স্কুল কামাই হবে, এই জন্যে দিদি আর আমি তাঁর সঙ্গে যেতে পারলুম না। ঠিক রইল যে, পরীক্ষা চুকে যাবার পরে আমরা দিল্লি যাব।

দিল্লি গিয়ে নানীর কাছে থাকতে বরাবরই আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু এবারে এমন একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যে, তখনও তার আঘাতটা কেউ ভুলতে পারছিলেন না। গোটা আবহাওয়াটা তারই বেদনায় যেন মুহ্যমান হয়ে ছিল।

১৯২৭ সন থেকে আমার দিদিমা থাকতেন আমার এক মামার্ কাছে। জীবন-যাপনের সেকেলে পদ্ধতিতে আমার এই মামাটি ইতিমধ্যে হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। সেটা বিচিত্র নয়, তার কারণ, জরাজীর্ণ যে বাড়ির একটা অংশে তাঁরা থাকতেন, অনেক শো বছর আগে সেটি তৈরী হয়েছিল, এবং তাতে আবরুর কোনও বালাই ছিল না। অথচ, অন্য কোনও বাড়িতে উঠে যাবেন, তারও উপায় নেই। মামা তাই করলেন কী, ওই সেকেলে বাড়ির মধ্যেই নিজেব রুচিমাফিক হাল-ফ্যাশনের একটা স্যুইট বানিয়ে নিলেন। একটা বেডরুম, একটা ড্রেসিংরুম, আর ছাতের উপরে একটা বাথরুম। স্যুইটটাকে তিনি একেলে কায়দায় সাজিয়ে নিয়েছিলেন। মামাব তো বিস্তর বন্ধুবান্ধব, তাঁর আমন্ত্রণে তাঁরা সবাই সেইখানে এসে জুটতেন। এ যখনকার কথা বলছি, তার প্রায় বছরখানেক আগে এই স্যুইটটা তৈরী করা হয়েছিল, এবং কেউ কল্পনাও করেনি যে, তার মধ্যে কোথাও কোনও গলদ রয়ে গেছে। অথচ হঠাৎ একদিন, প্রায় তাসের বাড়ির মতই, সেই নতুন অংশটা একেবারে হুড়মুড় করে ধসে পড়ল। উপর তলার অংশটা ভেঙে পড়ল নীচের তলায়, তারপর নীচের তলার মেঝেয় যে অল্পবয়সী তিনটি মেয়ে তখন খেলা করছিল, তাদের নিয়ে যাবতীয় আসবাবপত্রসমেত সেই তলা-দুটি একেবারে পাতালপুরীর সেলারে গিয়ে সেঁধিয়ে গেল। তিনটি মেয়ের মধ্যে দুটি যে কী করে রক্ষা পেয়ে গেল, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। দেখা গেল, তাদের চামড়া একটু-আধটু ছড়ে গেছে। আঘাত খুবই সামান্য, এমন কী, কারও একটা হাড় পর্যন্ত ভাঙেনি। তৃতীয় মেয়েটি কিন্তু বাঁচেনি। সেই ধ্বংসস্তূপের তলায় সে একেবারে থেঁতলে গিয়েছিল। সম্পর্কে সেও দিদিমার নাতনী। তার মা তখন বাড়িতে ছিলেন না। পরীক্ষার জন্যে মেয়েটিকে তিনি সঙ্গে নিয়ে বার হননি, দিদিমার কাছে তাকে রেখে গিয়েছিলেন।

এ একেবারে বিনামেঘে বজ্রাঘাত। বাড়ির যে অংশটুকু মামা নতুন করে বানিয়ে-ছিলেন, শীতের ঝরা পাতার মতই তা যেন টুপ করে খসে পড়ল। অথচ, বাড়ির যে-অংশটা পুরনো, জরাজীর্ণ—তার গায়ে একটুকু আঁচড় পর্যন্ত লাগল না। নিয়তির এ কী খেলা! সবাই তো স্তম্ভিত। কিন্তু, সত্যিই এটা কিছু অলৌকিক ব্যাপার নয়। বিপর্যয় ঘটবার কারণ ছিল বই কী। তখনকার দিনে মানুষ এত কথায়-কথায় স্থপতি কিংবা বাস্তুকারদের শরণ নিত না। যা করবার, রাজমিস্ত্রীরাই করত। তা, মামার অংশটা

যে রাজমিস্ত্রী নতুন করে বানিয়ে দিয়েছিল, সে এই সহজ কথাটাই ভেবে দেখেনি যে, পুরনো বাড়ির ভিত হয়ত এই নতুন অংশের ভার বইতে পারবে না। পরে অবশ্য এই ব্যাপারের কথাটা ভেবে দেখা হয়েছিল। কিন্তু সর্বনাশ যা হবার, তা তখন হয়ে গেছে। পনর বছর বয়সের যে মেয়েটি মারা গেল, তাকে আর তখন ফিরিয়ে আনবার উপায় নেই।

বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝা যেত না, কিন্তু এই মৃত্যুর ফলে ভিতরে-ভিতরে দিদিমা একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। বিশেষ করে এই কথাটা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না যে, মেয়েটিকে তাঁরই হেফাজতে রেখে যাওয়া হয়েছিল। একদিকে যেমন এই বিপর্যয়ের বেদনা, অন্যদিকে তখন একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার ঘটল। আমার মাসীর বিয়ে তো ঠিক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পাত্রপক্ষ হঠাৎ জানাল যে, এখানে তারা ছেলের বিয়ে দেবে না। বাড়ি ভেঙে পড়বার পরে কে যেন ভাংচি দিয়েছিল যে, এই দুর্ঘটনায় আমার মাসীরও একটা অঙ্গহানি হয়েছে। গুজবটা ঠিক কিনা, পাত্রপক্ষ সেটা যাচাই করে দেখারও প্রয়োজন বোধ করল না; শুকনো একটা 'না' বলে পাঠিয়েই তারা দায় চুকিয়ে দিল। আসলে হয়েছিল কী, দুর্ঘটনায় আমার মাসীর পায়ে একটু চোট লেগেছিল, হপ্তা দুয়েক তাঁকে একটু খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়েছিল, কিন্তু সেটা মোটেই মারাত্মক কোনও জখম নয়, কিছুদিন বাদেই তাঁর চোট সেরে যায়।

আমার এক মামাতো ভাই ছিল। তার আর আমার একই বয়েস। সে এই বাড়ির কাছেই থাকত। এর আগের বছর হঠাৎ টাইফয়েড হয়ে সে মারা যায়। তারপর এই মামাতো বোনটিও আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেল। দিল্লির বাড়িটা যেন ঝিমিয়ে পড়ল। কারও মুখে হাসি নেই। সেখানে আর কারও মন টিকছিল না।

তখনকার দিনে গ্রীষ্মের সময়ে ভারত-সরকারের গোটা দফতর দিল্লি থেকে সিমলায় চলে যেত। আমার মায়ের এক জ্ঞাতি-ভাইও এইসময় সিমলা যাচ্ছিলেন; তিনি বললেন যে, ইচ্ছে হলে আমরাও তাঁর সঙ্গে সিমলা গিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসতে পারি। শুনে তো তক্ষুনি আমরা রাজী হয়ে গেলুম। ছোট্ট-মাপের রেলগাড়িতে বসে পাহাড়িয়া পথে সিমলা যেতে-যেতে কী ভালই যে লাগছিল। নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। আমারও যাচ্ছিল, কিন্তু তাই বলে একটুও গা গুলিয়ে ওঠেনি। রেলগাড়ি মাঝে-মাঝে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। আমি সেই সুড়ঙ্গগুলিকে গুনছিলুম। এর আগে আর কখনও সুড়ঙ্গ দেখিনি।

এর আগে আমার দুই মামাতো ভাইয়ের কথা বলেছি। আগের গ্রীষ্মে তাদের মা-বাবার কাছে গিয়ে আমরা ছুটি কাটিয়েছিলুম। আকস্মিক যোগাযোগে সেই ভাই দুটিও তখন সিমলায় তাদের এক মামার বাড়িতে এসে ছুটি কাটাচ্ছিল। সিমলায় তাদের দেখা পেয়ে আমরা তো খুব খুশী। একসঙ্গে নানান জায়গায় বেড়াতে যেতুম, একসঙ্গে পাহাড়-চুড়োয় উঠতুম। সে খুব মজার ব্যাপার হয়েছিল। তা তাদের মামার বাড়ির লোকেরা একদিন চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করল। তাতে আমাদের সেই ভাইয়েরা বলল যে, চড়ুইভাতিতে আমাদেরও নেমন্তন্ন করতে হবে। কিন্তু এই প্রস্তাবে বোধহয় তাদের মামার বাড়ির লোকেরা বিশেষ খুশী হলেন না। স্পষ্ট করে কেউ বলল না বটে, তবে হাবভাবে বুঝতে পারা গেল যে, আমাদের নেমন্তন্ন করতে তাদের তেমন আপত্তি নেই, আসলে আপত্তি ঘটছে আমাদের যে মামার বাড়িতে আমরা উঠেছিলুম, তাঁকে নিয়ে। আমার এই মামাটি নেহাতই একজন হেড-ক্লার্ক, এবং তাঁর বাড়িতে থাকার ফলে আমাদেরও মর্যাদা নাকি হ্রাস পেয়েছে। কথাটা শুনে আমার সেই জ্ঞাতি-ভাইরা খুবই বিরক্ত বোধ করেছিল; আমাদের ডাকা হল না বলে তারাও সেই চড়ুইভাতিতে যেতে অস্বীকার করল। শেষপর্যন্ত সত্যিই যায়নি, নাকি গিয়েছিল, এতদিন বাদে তা আর আমার মনে নেই। আমার শুধু এইটুকু মনে আছে যে, বড়লোক-

ঘে'ষা এই অসার চালবাজি দেখে আমিও বড় বিস্ময় বোধ করেছিলুম। ছোট-বড়র এই বাছবিচারের ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি যে আদৌ অবহিত ছিলুম না, তা অবিশ্যি নয়; শ্রেণী-বৈষম্যের খবর মোটামুটি আমি জানতুম। তবে নিজেরই অজ্ঞাতসারে নিজেকে তো আমি উপর-তলার মানুষ বলেই ধরে নিয়েছিলুম; তা এখন দেখলুম, কার বাড়িতে থাকব না-থাকব তারই উপরে আমাদের মর্যাদা নির্ভর করছে। মর্যাদা যে কী করে এত ঠুনকো ব্যাপার হতে পারে, সেটা বুঝে উঠতে পারলুম না। অনেক দিন আগে সাজাহানপুরে এই রকমের একটা ঘটনা ঘটেছিল; সিমলায় থাকার সময় আবছাভাবে সেই ঘটনার কথাটা আমার মনে পড়ে যায়।

মাসখানেক সিমলায় কাটিয়ে সেবারে কসৌলি যাওয়া হয়েছিল। সেখানে আমার আর-এক মামা থাকতেন। শেষ-বিকেলে তাঁদের বাড়িতে আমরা পেশছই। পেশছে একটা মজার দৃশ্য দেখেছিলুম, মনে পড়ে। আমার মামার কাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে একজন যুবাবয়সী মানুষ ছাত্রের উপরে হাত বাড়িয়ে কী যেন খ'ুজছিল। আসলে তাঁরা তখন ব্যাডমিণ্টন খেলছিলেন। তা শাট্লকক্টা হঠাৎ ছাতের উপরে গিয়ে পড়ে। সেটাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে আনবার জন্যে এই কাণ্ড। এই ঘটনার পর বেশ কিছুদিন আমার মামাব ঘাড়ে একটা ব্যথা রয়ে গিয়েছিল। মামার কাছে তাঁর এক বোন থাকতেন। আমার সেই মাসীটিও তখন ব্যাডমিণ্টন খেলছিলেন। শাট্লককের জন্য চুপচাপ কোর্টের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। দীপ্ত মুখশ্রী। আমার এই মাসীর মতন এমন সুন্দরী এ-পর্যন্ত আমি খুব কমই দেখেছি। মায়ের ছোটকাকা তো তাঁদের পরিবারের অভিভাবক ছিলেন। এই মামা আব এই মাসী সেই ছোটকাকারই ছেলেমেয়ে। ছোটকাকা ছিলেন খুব জাঁদরেল স্বভাবের লোক। স্বৈরাচারী বললেই ঠিক হয়, বাড়িতে তাঁব হুকুম অমান্য করবার সাহস কারও ছিল না। তাঁব দাপটে ছেলেবেলায় আমার এই মামাটি কখনও লম্বা চুল রাখতে পারেননি। বাবার হুকুমে তাঁকে একেবারে কদমছাঁট করে চুল ছাঁটতে হত। ১৯৩১-৩২ সনে দিল্লিতে তাঁকে দেখেছিলুম। তখনকার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। তিনি তখন আই-সি-এস দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। তখন অবশ্য তাঁব চুলের দৈর্ঘ্য খানিক বেড়েছে, কিন্তু বাড়লে কী হয়, তখনও তাঁর সমস্ত চুল পাট হয়ে বসত না। খোঁচা খোঁচা হযে দাঁড়িযে থাকাটাই বোধহয় তাদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মামা তাঁর চুলের খুব যত্ন নিতেন, নানা রকমের ক্রিম-ট্রিম মাখতেন, কিন্তু অত করেও তাঁর চুলকে তিনি বশ করতে পারেননি, অন্তত একগুচ্ছ চুল তাঁর মাথার ঠিক মাঝ-বরাবব একেবারে সঙিনের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। দেখে যে কী হাসি পেত, তা আর কী বলব।

আমার এই মামাটিকে আমার খুব ভাল লাগত। এর আগে একবার দিল্লিতে গিয়ে, কাপড় শুকোবার তার ধরে দোল খেতে গিয়েছিলুম, তা তারটা হঠাৎ ছি'ড়ে যাওয়ায় বারান্দার কোনায় গিয়ে আমি আছড়ে পড়ি। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল আমার, তারস্বরে কাঁদছিলুম। মা বললেন, ডাক্তার দেখালে ভাল হয়, তা আমার যে মামার বাড়িতে সেবারে আমবা ছিলুম, মায়ের কথাকে তিনি কোনও পাত্তাই দিলেন না। বললেন, বাচ্চারা অমন আছাড়-টাছাড় খেয়ে একটু-আধটু কে'দেই থাকে, তাই নিয়ে এত উতলা হবার কিছু নেই। তারপর পুরো এক সপ্তাহ কেটে গেল, অথচ আমার যন্ত্রণা এতটুকু কমল না। তখন একদিন আমার এই মামাটি এসে উপস্থিত। তা মা তাঁকে বললেন যে, তাঁর মেয়েরা তো সহজে কাঁদে না, নিশ্চয় কোনও গোলমাল ঘটেছে, ডাক্তারকে দিয়ে একবার দেখিয়ে নেওয়া ভাল। সেই কথা শুনে এই মামা আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন, আর ডাক্তারও আমাকে পরীক্ষা করে বললেন যে, কণ্ঠার হাড় ভেঙেছে। যেখানে যন্ত্রণা হচ্ছিল, সেই জায়গাটা তিনি প্লাস্টার করে দেন। তাতে

আমার যন্ত্রণার উপশম হয়েছিল। মামা আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন বলেই তো সেদিন যন্ত্রণার হাত থেকে বেঁচেছিলুম; সত্যি বলতে কী, সেই থেকেই আমার এই মামাটির আমি ভক্ত হয়ে পড়ি।

মানুষের প্রকৃতি সত্যিই বড় বিচিত্র। ছেলেবেলা থেকে আই-সি-এস'দের আমি দু' চক্ষে দেখতে পারি না, অথচ আমার এই মামা যেদিন আই-সি-এস হলেন, সেদিন কিন্তু আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। মামার জন্যে সেদিন গর্ব বোধ করেছিলুম। আসলে এটা এক ধরনের দেমাক ছাড়া আর কিছু নয়। আই-সি-এস'দের তো কেষ্টবিষ্টু ভাবা হয়, এবারে আমার আপনজনও কেষ্টবিষ্টু হয়েছে—এই দেমাক।

সে-রাত্তিরে খেতে বসে মহা অস্বস্তিতে পড়েছিলুম। একেবারে সাহেবী কায়দায় টেবিল সাজানো হয়েছে। ছুরি-কাঁটা ব্যবহার করতে জানি না; তাই যতই তার উপরে চোখ পড়ে, ততই আমি দমে যাই। শেষপর্যন্ত ঠিক করলুম, দূর ছাই, খাব না। মিথ্যে করে বললুম যে, আমার খিদে নেই। মামা কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক আঁচ করেছিলেন। এই নিয়ে তিনি প্রথমটায় তো খুব একচোট ঠাট্টা করলেন আমাকে। তারপর শিখিয়ে দিলেন সাহেবী কেতায় ছুরি-কাঁটা দিয়ে কীভাবে খেতে হয়। পুডিং, স্যুপ, গ্রেভি! এর আগে জেলি পর্যন্ত খেয়ে দেখা হয়নি। খাওয়ার মত সহজ একটা ব্যাপার, অথচ সেখানেও কত কিছু শেখবার রয়েছে। কোনও পদ যদি আর-একটু চাও, তবে প্লেটের উপরে ছুরি-কাঁটা কীভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে, আর না-চাইলেই বা তাদের সাজাতে হবে কীভাবে, সব সেদিন শিখলুম। পরিবেষণের কায়দাও দেখলুম একেবারে অন্য রকমের। সবচাইতে মজা লাগল ফিংগার-বোল্ দেখে। কেন, বাথরুমে গিয়ে হাত ধোয়া যায় না?

* * *

ছুটি ফুরিয়ে গেল। আবার ইশকুল। আবার সেই একঘেঁয়ে, বিরক্তিকর জীবনযাত্রা। শিক্ষয়িত্রীদের একে-একে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, তার উপরে আবার বাচ্চা হবার জন্যে কেউ-না-কেউ সব সময়েই ছুটিতে যাচ্ছেন, তার ফলে পড়াশুনোও বিশেষ এগোচ্ছে না, এইসব কারণে লেখাপড়ায় আমারও আগ্রহ ধীরে-ধীরে কমে যেতে লাগল।

সব ছেলেমেয়েকেই ইশকুলে যেতে হয়। সেটাই নিয়ম, এবং এ নিয়ে কোনও তর্ক আমি কখনও তুলিনি। তবে একইসঙ্গে এও আমি জানতুম যে, সব ছেলেমেয়েই সত্যি কিছু ইশকুলে যায় না। আমাদের বাড়িতে যারা কাজ করে, তাদের বাচ্চাদের কথাই ধরা যাক। তারা কি কখনও ইশকুলে যায়? কিন্তু তাদের কথা আলাদা। আমরা তো আর তাদের মতো নই। তাই ইশকুলে যাওয়াটা আমাদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। কিন্তু, তা না হয় হল, উদ্ভট সব অঙ্ক আমাদের কষতে হবে কেন? একটা কল খুলে দিলে প্রতি ঘণ্টায় কোনও চৌবাচ্চার ২৩১ কিউবিক ফিট যদি ভর্তি হয়ে যায়, তবে অত কিউবিক ফিটের একটা চৌবাচ্চা ভর্তি হতে কত ঘণ্টা লাগবে, কিংবা একটা রেলগাড়ি যদি ঘণ্টায় ৪৫ মাইল বেগে ছোটে আর অন্য-একটা রেলগাড়ি যদি ঘণ্টায় ৩২ মাইল বেগে ছোটে, এবং দুটো রেলগাড়ির মধ্যেকার ব্যবধান যদি হয় ১৫০ মাইল, তাহলে প্রথম রেলগাড়িটা কতক্ষণে দ্বিতীয় রেলগাড়িটাকে ধরে ফেলবে,—এসব জেনে আমাদের লাভ কী? যত সব বাজে প্রশ্ন। উত্তরজীবনে যে এ-সব প্রশ্নের একটা নিয়েও আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না, তা আমি তখনই টের পেয়ে গিয়েছিলুম। সংস্কৃতও অতি নীরস লাগত। কাঁহাতক এইভাবে শব্দরূপ আর ধাতুরূপ মুখস্থ করা যায়? তার উপরে আবার আমার স্মৃতিশক্তিও বিশেষ প্রখর নয়। আজ যা মুখস্থ করি, কালই তা ভুলে যাই।

মনে পড়ে, যখন তখন এর-ওর-তার সঙ্গে ভাব করতুম আর আড়ি দিতুম। আজ যাকে ভাল লাগছে, কাল তাকে যদি ভাল না-লাগে, তবু তার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে হবে কেন, তা আমি বুঝতে পারতুম না। মা ভাবতেন, আমার মনে টান বলে কিছু নেই, ওই ভেসে বেড়ানোই আমার স্বভাব। সেই তুলনায় কমলা কত ভাল। কমলার মাত্র একটি-দুটি বন্ধু, কিন্তু তাদের সঙ্গে কমলার কখনও আড়ি হয় না। আমার সেক্ষেত্রে অগুন্তি বন্ধুবান্ধব। কিন্তু তাদের সবার প্রীতিই আমাকে যে বরাবর অনুগত থাকতে হবে, এমন যুক্তির কোনও অর্থই আমি খুঁজে পেতুম না। বন্ধুত্ব আমার কাছে একটা পরীক্ষার ব্যাপার। কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হলেই যে সারা-জীবন সেই বন্ধুত্বের জের টানতে হবে, এমন কথায় আমার আস্থা নেই। কে জানে, কমলা হয়ত খাঁটি বন্ধু খুঁজে পেয়েছিল। আমি পাইনি। কিন্তু তার আর কী করা যাবে? বন্ধুদের সঙ্গে এক-আধ সময়ে যে ঝগড়া হত না, তা নয়, কিন্তু সেটা বিরল ব্যাপার, আসলে ঝগড়া জিনিসটা আমার স্বভাবেই নেই। কিন্তু মাঝে-মাঝেই যেহেতু বন্ধুদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটত, তাই বলা হত যে, আমি ঝগড়াটে মেয়ে। আসলে, কমলা যেক্ষেত্রে চুপ করে থাকত, আমি সেক্ষেত্রে স্পষ্ট করে আমার মনের কথাটা জানিয়ে দিতুম। কী করব, চুপ করে মনের মধ্যে কিছু পুষে রাখার চাইতে যাকে যেটা বলবার সেটা খোলাখুলি জানিয়ে দিতেই আমি ভালবাসি।

•যাই হোক, এই একইভাবে বছর কাটতে থাকে। মাঝে-মাঝে এক-একটা ঘটনা ঘটে, যার ফলে এই একঘেঁয়ে জীবনযাত্রায় কিছুটা আলোড়ন দেখা যায়। এই যেমন সংগীত-সম্মেলন। এলাহাবাদে তখন ফি-বছর সংগীত-সম্মেলন হত। চলত তা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে। আমরা সাধারণত দুটো সিজন-টিকিট কাটতুম, তারপর নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে গান শুনতে যেতুম। তবে এও যেন খানিকটা অন্যদের সঙ্গে পাল্লা দেবার ব্যাপার। এলাহাবাদের যাঁরা বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁদের প্রত্যেকেই সংগীত-সম্মেলনে যান, অতএব আমাদেরও যাওয়া চাই, খানিকটা এই রকমের ব্যাপার আর কী। তবে, গানের গলা আমার না-ই থাক, গান শুনতে আমার ভালই লাগত। আর এই শুনতে-শুনতেই, প্রাথমিক ব্যাকরণ না-জানা সত্ত্বেও, রাগ-সংগীতের আমি সমঝদার হয়ে উঠেছিলুম।

এলাহাবাদে আমার এক জ্ঞাতি-ভাই ছিল। সে আমাকে তার সাইকেলে চড়িয়ে অনেক দূরে-দূরে চলে যেত। দিনের মধ্যে সেটাই ছিল আমার সবচাইতে আনন্দের সময়। আমার এই ভাইটি সাইকেল চালাত, আর আমি বসে থাকতুম তার সামনে। কী করে সাইকেল চালাতে হয়, ধৈর্য ধরে সে আমাকে শিখিয়ে দিত। তখনও ভাল করে শেখা হয়নি, এই অবস্থায় একদিন তো দুজনে দুটো সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছি, হঠাৎ তার পেডালের সঙ্গে আমার পেডালটা জড়িয়ে যায়, বাস্‌ হুড়মুড় করে সে তো তার সাইকেলসুদ্ধু আমার ঘাড়ের উপরে পড়ল, আর আমিও রাস্তার একেবারে মধ্যিখানে আছড়ে পড়লুম। গা-হাত-পা ভীষণভাবে ছড়ে গেল, বেশ কয়েক হপ্তা তখন যন্ত্রণা ভোগ করেছিলুম। আমার সাইকেল-শিক্ষারও সেইখানেই ইতি।

* * *

"কমলা ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে", "বিবি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে", "দিদ্দা ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে"! চিৎকার করতে করতে আমরা দৌড়চ্ছিলুম। দেখি, কে আগে বাড়িতে ফিরে খবরটা জানাতে পারে। একটু আগে 'লীডার প্রেস'-এ গিয়েছিলুম, সদ্য তখন পরীক্ষার ফল ছেপে বেরুচ্ছে। ফল জেনেই বাড়ির দিকে আমরা দৌড় লাগালুম। ওঃ, সে কী উত্তেজনা! অথচ, যাকে কেন্দ্র করে এই উত্তেজনা, সে কিন্তু এতটুকু অস্থির হয়নি। শান্ত হয়ে, চুপচাপ সে বাড়িতে বসে আছে। যেন

এ ব্যাপারে কোনও আগ্রহই তার নেই। পরে সে মাকে বলেছিল যে, ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করবে, তা তো সে জানতই, সুতরাং এ নিয়ে এত উত্তেজিত হবার কোনও কারণ ছিল না। কথাটা সে জাঁক করে বলেনি, খুবই শান্ত আর নম্র গলায় বলেছিল। পুরো ফল কয়েকটা দিন বাদে জানা গেল। শুধু যে ফার্স্ট ডিভিশনে হাই স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ করেছে, তা নয়, দুটো বিষয়ে লেটারও পেয়েছে, তার উপরে আবার যুক্তপ্রদেশ থেকে যত মেয়ে হাই স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়েছে, তাদের মধ্যে সেরা দশজনের সে একজন। তার জন্যে একটা বৃত্তিও সে পেয়েছে। বাড়িতে সেদিন দারুণ আনন্দ। তার একটা বড় কারণ এই যে, আমাদের পরিবারে এর আগে আর কেউ কখনও পরীক্ষায় এত ভাল ফল করতে পারেনি। অভিনন্দন জানিয়ে চিঠির পর চিঠি আসতে লাগল, টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম। বন্ধুবান্ধবরাও দলে-দলে এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু কমলার তবু এতটুকু উচ্ছ্বাস নেই। সে সেই আগের মতই শান্ত, স্থির। তার জন্যে সবাই তার খুব প্রশংসা করলেন। বললেন, এত ভাল ফল করেছে, তবু মাথা ঘুরে যায়নি, কী লক্ষ্মী মেয়ে!

দিদির পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ায় আমারও খুব আনন্দ হয়েছিল। এক্ষেত্রে তো আমাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, তার কারণ আমি তো আর পরীক্ষা দিইনি। কিন্তু তবু, কী জানি কেন, আমাদের পরিবারের সবাই এই ব্যাপারটা নিয়ে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন আমার পক্ষে এটা একটা পরাজয়ের ঘটনা। যেন তাদের হাবেভাবে এই কথাটাই প্রকট হয়ে উঠল যে, ঊর্মিলার কখনও কমলার মতন এত ভাল ফল হবে না। ঊর্মিলা না পারবে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করতে, না পাবে লেটার। যেন আগেভাগেই তারা আমাকে বাতিল করে দিল। সেই প্রথম স্পষ্ট করে আমি বুঝলুম যে, আমি যা-ই করি আর যতই ভাল করি, আমার পরিবারের লোকেদের কাছে দিদির তুলনায় আমি খাটো হয়েই থাকব। দিদির চাইতে যে আমি আরও ভাল করতে পারি, এ তারা কখনও স্বীকার করবে না। তবে আর ভাল করে লাভই বা কী।

পরের মাসে আমার মাসীর বিয়ে হবার কথা। পরীক্ষার পাট চুকে যাবার পরে দিদি তাই মায়ের সঙ্গে দিল্লি চলে যায়। আমার ইশকুল তখন খোলা, তাই তাদের সঙ্গে আমি যেতে পারলুম না, এলাহাবাদেই রয়ে গেলুম। মাসীর বিয়ের দিন পড়েছে আমার পরীক্ষার মধ্যে। আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। আমাকে যাতে পরীক্ষা দিতে না হয়, বাবা তার জন্যে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন। প্রিন্সিপ্যাল তো প্রথমটায় রাজী হলেন না। তারপর টার্মিন্যাল পরীক্ষাগুলোর রিপোর্টের উপরে চোখ বুলিয়ে যখন দেখলেন যে, কোনও বিষয়েই কখনও আমি ফেল করিনি, আর দারুণ রকমের ভাল না হলেও আমার ফল বরাবরই সন্তোষজনক, তখন শেষমেষ বললেন যে, হ্যাঁ, বাৎসরিক পরীক্ষা না দিলেও আমাকে তিনি ক্লাস নাইনে তুলে দেবেন। বাবা তো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আমিও দারুণ খুশী। পরীক্ষা দেওয়ার চাইতে বিয়েবাড়ির আনন্দে যোগ দেওয়া আমার কাছে তখন ঢের বেশী জরুরী ব্যাপার।

ঠাকুমার সঙ্গে আমাকে সেবার রেলগাড়ির লেডিজ' কম্পার্টমেন্টে তুলে দেওয়া হয়েছিল। ইন্টার ক্লাসে যাচ্ছিলুম, তাই আগে থাকতে আসন রিজার্ভ করা যায়নি। এ-সব কামরায় পুরো বার্থ দখল করবার অধিকার কারও নেই, শুধু বসবার জায়গাটুকুই বরাদ্দ, তবে অতসব নিয়মকানুন তো কেউ মানে না, বেঞ্চির উপরে বিছানাটাকে কোনক্রমে কেউ পেতে ফেলতে পারলেই অমনি পুরো বেঞ্চিটা তার দখলে এসে যায়। তা, কামরায় ঢুকে দেখি, আগেকার যাত্রীরা যে যার বিছানা পেতে সবগুলি বেঞ্চিই দখল করে বসে আছে। ঠাকুমা তো তাই দেখে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে, ঠেলাঠেলি করে আমাদের দুজনের জন্যে একটু পা ছড়িয়ে বসবার মতো জায়গা করে নিলেন। কিন্তু যেভাবে সেই জায়গাটুকু

পাওয়া গেল, তাতে অপমানে আমার কান যেন ঝাঁ ঝাঁ করছিল। বলা বাহুল্য, বসবার অধিকার অন্যদের তুলনায় আমাদের কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু সেই অধিকার যেভাবে আদায় করতে হল, তাতেই সেদিন বড় লজ্জা পেয়েছিলুম।

* * *

আমার যে মামাতো ভাইটির আমি খুব ভক্ত হয়ে পড়েছিলুম, সেবার শরৎকালে সে বিলেত যাত্রা করে। তার জন্যে আমি অশ্রুমোচন করিনি ঠিকই, তবে বড় বিষণ্ণ বোধ করেছিলুম। বিদায় নেবার আগে আমার অটোগ্রাফের খাতায় খুব দ্রুত সে হিন্দীতে একটি কথা লিখে দিয়ে গিয়েছিল। তর্জমা করলে তার অর্থটা দাঁড়ায় "সত্যকে ভালবেসো" কিংবা "সত্যি ভালবেসো"। দুভাবেই তার অর্থ করা যেতে পারে।

সত্যানুরাগী হও! সত্যাশ্রয়ী হও!

বরাবরই আমি সত্যকে আশ্রয় করেছি। অনেক কাল আগের কথা মনে পড়ে। তখন আমি নেহাতই শিশু। সেই সময়ে একদিন মায়ের ড্রেসিং টেবিলে খুব-খানিকটা ভেস্‌লিন লেপে দিয়েছিলুম। কিছু জিনিসপত্র তাতে নষ্ট হয়ে যায়। কাজটা যে কেন করেছিলুম, তা আর আজ মনে নেই, তবে এইটুকু বলতে পারি যে, জিনিসপত্র নষ্ট করবার জন্যেই যে এ-কাজ করেছিলুম, তা নয়। খুবসম্ভব খেলাচ্ছলেই কাজটা আমি করে থাকব। আমাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, এ-কাজ কে করেছে, তখন বললুম যে, আমি করেছি। তার আগে একটা গল্প পড়েছিলুম। একটা বাচ্চা ছেলের গল্প। কুড়ুল দিয়ে সে তার বাবার খুব প্রিয় একটা গাছ কেটে ফেলেছিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করবামাত্র কথাটা সে স্বীকার করায় তার বাবা তাকে শাস্তি না দিয়ে পুরস্কার দিয়েছিলেন। সত্যবাদিতার পুরস্কাব। তা আমার ভাগ্যে কিন্তু পুরস্কার জুটল না, দোষ স্বীকার করবামাত্র ঠাস করে আমার গালে একটা চড় কষিয়ে দেওয়া হল। শারীরিক কষ্ট পেয়েছিলুম ঠিকই, কিন্তু সেই কষ্টের চেয়েও অন্য-একটা কষ্ট সেদিন বড় হয়ে বেজেছিল। আমার মনে হয়েছিল, এটা ঘোর অবিচার। যাই হোক, তবু আমি সত্যকে ছাড়িনি। জানি না, সত্যের প্রতি আমার এই নিষ্ঠার কারণ কী। মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনী আমি পড়েছিলুম ঠিকই, বইখানা আমার মনে গভীর একটা ছাপও ফেলেছিল, কিন্তু সেই থেকেই যে আমি সত্যনিষ্ঠ, তাও নয়। ও-বই পড়বার আগেও আমি সত্যনিষ্ঠ ছিলুম। শৈশব থেকেই আমি সত্যবাদী। সেই আমাকে আমার জ্ঞাতি-ভাইটি এবারে সত্যানুরাগী হতে বললেন!

* * *

কী জানি কেন, আমার শরীরটা কিছুতেই বেড়ে উঠছিল না। এই ইশকুলে যখন প্রথম ভর্তি হই, তখন আমার যে চেহারা ছিল, তিন বছর বাদে এখনও সেই একই চেহারা, এই তিন বছরে মাথায় আমি একটুও বাড়িনি। আমার বন্ধুবান্ধবরা এতদিন আমার মতই ফ্রক, শালোয়ার কিংবা পাজামা পরত; এখন তারা একে-একে শাড়ি ধরেছে। তারা বড় হচ্ছে, বেড়ে উঠছে, তাদের শরীর ধীরে-ধীরে পালটে যাচ্ছে। অথচ আমাকে এখনও সেই দশ বছর বয়সের ছোট্ট মেয়েটি বলেই মনে হয়। তবে তা নিয়ে কোনও চিন্তাই আমার ছিল না। অন্যদের সঙ্গে আমার বৈষম্যের ব্যাপারটা প্রথম কবে উপলব্ধি করি, তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন ছিল আমাদের ইশকুলের প্রতিষ্ঠা-দিবস। সেই উপলক্ষে ইশকুলে একটা বিচিত্র-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল দুটি সম্মিলিত-নৃত্যানুষ্ঠান। একটি বড়দের, অন্যটি

ছোটদের। আমাকে যখন নৃত্যানুষ্ঠানের জন্যে নির্বাচিত করা হয়, তখন খুব ভাল লেগেছিল। আমাদের দলে আমাদের ক্লাসের আরও তিনটি মেয়েকে নেওয়া হয়েছিল, তা ছাড়া নেওয়া হয়েছিল দশম আর ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের কয়েকজন মেয়েকে। সবাই যখন একত্র হলুম, তখন দেখি, ও-মা, অন্য মেয়েদের পাশে আমাকে একেবারে বেঁটে-বামনের মতো লাগছে। সে এক হাস্যকর অবস্থা। ও-দলে আমাকে নেওয়াই চলে না। এদিকে আমাদের শিক্ষয়িত্রী কিন্তু আমার নাচ দেখে খুব খুশী। আমাকে একেবারে বাদ দিতে তাঁর সায় ছিল না। তাই তিনি ঠিক করলেন, বড়দের বদলে ছোটদের দলে আমাকে ঢুকিয়ে দেবেন। আমি তখন উঁচু ক্লাসের মেয়ে। নিচু ক্লাসের মেয়েদের দলে ঢোকা তো আমার পক্ষে খুব লজ্জার ব্যাপার, তাই আমি বললুম যে, না, ছোটদের দলে আমি নাচব না। কিন্তু আমাদের শিক্ষয়িত্রী সে-কথায় কান দিলেন না। তাঁর বক্তব্য, কোন্ দলে নাচব, সেটা বড় কথা নয়। আমি তখন বললুম যে, নাচের অনুষ্ঠান থেকে আমাকে একদম বাদ দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি জেদ ধরে বসে রইলেন যে, নাচতে আমাকে হবেই। আমি তো মহা মুশকিলে পড়লুম। ভাবতে লাগলুম, এই বিপদ থেকে কীভাবে এখন উদ্ধার পাওয়া যায়।

বুদ্ধি খাটিয়ে একটা উপায় শেষ পর্যন্ত বার করা গেল। যখন দেখলুম যে, উদ্ধারলাভের অন্য কোনও রাস্তা নেই, তখন সাহসে ভর করে প্রিনসিপ্যালের ঘরের ঠিক বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। অপেক্ষায় রইলুম, কখন তিনি বেরিয়ে আসেন। শুনেছিলুম, এই অনুষ্ঠানে কোনও মেয়েকেই একটির বেশী বিষয়ে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। তা ভেবেচিন্তে দেখলুম যে, অন্য কোনও বিষয়ের জন্যে যদি একবার মনোনীত হতে পারি, তাহলে নিশ্চয় নিচু ক্লাসের মেয়েদের নৃত্যানুষ্ঠান থেকে আমাকে বাদ দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে একটা অভিনয় হবারও কথা ছিল। সেটার পরিচালন-ভার নিয়েছিলেন প্রিনসিপ্যাল নিজে। কোনক্রমে যদি একবার তার জন্যে মনোনীত হয়ে যাই তো নাচের থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে যাব। সেটাই আমার বাঁচবার একমাত্র পথ। প্রিনসিপ্যাল যদি আমাকে অভিনয়ে ঢুকিয়ে নেন, তো নাচের শিক্ষয়িত্রী নিশ্চয় তাঁর উপরে আর কথা বলবেন না। মোট কথা, আমি তখন মরীয়া।

প্রিনসিপ্যাল তো এক সময় তাঁর ঘর থেকে বেরোলেন। কিন্তু আমাকে তিনি নজরই করলেন না। আমি তখন তাঁর পিছু নিলুম। তাতে তিনি বুঝলেন যে, তাঁর সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। কী চাই আমি, তিনি সেটা জিজ্ঞেস করবামাত্র দুরুদুরু বুকে তাঁকে বললুম যে, আমি অভিনয় করতে চাই, আমাকে একটা পার্ট দেওয়া কি সম্ভব হবে? শুনে প্রিনসিপ্যাল তো হতবাক্। এর আগে অন্য কোনও মেয়ে এইভাবে তাঁর কাছে গিয়ে পার্ট চায়নি। তিনি বললেন যে, এবার তো কোনও হিন্দী নাটক অভিনয় করা হবে না, একটা ইংরেজী বইয়ের অভিনয় হবে। বললুম, তাতে কি আমি একটা পার্ট পেতে পারি না? প্রিনসিপ্যাল আমার দিকে তাকিয়ে দু-এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন যে, বিকেলের দিকে তাঁর অফিসে এসে যেন একবার দেখা করি।

সে-বছর আমরা রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় করেছিলুম। প্রিনসিপ্যাল তার থেকে কয়েক লাইন আমাকে পড়তে বললেন। তারপর ঠিক করলেন যে, মদন অর্থাৎ প্রণয়-দেবতার পার্টটা আমাকে দেওয়া হবে। শুনে আমার আনন্দ ধরে না। বিজয়-গর্বে উৎফুল্ল হয়ে নাচের শিক্ষয়িত্রীর কাছে ফিরে এলুম।

* * *

যেমন রোজ যাই, ১৯৩৬ সালের ২০ জানুয়ারি তারিখেও সেইভাবেই আমরা ইশকুলে গিয়েছিলুম। গিয়ে শুনি সম্রাট পঞ্চম জর্জ মারা গেছেন। ইশকুল ছুটি হয়ে

যাবে, তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। প্রশ্ন হচ্ছে, ক'দিনের ছুটি। কে যেন বলল, রানী ভিকটোরিয়ার মৃত্যুর পরে ভারতবর্ষের প্রতিটি ইশকুল দু' সপ্তাহ বন্ধ ছিল। তাই যদি হয়, তবে পঞ্চম জর্জের মৃত্যুতেও অন্তত দিন-তিনেকের ছুটি নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তখনও ঘণ্টা পড়েনি। শুনলুম, সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ শুনে, প্রিনসিপ্যাল তাঁর পোশাক পালটাবার জন্যে বাংলোয় গিয়ে ঢুকেছিলেন। শোকের দিন তো, তাই ধপধপে সাদা পোশাক পরে তিনি বেরিয়ে এলেন। রোজই তাঁর খোঁপায় ফুল থাকে। সেদিন কিন্তু ছিল না। শেষ পর্যন্ত সবাই গিয়ে হলঘরে সমবেত হলুম। ভীষণ গোলমাল হচ্ছিল। প্রিনসিপ্যাল তো গম্ভীর গলায় বক্তৃতা শুরু করলেন, কিন্তু হট্টগোলে তাঁর একটা কথাও শোনা যাচ্ছিল না। তাতে তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। যাই হোক, গোলমাল তো এক সময়ে একটু থিতিয়ে এল। এমন দিনেও আমরা হৈ-হট্টগোল করছি, তার জন্যে প্রিনসিপ্যাল তো খুব একচোট বকলেন আমাদের। বললেন, ইংলণ্ডের রাজার কথা ভেবে আমাদের দুঃখ হোক আর না-ই হোক, একজন মানুষ তো মারা গেছেন বটে, সেই মৃত্যু-সংবাদ শুনে এত হৈ-হুল্লোড় করা নিশ্চয় শোভা পায় না। হলঘরে তখন আবার শৃঙ্খলা ফিরে এল। প্রিনসিপ্যালকে অবশ্য বলা হল না যে, কারও মৃত্যুতে যে আমরা খুশী হয়েছি, তা নয়, আসলে খুশী হয়েছি হঠাৎ একটা ছুটির সম্ভাবনায়। দু' মিনিটের জন্য নীরবতা পালন করা হল। তারপর সভাভঙ্গ। শুনলুম, শুধু সেইদিনই ইশকুল বন্ধ থাকবে। শুনে কী যে হতাশ হয়েছিলুম আমরা, তা আর বলবার নয়।

ইশকুল তো ছুটি হয়ে গেল। এখন বাড়ি যাই কীভাবে? যে-সব মেয়ে ইশকুলের বাসে যাতায়াত করে, তাদের কোনও ভাবনা নেই। ভাবনা আমাদের। টোঙ্গা কিংবা অন্য-কোনও ভাড়া-গাড়িতে আমরা ইশকুলে আসি। সে-সব গাড়ি চলে গেছে। এখন বাড়ি ফিরব কেমন করে? তাই নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলুম, এমন সময় একটা মোটরগাড়ি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ির মধ্যে তিনটি মেয়ে বসে আছে। কনভেণ্টের মেয়ে। ওদের এক বোন আমাদের ইশকুলে পড়ে। কনভেণ্টও তো ছুটি হয়ে গেছে, তাই মেয়ে তিনটিকে তুলে নিয়ে গাড়িটা তাদের সেই বোনকে তুলে নেবার জন্যে আমাদের ইশকুলে এসে ঢুকেছে। দেখলুম, কেঁদে কেঁদে মেয়ে তিনটির চোখ লাল হয়ে গেছে। তখনও তাদের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। জিজ্ঞেস করলুম, "ব্যাপার কী? তোমরা কাঁদছ কেন?" তাতে অশ্রুবিজড়িত গলায় তারা বলল, "রাজা মারা গেছেন, শোননি?" হঠাৎ ওইরকম গলায় তাদের কথা বলতে শুনে প্রথমটায় আমরা তো একটু অবাকই হয়ে গিয়েছিলুম, তারপরেই আমরা হো-হো করে হেসে উঠলুম। জিজ্ঞেস করলুম, "ইংলণ্ডের রাজা মারা গেছেন, তাতে তোমাদের কী, তোমরা কেন কাঁদছ?" উত্তরে তারা বলল, "বাঃ রে, ইশকুলে সক্কলে কাঁদছে, আর আমরা কাঁদব না?" মনে আছে, খুব ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছিলুম তাদের। আমাদের ইশকুলও ইশকুল আর কনভেণ্টও ইশকুল। অথচ দুই ইশকুলের মেজাজে আর পরিবেশে কী বিরাট পার্থক্য।

* * *

ফি বছর মাঘমেলার অনুষ্ঠান হয়। এটা আমাদের জীবনে একটা মস্ত ব্যাপার। আমরা মেলায় যাই, সবাই মিলে খুব আনন্দ করি। মেলা মানেই ভিড়, হট্টগোল, ঠেলাঠেলি, উত্তেজনা আর বিশৃঙ্খলা। এই সবই আমার খুব ভাল লাগত। প্রত্যেকেরই মেলায় যাওয়া চাই, তাই সেখানে গেলেই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। চুড়ি-বালা কিনবার, চাট আর কচুড়ি খাবার পক্ষে মেলাই একেবারে আদর্শ জায়গা। গঙ্গা আর যমুনা, দুটিই অতি পবিত্র নদী। তার সঙ্গমে ডুব দেওয়া অতি পুণ্যের

ব্যাপার। তা মাঘ মাসে মকর-সংক্রান্তি যেমন সবচেয়ে পবিত্র দিন, তেমনি আবার সবচেয়ে ঠাণ্ডা দিনও বটে। কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে সঙ্গমে স্নান করা অতি কঠিন কাজ। সত্যি বলতে কী, সেইজন্যেই সেদিন যেন সঙ্গমে স্নান করতে আমার ভাল লাগত, পুণ্যসঞ্চয়ের জন্যে আমি বিশেষ ব্যাকুল ছিলুম না। স্নান করে এসে জাঁক করে সে-কথা সবাইকে বলা যেত। শুনে, যারা স্নান করেনি, তারা যে একটু মুষড়ে পড়ত, তাও ঠিক।

যে-বছরের কথা বলছি, মাঘমেলার সেবারে একটা অন্য রকমের তাৎপর্যও ছিল, তার কারণ সেবারে ছিল অর্ধকুম্ভের যোগ। স্মরণাতীত কাল থেকে প্রতি বারো বছর অন্তর-অন্তর লক্ষ-লক্ষ মানুষ প্রয়াগে এসে জড় হয়। সেই জায়গাটাকেই আজ সবাই বলে এলাহাবাদ। গঙ্গা, যমুনা আর অদৃশ্য সরস্বতী এখানে মিলিত হয়েছে, তারই জন্যে এলাহাবাদে সবাই তীর্থ করতে আসে। বারো বছর অন্তর-অন্তর এখানে পূর্ণ-কুম্ভের মেলা হয়। পূর্ণ-কুম্ভের ছ' বছর বাদে সেবারে ছিল অর্ধ-কুম্ভের যোগ। তার আকর্ষণও কম নয়। বার্ষিক মাঘ-মেলার চেয়ে অনেক বড় মেলা বসেছিল। লাখ লাখ মানুষ এলাহাবাদে এসেছিল। বুড়ো, রুগ্ণ, পঙ্গু—হরেক বকমের মানুষ। তাদের আশা, সঙ্গমে স্নান করলেই তাদের অসুখ সেরে যাবে। দরিদ্ররা বড়লোক হতে এসেছিল, আর বড়লোকেরা এসেছিল আরও বড়লোক হবার আশা নিয়ে। সাধু, বৈরাগী, মোহান্ত —কত রকমের ধর্মসম্প্রদায়ের লোক যে এসেছিল, তার লেখাজোখা নেই।

অনেকে এখানে গোটা মাঘমাসটাই কাটিযে যায়। তাদের বেশির ভাগই থাকে কুঁড়েঘরে কিংবা তাঁবুতে। বাবা তাঁব পদাধিকারবলে ভালোমতন জাযগা বাছাই করে, সেখানে একটা তাঁবু খাটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। যেখানে তাঁবু পড়ল, সেই এলাকাটা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত। জায়গাটা ভিড়ের খুব কাছাকাছি নয়, আবার সঙ্গমের থেকেও অদূরে। যে-দিনের কথা বলছি, সেদিন ছিল রবিবার। ঠিক করা হয়েছিল, গোটা দিনটাই আমরা ওখানে গিয়ে কাটাব।

বাড়ির সবাই এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন। যে যাব নিজের কাজে ব্যস্ত। একা আমি ছিলুম তাঁবুর মধ্যে। হঠাৎ বাইরে থেকে খুব একটা গণ্ডগোলের শব্দ ভেসে এল। সারাটা দিনই তো এখানে হৈ-হল্লা লেগে আছে, কিন্তু এতটা হট্টগোল এর আগে শুনিনি। কী হচ্ছে দেখবার জন্য তাঁবুর থেকে বেরিয়ে এলুম। কিন্তু যা দেখলুম, তাতে আর আমার পা সড়ে না। বিরাট এক মিছিল চলেছে, সেই মিছিলের প্রতিটি মানুষই একেবারে আপাদমস্তক নগ্ন। হাজার হাজার নগ্ন মানুষ। বিশাল তাদের দেহ। বিশাল এবং বিশৃঙ্খল। ধূলিমলিন শরীর। চক্ষু দুটি জ্বলজ্বল করছে। সার বেঁধে তারা এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ কোত্থেকে যেন অসংখ্য স্ত্রীলোক ছুটে এল। নগ্ন মানুষগুলির কাছে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি করতে করতে ছুটে এল তারা।

নাগা সন্ন্যাসীদের কথা আমি শুনেছিলুম। পার্থিব কোনও-কিছুতেই তাদের আসক্তি নেই। এমন কী পরনের কাপড়ও তাদের কাছে পরিত্যাজ্য। আবছামতন মনে পড়ল, কে যেন বলেছিল, নাগা সন্ন্যাসীর স্পর্শ পেলে বন্ধ্যা রমণীও সন্তানবতী হয়। সেইজন্যেই এই রমণীরা এইভাবে ছুটে এসেছে। নাগা সন্ন্যাসীদের ছুঁতে চাইছে। সেইজন্যেই ওই সন্ন্যাসীদের পায়ের ধুলো নেবার জন্যে এদের এত ব্যস্ততা। ওই ধুলো এরা কপালে মাখবে। তাতে যদি এদের বন্ধ্যা-দশার অবসান হয়।

সম্পূর্ণ নগ্ন মানুষ এর আগে আর কখনও দেখিনি। কুৎসিত, নগ্ন একদল মানুষ। তারই মিছিলের মধ্যে ছুটে এসেছে মেয়েরা। দেখে আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল। অথচ, যতই চেষ্টা করি, বীভৎস সেই দৃশ্য থেকে আমার চোখ দুটিকে অন্য দিকে সরিয়ে নিতেও পারছিলুম না। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে যে কদর্যতা আর বীভৎসতা ছিল,

আমার মনের মধ্যে তা নিশ্চয় গভীরভাবে দাগ কেটে থাকবে। সন্দেহ নেই যে, আমার মুখের উপরেও তার ছাপ পড়েছিল। তাঁবুর মধ্যে যখন ফিরে আসি, তখনও আমার ঘোর কাটেনি। আমার দুই চোখের চেহারা দেখে মা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, ব্যাপার কী? মায়ের কথার কোনও উত্তরই আমি দিতে পারলুম না। মা তখন আবার শুধোলেন, কী হয়েছে, কোথায় গিয়েছিলুম আমি। বললুম, বাইরে গিয়েছিলুম, নাগা-সন্ন্যাসীদের মিছিল দেখেছি। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মা বললেন, দেখা আমার উচিত হয়নি। হয়তো তখন বাইরে ছিলুম আমি, ঠিক কথা, কিন্তু মিছিল আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার ভিতরে চলে আসা উচিত ছিল। যে-সব মেয়ের বিয়ে হয়নি, এ-সব তাদের দেখতে নেই।

*   *   *

শীত শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন এপরিল মাস। সেইসময়ে সকালে একদিন দেখতে পাই যে, আমাব ইজেরে যেন কিসের দাগ লেগে আছে। মনে হল, রক্তের দাগ. কিন্তু কোথাও কোনও যন্ত্রণা হচ্ছিল না, আমার শরীরের কোথাও যে কেটে কিংবা ছড়ে গেছে, তাও নয়. তাহলে এই রক্ত এল কোথা থেকে? ইশকুলে যাবার সময় হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু বুঝতে পারছিলুম না যে. রোজকার মতো আজও ইশকুলে যাব কিনা। আবার যদি ইশকুলে গিয়ে এই কান্ড হয়, তাহলে কী হবে? দিদিকে গিয়ে সব বললুম. শুনে সে গম্ভীর মুখে মাকে ডাকতে গেল। কী করতে হবে, তাঁরা আমাকে বলে দিলেন। তবে ব্যাপারটা যে কী, তা বুঝতে পারলুম না। তাঁদের কাছে এইটুকু মাত্র জানা গেল যে, এখন থেকে প্রতি মাসেই এইরকম হবে। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, তাই আমার খুব ভয়-ভয় করছিল। যেন দুই চক্রান্তকারীর মতো মা আর দিদি তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে। আমি কেঁদে ফেললুম। কান্না আর থামতেই চায় না। মা তাতে হতভম্ব হয়ে বললেন, "কাঁদছিস কেন? তোর কি কোনও যন্ত্রণা হচ্ছে?" না, আমার কোনও যন্ত্রণা হচ্ছিল না, কোনও অস্বস্তিও না। তবু চোখ ফেটে কান্না বেরিয়ে আসছিল। ইশকুলে গেলুম না, কিছু খেলুম না. পড়ে পড়ে শুধু কাঁদতে লাগলুম।

অনেক কিছুর অর্থ এতদিন বুঝতে পারিনি। এখন যেন একটু-একটু করে তার অর্থ আমার কাছে ধরা দিতে লাগল। কারও কাপড়ে হঠাৎ দাগ ধরে গেলে মেয়েদের তাই নিয়ে হাসাহাসি করতে দেখেছি। তাকে হঠাৎ ক্লাস ছেড়ে হোসটেলে চলে যেতে দেখেছি। মেয়েরা কানাকানি করত। কথা বলতে বলতে থেমে যেত। টুকরো-টুকরো কথা শুনতুম। কিন্তু, যেন একটা নিষেধাজ্ঞা জারী করে রাখা হয়েছিল এই সব ব্যাপারের উপরে, তাই মাকে কখনও এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। দিদিকেও না। জানতুম, এ-রকম হয়; কিন্তু প্রতি মাসে শুধু মেয়েদের বেলাতেই এ-রকম হয় কেন, এবং পুরুষদের কেন হয় না, তা জানতুম না।

অনেক রকমের বিধিনিষেধ আমার উপরে চাপিয়ে দেওয়া হল। এটা ছুঁয়ো না, ওটা ধোরো না, রান্নাঘরে যেও না। শুধু না, না আর না। এ নিয়ে প্রশ্ন করতুম। কিন্তু তার কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যেত না। শুনতুম, এটাই রীতি। ব্যাস্। এতদিন বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন বুঝতে পারলুম যে, আমার আয়া কেন মাঝে-মাঝে অনেক স্বাভাবিক কাজও করতে চায় না। তাকে এ নিয়ে প্রশ্ন করলে সে বলত, জমাদারনী তাকে ছুঁয়ে দিয়েছে, তাই সে অশুচি হয়েছে। কিন্তু আর-সবাইকে বাদ দিয়ে জমাদারনী এত ঘন-ঘন শুধু তাকেই বা ছুঁয়ে দেয় কেন, তা বুঝতে পারতুম না। এখন বুঝলুম, ব্যাপারটা আসলে কী। বিধিনিষেধের বাড়াবাড়ি দেখে আমি বিদ্রোহ করে বসলুম। বিধিনিষেধ মানতুম না। দিদি তাই নিয়ে মায়ের কাছে নালিশ করেছিল।

[illegible] যে সব মেনে চলুন, কিন্তু ঊর্মিলা কিছু মানে না। কিন্তু মা আর কী করবেন, আমাদের দিয়ে সবকিছু মান্য করিয়ে নেবেন, এমন সাধ্যই তাঁর ছিল না। আমি যদি না মানি, তবে আর উপায় কী?

* * *

বাবার বদলির আদেশ এসে গেল। ১৪ই মে ছিল ইশকুলের শেষ দিন। বন্ধুদের কাছে সেদিন বিদায় নিলুম। আর কখনও ওদের সঙ্গে দেখা হবে না। গলার কাছে কিছু-একটা আটকে যাচ্ছিল। কিন্তু বন্ধুরা যে খুব-একটা বিষণ্ণ, এমন মনে হল না। এ নিয়ে যেন বিশেষ গা-ই করল না তারা। বিদায়ের সময় সচরাচর যা বলা হয়ে থাকে, ধরাবাঁধা সেই রকমের গোটা কয়েক কথা বলল, এই মাত্র। বুঝলুম, এই বিচ্ছেদের বেদনা শুধু আমারই, ওদের নয়। কেন? এর কারণ কী? কেন শুধু আমারই এত কষ্ট হচ্ছে? ওদের কেন হচ্ছে না? সেই প্রথম আমি বুঝতে পারি যে, ক্রমেই আমি নীচের থেকে আরও নীচে তলিয়ে যাচ্ছি। বুঝতে পারি, আমার কোনও আকর্ষণী শক্তি নেই। ছাত্রী হিসেবে আমি মাঝারী। আমি মাথায় খাটো, মাপে ছোট। তাই খেলাধুলোয় আমি এঁটে উঠতে পারি না। কখনও কোনও খেলার দলে আমাকে নেওয়া হয়নি। গান-বাজনা আমাকে টানে না, সেদিকে কোনও ঝোঁক আমার নেই। তবে হ্যাঁ, নাচ শিখবার ইচ্ছে আমার প্রবল।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিরিশের যুগে এ-দেশের এক মস্ত নবজাগরণ ঘটেছিল। এলাহাবাদের মেয়েদের মধ্যে প্রায় সকলেই তখন কিছু-না-কিছু শিখছে। বাড়িতে এসে কোনও একটা বিদ্যা শিখিয়ে দিয়ে যাবেন, এমন লোকের অভাব সেখানে ছিল না। নৃত্যকলা তখনও অবশ্য কণ্ঠ কিংবা যন্ত্র-সংগীতের মত এত জনপ্রিয় হয়নি। কিন্তু নাচকে তো এককালে শুধুই নটীদের ব্যাপার বলে গণ্য করা হত, সেই অন্ধ-সংস্কার এমন-কী সেখানেও তখন কেটে গেছে ভদ্রঘরের মেয়েরা নাচ শিখলে সেটাকে আর দোষাবহ একটা ব্যাপার বলে কেউ ভাবে না। অথচ গান শেখার ব্যাপারে মায়ের অত আগ্রহ থাকলে কী হয়, আমার নাচ শেখার ইচ্ছাকে তিনি আদৌ আমল দেননি। ইশকুলে অবশ্য নাচ শেখানো হত। কিন্তু সেটা আলাদা ব্যাপার। ইশকুলের বাইরে নৃত্যশিক্ষার সুযোগ আমার হল না। তাহলে আর কোন্ গুণ বাকী রইল? এমন কোন্ গুণ, যা নিয়ে আমি গর্ব করতে পারি?

তবে সত্যি বলতে কী, লেখাপড়ার ব্যাপারেও নয়, সংস্কৃতি-চর্চার ব্যাপারেও নয়, আসলে গোল বেধেছিল আমার চেহারায়। চেহারার মধ্যেই তো ব্যক্তিত্বের ব্যাপারটা ঠিক ফোটে, তা আমার সেই চেহারাই বড্ড নিষ্প্রভ দেখাত। খাদীর পায়জামা-স্যুটে বড্ড বেঢপ লাগত আমাকে। পুরুষদের পক্ষে অবশ্য পায়জামা পরাটা খুবই চালু একটা রীতি। আমাদের এই ছোট্ট সমাজে সেক্ষেত্রে অল্পবয়সী মেয়েরাও পায়জামা পরে। মেয়েদের পায়জামা অবশ্য পুরুষদের মতন সাদাসিধে নয়, তাতে কুঁচি, লেস্, কশিদা ইত্যাদি সব হরেকরকমের কাজকর্ম থাকে। খাদীর আবির্ভাব ঘটবার পরে ছাপা-কাপড়ের পায়জামা আর কুর্তা খুব চলেছিল। তবে শুধু বাচ্চা-মেয়েরাই তা পরত; বয়স যাদের বারো পেরিয়েছে, তারা নয়। আমি এদিকে এত আস্তে বাড়ছিলুম যে, দু-বছর আগে তৈরী পোশাকও আমার ছোট হত না। ফলে মা-ও আমাকে নতুন পোশাক বানিয়ে দিতেন না। পোশাকটা যে বয়সের পক্ষে মোটেই মানানসই হচ্ছে না, তা আমি বুঝতে পারতুম, কিন্তু এই নিয়ে কিছু বলতে আমার রুচিতে বাধত। আমি চাইতুম, মা নিজেই সেটা বুঝুন, তিনি তো—অন্তত আমাদের সমাজের—এমন মেয়েদের স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন, যারা আমারই বয়সী। মা কিন্তু স্বচক্ষে সব দেখেও কিছু

বুঝছেন না। ভাবতুম, মানুষ এত অন্ধ হয় কী করে? নিজের পোশাক নিয়ে মা তো সারাক্ষণ বাবার কাছে নালিশ জানাচ্ছেন? তাহলে আমার অস্বস্তিটা তিনি ধরতে পারছেন না কেন?

আর কোনও গুণ আমার না-ই থাক, আমি কথা বলতে প্যারে। আবৃত্তি করতে পারি, গল্প বলতে পারি, বক্তৃতা দিতে পারি। পাঠ্য-বহির্ভূত নানা বিষয়ের চর্চার জন্যে আমাদের ইশকুলে একটা সমিতি গড়া হয়েছিল। তার কাজ ছিল প্রধানত বিতর্ক, আলোচনা আর আবৃত্তির ব্যবস্থা করা। ভেবেছিলুম, আমাকে নিশ্চয় এই সমিতির পরিচালনার কাজে ডাকা হবে। কিন্তু কোথায় কী। সভানেত্রী, সম্পাদিকা, কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যা—সমস্ত পদ একে-একে পূরণ করা হয়ে গেল। আমাকে সে-সব পদের জন্য নির্বাচিত করা তো দূরের কথা, আমার নামটা পর্যন্ত কেউ প্রস্তাব করল না। এই নিয়ে খুব ক্ষুব্ধ বোধ করেছিলুম। বুঝতে পেরেছিলুম, অন্যের চোখে কোনও মূল্যই আমার নেই। আমার অহমিকায বড় ঘা লেগেছিল সেদিন। চেহারার উপরে তো আমাব কোনও হাত নেই, অথচ নিজের সেই চেহারার উপরেও আমার বিরক্তি এসে গিয়েছিল।

*　　*　　*

সেই গ্রীষ্মে আমাব চেহাবায় একটা পবিবর্তন দেখা দেয়। ব্রেসিযার বস্তুটা তখনও আমাদেব মধ্যে চালু হয়নি। আঁটসাঁট অন্তর্বাস পবা হত। তা সেটা পরতুম না বলে ঠাকুমা সাবাক্ষণ খিটখিট কবতে শুরু কবলেন। পায়জামা ছেড়ে সেই প্রথম শাড়ি পরতে শুরু কবি। পুবনো পোশাক ছেড়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। শৈশব শেষ হয়ে গেল। তাব জন্যে কোনও দুঃখ আমাব ছিল না। পিছনে তাকিয়ে এখন মনে হয়, শৈশবের দিনগুলি বেশ ভালই ছিল। তখন কিন্তু তা মনে হত না। বইপত্রে তো 'ভাবনাভারমুক্ত সোনালী সময' বলে শৈশবেব গুণ গাওযা হয; আমার কিন্তু অমন কথা কখনও মনে হয়নি। আমি বড় হতেই চাইতুম। আমি চাইতুম, শিশু বলে আমাকে কেউ যেন অবজ্ঞা না করে; বড়দেব সঙ্গে যেমন ব্যবহাব করা হয, আমার সঙ্গেও ঠিক সেই রকমের ব্যবহার কবা হোক। কিন্তু বড় হযে আমি কী হ　সেই তো নারী হব, তা ছাড়া আর কী-ই বা আমি হতে পারি? কিন্তু আমি নাবী হযে উঠতে চাইতুম না। ফলে, আমার ভিতরে যে-সব পবিবর্তন দেখা দিচ্ছিল, তাই নিযে আমি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলুম। তার চেয়েও বেশী কষ্ট পাচ্ছিলুম শরীরেব সেইসব পবিবর্তনে, অন্যের দৃষ্টি থেকে যাকে লুকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। আমাব অবস্থা তখন করুণ। সবসময়ে একটু কুঁজো হযে থাকি, হাত দুখানা এমন আলগা করে ঝুলিযে রাখি, যাতে বোঝা না যায় যে, আমার শরীরের সামনের দিকটা ক্রমে পূর্ণ, পৃথুল হয়ে উঠছে। আমি খিটখিটে হয়ে উঠছিলুম। কারও সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগত না। এক-এক সময়ে আমার চিৎকার কবে উঠতে ইচ্ছে করত, ঝগড়া করতে ইচ্ছে করত, কাঁদতে ইচ্ছে করত। কিসের বিরুদ্ধে আমার লড়াই, তা আমি বুঝে উঠতে পাবতুম না। শুধু মনে হত, একটা-কিছু বিপদ ঘনিয়ে আসছে, তার বিরুদ্ধে আমাকে লড়তে হবে। সর্বোপরি আমি চাইতুম যে, সহানুভূতি নিয়ে অন্যেরা আমার সঙ্গে কথা বলুক, আমার কষ্টের কথাটা বুঝুক, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাকে একটু আশ্বাস দিক। কিন্তু তা কেউ করত না। বিষাদে এক-এক সময়ে মুষড়ে পড়তুম। কিন্তু তা　কারও চোখে পড়ত না। অন্যদের আমি দেখাতে চাইতুম যে, নেহাত মামুলী মেযে আমি নই, আমার একটা আলাদা মূল্য আছে, তাই আমাকে অবহেলা করা মোটেই উচিত হবে না। কিন্তু কেউ সে-কথা বুঝত না। কেউ যেন গা-ই কবত না। আমার সমস্ত রাগ এইসময়ে পুঞ্জীভূত হয়ে মায়ের উপরে

[illegible] কেন? কেন? কেন? নিজেরই মনের মধ্যে চিৎকার করে আমি এই প্রশ্ন করতে [illegible]। কেউ আমার কথা শুনতে পায় না, কেউ আমাকে লক্ষ পর্যন্ত করে না। যে-সব প্রশ্ন নিরুচ্চারিত রয়ে গেল, কারও কাছেই তার উত্তর পাওয়া গেল না। কেউ আমাকে বুঝতে পারল না।

মা একদিন বললেন, "ঊর্মিলার ব্যাপারটা কী? আগে কেমন মিষ্টি ছিল, শান্ত ছিল। কই, এমন একগুঁয়ে ভাব তো আগে দেখিনি।"

মা'র দিকে তাকালুম। আমার চোখ থেকে বিদ্বেষ ঝরে পড়ছিল। মা আজ এ-কথা জিজ্ঞেস করছে কেন? মা কেন কিছু বুঝতে পারে না? মুখে অবশ্য কিছু বলিনি। বলে লাভ কী?

আমাদের বাড়িটা ছিল একটা তপ্ত কড়াইয়ের মতো। বিরোধ-বিসম্বাদের অন্ত ছিল না, কথায় কথায় তক্কাতক্কি বেধে যেত। বিনা তর্কে কোনও-কিছুর মীমাংসা হবার জো নেই। অবাক হয়ে ভাবতুম যে, তর্কযুদ্ধে জিতবার জন্যে সবাই এত মুখিয়ে আছে কেন? এই রেষারেষি, এই বিরোধ, এই সংঘর্ষ—সত্যিই কি এর কোনও দরকার আছে? সর্বদাই কি অন্যকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে হবে, টিটকিরি দিতে হবে? এই জেদাজেদি, অন্যের উপরে টেক্কা দেবার এই তুমুল চেষ্টা, এই বুদ্ধির লড়াই—কতটুকু এর মূল্য? আবছামতো বুঝতে পারতুম যে, ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ থেকেই এ-সবের সৃষ্টি হচ্ছে। বাবা ছিলেন আইনজ্ঞ মানুষ; যে-কোনও বিষয়ের যেমন সপক্ষে তেমনি বিপক্ষেও তিনি প্রচুর যুক্তি হাজির করে লড়ে যেতে পারতেন। তবে, যখন যে-বিষয়ে যে-যুক্তি তিনি দিতেন, অন্তত তখনকার মতো তাঁর ভাব দেখে মনে হত যে, সেই বিষয়ে তা ছাড়া আর অন্য কোনও যুক্তি দেওয়া চলতেই পাবে না। আর মাযেব ভাব দেখে মনে হত যে, তর্কে জেতার উপরেই যেন তাঁর মান-সম্মান নির্ভর করছে, যেন সেটাই তাঁর অস্তিত্বের একেবারে মূল কথা। যেন তর্কে জেতাটাই আসল ব্যাপার, তর্কের বিষয়টা একটা উপলক্ষ মাত্র। বাবার রণকৌশল খুব সাধু ছিল না। মাকে তিনি ব্যঙ্গ করতেন, টিটকিরি দিতেন, তাঁকে হেয় করে তুলতেন। কিন্তু মাযের জেদ তাতে আরও বেড়ে যেত মাত্র। আরও কোমব বেঁধে তিনি লড়াই চালাতেন। সংঘর্ষ আরও কঠিন হত, বিরোধ আবও তুমুল। যা নিয়ে বিরোধ, সেই মূল বিষয়টা শেষ পর্যন্ত চাপা পড়ে কোথায় যে হারিয়ে যেত, তার আর পাত্তাই পাওয়া যেত না। কথায় যখন আর পেরে উঠতেন না, মা তখন ঝরঝর করে কেঁদে ফেলতেন। বিরোধ-বিসম্বাদের সেইটেই ছিল অনিবার্য পরিণতি। এরই মধ্যে আমি একটু-একটু করে বড় হয়ে উঠেছি; এই বিরোধ, এই কলহ, দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হিসেবেই একে আমি গ্রহণ করেছিলুম। তবে ১৯৩৬ সনের গ্রীষ্মে বাবা আর মায়ের সেই বিরোধ এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল, এর আগে আর কখনও তা যেখানে পৌঁছয়নি। সেবারকাব বিরোধের প্রকৃতিই যেন আলাদা। কিংবা কে জানে, তাঁদেব আচরণে হযত কোনও পরিবর্তন ঘটেনি; হয়ত আমিই ইতিমধ্যে পালটে গিয়েছিলুম, তাই ব্যাপারটাকে অন্য-বকম ঠেকছিল।

বাবা এইসময়ে আগ্রায় বদলি হয়েছিলেন। দিদিব পড়াশুনো নিয়ে সেখানে একটা সমস্যা দেখা দেয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই ইনটারমিডিয়েট ক্লাস ইশকুলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। কিন্তু আগ্রায় দেখলুম তা নয়, সেখানে ইনটারমিডিয়েট ক্লাস করতে হয় ইউনিভার্সিটি কলেজে। দিদি তখন ইনটারমিডিয়েট ফাইন্যালের ছাত্রী, ওদিকে আগ্রায় তখন মেয়েদের জন্যে আলাদা কোনও কলেজ ছিল না। ফলে অবস্থাটা এই দাঁড়াল যে, হয় তাকে বাড়িতে থেকে ছেলেদের সঙ্গে একই কলেজে পড়তে হবে, নয়ত তাকে বোর্ডিং-স্কুলে থাকতে হবে, কিন্তু বাবা-মা'র সঙ্গে সেক্ষেত্রে কোনও যোগাযোগই তার থাকবে না। বাস্, এই দুটো ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টা ভাল, তাই নিয়ে তো বাবা আর মায়ের মধ্যে তর্ক বেধে গেল। তর্ক চলতে লাগল দিনেব পর দিন। তুমুল তর্ক, তার শেষ হবার লক্ষণ নেই। মনে হত, এর আর কোনও মীমাংসা হবে না, শুধু তর্কই চলতে থাকবে, ফলে দিদিকে স্রেফ বাড়িতে বসেই দিন কাটাতে হবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নেহাতই দৈবাৎ ব্যাপারটার একটা মীমাংসা হয়ে যায়। আমাদের এক প্রতিবেশীর সঙ্গে একদিন আলাপ-পরিচয় হল। তিনি আগ্রা কলেজের অধ্যাপক। তাঁর দুই মেয়ে সেই

কলেজের ছাত্রী; তৃতীয় মেয়েটিকেও সেই বছরেই সেখানে ভর্তি করা হবে। ভদ্রলোক ও তাঁর মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে বাবা খুব খুশী হলেন। তাঁরাই বললেন যে, কলেজে যাবার সময়ে রোজ সকালে দিদিকে তাঁরা নিয়ে যাবেন; তারপর কলেজ ছুটি হলে বিকেলে আবার বাড়িতে পৌঁছে দেবেন। চমৎকার ব্যবস্থা। দিদি গিয়ে ছেলেদের কলেজে ভর্তি হল। সহশিক্ষা তো নামেমাত্র। ছেলেদের সংখ্যা সেখানে হাজারেরও বেশী; মেয়েদের সংখ্যা সেক্ষেত্রে জনা দশ-বারোও নয়।

আমি কোথায় পড়ব, তা নিয়ে কিন্তু তর্ক চালাবার কোনও অবকাশই ছিল না। আগ্রায় তখন মেয়েদের হাইস্কুল মাত্র একটিই; তাও সেই ইশকুল আমাদের বাড়ি থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ। বাস্, বিনা তর্কে আমাকে কুইন ভিক্টোরিয়া গার্লস' হাইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হল। ইশকুলের পরিচালক এক স্কটিশ মিশন। চিরকুমারীদের মধ্যে এক ধরনের কর্মদক্ষতা থাকে; তা আমাদের প্রিন্সিপ্যালের সেটা যথেষ্টই ছিল। প্রিন্সিপ্যাল ছাড়া আর-একজন শ্বেতাঙ্গী মহিলা আমাদের পড়াতেন। অল্পবয়সী, লাজুক ধরনের মহিলা। কথাবার্তা খুব কমই বলতেন। মেয়েরা তাঁকে খুব ভালবাসত, কিন্তু যেহেতু তিনি একটু দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন, তাই তাঁর সঙ্গে মেলামেশার বিশেষ সুযোগ পাওয়া যেত না। অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরা সবাই ছিলেন স্থানীয় খ্রীষ্টান।

ধর্মের ব্যাপারে বাবা ছিলেন উদার ও সহিষ্ণু; মানুষে মানুষে বৈষম্য তিনি বিশ্বাস করতেন না। এর ফলে ভারতীয় খ্রীষ্টানদের সম্পর্কে মায়ের তীব্র সংস্কার অনেকটাই লোপ পেয়েছিল। তবে আমার মনে কিন্তু এ-ব্যাপারে তখনও খুঁতখুঁতুনি নেহাত কম ছিল না। শৈশবে যে-সব কুসংস্কার আমার মনে দানা বেঁধেছিল, অবচেতনে তার প্রভাব তখনও প্রবল। সাজাহানপুরে প্রথম যখন ইশকুলে যাই, তখন আমি শিশু, সেইসময়ে যে বিরাগ আমার মনের মধ্যে জন্ম নেয়, সহজে তার হাত থেকে মুক্তি মেলেনি। বস্তুত আগ্রায় আসবার পরে সেইসব সংস্কার আবও দানা বাঁধতে থাকে। তার যে কারণ ছিল না, তাও নয়। এইসব মিশন-ইশকুলে যে কেন একটা আলাদা রকমের পরিবেশ বিরাজ করে, বুঝে উঠতুম না; সেই পরিবেশের মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতুম। এ নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি। অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করে সবকিছু আমি বুঝতে চাইতুম। তারই ফলে আমার মনে তখন শ্রেণী-চেতনার বীজ উপ্ত হলো। বুঝতে পারলুম, আমার সঙ্গে 'ওদের' যে বৈষম্য, ধর্ম দিয়ে তার ব্যাখ্যা হয না। বৈষম্যের হেতুটা আসলে এই যে, সমাজের দুই ভিন্ন স্তর থেকে আমরা এসেছি। ওদেব মধ্যে অধিকাংশ মেয়েই এসেছে নিম্নশ্রেণী থেকে। তার মধ্যে অনেকেই—সম্ভবত তাদের ধর্মান্তর খুবই সাম্প্রতিক—তথাকথিত অচ্ছুত সমাজের মেয়ে। খ্রীষ্টধর্ম তাদের সমতা দিয়েছে, মর্যাদা দিয়েছে, তাদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়েছে। যে-সমাজে শ্রেণী আর বর্ণবৈষম্যের অন্ত নেই, খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় তারই মধ্যে তারা পড়াশুনো ও কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ পাচ্ছে। সর্বোপরি, অচ্ছুত হয়ে থাকবার অভিশাপ থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে। খ্রীষ্টান হয়ে এই সবই পেয়েছে তারা। কিন্তু এত দিয়েও খ্রীষ্টধর্ম সেই সহজাত সুরুচি ও সংস্কৃতি তাদের দিতে পারেনি, একমাত্র ঐতিহ্য থেকেই যা জন্ম নেয়; বংশপরম্পরায় বিশেষ এক ধরনের জীবনবিন্যাস থেকেই যা কিনা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে। এক ধরনের আধুনিকতার পালিশ তাদের মধ্যে কখনও-কখনও দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটা নেহাতই উপর-উপর ব্যাপার, বিদেশ-থেকে-পাওয়া বস্তু, উপরন্তু অনেকক্ষেত্রেই বোঝা যায় যে, সেই আধুনিকতায় তারা ঠিক রপ্তও হতে পারেনি। ফলে আধুনিকতা, আসলে যা কিনা ইংরেজদের এক অসার নকলনবিশি ছাড়া আর কিছুই নয়। ছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই বোর্ডিং-বাড়িতে থাকে; তাদের অনেকেই অনাথ, মিশনই তাদের একমাত্র আশ্রয়।

বাবা ছিলেন মুক্ত বুদ্ধির মানুষ। তাই বলে তিনি নাস্তিক ছিলেন না। আসলে তিনি ছিলেন সত্য-অর্থে উদারপন্থী। তিনি বলতেন, সব ধর্মই সমান, সব ধর্মই দোষেগুণে গড়া। আর তাই অন্যের ধর্মবিশ্বাস, এমন কী ধর্মগত সংস্কারকেও আমাদের সম্মান করে চলতে হবে। বাবার কাছে এই কথাটা শুনে শুনে এ-ব্যাপারে আমারও একটা দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে গিয়েছিল। আমিও নিশ্চিত জেনেছিলুম যে, সব ধর্মই সমান। কিন্তু তাই যদি হবে, অর্থাৎ সব ধর্মই যদি সমান ভাল হবে, তবে তো ধর্মান্তর-গ্রহণের কোনও যুক্তিই থাকতে পারে না। তাই অন্যকে যারা ধর্মান্তরিত করতে চায়, তাদের আমি ঘৃণা করতুম। আরও বেশী ঘৃণা করতুম তাদের, এক ধর্মের আশ্রয় ছেড়ে যারা অন্য ধর্মের আশ্রয় নেয়। মানুষকে যাঁরা ধর্মান্তরগ্রহণের প্ররোচনা দেন, সেই মিশনারীদের প্রতি আমি আশৈশব বিদ্বেষ বোধ করেছি। মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করা তো মানুষের মর্যাদাকে আঘাত করারই সমতুল। ধর্মাচরণের স্বাধীনতায় আমার সায় ছিল, কিন্তু ধর্মপ্রচারের স্বাধীনতায় ছিল না। এ যেন অন্য মানুষের অজ্ঞতার কিংবা সামাজিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাকে ভাবতে শেখানো যে, তার ধর্ম আর-একজনের ধর্মের চেয়ে খারাপ। আমার সহপাঠিনীরা তো মহৎ কোনও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেনি। মনে-মনে তাদের তাই আমি অবজ্ঞা করতুম।

বোর্ডিংয়ের মেয়েরা সবাই খ্রীষ্টান। বাইরে থেকে যারা পড়তে আসে, তাদের আর বোর্ডিংয়ের মেয়েদের মধ্যে একটা বিভেদের দেওয়াল গড়ে তোলা হয়েছিল। আবার বাইরে থেকে যারা পড়তে আসে, তাদের মধ্যেও খ্রীষ্টান আর অখ্রীষ্টানদের জন্যে ছিল দু' রকমের ব্যবস্থা অখ্রীষ্টানদের জন্যে ছোট্ট একটা ঘরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, সেইখানে তারা দুপুরের খাওয়া খেয়ে নিত। আর বাইরের মেয়েদের মধ্যে যারা খ্রীষ্টান, তাদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল বোর্ডিংয়ের মেয়েদের সঙ্গে। অর্থাৎ খ্রীষ্টান আর অখ্রীষ্টানদের বৈষম্যটা ছিল একেবারে পাকাপোক্ত রকমেব। সেখানেই শেষ নয়। অখ্রীষ্টানদের মধ্যেও তো এমন ছাত্রী, সম্ভবত হিন্দু, থাকতে পারে, যে কিনা অন্যদের সঙ্গে এক জায়গায় বসে খেতে অনিচ্ছুক। তার জন্যেও আলাদা ঘরের ব্যবস্থা। আমিও হিন্দু, কিন্তু কোনও অহিন্দুর সঙ্গে এক জায়গায় বসে খেতে কোনও আপত্তিই আমার ছিল না। আর-একটা পার্থক্যও চোখে পড়ত। 'ওরা' যখন ওলড টেসটামেন্ট পড়ত, তখন আমরা পড়তুম মর‍্যাল সায়েন্স। নিউ টেসটামেন্টের ক্লাস অবশ্য একইসঙ্গে নেওয়া হত। এই পার্থক্যের কাবণ কখনও জিজ্ঞেস করিনি; তবে বিস্মিত বোধ করতুম ঠিকই।

অখ্রীষ্টানদের মধ্যে আমাকে নিয়ে হিন্দু মেয়ে ছিল দুজন। আর মুসলমান ছিল চারজন। প্রার্থনালয়ে যাওয়া সকলেব পক্ষেই বাধ্যতামূলক ছিল। এর আগে কখনও গির্জা কিংবা প্রার্থনালয়ে যাইনি। তাই বড় অস্বস্তি হত। আচারে-আচরণে ভুলত্রুটিও কম হত না। সবাই যখন সোজা হয়ে বসে আছে, আমি হয়ত তখন নতজানু। আবার অন্যেরা যখন নতজানু, আমি হয়ত তখন সটান বসে আছি। দুপুরের খাওয়ার সময়ে আমরা অখ্রীষ্টান মেয়েরা তো একটা ঘরে এসে জমায়েত হতম। মুসলমান মেয়েরা তখন আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত; প্রার্থনালয়ে গিয়ে খ্রীষ্টানদের মতো আচার-আচরণ করি বলে আমাকে তারা ভীষণ বকত। বলত, "তুই তো খ্রীষ্টান নোস্, তাহলে তুই হাঁটু গেড়ে ওদের ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিস কেন? ওখানে যাওয়াটা বাধ্যতা-মূলক, তাই যাই, কিন্তু তাই বলে আমরা হাঁটু মুড়ে বসি না, প্রার্থনাও করি না। তোরও করা উচিত নয়।" এমন তীব্রভাবে এ-সব কথা বলত তারা যে, আমার অবাক লাগত। রাগও হত। আমার কী করা উচিত কিংবা অনুচিত, তা ওরা বলবার কে? তার উপরে আবার আমি উঁচু ক্লাসের মেয়ে; ওরা আমার চেয়ে দু-এক ক্লাস নীচের

ছাত্রী। তাহলে? তা ছাড়া, আমি নিজেও যে এ নিয়ে ভেবে দেখিনি. তা নয়। কিন্তু, অন্যেরা যখন নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছে, আমি তখন টান হয়ে বসে থাকব, এটা ভাবতেই আমার খারাপ লাগত। সবকিছুতে সায় দিয়ে চলব, এমন মেয়ে আমি নই। কিন্তু তাই বলে এমন-কিছু করতেও আমার ভাল লাগত না, আমার বৈষম্যটা যাতে প্রকট হয়ে সকলের চোখে পড়ে। নতজানু হওয়া কিংবা না-হওয়া, দুই-ই আমার কাছে সমান। আমি যে ওদের মত আচার-আচরণ করছি, তার অর্থ অন্তত আমার কাছে এই নয় যে, ওদের ধর্মবিশ্বাসে আমার সায় আছে। নিজেদের বাড়িতেও তো কত সময় —নিজেদের দেবতায় বিশ্বাস না-থাকা সত্ত্বেও—আমি আচার-আচরণ মেনে চলি। যাই হোক্, প্রার্থনালয়ে যেতে আমার একটুও ভাল লাগত না। সমস্যার সমাধানের জন্য করলুম কী, দেরি করে ইশকুলে যেতে লাগলুম, ফলে আর প্রার্থনালয়ে যেতে হ'ত না। মাঝেমধ্যে তার জন্যে যে বকুনি খেতে হত না, তা নয়, তবে প্ল্যানটা মোটামুটি উতরে গেল।

ক্লাসে ঢুকে কখনও-কখনও মনে হত যে, তলে-তলে খুব একটা উত্তেজনা চলছে। কিন্তু তার কারণ কী, কেউ তা বড়-একটা আমাকে জানাত না। মনে হত, একটা কিছু চক্রান্তের ব্যাপার। আমাদের ক্লাসে ভেরা বলে একটা মেয়ে পড়ত। বাইরে থেকে পড়তে আসত। খুব স্পষ্টবাদী মেয়ে। হাসিখুশী, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ; মনে হত, ফুর্তিতে সব-সময় টগবগ করছে। ভেরার মা ছিলেন প্রাইমারী ইশকুলের ইন্সপেকট্রেস। অর্থাৎ বেশ ভাল ঘরের মেয়ে। ইশকুলে কী হচ্ছে না-হচ্ছে, একমাত্র ভেরার কাছেই তা জানা যেত। একদিন দেখি, গোটা ক্লাস খুব উত্তেজিত। ভেরাকে জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপার কী। তাতে সে বলল যে, আগের দিন মাঝরাত্তিরে একটা মেয়েকে আর-একটা মেয়ের বিছানায় দেখা গেছে। ওয়ার্ডেন তো ডর্মিটারির লাগোয়া একটা ঘরে থাকেন; মাঝরাত্তিরে তিনি একবার বাথরুমে গিয়েছিলেন। সেইসময়ে টর্চ জেবলে তিনি দেখতে পান যে, একটা বিছানা খালি। তক্ষুনি তিনি খোঁজ করতে আরম্ভ করলেন, আর খুঁজতে খুঁজতে সেই মেয়েটাকে তো আর-একটা মেয়ের বিছানায় পাওয়া গেল। ভেরা দেখলুম ব্যাপারটা নিয়ে দারুণ উত্তেজিত। আমি তো মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারলুম না। বেশ তো, একজন মেয়েকে আর-একজন মেয়ের বিছানায় দেখা গেছে, কিন্তু তাতে দোষটা হয়েছে কোথায়? বাড়িতে তো অনেক সময়েই আমি দিদির বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি; কিন্তু কই, বাড়িতে তো সেটাকে একটা বিসদৃশ ব্যাপার বলে কেউ মনে করে না। এরা তাহলে ব্যাপারটাকে বিসদৃশ ভাবছে কেন? খিলখিল করে এত হাসছে কেন? এতে এত হাসাহাসির কী আছে?

বড়দিনের বন্ধের পরে ইশকুল খুলেছে। সেইসময় একদিন ইশকুলে গিয়ে দেখি যে, গোটা ক্লাস যেন উত্তেজনায় টগবগ করছে। এবারের উত্তেজনা আগের থেকেও বেশী। কী ব্যাপার জানবার জন্যে এবারেও আমাকে সেই ভেরার শরণ নিতে হল। ভেরা বলল, মেয়েদের মধ্যে একজনকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাকে আর ইশকুলে আসতে দেওয়া হবে না। যার কথা বলল, সে বেশ বড়সড় মেয়ে, কুড়ি পেরিয়ে গেছে, আমাদের ক্লাসে তারই বয়স সম্ভবত সবচাইতে বেশী। মেয়েটাকে আমি যে বিশেষ পছন্দ করতুম, তা নয়। বুঝলুম না, ইশকুল থেকে তাকে তাড়ানো হল কেন। কী দোষ তার? ভেরা বলল, মেট্রনের সন্দেহ হয়েছিল, মেয়েটাকে তিনি তাই ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য একজন লেডি-ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেন। বাস্, তারপরেই তাকে তাড়ানো হয়েছে। ব্যাখ্যাটা আমার মাথায় ঢুকল না। কিন্তু এর বেশী কিছু জানতে পারিনি।

বাইরে থেকে ডোরিস নামে একটা মেয়ে আমাদের ইশকুলে পড়তে আসত। আমাদের কাছাকাছি থাকে, তাই মাঝেমধ্যে সে আর আমি একসঙ্গে বাড়ি ফিরতুম।

ডোরিসের বাবা কে, তিনি কী করেন, সে-সব আমি জানতুম না। তবে দেখে মনে হত, সে বেশ ভাল ঘরের মেয়ে। আমার কাছ থেকে সে পড়বার জন্যে খানকয়েক এই চেয়েছিল। তাই তাকে একদিন আমাদের বাড়িতে আসতে বলি। আমাদের বসবার ঘরের সাজসজ্জা দেখে সে তো অবাক। খোলাখুলি বলেই ফেলল যে, আমাদের বসবার ঘর যে এত শৌখিন আর ছিমছাম হবে, তা সে ভাবতেও পারেনি। হিন্দু বাড়ি সম্পর্কে খ্রীস্টান মেয়েরা সম্ভবত কিম্ভূত নানা ধারণা পোষণ করে।

ডোরিস নিশ্চয় আমাদের বাড়ির কথা অন্য মেয়েদের বলে থাকবে। সে এসে আমাদের বাড়িটা দেখে যাবার পরে লক্ষ করেছিলুম যে, অন্যেরা আমাকে বেশ সমীহ করে চলছে। আমাদের বসবার ঘরে মস্ত একটা বুক-কেস ছিল। আমার পড়াশুনোর উপরে কখনও কোনও বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়নি। যে-বই পড়তে চাই, তা-ই পড়তুম, এ নিয়ে কেউ কিছু বলত না। গল্প-উপন্যাস প্রায় সবই পড়ে ফেলেছিলুম। ডোরিস দুখানা বই পড়তে নিয়ে গেল। পরের দিন দেখি, সে খুব উত্তেজিত। চোখ বড়-বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে, খিলখিল করে হাসতে-হাসতে জিজ্ঞেস করল, যে-দুখানা বই সে আমার কাছ থেকে পড়তে নিয়েছে, আমি নিজে সে-দুখানা পড়েছি কিনা। বললুম, হ্যাঁ, পড়েছি। তাতে সে সন্দেহের চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। এ-সব বই পড়া সত্ত্বেও বোকার মতো সব প্রশ্ন করি কেন, খুবসম্ভব এটাই সে বুঝে উঠতে পারছিল না। একটা বইয়ের কথা এখনও মনে আছে। তাতে এক দম্পতির বিবাহ-রাত্রির বর্ণনা ছিল। বউটি লাজুক প্রকৃতির। আর বরটি, কী জানি কেন, তাকে বলছিল যে, বিয়ে করবার আগে এক বন্ধুর সঙ্গে তার খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। বন্ধুটি মেয়ে নয়, ছেলে। নিজেকে ধিক্কার দেবার ভঙ্গিতে, অনেকক্ষণ ধরে, বরটি তার সেই ছেলে-বন্ধুর কথা বলে যাচ্ছিল। বউটি তো মর্মাহত। পরনে ড্রেসিং-গাউন, সেই অবস্থাতেই সে পতিগৃহ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে এবং অর্ধেক রাত রাস্তায়-রাস্তায় পায়চারি করে ঘুরে বেড়ায়। তারপর ফিরে এসে তার স্বামীকে সে ক্ষমা করে দেয়।

আমাদের বাড়ি তো ইশকুলের খুব কাছেই, তাই দুপুরে খাওয়ার ঘণ্টায় আমি সাধারণত বাড়ি গিয়ে খেয়ে আসতুম। সেটাই ছিল সুবিধাজনক। একদিন তো বাড়ির থেকে একটু তাড়াতাড়ি ফিরেছি, দেখি ইশকুলের খাওয়ার-ঘর থেকে টিফিন-ক্যারিয়ার হাতে কে একটা লোক বেরিয়ে আসছে। এমন চেহারার লোক এর আগে কখনও দেখিনি। গায়ের রঙ মিশকালো, চুল কোঁকড়া। ছবিতে যে-সব নিগ্রোর চেহারা দেখেছি, ঠিক তাদের মতো। ভারতবর্ষেও যে এমন মানুষ থাকতে পারে, তা আমি জানতুম না। শুনলুম, মুসলমান যে মেয়েরা আমাদের ইশকুলে পড়ে, ও তাদের ভৃত্য। তারাই বলল যে, এই লোকটার পূর্বপুরুষরা বংশপরম্পরায় তাদের বাড়িতে ক্রীতদাস ছিল। সে নিজে অবশ্য ক্রীতদাস নয়, স্বাধীন, তাই তার সামনে মেয়েদের পক্ষে পর্দানশীনা থাকাই সঙ্গত। তবে কিনা, তাকে তারা ক্রীতদাস বলে ভাবতেই অভ্যস্ত, তাই তাকে দেখে ঘোমটা দিয়ে তারা মুখ ঢাকে না। শুনে তো আমি হতভম্ব। এ কি আরব্য-রজনীর গল্প? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? নাকি এটাই সত্য? ক্রীতদাস যেহেতু সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়, তাই তার সামনে পর্দানশীনা হবার দরকার করে না। তবে ক্রীতদাসকে যখন মুক্তি দেওয়া হয়, তখন আর সে সম্পত্তি বলে গণ্য হয় না। সে তখন আর-পাঁচজনের মতই সাধারণ একজন পুরুষমানুষ; ফলে তখন মেয়েদের পক্ষে সে বিপজ্জনক বলে গণ্য হতে থাকে! সাধারণ মানুষের বেলায় পর্দানশীনা হওয়া এবং ক্রীতদাসের বেলায় তা না-হওয়ার তো এ ছাড়া আর অন্য-কোনও ব্যাখ্যা হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু সে-কথা যাক। লোকটার দেশ কোথায়? কে তাকে মুক্তি দিয়েছিল? কবে দিয়েছিল? মনের মধ্যে অসংখ্য প্রশ্নের উদয় হচ্ছিল। কিন্তু মুসলমান মেয়েরা দেখলুম,

[illegible] কথা বলতে বিশেষ উৎসুক নয়, ফলে প্রশ্নগুলি আর জিজ্ঞেস করা হল না, চুপ করে রইলুম। এমন অভিজ্ঞতা পরে আর কখনও হয়নি।

আমাদের ইশকুলের মুসলমান মেয়েরা ধর্মবিশ্বাসে ছিল একটু গোঁড়া প্রকৃতির। এ-ব্যাপারে আমি চুপচাপ থাকতুম, তবু মাঝেমধ্যে যে খিটিমিটি লেগে যেত না, তাও নয়। নীতিশিক্ষার ক্লাস শেষ হবার পরে কথায়-কথায় একদিন তাদের বলেছিলুম যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি না। শুনে তারা চমকে গিয়েছিল। একজন তো বলেই বসল যে, আমার কথা ভেবে তার দুঃখ হয়। মনে পড়ে, ১৯৩৭ সনের কোনও-একটা সময় থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সচেতনভাবে আমি অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলুম। আয়েষার সঙ্গে যে কথা হয়েছিল, তা লিখে না রাখলে, বছরটা এত স্পষ্টভাবে আমার মনে থাকত না। বিশেষ কোনও ঘটনার সূত্র ধরে আমি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়েছিলুম কিনা, তা আমার মনে নেই। এই অবিশ্বাসের সূচনা হল কীভাবে? কীভাবেই বা তা দানা বাঁধল? স্মৃতির সরোবর মন্থন করে এর উত্তর আমাকে খুঁজে আনতে হবে।

আমার বয়স যখন সাত-আট বছর, মনে পড়ে, পুরাণের নানা বিচিত্র গল্প তখন মুগ্ধ হয়ে শুনতুম। দেবতাদের মধ্যে কৃষ্ণের চরিত্রই তো সবচাইতে মানবিক, তাঁকেই আমার সবচাইতে ভাল লাগত। চোখ বন্ধ করলে তাঁর ছবি আমার মনশ্চক্ষে ফুটে উঠত, আমার কানে বাজত তাঁর মোহিনী বাঁশির সুর। দেবতারা সুন্দর হবেন, এইটে ভাবতেই আমি ভালবাসতুম। যে ঈশ্বর নিরাকার, তাঁর মধ্যে সৌন্দর্য থাকবে কীভাবে? মনে পড়ে, একদিন একটা মন্দিরে গিয়েছিলুম। আমার বয়স তখন তা এই বছর পাঁচেক। আর-সকলের মতো আমার হাতেও ছিল অঞ্জলির ফুল আর ফল। কিন্তু মন্দিরে ঢুকে আমি কোনও দেবতার সন্ধান পেলুম না। জিজ্ঞেস করলুম, দেবতা কোথায়। তাতে গোলমতো একটা পাথর আমাকে দেখিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু পাথর আমার ভাল লাগল না। পাথরকে আমি দেবতা বলে স্বীকার করতে রাজী নই। এই বিকল্পের অর্থ কী? এ কি প্রতীক? ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, তাই তিনি বিমূর্ত । ফুল আর ফল আঁকড়ে ধরে, প্রায় কাঁদতে কাঁদতে আমি মন্দির থেকে ছুটে বেরিয়ে এলুম। সঙ্গে ছিলেন ঠাকুমা আর পিসিমা-কাকীমা। আমার কাণ্ড দেখে তাঁরা হতভম্ব। অনেক করে তাঁরা আমাকে বলেছিলেন যে, দেবতাকে যা দেব বলে মনস্থ করেছি, সেই ফুল-ফল ফিরিয়ে নিতে নেই, এতে পাপ হয়। কিন্তু আমি গোঁ ধরে বসে রইলুম। প্রতীকে আমার চলবে না। আমার দেবতার চোখ থাকা চাই, কান থাকা চাই, মুখ থাকা চাই। তাঁর চেহারা হওয়া চাই সুন্দর, সুঠাম। ঠিক মানুষেরই মতো।

বছরে দু'বার আমি নিজেই দেবীর পর্যায়ে উন্নীত হতুম। তখন আমাকে পুজো করা হত। শুধু মা আর ঠাকুমাই যে আমাকে পুজো করতেন, তা নয়। প্রতিবেশীদের মধ্যে যাঁদের নিজেদের মেয়ে ছিল না, আমাকে পুজো করতেন তাঁরাও। সেই দু' দিন যে নিজের মধ্যে কোনও ঈশ্বরিক ক্ষমতা অনুভব করতুম, তা নয়। আসলে আমি ছিলুম খুবই হিসাবী দেবী। তাই পুজো পাবার জন্যে বিশেষ করে সেইসব প্রতিবেশীর বাড়িতে আমি যেতুম, যাঁরা আমাকে দু আনা কি তারও বেশী প্রণামী দিতেন। এক বৃদ্ধা অনেকক্ষণ ধরে আমার পুজো করতেন। কিন্তু প্রণামী বাবদে তাঁর কাছে দু' পয়সার বেশী পাওয়া যেত না। হেতুটা দারিদ্র্য, না কৃপণতা, জানি না। তবে এটা ঠিক যে, অত কম প্রণামী দিতেন বলে তাঁকে আমি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতুম।

"গৌরী পূজা"কে নেহাতই অর্থহীন একটা অনুষ্ঠান বলে আমার মনে হত। এই নিয়ে মাকে অনেক ঠাট্টা করেছি। আমাদের পরিবারে এই পূজার প্রবর্তক কিন্তু বাবা। ঠাকুর্দার মৃত্যুর পরে বাবা একদিন একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছিলেন। সেইসময়ে আবেগের মাথায় তিনি সংকল্প করে বসেন যে, চাকরি পেলে সারাজীবন

তিনি কন্যাপুজো করবেন। পরে তিনি মাকে এই সংকল্পের কথা জানান। মা বললেন, সংকল্প যখন করা হয়েছে, তখন তা রাখতেই হবে। বাবার হয়ে তিনিই অতঃপর বছরে দু'বার গৌরীপুজো শুরু করে দেন। মূলে যে বাবার সংকল্প, তা আমি জানতুম না। যখন জানলুম, তখন তো আমি অবাক। এর পর থেকে বাবার সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে।

আমাদের বাড়িতে সবাই যে খুব ধর্মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন, তা নয়। বাবা তো পুজো-আচ্চা-অনুষ্ঠান নিয়ে অবিরত ঠাট্টাবিদ্রূপ করতেন। মায়েরও এ-সব দিকে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তবে, আমার ধারণা, নেহাতই অভ্যাসবশত, বেশ-কিছু পালা-পার্বণ তিনি মেনে চলতেন। একমাত্র ঠাকুমার জন্যই আমাদের ধর্মীয় আচার-আচরণের ঐতিহ্য অনেকটা অব্যাহত থাকতে পেরেছিল। 'গৌরী' পুজোর পরের দিন হত যার-যার নিজস্ব দেবতার পুজো-অনুষ্ঠান। আমার পূর্বপুরুষরা প্রায় দুই শতাব্দী আগে কাশ্মীর থেকে চলে এসেছিলেন। শুনেছি, সেখানে প্রধানা দুই দেবীর পুজো হয়। একজন দেবী আমিষাশী, ফলে তাঁকে আমিষ নৈবেদ্য দিতে হয়। অন্যজন নিরামিষাশী। তাঁকে দেওয়া হয় পায়েস। আমরা আমিষাশী দেবীর পুজারী। পুজোদিবসে তাঁকে ছাগ-যকৃৎ উৎসর্গ করা হত। বাড়িতে সেদিন পায়েসও হত। বাবা এ-সব ব্যাপারের ধার ধারতেন না। নৈবেদ্যর উপরে সিঁদুর দেবার জন্যে আমাদেরই ডাক পড়ত। আমার দিদি নিরামিষাশী। সে তাই ক্ষীরের উপরে সিঁদুর দিত। আমাকে সিঁদুর দিতে হত যকৃতের উপরে। রক্তে-মাখামাখি মস্ত একটা যকৃৎ, দেখেই ভীষণ খারাপ লাগত আমার। আমি সেটাকে ছুঁতেও চাইতুম না। ভিতরে ভিতরে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতুম। দীর্ঘদিনের এই পারিবারিক প্রথাটায় শেষপর্যন্ত আমিই একটা ছেদ টেনে দিই।

মনে আছে, নানীর সঙ্গে ছেলেবেলায় এক সন্ন্যাসিনীর কাছে গিয়েছিলুম। সবাই তাঁকে 'মহারাজজী' বলত। তাঁকে দেখবার জন্যেই যে গিয়েছিলুম, তা নয়। আসলে আমি গিয়েছিলুম একটু বেড়াবার টানে। তা 'মহারাজজী' তো আমাকে দেখে ভারী খুশী। একটা গেলাসে করে তিনি দুধ খাচ্ছিলেন, সেই এঁটো গেলাসটাই তিনি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি তো হতবাক্। একজন বর্ষীয়সী মহিলা তাঁর এঁটো দুধ আমাকে খেতে বলছেন, এ কী অশুভ ব্যাপার! একে তো এটা বিসদৃশ কাণ্ড, তার উপরে অস্বাস্থ্যকর। মুখ ফিরিয়ে নিলুম, ও-দুধ আমি খাব না। তাতে সমবেত ভদ্রমহিলারা তো ভীষণ চটে গেলেন। একজন আমাকে বকাবকি করতে লাগলেন, আর-একজন আমাকে দুধটা খেয়ে ফেলবার জন্যে সাধাসাধি করতে লাগলেন, আর-একজন আবার "দুধটা তবে আমাকে দাও, ও তো প্রসাদ আমি খেয়ে নেব" বলে গেলাসটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে উদ্যত হলেন। যেহেতু একজন সন্ন্যাসিনীর ঠোঁটের ছোঁয়া লেগেছে, অতএব দুধটা একেবারে অমৃত হয়ে গেছে, এমন কথা মানতে আমি রাজী নই। আমি ও দুধ, খাওয়া দূরের কথা, ছুঁতেও রাজী হলুম না। শেষ পর্যন্ত 'মহারাজজী'ই আমাকে উদ্ধার করলেন। তিনি বললেন যে, বাচ্চারা হচ্ছে ভগবানেরই মতো, তাঁদের দিয়ে কখনও জোর করে কিছু করাতে নেই। বলে গেলাসটা আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে বাকী দুধটা তিনি নিজেই খেয়ে নিলেন। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

* * *

নানী ইতিমধ্যে দিল্লি থেকে চলে এসেছিলেন। পরিবারের বিধবা আর দুঃস্থদের জন্য আমার প্রমাতামহ তো মথুরায় একটা মন্দির তুলে তার পিছনে একটা বাড়িও

বানিয়ে দিয়েছিলেন, নানী সেই বাড়িতে থাকতেন। আগ্রা থেকে মথুরার দূরত্ব পঞ্চাশ মাইলেরও কম। মোটরে করে প্রায়ই আমরা তাই নানীকে দেখতে যেতুম।

অনেকে সেই বাড়িতে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। সকলেই [illegible] বিধবা। ঈশ্বর ছাড়া অন্য-কোনও সহায় তাঁদের নেই। আমার এক মাসীও [illegible] থাকতেন। বারো বছর বয়সে এক ধনী-পরিবারে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। পাত্রটি [illegible]। ব্যবহারও ভাল। তখন তাঁরও বয়েস অল্প। পরে অবশ্য তাঁর স্বভাব-চরিত্র বিগড়ে যায়। মদ ধরেছিলেন। মাসীকে খুব নির্যাতনও করতেন। পৈতৃক সম্পত্তি তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন বলেই হোক, কিংবা সম্পত্তিলাভের ব্যাপারে মাসীর কোনও আইনগত বাধা ছিল বলেই হোক, মেসোমশায়ের মৃত্যুর পরে দেখা গেল যে, নিজের আর দুই মেয়ের ভরণপোষণ চালাবার মতো সামর্থ্যটুকুও মাসীর নেই। মেয়েদের সুপাত্র জুটল না। বড় মেয়েটির দোজবরে বিয়ে হল। পাত্র রীতিমত বয়স্ক। তার উপরে কিপ্টে, সন্দিগ্ধ, বদমেজাজী। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা হলে যা হয় আব কী, পুরনো চাকর-বাকরদেরও লোকটা আদপে বিশ্বাস করত না, সক্কলকে তার সন্দেহ। বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি তখন মিলত না, মাসতুতো বোনটি অগত্যা আদালতের শরণ নিয়ে আলাদা বসবাসের ব্যবস্থা করে নিল। ছোট মেয়েটি প্রথমে তার মায়ের দুর্দশা দেখেছে, এখন দিদির অবস্থাও দেখল। ঠিক করল, বিয়েই করবে না। মথুরার সেই বাড়িতেই তারা থাকত। সহায় একমাত্র ভগবান।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আমি অনেক আগেই পবিত্যাগ করেছিলুম। ধর্মনিষ্ঠ বলে যাঁদের খ্যাতি, যতই তাঁদের সান্নিধ্যে আসি, ততই আমার মনে হতে থাকে যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়ে বস্তুত তাঁদের উপায় নেই। ঈশ্বরই তাঁদেব একমাত্র ভরসা। ঈশ্বরে তাঁদের দরকার আছে, সে-কথা মানি। কিন্তু তাব থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো চলে না যে, তাঁদের চিত্তের বাইরেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে।

অলস চিত্তে একদিন একটা পঞ্জিকার পাতা উলটে জোরে-জোরে বলছিলুম যে, যাত্রার পক্ষে কোন্ কোন্ দিন শুভ, আর কোন কোন্ দিন অশুভ। সেই সময়ে বিশেষ একটা বাক্যেব উপবে আমাব চোখ আট্কে যায়। বাক্যটিব মর্মার্থ : "যে-দিন ইচ্ছে, যখন ইচ্ছে যাত্রা করতে পারো। চিত্ত দৃঢ় থাকলেই হলো, অন্য আর কিছুতেই কিছু আসে যায় না।" উদ্ধৃতিগুলি প্রাচীনকালেব বিখ্যাত সব মানুষদের। এটির তলায় দেখি লেখা রয়েছে 'চার্বাক'। এর আগে তাঁর নাম শুনিনি। মা বললেন, চার্বাক এ-দেশের বহুজনশ্রদ্ধেয় এক প্রাচীন দার্শনিক, তিনি অজ্ঞাবাদেব প্রবক্তা। প্রাচীন কালের হিন্দুরা যে নানাবিধ জীবনদর্শনেব মধ্যে অজ্ঞাবাদকেও ঠাঁই দিয়েছিলেন, এ-কথা জেনে সেদিন বড় বিস্ময়বোধ করেছিলুম।

* * *

আজও তাকে স্পষ্ট মনে পড়ে। আমাদের পাঁচিলের উপরে পা ঝুলিয়ে সে বসে ছিল। হাসিতে সারা মুখ উদ্ভাসিত, বড় বড় চোখ দুটিতেও সেই হাসির ছোঁয়া লেগেছে। সেই তাকে প্রথম দেখি। পরমুহূর্তেই সে মাটির উপরে লাফিয়ে পড়ে, তার শাট্লকক্টা কুড়িয়ে নিয়ে, ফেব তাদের আর আমাদের বাড়িব মধ্যেকাব পাঁচ-ফুট উঁচু পাঁচিলের উপরে লাফিয়ে উঠে উধাও।

সদ্য তখন আমরা আগ্রায় এসেছি। কাউকে চিনি না। পিছনের বারান্দায় বসে বুঝতে পারতুম যে, পাশের বাড়িতে ব্যাডমিনটন খেলা চলছে। কিন্তু মাঝখানে ছিল পাঁচিল, তাই কারা খেলছে, দেখতে পেতুম না, শুধু শাট্লককের যাতায়াতটাই চোখে পড়ত।

প্রথম কবে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল, মনে পড়ে না। শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, প্রথম দর্শনেই দুজনে দুজনকে ভালবেসেছিলুম, পরস্পরকে বন্ধু বলে জেনেছিলুম। আমার চাইতে সে মাত্রই কয়েক মাসের বড়, আমার মতই সেও তার পরের বছরে হাইস্কুলের শেষ পরীক্ষা দেবে। কিন্তু সে ইশকুলে যেত না। তার প্রধান আকর্ষণ ছিল সংগীত। সে গান শিখছিল। নিতান্ত খেয়ালের বশে নয়, [illegible]
তাদের গোটা সংসারের কেন্দ্রে ছিল সে আর তার বাবা।

তার বাবার চেহারা ছিল খাঁটি মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের মতো। [illegible] কলেজে তিনি ইতিহাস পড়াতেন। হিন্দুস্থানী তিনি ভালই বলতেন। তবে কিছু কিছু উর্দু শব্দের উচ্চারণ ঠিক জানতেন না। আওরংজেবকে বলতেন আওরনজেব। শুনে আমার খুব মজা লাগত। ডালি তাঁর মেয়ে। মেয়েকে তিনি দারুণ ভালবাসতেন। ঠিক এইরকমের গভীর স্নেহের স্বাদ আমি নিজে কখনও পাইনি। ডালির ভাইয়ের বয়স ন বছর। লাজুক ছেলে। তখন তার জীবনের সেই পর্যায় চলছে, ছেলেরা যখন মেয়েদের একটু এড়িয়ে চলে। ডালির একটি বোনও ছিল। তার বয়েস পাঁচ। ও-বাড়িতে ডালির মাকেই কিন্তু আমার সবচাইতে ভাল লাগত। মনে হত যেন শরৎচন্দ্রের আঁকা নারী-চরিত্র; উপন্যাসের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সাংসারিক দায়দায়িত্ব তাঁকে কঠিন করে তোলেনি; বরং তাঁর চরিত্রে যেন আশ্চর্য এক দীপ্তি এনে দিয়েছিল। ভদ্রমহিলা সুন্দরী। কিন্তু সে শুধু শারীরিক সৌন্দর্যের ব্যাপার নয়, তার চাইতে বেশী-কিছু। যেমন নরম তাঁর ত্বক, তেমনি মসৃণ, গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মতো, ঢেউ-খেলানো কালো চুল, সতেজ লাবণ্যময় মিষ্টি মানুষটি, কী ভালই যে তাঁকে লাগত। এত সরল, এত সাদাসিধে, তবু তারই মধ্যে থেকে এত মাধুর্য বিকীর্ণ হচ্ছে, সত্যি বলতে কী, এর আগে তাঁর মতন মহিলা আমি একটিও দেখিনি। ডালিদের সঙ্গে মিশতে আমার খুব ভাল লাগত; তাঁরাও আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন।

আগ্রার আর-একটি পরিবারের সঙ্গেও এই সময়ে আমাদের খুব অন্তরঙ্গতা হয়। ডালিদের পরিবারের সঙ্গে কোনও মিলই তাঁদের ছিল না। স্বামী, স্ত্রী ও তাঁদের ন'টি সন্তান নিয়ে এই পরিবার। বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে, সে দূরে থাকে। মেজো মেয়েটি দিল্লির লেডি হার্ডিঞ্জ কলেজে ডাক্তারি পড়ে। বাকী সাতটি ছেলেমেয়ে থাকে আগ্রায়, তাদের বাবা-মায়ের কাছে। সংস্কারটা কোথা থেকে জন্ম নিয়েছিল জানি না, তবে বৃহৎ পরিবারের বিরুদ্ধে আমার সংস্কার বরাবরই অতি প্রবল। তবে আগ্রার এই পরিবারটিকে দেখে বুঝেছিলুম যে, বৃহৎ পরিবারও সুখী হতে পারে। পরিবারের কর্তা আগ্রা কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী, দুজনেই অতি সাদাসিধে মানুষ। দেখে নেহাতই মামুলী বলে মনে হয়। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন একটা নিবিড় মমতার সম্পর্ক এক্ষেত্রে ছিল, যা কিনা অতি বিরল, সচরাচর যা চোখে পড়ে না। দুজনের মধ্যেকার এই সঙ্গতির রেশ যেন গোটা পরিবারেই ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সবচাইতে ছোট্ট বাচ্চাটির বয়স তখন দু' বছর। সেই রেশটা যেন তাকেও আচ্ছন্ন করে রাখত।

মধ্যবিত্ত পরিবারে সেকালে চাকর-বাকরের সংখ্যা নেহাত কম হত না, সেটাই ছিল রেওয়াজ। কিন্তু এত বড় সংসারের খরচা তো নেহাত কম নয়, তাই একগাদা ঝি-চাকর রাখবার সামর্থ্য সম্ভবত তাঁদের ছিল না। বাড়িতে একটি ঠিকে-রাঁধুনী দেখতুম, দু বেলা এসে সে রান্না করে দিয়ে যেত। রান্না শেষ হলেই সে চলে যেত, বাড়ির লোকদের খাওয়া কখন শেষ হবে, তার জন্যে অপেক্ষা করত না। একটি চাকরও ছিল। হাসিখুশী, বয়েস অল্প, বাচ্চা ছেলেটিকে সকালে-বিকেলে সে একটু বাইরে

থেকে ঘুরিয়ে আনত। বাড়ির বাকী কাজ তাহলে করে কে, এইটে আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতুম না। যখনই ওদের বাড়িতে গেছি, দেখতে পেয়েছি যে, ঘরদোর একেবারে ফিটফাট। ছেলেমেয়েরা পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেকের পোশাক পরিপাটি। চিৎকার নেই, গোটা বাড়িটা যেন আশ্চর্য এক শান্তির মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে। বাড়ির গিন্নীটি যে সংসারের ঝক্কি সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, এমনও মনে হত না, এবং এটাই আমাকে সবচাইতে বিস্মিত করত। সন্ধ্যার সময়ে স্বামী-স্ত্রী বেড়াতে বেরোতেন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, কিংবা নিজেদের বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা করতেন, এই নিত্যকর্মে কখনও ছেদ পড়ত না। মনে হত, সংসারটা যেন নিজেরই ছন্দে মসৃণভাবে চলছে।

যে-মেয়েরা আগ্রায় থাকত, তাদের মধ্যে দ্বিতীয়টি আমার দিদির বয়সী, দিদির সঙ্গে একই ক্লাসে সে পড়ত, তাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। আমার বন্ধুত্ব ডালির সঙ্গে। সবসময়ে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াই। যেমন-বয়েসে, তেমনি পড়াশুনোতেও তিচ্চি ছিল এই দু দলের মধ্যবর্তিনী। তবে আমাদের দলেই সে ভিড়ে গিয়েছিল। কামোজাই আমার দিদির চাইতে মাত্র দু বছরের বড়। তবে সাত ভাইবোনের মধ্যে তখন সেই সবচেয়ে বড় তো, তাই দায়িত্ববোধও বেশী, মাঝেমধ্যে আমাদের সঙ্গে মিশত বটে, তবে ওই বয়সেই তার ভাবভঙ্গী হয়ে গিয়েছিল একটু ভারিক্কি ধরনের, আমাদের মধ্যে সে ঠিক মিশে যেতে পারেনি।

শেঠী-বাড়ির মেয়েদের সাজ-সজ্জায় কোনও জলুস ছিল না। কিন্তু সাদাসিধে পোশাকেও তারা সর্বদা ফিটফাট থাকত, কখনও তাদের নোংরা ময়লা জামাকাপড় পরতে দেখিনি। সারল্যের মধ্যেও যে একটা মর্যাদা থাকতে পাবে, থাকে, সেই প্রথম সে-কথা আমি বুঝতে পারি। ঠিক তাদের বিপরীত ছিল আমাদের পাড়ার আর-একটি মেয়ে। কামোজাইয়ের সঙ্গে সে একই ক্লাসে পড়ত। সাজসজ্জা করত খুব ঘটা করে। অন্যেরা খুব সাদাসিধে পোশাক পরত বলেই সেই পটভূমিকায় তার পোশাকের উগ্রতা খুব প্রকট হয়ে চোখে পড়ত। মেয়েটার নিজের মা মারা গিয়েছিলেন; সৎমা তার প্রায় সমবয়সিনী। মেয়েটা বলত যে, সে আর তার সৎ-মা, খেলাচ্ছলে, পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাজসজ্জা করে। শুনে খুব অদ্ভুত লাগত। মনে হত, এটা নিতান্ত কুরুচির ব্যাপার। কামোজাইয়ের সঙ্গে যে কী করে তার এত বন্ধুত্ব হল, বুঝতে পারতুম না।

* * *

পাশের মেয়েটা আমাকে একটা ধাক্কা দিতেই চমকে উঠলুম। মনে পড়ল, আমি ক্লাসের মধ্যে বসে আছি, ভূগোল পড়ানো হচ্ছে। সহপাঠিনীরা ভেবেছিল, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। তারা তাই খিলখিল করে হাসছিল। দিদিমণি আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু খুবসম্ভব বারবার জিজ্ঞেস করেও তিনি আমার সাড়া পাননি, কিছুই আমার কানে যাচ্ছিল না। তাই বলে যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাও নয়। আসলে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। চোখ, কান—দুই-ই খোলা ছিল আমার, কিন্তু দিদিমণিকে আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না, দেখছিলুম আমার মাকে, তাঁর কান্নার শব্দ আমার কানে ভাসছিল। কাল সারারাত মা খালি কেঁদেছেন। অমানবিক, অস্বাভাবিক কান্না। কী যেন কথাটা? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, হিস্টিরিয়া। বাবা অন্তত তা-ই বলেছিলেন। বাড়িতে একজন অতিথি এসেছিলেন। কথায়-কথায় বাবা তাকে বলছিলেন যে, মায়ের মাঝেমাঝে এইরকমের হিস্টিরিয়া হয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই কথাটা তিনি বলেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যে, ভিতরে-ভিতরে

তিনি বেশ অস্থির হয়ে উঠেছেন।

বাবা আর মাকে আমি যেন একটা দাঁড়িপাল্লায় তুলে দিয়েছি। কখনো দেখছি, বাবার পাল্লা ভারী, কখনো মায়ের। কী হয়েছে ওঁদের মধ্যে? সমস্যাটা কী? কী নিয়ে গণ্ডগোল বেধেছে? বুঝতে চেষ্টা করতুম, কিন্তু শত চেষ্টাতেও বুঝে উঠতে পারতুম না। অনেক ব্যাপার নিয়েই ওঁদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়। সবচাইতে বেশী ঝগড়া বাধে তাস খেলা নিয়ে।

বাবা মদ খান না। মায়ের তাই নিয়ে খুব গর্ব। কতজনেরই কত বদ-খেয়াল থাকে। বাবার সে-সব নেই। বাবার শুধু একটি নেশা, তিনি তাস খেলতে ভালবাসেন। অধিকাংশ সময়েই ব্রিজ খেলেন। বাজি রেখে খেলেন ঠিকই, কিন্তু বাজির অঙ্কটা এতই কম যে, তাঁকে জুয়াড়ী বলা যায় না। তবে বাবার ক্ষেত্রে এই ব্রিজের নেশা ছিল মদের নেশার চেয়েও প্রবল। খেলতে বসলে তাঁর আর অন্যদিকে খেয়াল থাকত না, খেলছেন তো খেলছেনই। তাসের আসর থেকে বাড়ি ফিরতে তাঁর খুব রাত হত, মা আর চাকর-বাকরদেরও তাই জেগে থাকতে হত, বাবা না-আসা পর্যন্ত তাদেরও খেয়ে নেবার উপায় নেই। এই নিয়ে খুব খিটিমিটি লাগত। বাবা তাই রাত্তিরের খাওয়া বন্ধ করে দিলেন। অফিস থেকে বাড়িতে ফিরে পেট পুরে চা-জলখাবার খেয়ে নিতেন, তারপর ক্লাবে কিংবা কোনও বন্ধুর বাড়িতে তাস খেলতে চলে যেতেন। রাত্তিরে তো তিনি খাচ্ছেন না, চাকর-বাকরদেরও তাই তাঁর জন্যে জেগে থাকবার দরকার নেই। মায়েরও না। মা তবু জেগে থাকতেন। তিনি ঘুমোতে পারতেন না। বলতেন, তাঁর স্বামী যতক্ষণ না নিরাপদে বাড়িতে ফিরছেন, ততক্ষণ তাঁর চোখে ঘুম আসা সম্ভব নয়।

মাকে একলা ফেলে রেখে বাবা এই যে প্রতি সন্ধ্যায় তাস খেলতে চলে যেতেন, এটা কি অন্যায়? নাকি তাস খেলার মতো এত তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে মা যে নিত্য ঝগড়াঝাঁটি করতেন, অন্যায় সেটাই?

মা কি একাই জেগে থাকতেন? জেগে থাকতুম আমিও। বাবার প্রতীক্ষায় কত যে জেগে থেকেছি, মা তো জানেন না, কখনও জানবেনও না। একদিনের কথা বলি। সেদিন বড় ভয় পেয়েছিলুম। শীতের মধ্যরাত্রি। হঠাৎ দেখি, বাবা আর দিদি আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মা কোথায় গেছেন, আমি জানি কিনা! সে কী, মা হঠাৎ কোথায় গেলেন? সত্যি বলি, মাঝরাত্তিরে আমার ঘুম ভাঙিয়ে যখন ওই প্রশ্ন করা হল, তখন প্রথমেই যে-কথাটা আমার মনে হয়েছিল, তা এই যে, নিঃশব্দে এই বাড়ির থেকে মা বেরিয়ে গিয়েছেন, আর কখনও এখানে তিনি ফিরবেন না।

পরে দেখা গেল, ব্যাপারটা আসলে তা নয়। মা হঠাৎ একটা ব্রেক-কষার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন, ঠিক তারপরই একটা তুমুল সংঘর্ষের শব্দ তাঁর কানে পৌঁছয়। যেন হঠাৎ দুটো গাড়িতে ভীষণ ধাক্কা লেগেছে। তাঁর মনে হয়েছিল, দুটো গাড়ির একটা হয়ত বাবার। নিশ্চয়ই কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে; কে জানে, হয়ত তিনি ভীষণভাবে আহত হয়েছেন। মনের মধ্যে এই চিন্তার উদয় হবামাত্র আমাদের বাংলো থেকে মা ছুটে বেরিয়ে যান। বাংলোর সামনেই বড় রাস্তা। বাবাও তক্ষুনি বাড়ি ফিরেছেন। মা যে-দরজা দিয়ে রাস্তার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন, বাবা সেই দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢোকেননি। তিনি ঢুকেছিলেন আর-একটা দরজা দিয়ে। মাকে তিনি তাই দেখতে পাননি। বাড়িতে ঢুকে, মায়ের বিছানা শূন্য দেখে, তিনি অবাক হয়ে যান। প্রথমেই দিদিকে তিনি জাগিয়ে দেন। তারপর আমাকে। জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার, মা নেই কেন? তার খানিক বাদেই মা ফিরে আসেন। নিশ্চিন্ত হয়ে তখন আবার আমরা ঘুমোতে

যাই। আসলে কিন্তু এতে বিশেষ উত্তেজিত হবার কোনও কারণই ছিল না। অতি তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু আমার অবচেতনে সেদিনকার সেই গভীর উদ্বেগের একটা ছাপ থেকে যায়। মাঝরাত্তিরে ঘুম থেকে উঠে সেদিন আমার মনে হয়েছিল, চিরদিনের জন্যে মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। বড় অসহায় বোধ করেছিলুম সেদিন। সেই অসহায়তা-বোধ, সেই উদ্বেগের কারণ আর কিছুই নয়, সাংসারিক অশান্তি।

* * *

একই মানুষ একই সময়ে কীভাবে একাধিক স্তরে জীবনযাপন করে এবং একাধিক রকমের অস্তিত্বের জের টেনে ঘুরে বেড়ায়, ভেবে এক-এক সময়ে অবাক হয়ে যাই। ভিতরকার কোনও শক্তির দরুনই এটা সম্ভব হয় নিশ্চয়; এই শক্তিটা যদি না থাকত, তাহলে নিশ্চয় আমাদের ব্যক্তিত্ব দ্বিধাখণ্ডিত হয়ে যেত। আমি ইশকুলে যাই, আমি বাড়িতে থাকি, আমার বন্ধুবান্ধব আছে। ইশকুল, বাড়ি, বন্ধুমহল—তিন জায়গায় আমার তিন রকমের অস্তিত্ব; তিন স্তরে আমি তিন রকমের মানুষ।

সাড়ে তিনটের খানিক বাদে ইশকুল থেকে ফিরতুম। তারপর অধীর হয়ে অপেক্ষা করতুম দিদির জন্যে। আমার ইশকুল তো নেহাতই মামুলী ধরনের। কিন্তু দিদির কলেজ, অন্তত আমার চোখে, তা নয়। সে ছেলেদের কলেজে পড়ে। নিশ্চয় সেখানকার পরিবেশ একেবারে নতুন রকমের, অনেক উত্তেজনাময়। রোজই সেখানে নিশ্চয় নতুন কিছু ঘটে; এমন-কিছু, যার স্বাদ একেবারে অন্য রকমের। দিদিকে তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করতুম। জিজ্ঞেস করতুম, সেদিন কী হল। যেন দিদির মুখে তার কলেজের গল্প শুনে আমিও সেই জীবনের কিছুটা স্বাদ পেতুম। চা খেতে-খেতে এইসব গল্প হত। তারপর দ্রুত পায়ে যে যার বন্ধু-মহলে চলে যেতুম।

ডালি রোজ অন্তত ঘণ্টা তিনেক গানের রেওয়াজ করত। তার উপরে ছিলেন তাঁর মাস্টারমশাইরা। সে তো ইশকুলে যায় না। তাই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্যে ভিন্ন-ভিন্ন মাস্টারমশাইয়ের ব্যবস্থা। বাড়িতে তাঁদের কাছে পড়ে সে পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। একটু ফুরসত পেলেই সে আমাদের কাছে আসতে চাইত, কিন্তু তক্ষুনি হয়ত একজন মাস্টারমশাই এসে পড়লেন, বাস্, সন্ধ্যাটা অমনি মাটি। কখনও ডালিকে নিয়ে, কখনও-বা তাকে না-নিয়েই আমরা শেঠীদের বাড়িতে যেতুম। নোংরা না-হওয়া পর্যন্ত পোশাক-টোশাক আমরা বিশেষ পালটাতুম না, কিন্তু শেঠীদের বাড়িতে অন্য রকম ব্যাপার, বিকেল হলেই ছেলেমেয়েরা সেখানে হাতমুখ ধুয়ে, পোশাক পালটে ফিটফাট। বড়রা ছোটদের চুল বেঁধে দেয়, ফ্রকে বোতাম লাগানো কি ওইরকমের খুঁটিনাটি নানা কাজে সাহায্য করে। ডালি কিংবা শেঠীদের বাড়িতে মাঝে-মাঝে এমন কোনও বন্ধু কিংবা আত্মীয় আসতেন, যাদের সঙ্গে গল্প করতে তাদের বিশেষ ভাল লাগত না। আমরা তখন তাদের বাড়ির থেকে পালিয়ে আসবার সুযোগ করে দিতুম। বাড়িতে না থাকলে কেউ তাদের ডেকে পাঠাত না। কিন্তু থাকলেই মুশকিল। তখন আর সেখান থেকে নড়বার উপায় নেই। এ-ব্যাপারে আমাদের বাড়িই ছিল তাদের পক্ষে সবচাইতে নিরাপদ আস্তানা। একে তো আমাদের বাড়িতে লোকজনের সমাগম খুব কমই ঘটে, তারপর বাবাও বড়-একটা বাড়িতে থাকেন না। হয় তিনি অফিসে, নয় ক্লাবে।

সামনের লনে বসে আমরা গল্প করতুম, কিংবা দল বেঁধে কোথাও বেড়াতে যেতুম। এর আগে আমাদের একলা কোথাও বেরুতে দেওয়া হত না। দিদি আর আমি একসঙ্গে কোথাও যাব, তাতেও বড়দের বিষম আপত্তি। সাধারণত একজন চাকরকে আমাদের সঙ্গে দেওয়া হত। আগ্রায় সেই প্রচলিত নিয়মের অবসান হল। কারণটা এই নয় যে, আমাদের বয়স ইতিমধ্যে বেড়েছে। কারণ অন্য। প্রথমত, দলে এখন অনেক মেয়ে।

দ্বিতীয়ত, শেঠীদের বাড়ির মেয়েরা অনেক স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। তাদের দৃষ্টান্ত দেখে আমাদেরও স্বাধীনতার পরিমাণ, বিনাবাক্যে, বাড়িয়ে দেওয়া হল। শেঠীদের বাড়ির মেয়েদের চালচলন এতই সরল আর সাদাসিধে যে, তাদের নিন্দা করবার উপায়ই কারও ছিল না। অন্যদিকে, সেই সময়কার মানের বিচারে, তারা বেশ আধুনিকও বটে। কামোজাই আর পিপো, দুজনেই গাড়ি চালাতে পারত। তিচ্চিও গাড়ি চালাতে শিখছিল। চাল মারবার জন্যে তারা গাড়ি চালাত না। নেহাত দরকার হলে তবেই চালাত। চলাফেরার ব্যাপারে স্বাধীনতা পেয়ে আমাদের খুব ভাল লাগছিল। আমাদের কাছে এই স্বাধীনতাটুকুর মূল্য তখন অনেক। একটা নিয়ম অবশ্য মেনে চলতে হত। সেটা এই যে, রাত আটটার মধ্যেই বাড়ি ফিরতে হবে। মাঝে-মাঝে অবশ্য সেটা সম্ভব হয়ে উঠত না। গল্পগুজবে এতই মশগুল হয়ে পড়তুম, কিংবা বেড়াতে-বেড়াতে এত দূরে চলে যেতুম যে, বাড়ি ফিরতে দেরি হত। বাড়িতে সেদিন অশান্তি ঘটতই। তাতে বিরক্ত বোধ করতুম ঠিকই, কিন্তু বিদ্রোহ করতুম না। তার কারণ, সদ্য তখন স্বাধীন হয়েছি।

*   *   *

একদিন আমাদের মধ্যে কী একটা বিষয় নিয়ে তুমুল তর্ক বেধে যায়। পিপো যখন আর তর্কে এঁটে উঠতে পারছে না, তখন হঠাৎ বলে বসল, "কিন্তু বাবুজী তো এই কথাই বলেন।"

উত্তরে আমি বললুম, "বা রে, বাবুজীরও তো ভুল হতে পারে।"

কথাটা যে তার বাবার প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাবার জন্যে বলেছিলুম, তা নয়। পিপো কিন্তু ব্যাপারটাকে সেইভাবেই নিল। তার বিশ্বাস, কথাটা বলে আমি ঘোর অন্যায় করেছি। তার বাবা-মা, বিশেষত বাবা, যে আদৌ কোনও ব্যাপারে ভুল করতে পারেন, এমন কথা কখনও তার কল্পনায় ছিল না। ভুলের সম্ভাবনাটা তার কাছে এতই অভিনব ও চমকপ্রদ যে, সে তো মহা চিন্তায় পড়ে গেল।

অথচ এমন নয় যে, শেঠীরা নেহাতই সর্বপ্রকার সংস্কারে সায়-দিয়ে-চলা মানুষ। বরং তার উল্টোটাই সত্যি। সনাতন নানা সামাজিক রীতিনীতি তাঁরা মেনে চলতেন না, সেদিক থেকে তাঁদের বিদ্রোহীই বলতে হয়। তাঁদের সমাজের প্রচলিত রীতি এই যে, বাড়ির বউদের সর্বদা ঘোমটা দিয়ে থাকতে হবে, বাড়ির বাইরে যাওয়া চলবে না, প্রকাশ্যে কখনও স্বামীর কাছে যাওয়াও তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। এইরকমের আরও হাজার গণ্ডা বিধিনিষেধ।। কিন্তু শেঠীরা তো সে-সব বিধিনিষেধ মেনে চলেননি। বস্তুত মানবেন না বলেই তো নিজেদের প্রদেশ রাজস্থান ছেড়ে তাঁরা যুক্তপ্রদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছেন। নিজের জায়গার তুলনায় অন্য জায়গায় যে রীতি অমান্য করা অনেক সহজ, তা কে না জানে। তাঁদের ন'টি সন্তানের মধ্যে সাতটিই মেয়ে। স্বাধীন পরিবেশের মধ্যে তাদের তাঁরা মানুষ করে তুলছেন; সর্বরকমের সংস্কার থেকে তাদের মুক্ত থাকতে শিখিয়েছেন। তাদের বাবা সর্বদা বলেন যে, কোনওকিছুকেই বিনাবাক্যে মেনে নেওয়া উচিত নয়। প্রত্যেকেরই চিন্তা করে দেখা উচিত, কোন্‌টা ভাল আর কোনটা মন্দ। বাপ-মায়ের উপরে নির্ভর না করে নিজস্ব চিন্তাশক্তির উপরে নির্ভর করে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো উচিত। অন্যের বিশ্বাস সম্পর্কে সহিষ্ণু হওয়া ভাল, কিন্তু তাই বলে অন্যের বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ঠিক নয়। তিনি এও বলতেন যে, কোনও ব্যাপারে যদি মেয়েদের সঙ্গে তাঁর মতে না মেলে তো তার জন্যে তিনি কিছু মনে করবেন না। বলতেন যে, মেয়েরা স্বাধীনভাবে সবকিছুকে ভেবে দেখছে, এইটে দেখলেই তিনি খুশী হবেন। কোন্‌টা তিনি ভাল মনে করেন, সেটা বলে দেওয়া তাঁর কর্তব্য বটে, কিন্তু মেয়েদের যে সে-কথা মানতেই হবে, এমন কোনও নৈতিক বাধ্যবাধকতা

তাদের নেই। কিন্তু বাবা এ-সব কথা বললে কী হয়, মেয়েরা তাঁর দ্বারা এতই প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল এবং বাবাকে তারা এতই শ্রদ্ধা করত যে, বাবাও যে ভুল করতে পারেন, এই সহজ কথাটাই কখনও তাদের মনে হয়নি। আমার কিন্তু এমন কোনও সংস্কার ছিল না। এমন কী, দিদি তো আমার মতো বেয়াড়া নয়, তা সেও কখনও এমন কথা ভাবত না যে, বাবা-মা'র পক্ষে কোনও ব্যাপারে কোনও ভুলচুক ঘটা একেবারে অসম্ভব একটা ব্যাপার।

ডালিদের বাড়ির শিক্ষার সঙ্গে অবশ্য না মিলত শেঠীদের, না মিলত আমাদের। সে আর-একটু সনাতনী আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিল। সে ভাবতে শিখেছিল যে, সন্তানের পক্ষে বাবা-মাকে বিচার করতে বসাটাই একটা মস্ত পাপ। নানা ব্যাপারে তার নিজস্ব ধ্যানধারণা থাকতে পারে, তাই বলে এমন কথা বলা উচিত নয় যে, বাবা-মা ভ্রান্ত। ও-সব কথা বলা একটা পাতকের ব্যাপার। আমাদের দলের মধ্যে, বস্তুত আমাদের বয়সী সমস্ত মেয়ের মধ্যে, একমাত্র সে-ই রোজ সকালে পুজার্চনা করত। কাজটা সে গোপনে করত না, সবাই জানত যে সে পুজার্চনা করে, কিন্তু কাজটা সে নিঃশব্দে করত, ঘটা করে কাউকে এ সম্পর্কে কিছু বলত না। ব্যাপারটা আগে আমি জানতুম না। এ যেন তার নেহাতই ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার। অনেকে যেমন ভোরে উঠে স্নান সেরে নেয়, এও যেন ঠিক তেমনি একটা নিজস্ব অভিরুচির ব্যাপার। ডালি তো এ সম্পর্কে আমাকে কখনও কিছু বলেনি, হঠাৎ একদিন ব্যাপারটা আমার চোখে পড়ে যায়। দেখে বিস্ময় বোধ করেছিলুম, কিন্তু একইসঙ্গে বুঝতে পেরেছিলুম যে, এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা কিংবা ডালিকে এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করা আমার উচিত হবে না।

ডালির সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব যতই নিবিড় হয়ে ওঠে, ততই তাঁর মাকে আরও ভাল করে জানবার সুযোগ পাই। এবং যতই তাঁকে জানতে থাকি, ততই যেন তাঁর নতুন-নতুন পরিচয় আমার কাছে উন্মোচিত হতে থাকে। বাইরে যিনি এত সরল, এত সাদাসিধে, ভিতরে তাঁর গুণের সীমা নেই। যত দেখি, ততই অবাক হই। পড়তে আর লিখতে তো তিনি জানেনই, ইংরেজীতে কথাও বলতে পারেন অনর্গল। বাংলা সাহিত্য তিনি ব্যাপকভাবে পড়েছেন, ইংরেজী সাহিত্যেও তাঁর পড়াশুনো নেহাত কম নয়। ডালি কী পড়বে, না পড়বে, সে-বিষয়ে তিনি কড়া নজর রাখতেন। ডালি কোনও বই পড়তে চাইলে মা-ই ঠিক করে দিতেন যে, সে-বই তার পড়া উচিত হবে কি না। ডালির বাবা তাঁর কাজকর্ম আর বন্ধুদের নিয়ে ব্যস্ত। এ-সব দিকে নজর রাখবার ফুরসত তাঁর ছিল না।

ডালির মা সর্বদা গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত থাকতেন। রান্নার জন্যে আলাদা একজন লোক ছিল ঠিকই, কিন্তু বেশির ভাগ রান্না মা নিজেই করতেন। বাবা ছিলেন অতিথিবৎসল মানুষ; বাড়িতে তাই অতিথির পাট লেগেই থাকত। কেউ যদি সকালে তাদের বাড়িতে দেখা করতে আসত, তো বাবা অমনি বলে বসতেন যে, দুপুরের খাওয়াটা সেরে যেতে হবে। বিকেলে কেউ দেখা করতে এলে রাত্তিরের খাওয়ার জন্য তাকে আটকে রাখতেন। এ নিয়ে তাঁর পীড়াপীড়ির অবধি ছিল না। কত যে লোক আসত ডালিদের বাড়িতে। কলকাতা থেকে আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবরা বেড়াতে এলেই তাদের বাড়িতে জায়গা হয়ে যেত। বন্ধুদের বন্ধুরাও কম আসত না। কলকাতা থেকে বাঙালী কেউ এলেই হল, ডালিদের বাড়ির দরজা তার জন্যে অবারিত। সকলেই সেখানে স্বাগত। সত্যি বলতে কী, বাঙালী সমাজের কাছে ওটা যেন একটা বিনা-পয়সার হোটেল-বাড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডালির বাবা অতি সজ্জন মানুষ, ব্যাপারটা তাঁর ভালই লাগত। তবে এক-এক সময় তিনিও আর পেরে উঠতেন না। কিন্তু তা

হলে কী হয়, কাউকে ফিরিয়ে দেওয়া তাঁর ধাতে নেই। তাঁর এই উদারতা আর অতিথি-বৎসলতার ঝক্কি পুরোপুরি মাকেই সামলাতে হত। অক্লান্তভাবে তিনি সকলের পরিচর্যা করতেন। আগ্রার বাজারে বাংলাদেশী মিষ্টি পাওয়া যেত, কিন্তু তাও তাঁর নিজের হাতে করা চাই, নইলে যে ততটা স্বাদু হবে না। অতিথিদের মধ্যে কেউ বা রাত্তিরে ভাতের বদলে লুচি খান, কারও বা দু'বেলাই ভাত চাই. ভাত না-খেলে তাঁদের মনে হয় যে, খাওয়াটা ঠিক হল না, কেমন যেন একটু খিদে-খিদে রয়ে গেল। তা এই সর্বদিকেই নজর রাখতে হত তাঁকে। সারাক্ষণই তিনি হে'সেলে বন্দী হয়ে থাকতেন। রাঁধুনী রয়েছে, কিন্তু তাতে কী, তরকারি কোটা. ময়দা ঠাসা. ভাজাভুজি করা, সবই আমি নিজের হাতে তাঁকে করতে দেখেছি। মৎস্য-রন্ধনে বঙ্গদেশ, বিশেষত পূর্ববঙ্গের খ্যাতির কথা তো সকলেই শুনেছেন। তা মা যে কত রকম মাছের পদ করতেন, তার লেখাজোখা নেই। মা ঢাকার মেয়ে। যখনই তাঁদের বাড়িতে বিশেষ কোনও পদ হত, তখনই তার বেশ খানিকটা অংশ আমার জন্যে তিনি পাঠিয়ে দিতেন।

বাড়ির সকলের পশমী জামা মা-ই বুনে দিতেন। সেলাই-ফোঁড়াই সবই করতেন নিজের হাতে। অথচ এত কাজ সত্ত্বেও তাঁর পড়বার সময়ের অভাব হত না। রোজকার খবরের কাগজ ছাড়াও বেশ কয়েকখানা সাময়িক পত্রিকা তিনি পড়তেন। ডালির পড়বার জন্যে বই বেছে দিতেন। এত খাটাখাটুনি, তবু মুখে সারাক্ষণ লাজুক মিষ্টি একটা হাসি যেন লেগেই আছে। ওই হাসিই সকলকে আপন করে কাছে টানত। আমাকেও টেনেছিল।

প্রায়ই ডালিদের বাড়িতে যেতুম তো, তাই বাংলা কথা অহরহ শুনতে পেতুম। ও-ভাষা বুঝবার জন্যে কোনও চেষ্টাচরিত্র আমাকে করতে হয়নি। বাংলা লিপি তো অনেকটা দেবনাগরী লিপির মতো; ডালিকে বলেছিলুম, ও যেন ওদের লিপিটা আমাকে শিখিয়ে দেয়।

সীমানার পাঁচিলের গা ঘেঁষে, ডালিদের বাড়িতে একটা গাছ ছিল। তার ডালপালার মধ্যে আমরা একটা বাক্স লুকিয়ে রেখেছিলুম। আমি আর ডালি তার মধ্যে চিঠি রেখে আসতুম। আমি চিঠি লিখতুম বাংলা অক্ষরে। ডালি কোন্ লিপিতে লিখত, মনে নেই। অন্যদের কাছে এই চিঠির ব্যাপারটা আমরা গোপন রেখেছিলুম। গাছটার কাছে গিয়ে, বাক্সের মধ্যে উঁকি মেরে আমরা দেখতুম, কোনও চিঠি আছে কিনা। বাল্যকালের সেই খেলার মধ্যে কী যে উত্তেজনা ছিল।

আমাদের বাড়ির আঙিনা অনেক বড়। কিন্তু তাতে বড় কোনও গাছ নেই। ডালিদের আঙিনায় কিন্তু বেশ কয়েকটা নিমগাছ ছিল। মাটির থেকে খানিকটা উপরেই তার ডালপালা বেরিয়েছে, তাই সহজেই চড়া যায়। ডালি অনেক সময় দেখতুম গাছের একটা উঁচু ডালে বসে বই পড়ছে। আমিও তার দেখাদেখি, চেয়ার-টেবিল ছেড়ে, গাছের একটা উঁচু ডালে বসে বই পড়তে শুরু করেছিলুম। সে ভারী মজার ব্যাপার। আমার মনঃসংযোগের শক্তি নিশ্চয় একটু বেশী পরিমাণেই ছিল। অন্তত পড়া যে বেশ ভালই এগোচ্ছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

* * *

নববর্ষ থেকে আমরা জোর পড়াশুনো শুরু করে দিই। আর দেরি নেই। সামনেই সকলের ফাইনাল পরীক্ষা। শুধু এক তিচ্চি বাদে।

রোজ ইশকুলে যেতুম। কিন্তু পড়াশুনোয় তাতে বিশেষ সাহায্য হত না। ভারতবর্ষের সব হাইস্কুলেই ইতিপূর্বে শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজী। কিন্তু দু' বছর আগে যুক্তপ্রদেশ

বোর্ড ইংরেজীকে ঐচ্ছিক করে দেন। অর্থাৎ ফাইনাল পরীক্ষা যেমন ইংরেজীতে, তেমনি হিন্দীতেও দেওয়া চলবে, যার যেমন অভিরুচি। আগ্রা আসবার আগে যাবতীয় বিষয় আমি হিন্দীতে শিখতুম। কিন্তু এখানে এই মিশন ইশকুলে সবকিছু পড়ানো হয় ইংরেজীর মাধ্যমে। ফলে হিন্দী ছেড়ে, মাত্র এক বছরের মধ্যেই আমাকে ইংরেজীতে সবকিছু রপ্ত করতে হবে। সে যে কী পরিশ্রমের ব্যাপার। তার উপরে আবার এই ইশকুলটাতে শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ছিল প্রযোজনের তুলনায় কম। তাই বিষয়-নির্বাচনে ছাত্রীদের কোনও স্বাধীনতা ছিল না। ইতিহাস আর ভূগোল শিক্ষার ব্যাপারে একটা অদ্ভুত নিয়ম সেখানে চালু ছিল। এ-বছরের ছাত্রীরা যদি ইতিহাসের পরীক্ষা দিল, তো পরের বছরের ছাত্রীরা দেবে ভূগোলের পরীক্ষা। আগ্রায় আসবার আগেই আমি ভূগোল নিয়েছিলুম; অথচ আগ্রায় এসে দেখি, সে-বছর সেখানে ইতিহাসে পরীক্ষা দেবার জন্যে ছাত্রীদের তৈরী করা হচ্ছে। ইশকুলে ভূগোল পড়ানো হয় না, তাই বাড়িতেই—গৃহশিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই—আমি ভূগোল নিয়ে তৈরী হতে লাগলুম। শুধু কি তাই? ক্লাসে পড়ানো হয় গার্হস্থ্য বিজ্ঞান; অথচ গোড়াতেই আমি সংস্কৃত নিয়ে বসে আছি। এখন তো আর বিষয় পালটানো সম্ভব নয়, পালটাবার ইচ্ছেও আমার ছিল না। আমাকে সংস্কৃত শেখবার জন্যে এক পণ্ডিতজীকে জোগাড় করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর স্ত্রী হঠাৎ মারা গেলেন। তিনিও সেই যে তাঁর গ্রামের বাড়িতে চলে গেলেন, আর ফিরলেন না। তখন আর-একজন শিক্ষক জোগাড় করা হল, কিন্তু তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন। শেষ দু' মাস বাড়িতে কোনও শিক্ষকই আমার ছিল না। বাড়িতে বসে নিজের চেষ্টায় ভূগোল আর সংস্কৃত শিখতে লাগলুম। ইশকুলে হিন্দী শিক্ষার মানও ছিল খুব নিচু। কী জানি কেন, এই মিশনারী ইশকুলগুলি ছাত্রদের সর্বদা হিন্দীর বদলে উর্দু নিতে উৎসাহিত করত। আমাদের ক্লাসে ছাত্রী-সংখ্যা মোট পঁয়তিরিশ। তার মধ্যে আমি ছাড়া আর মাত্র একটি মেয়ে হিন্দী পড়ত। সমস্যা দেখা দিল ইংরেজীর বেলাতেও। আগের ইশকুলে যে-সব পাঠ্য বই পড়েছি, এখানে তা পড়ানো হয় না, অন্য-সব পাঠ্য বই পড়ানো হয়, যতদূর মনে পড়ছে, সমস্যাটা ছিল এই রকমের। শেষ বিচারে দেখা যাবে, একমাত্র অঙ্ক ছাড়া আর-কিছুই আমি এই ইশকুলে শিখতুম না, অন্য সব বিষয় বাড়িতেই পড়ে নিতে হত।

তাতে আমার ক্ষতি হয়নি। হতে পারে, এই অসুবিধেগুলিকে আমি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিলুম। কিংবা এমনও সম্ভব যে, অন্যদের তুলনায় নিজেকে আমি বেশী মেধাবী ভাবতুম। হেতুটা যাই হোক, মাধ্যমের পরিবর্তন ইত্যাদি যে-সব অসুবিধে তখন দেখা দিয়েছিল, তাতে আমি আদৌ মুষড়ে পড়িনি। বরং তাতেই যেন আমার জেদ আরও বেড়ে গেল। এলাহাবাদের শিক্ষা-জীবনের শেষ-বছরে ছাত্রী হিসেবে আমার ভারসাম্য যেন আমি হারিয়ে ফেলেছিলুম। আগ্রায় তা আবার ফিরে পাওয়া গেল।

ডালিও ভূগোল নিয়ে পড়ছিল। অনেক সময় আমরা একসঙ্গে পড়তুম। তবে, ইউ-পি বোর্ডের পরীক্ষা সে দিচ্ছিল না। তার কারণ হয়ত এই যে, ইউ-পি বোর্ড যে-সব বিষয় নিয়ে তখন পরীক্ষা দেওয়া অনুমোদন করত, সংগীত তার অন্যতম নয়। ডালি তাই ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে তার বাবার সঙ্গে বারাণসী চলে গেল, সেখান থেকে সে পরীক্ষা দেবে। এমন সব বিষয় নিয়ে সে পরীক্ষা দিচ্ছিল যে, বিভিন্ন পরীক্ষার মাঝখানে বেশ কয়েক দিন ধরে ফাঁক পড়ে যাচ্ছিল; দেখা গেল যে, মাসখানেকেরও বেশী সময় তাকে আগ্রা ছেড়ে থাকতে হবে। তাঁর বাবার পক্ষে তো আর অতদিন বারাণসীতে থাকা সম্ভব নয়, তাই উপায়ান্তর না দেখে ডালিকে তিনি বারাণসীতে তাঁদের এক বন্ধুর আশ্রয়ে রেখে খুব বিষণ্ণ চিত্তে আগ্রায় ফিরে এলেন। ডালির মায়ের কাছে শুনেছি, মেয়েকে ছেড়ে দূরে থাকবার কষ্ট সহ্য না করতে পেরে তিনি কেঁদে

ফেলেছিলেন। শুনে তো আমি হতবাক্। আমার বাবাকে তো কখনো কাঁদতে দেখিনি। কাঁদার অধিকার তো শুধুই মেয়েদের। পুরুষরা কি কাঁদে নাকি? তাও ডালি তো আর চিরদিনের জন্যে চলে যাচ্ছে না, মাত্রই হপ্তা কয়েক অন্য জায়গায় থাকবে। মেয়েকে মাত্র সেই ক' সপ্তাহের জন্য দেখতে না পাওয়ার কষ্টে যে কেউ কাঁদতে পারে, তা আমি ভাবতে পারিনি। ডালিকে ছেড়ে থাকতে অবশ্য আমারও খুব কষ্ট হত। যাই হোক, আমাকে সংস্কৃত শেখাবার জন্যে ইতিমধ্যে নতুন আর-একজন 'পণ্ডিতজী'কে জোগাড় করা হয়েছিল। সংস্কৃতে তখন আমি ভীষণ কাঁচা। পন্ডিতজী তো ব্যাপার দেখে মুষড়ে পড়লেন। আমি কিন্তু আদৌ হতাশ হইনি। আমার মনোবলে কিছুমাত্র ঘাটতি ছিল না। জানতুম যে, শেষ পর্যন্ত ঠিকই শিখে নিতে পারব।

পরীক্ষার আগে কিছুদিনের ছুটি পাওয়া যায়। প্রস্তুতির ছুটি। সেইসময় আমাদের ক্লাস-টীচার একদিন ক্লাসের সমস্ত মেয়েকে চড়ুইভাতি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। রেণুকা বলে একটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে পড়ত। মিষ্টি স্বভাবের সুন্দরী মেয়ে। নরম ঢেউ-খেলানো চুল, হাসিটি দিলখোলা। আমার খুব ইচ্ছে হত যে, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করি। দেখে মনে হত, অন্য মেয়েদের থেকে সে একটু আলাদা। বেশ মার্জিত রুচির মেয়ে। ইতিমধ্যে এই একটা ব্যাপার আমি বুঝে নিয়েছিলুম যে, ভাল ঘরের মানুষরা যখন খ্রীষ্টান হয়, তখন তাদের নামটা সাধারণত পালটায় না, খ্রীষ্টান হলেও তাদের ভারতীয় নামটাই বহাল থাকে। নিম্নশ্রেণীর লোকেদের নাম সেক্ষেত্রে খ্রীষ্টান হলেই পালটে যায়। ভারতীয় নামের বদলে তাদের তখন বিলিতী এক-একটা নাম জুটে যায়। রেণুকারাও খ্রীষ্টান। কিন্তু ধর্ম পালটালেও তাদের নাম যে পালটায়নি, এইটে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে, সে ভাল ঘরের মেয়ে। সেই চড়ুইভাতির আসরেই প্রথম তার সঙ্গে ভাল করে আলাপ হল। শুনে অবাক হলুম যে, ইশকুলটার উপরে সেও খুব বিরক্ত। সেখানকার পরিবেশ তার পছন্দ নয়। বিশেষ করে বোর্ডিং-বাড়ির পরিবেশকে সে একটুও পছন্দ করে না।

হাইস্কুল থেকে যারা চলে যাচ্ছে, তাদের জন্য বিদায়-সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়েছিল। সকলেই বিষণ্ণ, সকলেই সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। আমি বিশেষ বিষণ্ণ বোধ করছিলুম না; এমন কাউকে দেখছিলুম না, যার কাছ থেকে বেদনার্ত চিত্তে বিদায় নিতে পারি। এলাহাবাদে থাকতে আমার প্রতি অন্য মেয়েদের উদাসীনতায় দুঃখিত বোধ করতুম; কিন্তু এখানে আর সেই দুঃখ আমি পাইনি। কেননা, উদাসীন এখন আমিও। পরস্পরকে চুমু খেয়ে বিদায় নেবার প্রথায় অবশ্য একটু অস্বস্তি বোধ করছিলুম। ব্যাপারটায় আমি এতই অনভ্যস্ত যে, এমন কী, সৌজন্যমূলক একটা প্রথা হিসেবেও অন্যের দিকে গাল বাড়িয়ে এগিয়ে দিতে আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল।

* * *

পরীক্ষার পরে সবাই মিলে নৈনীতালে ছুটি কাটাতে গেলুম। আমার এক কাকা তখন সদ্য এম. এস-সি. পরীক্ষা দিয়েছেন। তিনিও নৈনীতালে এসেছিলেন। এম. এস-সি তে তাঁর বিষয় ছিল বটানি অর্থাৎ উদ্ভিদ-বিজ্ঞান। পড়াশুনোর সুবিধের জন্যে তিনি এলাহাবাদেই থেকে গিয়েছিলেন। এবারে নৈনীতালে তাঁকে পেয়ে সবাই খুব খুশী। আমাকে আর দিদিকে তো আর একা-একা কোথাও যেতে দেওয়া হত না। কিন্তু কাকা এসে পড়ায় আমাদের খুব সুবিধে হয়ে গেল। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমরা মনের আনন্দে বেড়াতুম, পাহাড়ে উঠতুম, চড়ুইভাতি করতে যেতুম।

ব্রিজ খেলার সঙ্গী পান না, বাবার তাই মহা দুঃখ। সঙ্গী হবার জন্যে অগত্যা মাঝেমধ্যে আমাদেরই ডাক পড়ত। ব্রিজ খেলতে আমার ভাল লাগত। বড়দের খেলা

খেলছি, এইটে ভাবতেই বেশ উত্তেজনা বোধ করতুম। বাবার এই একটা বদভ্যাস ছিল যে, খেলায় ভুলত্রুটি ঘটলে শুধু সেটার সমালোচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না, তাই নিয়ে ভীষণ চেঁচামেচি লাগিয়ে দিতেন ও দারুণভাবে বকাবকি করতেন। সেটা যে তাঁর বন্ধু কিংবা সহকর্মীদের বেলায় করতেন না, তাও নয়। তবে বন্ধু আর সহকর্মীরা তো বাবার চেঁচামেচির উত্তরে পাল্টা চেঁচাতে পারতেন, আমরা সেটা পারতুম না। এই কারণে বাবার সঙ্গে খেলতে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করতুম। অস্বস্তি বোধ করতেন কাকাও। ব্রিজ খেলার ডাক পড়লেই তিনি বাড়ি থেকে নিঃশব্দে সরে পড়তেন। ফলে মা, দিদি আর আমাকে গিয়ে বাবার সঙ্গে ব্রিজ খেলতে বসতে হত।

ব্রিজ খেলায় আমি নিতান্ত অপটু নই। বছর তিন-চার আগেই বাবা এই খেলাটা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। খেলার নিয়ম-কানুন আমি জানতুম, মোটামুটি ভালই খেলতুম, কিন্তু প্র্যাকটিস করবার অবকাশ তো বিশেষ হত না, তাই মাঝেমধ্যে ভুলত্রুটি ঘটে যেত। একদিন তো আমরা চারজনে এসে খেলছি। কে যে সেদিন আমার পার্টনার হয়েছিলেন, মনে নেই। তবে বাবা নন। হয় মা, নয়তো দিদি। একবার তো আমি গ্র্যান্ড স্ল্যাম বিড করে বসলুম। চমৎকার হাত পেয়েছিলুম, ডামির হাতও খারাপ নয়, ঠিকমত খেলতে পারলে তেরোটা পিঠ করে নেওয়া মোটেই শক্ত হ'ত না। করে নিতে পারতুমও। ডামির হাতে সাত-তাসের একটা লম্বা স্যুট ছিল, তার মধ্যে একবার ঢুকে পড়লেই সাতটা পিঠ তুলে নেওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা এই যে, ডামির হাতে ঢুকে পড়বার রাস্তা মাত্র একটি। খেলতে গিয়ে ভুল করলুম, ফলে খেলাটা করে নেবার সুযোগ আমার হাতছাড়া হয়ে গেল, এবং সুযোগটা প্রতিপক্ষের হাতে চলে যাবার পরে ডামির হাতে ঢুকবার কোনও উপায়ই আমার রইল না। ভুলটা আমি তন্মুহূর্তেই বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নেই, পড়ে-পড়ে আমাকে মার খেতে হল। খেলা শেষ হবার আগেই বাবা ওদিকে তুমুল চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন; বলছেন, কী মারাত্মক ভুল করেছি আমি। কিন্তু ভুলটা এতই প্রকট যে, চিৎকার করে সেটাকে বুঝিয়ে বলবার কোনও দরকারই ছিল না। আমার মনের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। গ্র্যান্ড স্ল্যাম করবার সুবর্ণসুযোগ আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে, ভুল করে আমি নিজেই তখন অনুতপ্ত। তার উপরে আবার বাবা যখন আমাকে বকাবকি করতে শুরু করলেন, তখন আর আমি নিজেকে সামলাতে পারলুম না। বললুম যে, যে-ভুল করেছি, তার মাশুল যখন আমাকেই দিতে হচ্ছে, তাঁর তো তখন এত চেঁচামেচি করবার দরকার নেই। তিনি তো আমার পার্টনারও নন, তাহলে তিনি আমাকে বকছেন কেন? আমার এই কথায় যেন আগুনে ঘি পড়ল, বাবা একেবারে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। আগের চেয়েও চড়া গলায় তিনি চেঁচাতে লাগলেন। সেবারে আমার তাস বাঁটবার পালা। তাসগুলোকে গুছিয়ে নিয়ে শাফল করতে শুরু করেছি, বাবা ওদিকে সমানে চেঁচাচ্ছেন। চেঁচিয়ে বললেন, হারজিতের কথা হচ্ছে না, ব্রিজটা যাতে নির্ভুলভাবে খেলতে শিখি, তারই জন্যে আমার ভুলটা তিনি ধরিয়ে দিচ্ছেন, আমি তো একেবারে নির্বোধের মতো খেলেছি। আর সহ্য করতে পারলুম না। শাফল করতে-করতেই হঠাৎ তাসজোড়াকে তুলে নিয়ে বাবার মুখের উপরে ছুঁড়ে মারলুম। নিমেষে লাল হয়ে গেল বাবার মুখ। টেবিল ছেড়ে তক্ষুনি তিনি উঠে পড়লেন। যাবার আগে বলে গেলেন, আর কখনো তিনি আমার সঙ্গে ব্রিজ খেলবেন না।

নিজের আচরণে আমি নিজেই তখন স্তম্ভিত। পাথরের মতো আমরা তিনজন টেবিলে বসে রইলুম। অনেকক্ষণ। কারও মুখে কথা নেই। হঠাৎ একটা উত্তেজনার বশে বাবাকে আঘাত করেছি, এমন বললে ব্যাপারটার ঠিক ব্যাখ্যা হয় না। আসলে

যেন যন্ত্রচালিতের মতো কাজটা আমি করেছিলুম। কী যে করছি, তা বুঝবার মতো মানসিক অবস্থাই আমার ছিল না। যতই ক্রুদ্ধ কিংবা উত্তেজিত হই, বাবাকে আঘাত করব, এটা আমার কল্পনার বহির্ভূত ব্যাপার। পরে এর জন্য ভীষণ অনুতপ্ত বোধ করেছি, শুধু এইটুকু বললে প্রায় কিছুই বলা হয় না। নিজের আচরণে এতই বিমূঢ় বোধ করেছিলুম যে, লজ্জায় কয়েকটা দিন আমি মাথাই তুলতে পারিনি। আনুষ্ঠানিক-ভাবে ক্ষমা চাইতেও সাহস হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, সেটাও যেন একটা ধৃষ্টতার ব্যাপার হবে। মাও বললেন, থাক, তার দরকার নেই। বাড়ির মধ্যেই আমরা ঘুরিফিরি; এমন একটা ভাব দেখাই যেন কিছুই ঘটেনি। বাবা আর আমি যখন মুখোমুখি হই, তখন দুজনেই সচেতন থাকি যেন আমাদের কথাবার্তায় কোনও আড়ষ্টতার চিহ্ন না ফোটে।

চোখের সামনে বরফে-ঢাকে শিখরমালা। রোদ্দুরে সেই শিখরগুলি ঝলমল করে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে আমার খুব-একটা টান নেই। কিন্তু এ-দৃশ্য এতই অসামান্য যে, আমার মনেও তার মহিমার ছোঁয়া লাগে, সারাক্ষণ অভিভূত বোধ করি। নির্মেঘ নীল আকাশ, উজ্জ্বল সূর্য আর বরফে-ঢাকা ঢেউ-খেলানো পাহাড়—আশ্চর্য এই সম্ভার দিয়ে রানীখেত আমাদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানাল। পাঁচ বছরে এমন দৃশ্য একবার দেখবার সৌভাগ্য ঘটে কি না-ঘটে। রানীখেতের শোভা আমাদের মুগ্ধ করেছিল; ঠিক করা হল, আরও কয়েকটা দিন সেখানে থাকা হবে। তবে আধুনিক জীবনের যে-সব উপকরণে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম, রানীখেতে সে-সব ছিল না। অনেক কাল বাদে আবার কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালা হল। পুরনো নানা অসুবিধের কথা কত সহজেই আমরা ভুলে যাই। ভুলে যাই যে, প্রথম যখন সাজাহানপুরে গিয়েছিলুম, সেখানেও তখন বিজলি-বাতি ছিল না। বারাণসীর যে-অঞ্চলে আমরা থাকতুম, সেখানেও না। মাত্র বছর পাঁচেক আগেও তো কেরোসিনের লণ্ঠন না-জ্বেলে আমাদের উপায় ছিল না; অথচ এরই মধ্যে সে-সব দিনের কথা আমরা ভুলেছি; মনে হচ্ছে, এ এক নতুন ব্যাপার। নতুনত্বের মোহ অবশ্য শিগগিরই কেটে গেল। বিছানায় শুয়ে রাত জেগে বাবা বই পড়েন। এ তাঁর অনেক দিনের অভ্যাস। কেরোসিনের আলোয় তাঁর পড়ার অসুবিধে হতে লাগল। তার উপরে আবার বাথরুমে ফ্লাশ নেই, সেও এক মস্ত অসুবিধে। রানীখেত থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে তাই আমরা আলমোরায় চলে এলুম।

আলমোরার প্রসঙ্গ উঠলেই আমার রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে যায়। ছবিটি অবিস্মরণীয়। চাকা-লাগানো চেয়ারে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ, আর তাঁর দুই চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ সেদিন সর্বসমক্ষেই কাঁদছিলেন; চোখের জলকে গোপন করবার কিংবা তাকে মুছে ফেলবার কোনও চেষ্টাই তিনি করছিলেন না। দীর্ঘ অসুখের পরে তখন তিনি একটু-একটু করে সুস্থ-সবল হয়ে উঠছেন। সেই মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে আলমোরার অধিবাসীরা এক সভার আয়োজন করেছিলেন। আমরা সেই সভায় গিয়েছিলুম। সেখানে হিন্দী কবি সুমিত্রানন্দন পন্থকেও দেখা গেল। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ঢেউ-খেলানো চুল, সুমিত্রানন্দনের চেহারা একটু মেয়েলী ধরনের। মানপত্রটি তিনিই পাঠ করলেন। একে তো তিনি খুব উঁচু-গলায় পড়ছিলেন, তার উপরে আবার তাঁর ভাষাও একটু বেশী-রকমের জমকালো আর কাব্যিক, গোটা ব্যাপারটাকেই তাই বড় কৃত্রিম ঠেকছিল; গুরুদেবের প্রতি সর্বজনের চিত্তে যে একটা গভীর ভালবাসা আর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে, তার আভাস তাতে একটুও ফুটে উঠল না। বছর চোদ্দ বয়সের একটি ছেলে গান গাইল। রবীন্দ্রনাথেরই গান, ছেলেটি গাইলও বড় সুন্দর। সুমিত্রানন্দন পন্থের তরফে যে ত্রুটি ঘটে গিয়েছিল, ছেলেটির গানের মাধ্যমে যেন তার ক্ষতিপূরণ হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ বাংলায় বক্তৃতা দিলেন। কী রাজসিক তাঁর চেহারা! ঢলে পোশাক পরেছিলেন। বড্ড দুর্বল দেখাচ্ছিল। বস্তুত দাঁড়িয়ে বলবেন, এমন শক্তি তখন তাঁর ছিল না। তা না-ই থাক, দেখলুম যে তাঁর কণ্ঠ তখনও সমান সতেজ, তার থেকে এক আশ্চর্য আবেগ যেন উপচে পড়ছিল। তাঁর বয়স তখন ছিয়াত্তর বছর। বিশ্বমানবতার আদর্শের জন্য তিনি দীর্ঘদিন এক কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, সেই আদর্শকে মূর্ত করে তুলবার জন্যই শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর বিশ্বভারতী। কিন্তু তখন তাঁর মনে হচ্ছিল যে, তাঁর আদর্শ যেন ধুলোয় ধসে পড়ছে। ইউরোপের আকাশে ঘনিয়ে উঠছে মহাযুদ্ধের কালোমেঘ, শান্তি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির লক্ষ্য ক্রমে আবছা হয়ে যাচ্ছে। অশুভ সেই লক্ষণ দেখে তিনি যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন, অসহায় বোধ করছিলেন। মানুষের উপরে বিশ্বাস হারাতে তিনি রাজী ছিলেন না; তখনও সেই বিশ্বাসকে তিনি আঁকড়ে ধরে ছিলেন। কিন্তু একইসঙ্গে যে ভিতরে-ভিতরে খুব দুঃখ পাচ্ছিলেন, তাও ঠিক। চাকা-লাগানো চেয়ারে তিনি বসে ছিলেন; আর তাঁর চোখ বেয়ে জল গড়াচ্ছিল।

সেদিনকার সেই সভাস্থলে কারও চোখই শুকনো ছিল না। সভা শেষ হল। সার বেঁধে সবাই এগিয়ে গেলেন তাঁকে দর্শন করতে; একে-একে সবাই তাঁকে প্রণাম করলেন। ব্যক্তিগত অনুভূতিকে প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে আমার ভাল লাগে না। কিন্তু সেই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে নিজেকে সেদিন ভীষণ দীন মনে হচ্ছিল। ভীষণ ইচ্ছে করছিল যে, ছুটে গিয়ে ওঁকে প্রণাম করি, ওঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।

* * *

আলমোরা থেকে বিনসার সাড়ে আঠারো মাইল পথ। সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে অবিরত আমাদের বোটানির তালিম নিতে হয়েছিল। কাকার এক বন্ধুও আমাদের সঙ্গে সেবারে বিনসার যাচ্ছিলেন। সদ্য তাঁরা দুজনে বোটানি নিয়ে এম.এস-সি পাশ করেছেন। পথের দুদিকে নানা রকম গাছপালা। কোন্‌টার কী নাম, তাই নিয়ে ক্রমাগত তাঁদের মধ্যে তর্ক আর বাজি-ধরাধরি চলতে লাগল। কিন্তু চূড়ান্ত রায় দিতে পারেন এমন কোনও বিচারক তো নেই, তাই তাঁদের তর্কের কোনও ফয়সলাও হচ্ছিল না। তাঁদের তর্ক আর আলোচনা শুনে আমার আর দিদির খুব মজা লাগছিল। পথ চলতে চলতে উদ্ভিদের পরিচয় আর জীবন সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান আহরণ করা গেল। হরেক রকমের উদ্ভিদের যে-সব বৈজ্ঞানিক নাম সেদিন শুনেছিলুম, আজ অবশ্য তার মধ্যে মাত্র একটা নামই আমার মনে আছে: "পাইনাস লঙ্গিফোলিয়া"। নামটা মনে থাকবার কারণ হয়ত এই যে, পথের অনেকটাই গিয়েছিল পাইন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। অনেক রকমের পাইন সেদিন দেখেছিলুম।

দলে আমরা ছ' জন। কিন্তু ঘোড়া নেওয়া হয়েছিল মোট তিনটে। ঠিক করা হয়েছিল যে, পালাক্রমে আমরা ঘোড়ায় চড়ব। পাহাড়িয়া টাট্টু। চড়বার জন্যে বিশেষ কোনও কায়দা-কৌশল জানতে হয় না, সহজেই বাগ মানানো যায়। কিন্তু একটু বাদেই ধরা পড়ল যে, তিনটের মধ্যে একটা হচ্ছে খচ্চর, এবং খচ্চরকে বাগ মানানো যে অতি কঠিন কর্ম, সেটাও চটপট বুঝতে পারা গেল। দিদি তো খচ্চরের পিঠ থেকে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল; বাহনও তাকে ফেলে দিয়েই হাওয়া। ভাগ্যক্রমে দিদির খুব-একটা মারাত্মক আঘাত লাগেনি। দিদির অবস্থা দেখে পুরুষরা সবাই জেদ ধরল যে, তারা খচ্চরের পিঠে উঠবে। কিন্তু, প্রত্যেকেই যদিও চেষ্টা করেছিল, একজনও তাকে বাগ মানাতে পারেনি, সকলকেই হার মানতে হল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, সবাই হেঁটে যাব। ঘোড়ার পাশাপাশি হেঁটেই আমরা বাকী পথটুকু পাড়ি দিলুম।

রানীখেতে যেক্ষেত্রে আধুনিক সুখ-সুবিধার কিঞ্চিৎ অভাব ছিল, বিনসারে সেক্ষেত্রে

আধুনিক জীবনের উপকরণ বলতে কিছুই ছিল না। ছোট্ট গ্রাম। তারই মধ্যে ব্রিটিশ অফিসাররা গোটা ছয়েক বাংলো-বাড়ি বানিয়েছিলেন, চারপাশের কুঁড়েঘরের মধ্যে সেই বাংলো ক'টি খুব প্রকট হয়ে চোখে পড়ে। গ্রামে দোকান বলতে মাত্র একটি। বিনসারে যা-কিছু লভ্য, তা ওই দোকানেই পাওয়া যায়। দোকানী লোকটিই গ্রামের মোড়ল। উপরন্তু সে একাধারে পোস্টমাস্টার ও পিওন। সপ্তাহে একবার আলমোরা গিয়ে চিঠিপত্র নিয়ে আসে। কিন্তু ঠিক কবে যাবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। নিজের সুবিধে অনুযায়ী যায়; ফলে ন-দশ দিনেও সপ্তাহ হয় বই কী।

বিনসারে তখন না ছিল ঝাড়ুদার, না ছিল ধোপা। ঝাড়ুদার কিংবা ধোপা ছাড়া যাদের চলে না, ও-সব তাদের আলমোরা থেকে আনিয়ে নিতে হয়। ময়লা-জামাকাপড় সপ্তাহে একবার আলমোরায় পাঠিয়ে কাচিয়ে আনা যায় বটে. কিন্তু ঝাড়ুদারের ব্যাপারে তো তেমন কোনও ব্যবস্থা হবার উপায় নেই।

কিন্তু তা হোক, এ-সব অসুবিধে সত্ত্বেও বলতেই হয় যে, বিনসার অতি সুন্দর জায়গা। আমরা যে-বাংলোটি ভাড়া করেছিলুম, তার মালিক সেনা-বিভাগের এক ইংরেজ অফিসার। শুনেছিলুম, তিনি দেশে গেছেন। ছুটি নিয়ে সাময়িকভাবে, না চিরতরে, তা অবশ্য জানতুম না। বাংলোর মধ্যে তাঁর নানা রকমের কিছু বই আর বিস্তর সাময়িকপত্র চোখে পড়ল। বাবা তো বই আঁর কাগজপত্র দেখে মহা খুশী; বাড়িতে ঢুকেই তিনি পড়তে বসে গেলেন। কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে অবাক হলুম। এত যে শ'য়ে-শ'য়ে সাময়িকপত্র রয়েছে, কোনওটারই কিন্তু দশ-বারো সংখ্যার বেশী নেই। এ-সব পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে উপন্যাস ছাপা হয়। কিন্তু কোনও পত্রিকারই যেহেতু বেশী সংখ্যা পাওয়া গেল না, তাই যে-উপন্যাসই পড়তে শুরু করি, খানিক বাদেই সেটা মধ্যপথে আটকে যায়, পরবর্তী সংখ্যার আর হদিশ মেলে না। বিরক্তিকর ব্যাপার। এ-যেন এমন একটা বই পড়তে বসা, যার বেশ-কিছু পৃষ্ঠা কেউ ছিঁড়ে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত একটা খেলা আমরা বার করলুম। পর্যায়ক্রমে আমাদের বলতে হবে যে, উপন্যাসটা কীভাবে শেষ হতে পারে। অর্থাৎ যেটুকু পাওয়া যাচ্ছে, তার পরের অংশটুকু বানিয়ে বানিয়ে বলতে হবে। দেখে অবাক হলুম, এ-ব্যাপারে একজনের পরিণতির সঙ্গে অন্যজনের পরিণতি বিন্দুমাত্র মেলে না। প্রত্যেকেরই চিন্তা একেবারে আলাদা।

ঘরের মধ্যে একটা লেখার টেবিল ছিল। তার টানার মধ্যে একদিন একটা বিচিত্র বস্তু আবিষ্কার করা গেল। দেখলুম, ইংরেজ যে অফিসারের বাড়িতে আমরা ছিলুম, অন্যকে লেখা প্রতিটি চিঠির তিনি একটা করে কার্বন-কপি রেখেছেন। সেই অনুলিপিগুলি পড়তে আমাদের বিবেকে বাধেনি। বাড়িটা আমাদের ভাড়া দিয়েছেন, অথচ টানায় একটা তালা পর্যন্ত লাগাননি, এদিকে টানার মধ্যে রাশি-রাশি চিঠিপত্র, এই অবস্থায় সেগুলি যদি পড়েই থাকি, তবে নিশ্চয় মস্ত কোনও অন্যায় করিনি। টানায় যদি তালা লাগানো থাকত, তাহলে নিশ্চয় তালা ভেঙে আমরা টানার মধ্যে উঁকি মারতুম না। সে যাই হোক, চিঠিপত্র পড়ে এইটে বোঝা গেল যে, ভদ্রলোকের বাবা আর মায়ের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে গেছে, এবং কারও প্রতি পক্ষপাত না দেখিয়ে অতি সতর্কভাবে দুজনের সঙ্গেই তিনি সম্পর্কটা ভাল রাখবার চেষ্টা করছেন। তখনও তাঁর আশা, বাবা আর মায়ের মধ্যে শেষপর্যন্ত একটা মিটমাট হয়ে যাবে। চিঠিগুলির মধ্যে গভীর একটা বেদনার ছাপ ছিল। ইংরেজ অফিসারটির জন্যে আমরা সত্যিই দুঃখ বোধ করেছিলুম।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বিনসারের উচ্চতা ৭,৯০০ ফুট। আকাশ নেহাত অপরিষ্কার না থাকলে হিমালয়ের অতি উঁচু কিছু শিখর সেখান থেকে দেখা যায়। যতদূর মনে

পড়ছে, পূর্ব-পাণ্ডালী, নন্দাকোট, ত্রিশূল আর নন্দাদেবী সেখান থেকে পরিষ্কার চোখে পড়ে। তখন অবশ্য নন্দাদেবীর সেই গৌরব ছিল না, কিন্তু দেশ বিভাগ হয়ে যাবার পরে সে-ই তো ভারতের সর্বোচ্চ শিখর। তার উচ্চতা ২৩,০০০ ফুটেরও বেশী। শিখরের শোভা দেখবার সবচাইতে ভাল সময় নাকি ভোরবেলা। একদিন তাই খুব ভোরে উঠে, বিনসারের সবচেয়ে উঁচু টিলার উপরে গিয়ে জড় হয়েছিলুম। সবে তখন পূর্বাকাশে সূর্যদেবের অরুণ আভা দেখা দিয়েছে। আকাশ নির্মেঘ, একটুও কুয়াশা নেই, দৃষ্টি একেবারে অবাধ। টিলার উপরে পাথুরে একটা স্তম্ভের উপরে একটা দূরবীন বাসানো। দূরবীন দিয়ে যে-সব শিখর দেখা যায়, স্তম্ভের গায়ে সেইসমস্ত শিখরের নাম খোদাই করা রয়েছে। দূরবীন দিয়ে কিছু দেখা ভারী মজার ব্যাপার। কিন্তু মজাটা আমি এক্ষেত্রে ঠিক উপভোগ করতে পারিনি। শিখর তো দেখব, কিন্তু কোন্‌টার কী নাম সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হব কী করে। যেটাকে দেখছি বলে ভাবছি, আসলে হয়ত আদৌ সেটাকে দেখছি না, দেখছি অন্য-কোনও শিখরকে।

সন্দেহ নেই, বিনসার থেকে হিমালয় পর্বতমালার শোভা অতি সুন্দর দেখা যায়। আমি কিন্তু একেবারে অন্য কারণে জায়গাটাকে ভালবেসেছিলুম। সেখানে আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল—না, তুষারমৌলি হিমালয়ের শোভা নয়, সেখানকার আপেল-বাগান। আপেল তখনও পাকেনি। তার স্বাদ তখনও অম্লমধুর। কাকা, দিদি আর আমি সেই বাগানের মধ্যে—সঙ্গে কিছুটা নুন নিয়ে—ঘুরে বেড়াতুম, আর আপেল ছিঁড়ে ছিঁড়ে নুন মাখিয়ে খেতুম। মালীকে ফাঁকি দিয়ে আপেল খাওয়া, সে ভারী উত্তেজনার ব্যাপার। দু'বার আমরা ধরা পড়ে যাই। কিন্তু চুরি করে আপেল খাচ্ছি, অথচ কেউ কিছু বলছে না, তার চাইতে ধরা পড়তেই যেন মজা লেগেছিল।

নৈনীতালের সেই ঘটনার পবে বাবা আর আমি, দুজনেই পরস্পরের সান্নিধ্যে কিছুটা অস্বস্তি বোধ কবতুম। বাবার তো খুব ব্রিজের নেশা, কিন্তু সেই ঘটনার পরে আর মুখ ফুটে এ-ব্যাপারে তিনি কিছু বলতেন না। আস্তে আস্তে, খুব কৌশলে, মা আবার আমাদের মধ্যে একটা মিলমিশ ক'রে দেন। কিন্তু তাতেই আবার মুশকিলে পড়ে গেলুম। কোথায় আপেল-বাগানে গিয়ে চুরি করে আপেল খাব, তা নয়, তাস খেলতে বোসো।

* * *

বিনসারে থাকতে এক মাতাজীব কথা শুনেছিলুম। আরও উঁচুতে তাঁর আশ্রম। খোঁজখবর করে বোঝা গেল যে, বাবার পরিচিত এক ভদ্রলোকের তিনি স্ত্রী। অনেক কাল আগে বাবা তাঁদের চিনতেন; কিন্তু পরে আর তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। বাবা যখন তাঁদের চিনতেন, এই ভদ্রমহিলা তখন নাকি দারুণ রকমের আধুনিকা ছিলেন; সমাজে যাঁদের 'মক্ষিরানী' বলা হয়, সেই রকমেরই এক মহিলা আর কী। সেই তিনিই সন্ন্যাসিনী হয়েছেন, এই খবর শুনে বাবা তো হতভম্ব। এমন কোন্ বিপর্যয় ঘটল যে, পারিবারিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি সন্ন্যাস নিলেন, ভেবে ভেবে বাবা আর কূলকিনারা পান না। শেষ পর্যন্ত যা জানা গেল, সে প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

কর্মসূত্রে এই ভদ্রমহিলার স্বামী নাকি একবার পারিতে গিয়েছিলেন। সেইসময়ে ইনিও তাঁর সঙ্গে যান। তা পারির রাস্তায় একদিন হাঁটছেন, এমন সময় ইউরোপীয় এক ভদ্রলোক মাঝপথে তাঁকে আটকে দিয়ে বললেন, তাঁকেই তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। শুনে ভদ্রমহিলা তো হতবাক্। কে এই ভদ্রলোক, বিশেষ করে তাঁকেই বা কেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিছুই তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা-ই বা সম্ভব হল কই। ভদ্রলোক যাকে বলে নাছোড়বান্দা।

ভদ্রমহিলার পিছু নিয়ে তিনি তাঁর হোটেলে এসে উঠলেন। তাঁকে বললেন যে, পূর্বজন্মে তিনি তাঁর মা ছিলেন, এবং একটা বিশেষ লক্ষ্যসাধনের জন্যই আবার তিনি ধরাধামে জন্ম নিয়েছেন। ভদ্রমহিলা তাঁর কথার প্রতিবাদ করেছিলেন; অনেক করে তাঁকে বলেছিলেন যে, কোনও লক্ষ্যসাধনের তাড়নাই তাঁর নেই; এমন কী, এও বলেছিলেন যে, পুনর্জন্মে তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু অচেনা সেই মানুষটি তবু তাঁকে ছাড়লেন না। একেবারে জোঁকের মতন তিনি তাঁর সঙ্গে লেগে রইলেন। বস্তুত, ভদ্রমহিলা যখন দেশে ফিরলেন, তখন তাঁর পিছু নিয়ে সেই ভদ্রলোক এ-দেশে এসে উপস্থিত। শেষ পর্যন্ত যে ভদ্রমহিলাকে কী করে তিনি বোঝাতে পারলেন যে, সত্যিই একটা লক্ষ্য-সাধনের জন্যে তিনি জন্ম নিয়েছেন, এবং কী করেই বা তাঁকে সংসার-জীবন থেকে ছাড়িয়ে আনলেন, তা অবশ্য জানা গেল না। তবে যেটুকু জানলুম, তাই কি কিছু কম বিস্ময়কর? এমন অদ্ভুত গল্প এর আগে আর কখনও শুনিনি। গল্পটা সত্যি কিনা, তা বুঝবার কোনও উপায় অবশ্য ছিল না। যাই হোক, কৌতূহলের বশে একদিন তো আমরা তাঁর আশ্রমে গিয়ে হাজির হলুম।

আশ্রম বলতে গুটি দুই কুটীর। সেখানে যেতে এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। দীর্ঘদেহ পুরুষ, মাথার চুল সোনালী। পরনে গেরুয়া কাপড়। তাতে তাঁর নীল দুটি চক্ষু যেন আরও দীপ্তি পেয়েছে। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। এমন সুপুরুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। পৌরুষের সঙ্গে মিশেছে আধ্যাত্মিকতা; এই মিশ্রণের জন্যেই যেন তাঁকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। হাত জোড় করে তিনি আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। বিনম্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের আসবার উদ্দেশ্য কী। পরে জেনেছিলুম যে, এই বিদেশী ভদ্রলোক ইতিপূর্বে বেশ কয়েক বছর বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। মাতাজীর সান্নিধ্যে আসবার পর তিনি চাকরি ছেড়ে দেন; বছর দুয়েক আগে এই আশ্রমে এসে তিনি যোগ দিয়েছেন।

বুঝতে পারলুম না, এই ভদ্রমহিলার প্রতি এত লোক এইভাবে আকৃষ্ট হয় কেন। শীর্ণ দুর্বল রুখু-রুখু চেহারা; এঁর অতীত-জীবন তো নেহাত মামুলী ছিল না; কিন্তু এখনকার এই চেহারা দেখে সেই অতীতের আন্দাজ পাবার কোনও উপায় নেই। বাবা তাঁকে তাঁদের পুরনো পরিচয়ের কথা মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কে জানে, হয়ত সেই কারণেই নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিলেন ভদ্রমহিলা। চুপচাপ বাবার কথা তিনি শুনে গেলেন, এ সম্পর্কে কোনও মন্তব্যই করলেন না। ঐহিক কিংবা পারত্রিক, কোনও ব্যাপারই তাঁকে দিয়ে কিছু বলানো গেল না। তাঁকে দেখে আর-একজন মাতাজীর কথা মনে পড়ল আমার। আলমোরায় তাঁর আশ্রমে আমরা গিয়েছিলুম। যেমন যুক্তপ্রদেশে, তেমনি তার বাইরেও তাঁর খ্যাতির কথা তখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। মায়ের ইচ্ছে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। আমার কোনও কাজ ছিল না, তাই আমিও তাঁর সঙ্গ নিলুম। তা ছাড়া লোকমুখে শুনেছিলুম যে, তিনি নাকি দারুণ রূপসী। তা দেখলুম যে, কথাটা মোটেই মিথ্যে নয়। তাঁর হাসি শুধু ঠোঁটেই লেগে থাকে না, সারা মুখে ছড়িয়ে যায়। কোনও রকমের প্রসাধন-দ্রব্য ব্যবহার করেননি, তবু তাঁর ঠোঁট দুটি দেখলুম গোলাপের মতো লাল, গায়ের রঙ যেন ফেটে পড়ছে। তাঁর বয়স তখন তিরিশের কোঠায় ব্যক্তিত্ব যেন চুম্বকের মতো সবাইকে কাছে টানে, কথা বলবার ভঙ্গিটিও ভারী মধুর। খুব সহজে, শান্তভাবে নানান বিষয়ে তিনি কথা বলছিলেন। নম্র কণ্ঠস্বর। চুপ করে সবাই তাঁর কথা শুনছিল। মনে হচ্ছিল, সবাইকে যেন তিনি সম্মোহিত করে রেখেছেন। আমার সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন, তাতেই তাঁকে আমার আরও ভাল লেগেছিল।

বাবা তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁর বড় মেয়েটি খুব শান্ত আর লক্ষ্মী, সব ব্যাপারেই

তার মনোযোগ খুব ঐকান্তিক। তারপর আমার দিকে আঙুল তুলে বললেন যে, এই ছোট মেয়েটি তার একেবারে উল্টো। ভারী ছটফটে, সারাক্ষণ শুধু খেলে বেড়ায়। একে নিয়ে কী করা যায় বলুন তো? শুনে আনন্দময়ী মা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্ত গলায় বললেন যে, সকলের প্রকৃতি সমান হয় না। কোনও দুটি মানুষই একেবারে একরকম নয়; জোর করে তাদের একরকম করা হবে, এটাও একটা অসম্ভব ব্যাপার। শুধু অসম্ভব নয়, অন্যায়ও বটে। ভিন্ন ভিন্ন মানুষকে একই ছাঁচে ফেলে এক করে দেবার কোনও অর্থ হয় না। প্রত্যেকেরই একটা নিজস্ব প্রবণতা রয়েছে, সেই প্রবণতা অনুযায়ী তাকে বেড়ে উঠতে দেওয়া চাই। দিদিকে দেখিয়ে বললেন, "ও যদি একটু ভারিক্কি প্রকৃতির হয় তো হোক। সেটাই ওর পক্ষে ভাল। আর ও (অর্থাৎ আমি) যদি হয় ফুর্তিবাজ আর ছটফটে, তবে তাই হোক না। ও যা, ও তা-ই, জোর করে ওকে অন্য-কিছু বানাবার দরকার নেই।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "খুব খেলবি, খুব খাবি আর খুব পড়বি।"

তাঁকেও দেখেছিলুম। এঁকেও দেখলুম। তাঁর সঙ্গে এঁর তুলনা হয় না। হতাশ হয়ে আমরা ফিরে এলুম। বুঝতে পারলুম না, ঘর-সংসার থেকে ছাড়িয়ে এনে এঁকে যিনি 'মাতাজী' করেছেন, ইউরোপীয় সেই ভদ্রলোকটি এখন কোথায়। এঁর স্বামীর কথাও ভাবতে লাগলুম। তিনি এখন কোথায় থাকেন? স্ত্রীর এই রূপান্তরকে তিনি কীভাবে নিয়েছেন?

* * *

জুন মাস শেষ হয়ে আসছে। ভিতরে-ভিতরে আমরা একটু অস্থির হয়ে উঠেছিলুম। পরীক্ষার ফল তো এতদিনে বেরিয়ে যাবার কথা। বিনসারের সেই মানুষটি, একইসঙ্গে যে কিনা পোস্ট-মাস্টার আর পিওন, যখনই তাকে জিজ্ঞেস করি, আমাদের নামে কোনও চিঠিপত্র আছে কিনা, সে বলে যে, না, নেই। শুনে কেমন যেন সন্দেহ হত। মনে হত যে, চিঠিপত্র আনবার জন্যে লোকটা হয়ত ইতিমধ্যে আদৌ আলমোরায় যায়নি। শেষ পর্যন্ত আমরাই একজনকে আলমোরায় পাঠিয়ে অধৈর্য হয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

অনেকগুলো চিঠি নিয়ে সে ফিরে এল। চিঠির তারিখ দেখে বোঝা গেল, বেশ কিছুদিন ধরে সেগুলি আলমোরায় পড়ে ছিল। সব চিঠিরই এক সুর। তবে দাদার চিঠিতেই সেই সুরটা সবচেয়ে প্রকট হয়ে ফুটেছে। তিনি লিখেছেন যে, কমলা যে এবারে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে, এতে তিনি খুব দুঃখিত। আর ঊর্মিলা? ঊর্মিলার সম্পর্কে তিনি ভেবেছিলেন বটে যে, সেও পাশ করে যাবে, তবে সেও যে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করবে, তা তিনি ভাবতে পারেননি, তাই খুব বিস্মিত হয়েছেন। হাইস্কুলের পরীক্ষায় দিদি প্রথম বিভাগে পাশ করেছিল। দুটো বিষয়ে লেটার পেয়েছিল। বৃত্তি পেয়েছিল। পরের পরীক্ষায় সে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করল। দিদির পক্ষে এটা যে খুবই অসম্মানজনক ব্যাপার, তাতে আর সন্দেহ কী। তার জন্যে খুব দুঃখ বোধ করেছিলুম আমি। তবে ভিতরে-ভিতরে একটু খুশীও যেন হয়েছিলুম। মনে হয়েছিল, যাক্, শেষ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আর কোনও ব্যবধান রইল না, দুজনেই এবারে তুল্যমূল্য হয়েছি।

ঠিক হল যে, ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে দিয়ে বিনসার থেকে আমরা হেঁটেই ফিরব। মাঝখানে এসে ঘোড়াওয়ালারা হঠাৎ খুব হৈ-হল্লা জুড়ে দিল। তারপরেই দেখি, বড় রাস্তা ছেড়ে একটা সরু পথের দিকে তারা দৌড় লাগিয়েছে। ব্যাপার কী, ভাল করে সেটা বুঝে উঠবার আগেই নামল বৃষ্টি। তুমুল বৃষ্টি। একেবারে আকস্মিক

ব্যাপার! বিনসার থেকে যখন রওনা হই, আকাশে তখন একটুও মেঘ ছিল না; অথচ মাঝপথে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। শুধু কি বৃষ্টি? তার সঙ্গে এমন জোরো হাওয়া বইতে লাগল যে, ভয় হল, হাওয়ার ঝাপটায় আমরা উড়ে না যাই। সঙ্গের লোকেরা কাছাকাছি একটা বাংলোয় আমাদের নিয়ে গেল, আপাতত সেখানেই আশ্রয় নিতে হবে। তাদেরই কাছে শুনলুম, জায়গাটার নাম খালি। আরও কী-সব তারা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় আমাদের কথাবার্তা শুনে বাংলোর মালিক ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন, এবং বাইরে আমরা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে আমাদের ভিতরে গিয়ে বসতে বললেন। বাবা একটু ইতস্তত করছিলেন। হঠাৎ তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই মানুষটি রঞ্জিত পণ্ডিত। শুভেচ্ছা বিনিময় হল। আমরা ভিতরে গিয়ে বসলুম। বেশীক্ষণ বসতে হয়নি। মিনিট কুড়ির মধ্যেই ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল। যেমন অকস্মাৎ বৃষ্টি নেমেছিল, তেমনি অকস্মাৎ আকাশ আবার সেই আগের মতই ফর্সা। আমরাও আবার যাত্রার তোড়জোড় করতে লাগলুম। গৃহকর্তা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে, অন্তত চা-টা যেন আমরা খেয়ে যাই, কিন্তু আমরা আর অপেক্ষা করলুম না। সূর্যাস্তের আগে আলমোরা পৌঁছতে হবে, তাই বৃষ্টি থামতেই ফের পথে বেরিয়ে পড়লুম।

বিনসারের উচ্চতা, আগেই বলেছি, প্রায় ৮,০০০ ফুট। তারপরেই খাড়া উৎরাই। বিনসারের তুলনায় খালি অনেক নীচে। তারপরে আবার চড়াই ভাঙতে-ভাঙতে আলমোরায় পৌঁছতে হয়। আলমোরার উচ্চতা হল ৫,৬০০ ফুট। দুটো উঁচু জায়গার মধ্যখানে অবস্থান হবার দরুন খালিতে জল পাওয়া একটা সমস্যা। রঞ্জিত পণ্ডিত হালে সেখানে জায়গা-জমি কিনেছিলেন। ইঞ্জিনীয়ারিং কৌশল খাটিয়ে তিনি চেষ্টা করছিলেন যাতে সেখানে জল পাওয়া যায়। কৌশলটা তিনি ব্যাখ্যা করে বাবাকে বোঝাচ্ছিলেন। আমার অবশ্য সেদিকে কান ছিল না। অবাক হয়ে আমি ঝড়বৃষ্টির তাণ্ডব দেখছিলুম।

বড় রাস্তায় পৌঁছে দেখি, বাবা খুব উত্তেজিত। আমি তো হতভম্ব। রঞ্জিত পণ্ডিতকে আমার বেশ ভালই লেগেছিল। অতি সুদর্শন মানুষ। তার উপরে নম্র, ভদ্র, অতিথিবৎসল। বাবা কিন্তু চটে লাল। "আমাকে উনি ভাবেন কী? আমি কি একটা চার বছরের বাচ্চা? কী ভাবে জল আনবেন, সাত কাহন করে তার ফিরিস্তি দেওয়া হচ্ছিল, এক কথাই বারবার করে বলা হচ্ছিল! সবাইকে উনি অত বোকা ভাবেন কেন?" বাবাকে এর আগে অন্যদের সম্পর্কে এমন তীব্রভাবে মতপ্রকাশ করতে দেখিনি। সেদিন তাই খুব বিস্ময়বোধ করেছিলুম।

* * *

এর আগে আর কখনও এমনভাবে জুলাই মাসের প্রতীক্ষায় থাকিনি। জুলাইয়ে কলেজে ভর্তি হব। ভাবতেই তো উত্তেজনা। তার উপরে আবার ছেলেরা আর মেয়েরা একই কলেজে পড়ে। অর্থাৎ জীবন এবারে আরও মুক্ত হবে, দিগন্ত হবে আরও প্রসারিত। এখন থেকে উচ্চতর শিক্ষা-জীবনের সূচনা। আরও ভাল লাগছিল এই কথা ভেবে যে, এখন থেকে ডালিও আমার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়বে। এতদিন তো ব্যাগের মধ্যে বইখাতা বোঝাই করে ইশকুলে যেতুম; সেই ব্যাগটাকে এবারে বিদায় দিলুম। হাইস্কুল পরীক্ষায় পাশ করেছি, সেইজন্যে বাবা আমাকে একটা পার্কার কলম কিনে দিয়েছেন। শুধু চটি খাতা আর সেই কলমটা নিয়ে আমি কলেজে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলুম। আজ আমার কলেজ-জীবনের প্রথম দিন।

খুব সাদাসিধে পোশাক পরেছি। কলেজে রওনা হব, এমন সময় ইশারা করে দিদিমা আমাকে ডাকলেন। বললেন, "মানব-জীবনে জ্ঞানই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ।" বললেন, জ্ঞানকে সম্মান করা চাই, জ্ঞানার্জনের জন্য কঠিন পরিশ্রম করা চাই।

জ্ঞানার্জনের জন্য যদি কারও কাছে নিচু হতে হয়, তবে তাতে কুণ্ঠিত হওয়া চলবে না, নিচুই সেক্ষেত্রে হতে হবে। "ছেলেদের সঙ্গে একই কলেজে তুমি পড়তে যাচ্ছ। তাতে কোনও দোষ নেই। শুধু মনে রেখো যে, অন্য কোনও কারণে নয়, শুধু শিক্ষা লাভের জন্যেই ছেলেদের কলেজে তোমাকে পাঠানো হচ্ছে, তাকেই তোমার একমাত্র লক্ষ্য বলে জেনো। আর-একটা কথা। কোনও ছেলের সঙ্গেই কখনও হাসি-বিনিময় করো না, বাস্, তাহলেই দেখবে যে, সব ঠিক আছে। ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন।"

এতই আন্তরিক ও ঐকান্তিকভাবে দিদিমা এই কথাগুলি বলেছিলেন যে, এ নিয়ে তাঁকে পরিহাস করতে পারিনি। তা ছাড়া দিদিমা ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার খুবই পক্ষপাতী। সেইজন্যে তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধাও করতুম। বাড়ির মেয়ে ছেলেদের কলেজে পড়তে যাচ্ছে, তবু তাতে আপত্তি নেই, দিদিমার বয়সী প্রবীণদের মধ্যে সেকালে এতটা ঔদার্য খুব কমই দেখা যেত। সহশিক্ষার ব্যাপারে তখনকার মনোভাবকে যে-রকম প্রাঞ্জলভাবে তিনি ব্যক্ত করলেন, তাতেই বরং আমি বিস্ময় মেনেছিলুম। আমাদের সমাজে পুরুষদের কখনও দূরে ঠেলে রাখা হয়নি। তবে, বলা বাহুল্য, স্বাধীনভাবে যে-সব পুরুষদের সঙ্গে আমরা মিশতে পারতুম, তাঁরা আমাদেরই আত্মজন কাকা কিংবা ভাই কিংবা জ্ঞাতি-ভাই। তাঁদের বাদ দিলে দেখা যাবে যে, অনাত্মীয় পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার কোনও অবকাশই আমাদের ঘটত না। আগ্রায় আমাকে ছেলেদের কলেজে পড়তে দেওয়া হয়েছিল, তার কারণ, মেয়েদের জন্যে আলাদা কোনও কলেজ সেখানে ছিল না। এ যেন আমার উপরে একটা বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপার। যেন প্রচ্ছন্নভাবে আমাকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, তুমি পড়তে চাও, তাই পড়বার সুযোগ তোমাকে দেওয়া হল, কিন্তু দেখো, যে-সব ছেলের সান্নিধ্যে তোমাকে আসতে হবে, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে যেও না। এই শর্ত। কোনও ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করলে, কিংবা এমনকী, ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতালেও ধরে নেওয়া হবে যে, অলিখিত এই শর্তটা আমি ভঙ্গ করেছি, আমার উপরে ন্যস্ত আস্থার মর্যাদা আমি রাখতে পারিনি। শর্তের ব্যাপারটা যে আমি বুঝতুম না, এমন নয়। তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার, মানসিক কিংবা নৈতিক, কোনও কারণই আমার ছিল না।

রেভারেন্ড সুলির কথা মনে পড়ে। গভীর নীল চোখ, কালো দীর্ঘ শ্মশ্রু। এমন চেহারা যে, দেখলেই শ্রদ্ধা হয়। ধীর কণ্ঠস্বরে, আগ্রহভরে তিনি পড়াতেন। চালচলন শান্ত, নম্র। কোমল অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাঁর ক্লাসে কখনও গণ্ডগোল হত না। দীর্ঘদিন ধরে তিনি সেণ্ট জন'স কলেজের অধ্যক্ষ। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে কেউ কখনও তাঁকে গলা চড়িয়ে কথা বলতে শোনেনি।

নবাগতদের স্বাগত জানিয়ে তিনি একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, কলেজে ঢুকবার পরে আর কেউ অল্পবয়সী ছেলে কিংবা মেয়ে নয়, তারা তখন তরুণ তরুণী। অধ্যাপকেরা তাদের সেই চোখেই দেখবেন, এবং তারা নিজেরাও যেন নিজেদের সেই চোখেই দেখতে শেখে। বাস্, ছিলুম একটা পুঁচকে মেয়ে, রেভারেণ্ড সুলির কল্যাণে তক্ষুনি আমি তরুণী হয়ে গেলুম।

আমার বয়স তখন পনরও নয়। চারদিকে রাশি-রাশি মুখ। সেই মুখগুলি আমি দেখছিলুম। আমার চোখে কিছুমাত্র ভয় কিংবা সংকোচ ছিল না। ছিল শুধু কৌতূহল। আমি যে মেয়ে, এই চিন্তা আমাকে আড়ষ্ট করেনি। আমার আচরণ স্বচ্ছন্দ, কোনও কাপট্য তাতে ছিল না। বরাবরই আমি একটু দামাল স্বভাবের মেয়ে, ছেলেদের ভিড়ের মধ্যেও তাই আমার কোনও অস্বস্তি হয়নি। আমার কৌতূহল ছিল; কিন্তু নারী আর পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারটা নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামাবার মতো ধাতই আমার

ছিল না। নারী আর পুরুষের সমান সুযোগ-সুবিধে পাওয়া দরকার, এই দাবির কথা আমি অনেক শুনেছি; কিন্তু তাতে আমি নারীমুক্তি-আন্দোলনের একজন জঙ্গী সমর্থক হয়ে উঠিনি, শুধু বুঝতে শিখেছি যে, নারী আর পুরুষের মধ্যে বস্তুত কোনও পার্থক্য নেই। এই বিশ্বাস আমাকে এতটাই আচ্ছন্ন করেছিল যে, 'সেক্স' বলে যে একটা ব্যাপার রয়েছে, নিজের কিংবা অন্যদের বেলায় তার অস্তিত্বটাই আমি স্বীকার করতুম না। একটা অলীক বিশ্বাস আমাকে পেয়ে বসেছিল, সেই বিশ্বাসটাকে আমি আমার সহপাঠীদের উপরেও আরোপ করেছিলুম। আমি ধরেই নিয়েছিলুম যে, এ-ব্যাপারে আর-সকলের ভাবনাও একেবারে আমারই মতো।

ডোরিস আর ভেরাও সেন্ট জন'স কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তবে ডোরিস ছিল বিজ্ঞানের ছাত্রী। একটা আলাদা বাড়িতে তাদের পড়ানো হত। আমরা যে-বাড়িতে পড়তুম, তার থেকে সেটা একটু দূরে। ফলে তার সঙ্গে প্রায় দেখাই হত না। বাবা চাইতেন, বাড়িতে কেউ-একজন ডাক্তার হোক। এই কারণেই ইন্টারমিডিয়েট পড়বার সময় আমার কাকার অন্যতম বিষয় ছিল জীববিজ্ঞান। কিন্তু ডাক্তারি পড়তে হলে খুব খাটতে হয় তো, সেই খাটুনির ভয়ে ও-দিকে তিনি আর গেলেনই না, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে এম. এস-সি পাশ করলেন। আর দিদি যে কোনও বৃত্তি নিয়ে অর্থোপার্জন করবে, এটা কারও কল্পনায় ছিল না, তাই বাবাও কখনও এমন কথা বলেননি যে, সে ডাক্তারি পড়ুক। দিদি তো আর প্র্যাকটিস করবে না, তবে আর ডাক্তারি পড়ে লাভ কী। বাকী রইলুম আমি। ইতিপূর্বে আমি কাকাকে একটা ব্যাঙ কাটতে দেখেছিলুম। কাটছিলেন, আর সব বুঝিয়ে বলছিলেন। দেখে যে আমি কৌতূহল বোধ করিনি, তা নয়। কিন্তু অন্যে ব্যাঙ কাটছে, এটা দেখা এক জিনিস, আর নিজে একটা নোংরা প্রাণীকে হাতে নিয়ে তার মধ্যে ছুঁচ ফোঁটানো আর-এক জিনিস। ব্যাঙ কাটবার দরকার না-হলে অ্যান্দিনে আমি ডাক্তারি করে বেড়াতুম। যাই হোক্, ডাক্তারি যখন পড়ব না, তখন জীববিজ্ঞান নেবারও কোনও অর্থ হয় না। তাই বলে যে বিজ্ঞানেই আমার অরুচি, তা কিন্তু নয়। ইচ্ছে ছিল, অংক নিয়ে আমি বিজ্ঞান পড়ব। বিষয় হিসেবে অংকের তখন খুব সম্মান। তা ছাড়া, দিদি পড়েছিল অংক নিয়ে, আমারও তাই অংক নেবার ইচ্ছে। বাবা কিন্তু সে-কথায় কানই দিলেন না। আমার বিদ্যাবুদ্ধিতে কোনও আস্থাই তাঁর ছিল না। তাঁর কথা, হয় আমাকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি আর বায়োলজি নিয়ে বিজ্ঞান পড়তে হবে, নয়ত আদৌ বিজ্ঞান পড়া চলবে না। অগত্যা আমাকে আর্টস পড়তে হল। বিষয় নিলুম অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান আর হিন্দী। তা ছাড়া ইংরেজী তো পড়তেই হবে। পৌরবিজ্ঞান পড়তে আমার খুব আগ্রহ। তার কারণ, ডালির বাবা ওটা পড়ান। বলতে কী, আমার দিদি তো আগ্রা কলেজের ছাত্রী, তাই সেখানে ভর্তি হলে সেটাই হত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু আগ্রা কলেজে আমি গেলুম না। ডালির বাবার কাছে পৌরবিজ্ঞান পড়ব বলে সেন্ট জন'স কলেজে এসে ভর্তি হলুম।

* * *

নিজে সবকিছু ভেবে দ্যাখো! কোনও-কিছুকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ কোরো না! ভাবো! ভাবো! ভাবো! ডালির বাবা চোখ বুঁজে পড়াতেন। মনে হত, ধ্যানস্থ অবস্থায় তিনি কথা বলছেন। শুধু কথাই তিনি বলতেন না; হাতের এক-একটি মুদ্রার সাহায্যেও যেন নতুন-নতুন বিষয় আর বক্তব্যকে তিনি ফুটিয়ে তুলতেন। নাগরিকতা বলতে কী বোঝায়, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কী, নাগরিকতা সংক্রান্ত ধারণা কীভাবে প্রসারিত হয়ে যায়, এবং গোটা মানব-সংসার কীভাবে তার পরিধির মধ্যে চলে আসে—কত কথাই যে তিনি বলতেন।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র—এ-সব কথা তো আগেও কত বলেছি, শুনেছি। শুনে শুনে বিরক্তিকর ঠেকত। শব্দগুলিকে নেহাতই মামুলী মনে হত। কিন্তু কস্তাপচা সেই শব্দগুলিই এবারে যেন নতুন অর্থ, নতুন তাৎপর্য নিয়ে ফুটে উঠতে লাগল। কার কী ব্যাখ্যা, শুনলুম। জানলুম, কার কী বৈশিষ্ট্য। শুনতে-শুনতে, জানতে-জানতে মনে হতে লাগল যেন আমার চোখের সামনে একটা নতুন জগৎ উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে। বড় সুন্দর, বড় বর্ণাঢ্য সেই জগৎ। অথচ তার অস্তিত্ব আগে আমার কল্পনাতেও ছিল না। যেন চিন্তা আর আদর্শের এক আশ্চর্য চাবিকাঠি আমার হাতের মুঠোয় আমি পেয়ে গেলুম।

"আমরা যখন অর্থনীতি পড়ি, বস্তুত তখন দৈনন্দিন কর্মজীবনের মধ্যে মানুষকেই আমরা বিচার করে দেখি।" বিত্তের পটভূমিকায় এ আসলে মানুষেরই আলোচনা; মানুষ কীভাবে বিত্ত উৎপাদন করে, এবং তাকে ভোগই বা করে কীভাবে..

কে যেন একদিন বলেছিল, "পাত্র আসলে একটি হাঁদারাম।" শুনে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। তক্ষুনি আমি অধ্যাপক পাত্রের সমর্থনে কোমর বেঁধে কথা বলতে লেগে যাই। অধ্যাপক পাত্র আমাদের অর্থনীতি পড়াতেন। আমার কাছে তিনিই ছিলেন মূর্ত জ্ঞান। বিত্ত, উৎপাদন, ভূমি, শ্রম, মূলধন আর সংগঠনের রহস্য কী, সে তো তাঁরই কাছে আমি জেনেছিলুম। রিকার্ডোর থিওরি অব রেণ্ট, ফিজিওক্র্যাটের আয়রন ল অব ওয়েজেস, ল অব ডিমিনিশিং রিটার্নস, রিলেশন অব ডিমাণ্ড অ্যাণ্ড সাপ্লাই—এ-সব তো তিনিই আমাদের বুঝিয়ে বলেছেন। অধ্যাপক পাত্রই তো আমার মনের মধ্যে নতুন সেই চিন্তা-পদ্ধতিকে জাগিয়ে দিয়েছেন, আগে যার সম্পর্কে কোনও ধারণাই আমার ছিল না, অথচ এখন যা আমার দৈনন্দিন চেতনারই একটা অংশ। আমার বিশ্বাস আর মূল্যবোধ যে পালটে গেছে, তার মূলে তো আর কেউ নন, ডালির বাবা আর অধ্যাপক পাত্র।

পণ্ডিতজী আমাদের হিন্দী পড়াতেন। তিনি বলতেন যে, শুধু ভাষা শিখলেই হবে না। আমরা তো আর হাইস্কুলের ছাত্রী নই, শুধু ভাষাজ্ঞান এখন যথেষ্ট নয়, সাহিত্যবোধও থাকা চাই। সমালোচনার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলতে হবে। কার সঙ্গে কার মিল আর অমিল, সব বুঝতে হবে। সাহিত্যের মূল্যনিরূপণ করতে হবে। তাকে বিচার করে দেখতে হবে। তার জন্য চিন্তাভাবনা করা চাই। পড়ো আর ভাবো, ভাবো আর পড়ো।

অধ্যাপক আভ্রি বলতেন, পুঁথিপড়া বিদ্যে দিয়ে কাজ হয় না, প্রতিটি সমস্যাকে একেবারে আমূল বিচার করে দেখতে হবে। "যতক্ষণ না অন্যদের একটা বিষয় ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারছ, ততক্ষণ জানবে যে, তোমরা নিজেও সেটা বোঝোনি। ছুটির পরে বাড়িতে ফিরে সবচেয়ে অজ্ঞ আর নিরক্ষর লোকটিকে—এই ধরো তোমাদের চৌকিদার কি জমাদারকে—পাকড়াও করবে, তারপরে ক্লাসে যা শিখেছ সেটা তাকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করবে। যদি তাকে বোঝাতে পারো, একমাত্র তবেই জানবে যে, তুমি নিজেও বুঝেছ।" বাগাড়ম্বরের অভ্যাস থেকে মুক্ত হও, তোতাপাখির মতো কতকগুলি বাঁধাবুলি আওড়াবে না, ব্যাপারটাকে নিজে ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করো, সমস্যার একেবারে ভিতরে তাকাও, বইয়ের মধ্যে তার সমাধান না খুঁজে নিজেই সেটা বুঝে নাও। ভাবো! ভাবো! ভাবো! প্রতিটি অধ্যাপকই দেখছি নিজের চিন্তাশক্তির উপরে নির্ভর করবার উপদেশ দেন। এ কি নেহাতই একটা কাকতালীয় ব্যাপার? নাকি এর একটা বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে? উপদেশটা কি গোটা ক্লাসকেই তাঁরা দেন? নাকি দেন শুধু আমাকেই? মন দিয়ে তাঁদের কথা আমি শুনতুম। অন্যেরা শুনত কিনা, জানি না।

অধ্যাপক আন্ডি আমাদের নিয়মিত খবরের কাগজ পড়তে বলতেন। এ সময়কার কথা বলছি, অনেক ছাত্রের বাড়িতেই তখন খবরের কাগজ রাখা হত না। যাঁরা খুব সচ্ছল নন, তাঁদের কাছে খবরের কাগজ ছিল একটা বিলাসিতার ব্যাপার। যা কিনা পরিত্যাজ্য।

অধ্যাপক আন্ডি একদিন বলেছিলেন যে, পরদিন কোনও ছাত্র যদি খবরের কাগজ না পড়ে কলেজে আসে, তাহলে তাকে তাঁর ক্লাসে তিনি ঢুকতে দেবেন না। পরদিন তিনি ক্লাসে এসে বললেন, যারা খবরের কাগজ পড়ে এসেছ, তারা হাত তোলো। আমি অমনি সবচেয়ে উঁচুতে আমার হাত তুলে ধরলুম।

দেখে সহাস্যে তিনি বললেন, "কী পড়েছ?"

একটুও ঘাবড়ে না গিয়ে, গম্ভীর গলায় বললুম, "বিজ্ঞাপন পড়েছি সার্।" বলতে এমন কী, আমার চোখের পাতাও এতটুকু কাঁপল না। তাই শুনে তিনিও খুব গম্ভীর গলায় বললেন, "কিসের বিজ্ঞাপন? পাত্রপাত্রীর বুঝি?" গোটা ক্লাস তো হেসে খুন।

কদাচিৎ-কখনো এইরকমের হাসিঠাট্টা হত। অর্থাৎ নিয়ম নয়, এটা ব্যতিক্রম।

মাভিস ছিল এম.এ. ফাইনালের ছাত্রী। সেন্ট জন'স্ কলেজের সবচেয়ে পুরনো ছাত্রীদের সে একজন। স্বভাবতই তাকে নিয়ে সকলের খুব কৌতূহল ছিল, ঠাট্টা করে ছেলেরা অনেক সময় তাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করত। মাঝেমাঝে সেটা যে মাত্রা ছাড়িয়ে যেত না, তাও নয়। মাভিস বলত, "আমি যেন একটা কিওরিঁওর মতন বস্তু, সর্বক্ষণের জন্যে তাকের উপরে আমাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।" ছেলেরা সবসময়ে তার পিছু নিত, তাকে খেপিয়ে দেবার চেষ্টা করত। কিন্তু মাভিস খুব তেজী মেয়ে। তার রসবোধও ছিল। ঠাট্টায় সে রেগে যেত না, বরং ছেলেদের উপরে পাল্টা চাল চেলে শোধ তুলত।

ফাইনাল ইয়ারের ছাত্রছাত্রীরা এই কলেজে অনেক সময় নিচু ক্লাসের ছাত্রদের টিউটোরিয়াল ক্লাস নিত। এটা অনেক দিনের রীতি, এবং এতে দু' পক্ষেরই লাভ হত। উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরা যেমন এতে করে কিছু টাকা পেয়ে যেত, তেমনি পড়ানোর একটা অভিজ্ঞতাও হত তাদের; অন্যদিকে, কলেজ-কর্তৃপক্ষকেও বাড়তি অধ্যাপক নিয়োগ করতে হত না। আমাদের ক্লাসের ছাত্রীদের ইংরেজী টিউটোরিয়ালের ভার পড়েছিল মাভিসের উপরে। ডোরিসেরই সে বড় বোন; তাই আমার সঙ্গে খুব শিগগিরই তার বেশ ভাবসাব হয়ে যায়। তার কাছে অনেক গল্প শোনা যেত। ছেলেদের দুষ্টুমির গল্প। মাভিস যখন প্রথম এই কলেজে ভর্তি হয়, তখন ছেলেরা কীভাবে তার পিছনে লাগত, সেই গল্প সে খুব মজা করে বলত।

ক্লাসের মধ্যে মেয়েরা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে বসত। ছেলেদের থেকে বেশ-কিছুটা দূরে, ডায়াসের এক পাশে, তাদের বসবার জায়গা। তা একদিন হয়েছে কী, মাভিস যেখানে বসে, ছেলেরা সেইখানে একটা পেরেক বিঁধিয়ে রেখে গেছে। মাভিস সেটা জানত না। সে এসে রোজকার মতন সেখানে বসতেই পেরেকটা তার কাপড় ফুঁড়ে শরীরের মধ্যে বিঁধে গেল। সেদিন একেবারে খেপে গিয়েছিল মাভিস। ব্ল্যাকবোর্ডের কাছেই ছিল একটা ডাস্টার। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিল সে। তারপর, ছেলেদের মধ্যে যে কিনা সবচেয়ে গলা ফাটিয়ে হাসছিল, সজোরে সেটাকে তার দিকে ছুঁড়ে মারল। ছেলেদের আর-একটা দুষ্টুমির গল্পও মাভিসের কাছে শুনলুম। মাভিসের সাইকেলের সেফ্‌টি ভাল্‌ভ তারা প্রায়ই সরিয়ে ফেলত। তার ফলে কলেজ থেকে হেঁটে তাকে বাড়ি ফিরতে হত। এক-আধদিনের ব্যাপার তো নয়, মাঝেমাঝেই এই রকম দুষ্টুমি করত তারা। মাভিস তো অতিষ্ঠ। শেষপর্যন্ত সে করল কী, পিরিয়ড শেষ হবার মিনিট কয়েক আগেই একদিন ক্লাস থেকে সে বেরিয়ে এল।

হাতে একটা মস্তবড় গুনছুঁচ। সাইকেল-স্ট্যান্ডে ছেলেদের সাইকেলগুলি সারি-সারি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। সেইখানে গিয়ে ছুঁচ ফুটিয়ে প্রতিটি সাইকেলের টায়ার সে পাংচার করে দিল। ঘণ্টা বাজল। ছেলেরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু মাভিস তাদের দিকে একবার হাত নেড়েই সেখান থেকে হাওয়া। ছেলেরা সেদিন বুঝতে পেরেছিল যে, দুষ্টুমিতে মাভিসও কম যায় না। তারপর থেকে আর তাকে তারা ঘাঁটায়নি।

মাভিসদের সময়ে আর-একটা দুষ্টুমি খুব চালু ছিল। প্রেমপত্র পাঠানো। এই ব্যাপারটা আমাদের সময়েও দেখেছি। নেহাতই নির্দোষ ব্যাপার, কিন্তু আমাদের বয়স তখন খুব অল্প তো, তাই এতে বিরক্তি আর উদ্বেগ বোধ করতুম। একটু-একটু শিহরণ যে জাগত না, তাও নয়।

ডালি আর আমি, দুজনেই তখন অল্প-অল্প করে মাথায় বেড়ে উঠছি। অন্যদের তুলনায় তখনও আমরা দৈর্ঘ্যে অনেক খাটো, দেখতে একেবারে সমতল, আমাদের শরীর তখনও ভরাট, পুরন্ত হয়ে ওঠেনি। তার উপরে আমার চুল আবার বব্ করে ছাঁটা, তাও বেশ ছোটো করে। আমার চুল তখন কানের লতির নীচে নামত না। দেখতে ছিলুম প্রায় ছেলেদেরই মতো। অর্থাৎ যৌন আবেদন বলতে যা বোঝায়, আমার তা বিশেষ ছিল না। তা সেটা ছিল না বলে, উপরন্তু আমি একটু হাসিখুশী ছিলুম বলে, অন্য মেয়েদের তুলনায় আমার সঙ্গে ছেলেরা অনেক সহজে মিশতে পারত। আমার ক্ষেত্রে তো আর ভয়ের কোনও হেতু নেই, তাই ছেলেরা কিছুমাত্র আড়ষ্ট বোধ করত না।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী ছিল বাসন্তী। বয়সে সবচেয়ে ছোট হলে কী হয়, তার শরীর এরই মধ্যে ভরাট হয়ে উঠেছে। ফর্সা রঙ, লম্বাটে গোল মুখের উপরে ডাগর দুটি চোখ। এক ঢাল চুল, আলগা করে বাঁধা, মনে হত যেন চুলের উপরে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে আবার দু-এক গুছি চুল কপালের পাশে ঝুমকোর মতো লতিয়ে দিত, তখন তার চেহারার আকর্ষণ আরও বেড়ে যেত যেন। নীচের ঠোঁট ঈষৎ পুরু, চেহারায় তাতে বেশ একটু মাদকতার ছোঁয়া লেগেছিল। একটু ছেলেমানুষী ধরনের দাম্ভিক, দেমাকী, অকালপক্ক মেয়ে।

ডালির রঙ ময়লা। তার মায়ের পাশে তাকে আরও ময়লা দেখাত। মায়ের ঠোঁট দুটি পাতলা, চোখ মুখ সবই একেবারে নিখুঁত। ডালির চেহারা সেই তুলনায় খারাপই বলতে হয়। দুঃখ করে মা বলতেন, "মেয়ের রঙ যা ময়লা, ভাল বর জোটানো শক্ত হবে।' ডালির তা নিয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না। চেহারা নিয়ে তার কোনও হীনম্মন্যতা ছিল কিনা তা অবশ্য জানি না। তবে যেমন ওদের বাড়িতে, তেমনি আমাদের বাড়িতেও কেউ যে তাকে সুরূপা ভাবত না, সেটা ঠিক। মাঝখানে সিঁথি কেটে টান্ করে চুল বাঁধা। ডালির চেহারা তাতে একটু কঠিন আর গ্রাম্য দেখাত। কিন্তু ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে এই ক্ষতিটা তার ক্ষেত্রে পুষিয়ে গিয়েছিল। মুখখানা ভারী মিষ্টি; দেখলেই মনে হত, এক্ষুনি হেসে উঠবে। চোখ দুটিও ছিল ভারী মোহময়। মা যা-ই ভাবুক, ছেলেরা তার দিকে দারুণ আকৃষ্ট হত।

বাসন্তী, ঊর্মিলা, ডালি—সারাক্ষণ এই তিনটি মেয়ে একসঙ্গে ঘুরছে। তিনজনের নামের ইংরেজী আদ্যক্ষর জুড়ে দিয়ে ছেলেরা আমাদের 'বাড' বলত। কিছুদিন বাদেই দেখা গেল যে, কলেজে হেন ছেলে নেই, যে 'বাড'কে চেনে না। ভেরার কথা মনে পড়ছে। সে ছিল খুব চঞ্চল আর হাসিখুশী মেয়ে। চোখ দুটি বড় বড়, সব সময়ে সেই চোখের মধ্যে যেন দুষ্টুমি ঝিলিক দিত। সমস্ত রকমের রঙ্গরসে ভেরা আমাদের সঙ্গিনী হয়ে উঠেছিল। এডনা আর বিজয়ার সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক ছিল খুব ভাল। তবে তারা ঠিক অতটা অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেনি।

ছেলেদের সম্পর্কে আমাদের যেটুকু আগ্রহ ছিল, আসলে সেটা কৌতূহলের অতিরিক্ত কিছু নয়। মাঝেমধ্যে নির্দোষ কিছু মজা করতুম, এইমাত্র। আমাদের যে বয়স আর যে সামাজিক পটভূমিকা, তাতে উপর-উপর একটা আলাপ-পরিচয়ের সূত্র রক্ষা করে যেতুম, ছেলেদের সঙ্গে তার চেয়ে গভীর কোনও সম্পর্কের কথা আমরা ভাবতেই পারতুম না। ইংরেজীর ক্লাসে অন্য যে-সব মেয়ে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিত, তাদের সম্পর্কে আমরা ছিলুম নিতান্ত নিরাসক্ত। বাকী ক্লাস তারা কোথায় করত, জানি না, তবে সেণ্ট জন'স্ কলেজে নিশ্চয় নয়। এই একটা ব্যাপার দেখে বিস্ময় বোধ করতুম যে, অনেকগুলো মানুষকে যখন একই জায়গায় এনে ঢোকানো হয়, তখন তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য যেন লোপ পেতে থাকে, এমন কী তাদের চেহারাও যেন ক্রমে-ক্রমে একই রকমের দেখায়। বাইরে থেকে যে দশটি মেয়ে এসে এখানে একইসঙ্গে ইণ্টারমিডিয়েট আর শিক্ষক-শিক্ষণের ক্লাস করছে, নিশ্চয় এদের প্রত্যেকেরই আলাদা কিছু-না-কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু সেটা যেন এখানে চোখেই পড়ে না। সামনের বেঞ্চিতে, ডায়াসের দিকে তাকিয়ে, পাশাপাশি যখন তারা বসে থাকে, তখন মনে হয়, তাদের চেহারা একেবারে একই রকম। তার উপরে আবার একজনও সুশ্রী নয়। আমরা তিন বন্ধু, অর্থাৎ 'বাড', বসতুম ডায়াসের এক পাশে। অধ্যাপকের দৃষ্টির একটু বাইরে। ওই দশটি মেয়েকে নিয়ে আমরা নানারকমের মজা করতুম।

পরিবর্তনশীল সমাজের মানুষ আমরা। আমাদের মূল্যবোধ আর আদর্শে অনেক ফাঁকি রয়ে গেছে। ভাবতে ভাল লাগত যে, আমি স্বাধীনা নারী, প্রেম করে বিয়ে করাটা আমার চোখে ছিল একটা প্রগতির ব্যাপার। আবার একইসঙ্গে আমি নিশ্চিত জানতুম যে, যথাসময়ে আমাদের বাপ-মা আমাদের জন্যে পাত্র জুটিয়ে আনবেন। এবং সেই নিশ্চিন্তিটুকু ছিল বলেই, যে-সব মেয়ে 'আখেরী' কোনও মতলব নিয়ে ছেলেদের আকর্ষণ করবার চেষ্টা করে, তাদের আমরা মোটেই ভাল চোখে দেখতুম না। প্রেম সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না আমার। আর তাই, বিশেষ কোনও মেয়ের হাবেভাবে একবার বিশেষ কোনও ছেলের প্রতি পক্ষপাত একটু প্রকট হলেই হল, ব্যাপারটা আমার ভীষণ বিসদৃশ লাগত; মনে হত, ফাঁদ পেতে এরা স্বামী ধরবার তালে আছে। একটু বোকা ছিলুম তো। তাই যখন শুনি যে, গির্জেটাই হচ্ছে ছেলেমেয়েদের মিলিত হবার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট জায়গা, এবং সেইখানেই তাদের প্রেমপত্রের আদানপ্রদান হয়, তখন আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম। রবিবারের জন্যে মেয়েদের তখন সে কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা। রবিবারে তারা গির্জেয় যেত, সঙ্গে বাইবেল, প্রেমপত্র লুকোনো থাকত সেই বাইবেলের মধ্যে। সেইটেই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা, কারণ বাইবেল তো আর কেউ তল্লাসি করে দেখবে না। শুনে 'ছি ছি' করতুম, পবিত্র গ্রন্থের মধ্যে প্রেমপত্র লুকিয়ে রাখা, এর নাম কিনা প্রেম! জীবনে যে কীভাবে প্রেম আসে, সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা আমার ছিল না। ভাবতুম, প্রেম হচ্ছে অমৃত, স্বর্গ থেকে সে ঝরে পড়ে।

যে-সব মেয়ের কথা বলছি, বয়সে তারা আমাদের চাইতে বেশ-কিছুটা বড়। উপরন্তু তারা খ্রীষ্টান, ফলে তাদের পারিবারিক পটভূমিকাও আমাদের থেকে কিছুটা আলাদা। সহপাঠীর সঙ্গে প্রেম করে তাকে বিয়ে করা, আমাদের ক্ষেত্রে এটা দোষাবহ ব্যাপার বলে গণ্য হলেও, তাদের ক্ষেত্রে এটা মোটেই দোষের কিছু নয়। এমন একটা ভাব তারা দেখাত যেন ক্লাসের খ্রীষ্টান ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করবার অধিকার একমাত্র তাদেরই। এইটে দেখে আমাদের খুব মজা লাগত। ছেলেদের মধ্যে কারও সম্পর্কেই আমাদের এমন-কিছু আগ্রহ ছিল না; তবু খ্রীষ্টান মেয়েদের জ্বালাবার জন্যে অনেক সময় তাদের দেখিয়ে-দেখিয়ে আমরা খ্রীষ্টান ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতুম। এটা আমরা খুব ভালই জানতুম যে, খ্রীষ্টান মেয়েদের চেয়ে আমাদের চেহারা অনেক ভাল।

তাই, খ্রীষ্টান ছেলেদের সঙ্গে আমাদের মিশতে দেখে, তারা রাগে জ্বলত। আমরা মিশতুম মজা করবার জন্যে, কিন্তু তাদের ঈর্ষার সীমা থাকত না। কোন্ মেয়েটা কোন্ ছেলের দিকে ঝুঁকছে, ভেরার কাছেই সে-সব খবর আমরা পেয়ে যেতুম। আমাদের এই মজার খেলায় তাকেও আমরা সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলুম। আজ অবশ্য মনে হয় যে, কাজটা ভাল করিনি, কিন্তু তখন তা মনে হত না।

সেই বয়সে আমার এই একটা দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, যৌন সম্পর্ককে দূরে রেখেই, ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের একটা সহজ সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। ভেবেছিলুম, আমার নিজের দৃষ্টান্ত দিয়েই এই সত্যকে আমি প্রমাণ করব। ছেলেদের সঙ্গে ছেলেদের কিংবা মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের যে-রকম সম্পর্ক হয়, ছেলেতে-মেয়েতে ঠিক সেই রকমের সম্পর্ক কেন হবে না? না, এটা ঠিক প্লেটোনিক প্রেমের ব্যাপার নয়। প্লেটোনিক প্রেম আমার কাছে ছিল একটা বিদ্রূপের ব্যাপার। আসলে এই প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলুম যে, মেয়ে আর ছেলেদের সম্পর্ক একেবারে ঘি আর আগুনের মতো; তাদের পাশাপাশি রাখলে আর রক্ষে নেই—এই ধারণাটাকেই আমি ভেঙে দিতে চেয়েছিলুম।

সচেতন ইচ্ছা থেকে যার জন্ম, সেই প্রেমে আমার বিশ্বাস ছিল· যে প্রেম নিরুপায় আত্মসমর্পণের ব্যাপার, তাতে ছিল না। প্রেম আমার কাছে কোনও রহস্যময় ব্যাপার নয়, তাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেও আমি দেখতুম না। প্রেম যে একটা কদর্য কাণ্ড, এমন কথা আমি কখনও ভাবিনি; তবে একইসঙ্গে আমার মনে হত যে, নানা রকমের ইশারা ইঙ্গিত আর সন্দেহ এর মধ্যে একটা কদর্যতার দ্যোতনা এনে দিয়েছে। আর যৌন আকর্ষণকে মনে হত স্বাভাবিক সম্পর্কের পরিপন্থী একটা ব্যাপার বলে। ওই আকর্ষণটা রয়েছে বলেই নরনারীর সম্পর্ক যেন স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হতে পারে না, পরস্পর সম্পর্কে তারা সতর্ক থাকতে চায়, ফলে তাদের বন্ধুত্বের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা আর বজায় থাকে না। এই কারণেই আমি বলতুম যে, ক্লাসের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কামগন্ধহীন একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠা উচিত। প্রেমের বিরোধী আমি ছিলুম না; আমি শুধু এইটুকুই বলতুম যে, ইচ্ছা থাকলেই কামের তাড়নাকে জয় করা যায়। জয় করতে যারা পারে না, অর্থাৎ কামের কাছে যারা আত্মসমর্পণ করে বসে, তাদের আমি হেয় ভাবতুম। আমি বিশ্বাস করতুম যে, সজ্ঞান ইচ্ছার থেকে প্রবৃত্তির জন্ম হওয়া উচিত; মানুষের ইচ্ছা তার প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হবে, এটা ভাবতে আমার একটুও ভাল লাগত না। আমি ভাবতুম যে, আমার এই বিশ্বাস একেবারে অভ্রান্ত। বিশ্বাসের সেই দুর্গে আমি আশ্রয় নিয়েছিলুম।

বয়স্কপাঠ্য বই ইতিমধ্যে অনেক পড়েছিলুম ঠিকই, কিন্তু আমার বয়স তো তখন খুবই কম, অভিজ্ঞতাতেও যাকে বলে একেবারেই কাঁচা, এ-সব ব্যাপারে একেবারে মুখ্খু বললেই ঠিক হয়, অথচ প্রেম, কাম, বিবাহ ইত্যাদি সব বিষয়ে আমার ধারণা তখন একেবারে বদ্ধমূল, ভাবতুম যে, তার আর নড়ন-চড়ন হবার জো নেই। অন্য মেয়েরা খুব টমাস হার্ডির বই পড়ত, 'এ পেয়ার অব ব্লু আইজ' পড়ে তারা তো দারুণ মুগ্ধ। আমি 'টেস' পড়েছিলুম, কিন্তু অন্য সব লেখকের তুলনায় ডিকেন্স্‌কে আমার অনেক বেশী ভাল লাগত। বই পড়ার ব্যাপারে আমার অভ্যাস কিছুটা খাপছাড়া ধরনের। একদিন আমাদের বইয়ের আলমারিটা হাঁটকাতে-হাঁটকাতে লিও টলস্টয়ের একটা চটি বই আমার হাতে এসে গেল। টলস্টয় সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা আমার ছিল না, তবু যে বইখানার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং এ-বিষয়ে আমি একটু কৌতূহল বোধ করেছিলুম, তার কারণ বইখানা খুলে দেখি, তার পাতায়-পাতায় লাল-নীল পেনসিল দিয়ে দাগানো। বই পড়তে-পড়তে কোনও

একটা জায়গা ভাল লাগলে বাবা সাধারণত সেখানে লাল-নীল পেনসিলের দাগ দিয়ে রাখতেন। কিন্তু এমনভাবে দাগানো বই এর আগে আর দেখিনি। বইয়ের শেষে লাল পেনসিলে লেখা ১৯২২। তাই দেখে আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। বুঝতে পারলুম, ওই বছরেই বাবা এই বইটা পড়েছিলেন। আমার জন্মও ওই ১৯২২ সনে।

এটা ঠিক টলস্টয়ের বই নয়। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই। 'ক্রুজার সোনাটা' বলে তিনি একটা বই লিখেছিলেন। তাই নিয়ে খুব হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। বইখানার মধ্যে টলস্টয়ের যে-সব ধারণা ও বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছিল, অনেকে তাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। যৌন সম্পর্ক ও বিবাহের ব্যাপারে টলস্টয়ের ধ্যানধারণার বিচার-বিশ্লেষণ করে তখন অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছিল। টলস্টয় তার যে উত্তর দিয়েছিলেন, পরে তা একত্র করে একটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করা হয়। প্রশ্নগুলোও তার মধ্যে ছাপা হয়েছিল। এটিই সেই পুস্তিকা। মূল উপন্যাসখানা তো পড়িনি, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সবটা তাই বোঝা গেল না, তবে যৌন সম্পর্ক ও বিবাহের ব্যাপারে টলস্টয়ের মতামতের একটা আন্দাজ তাতে পাওয়া গেল। অন্তত তখন আমার তা-ই মনে হয়েছিল।

এখন বুঝতে পারি যে, সেই বয়সে ব্যাপারটা আমি ঠিক স্পষ্ট করে বুঝিনি। বইখানার নানান জায়গায় বাবা তাঁর লাল-নীল পেনসিলের দাগ দিয়ে রেখেছিলেন। তাতে করে বিভ্রান্তি আরও বেড়েই যায়। তবে নারীর যে চিত্র তাতে আঁকা হয়েছিল, এখনও তা স্পষ্ট মনে পড়ে। গ্রীষ্মদিবসের পটভূমিকায় নারীর বেশ-একটা বর্ণাঢ্য বর্ণনা তাতে ছিল। তার মধ্যে আবার প্রাধান্য ছিল উজ্জ্বল হলুদের, যা কিনা বাসন্তী মেজাজটাকে বেশ স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলে। উন্নত বুক, তার উপরে আঁটসাঁট হলুদ জাম্পার; এমনভাবে পোশাক পরেছে নারী, পুরুষের আগ্রহ যাতে খুব সহজেই আকর্ষণ করা যায়। বর্ণনা থেকে মনে হয়েছিল, উজ্জ্বল হলুদ পোশাক সম্পর্কে টলস্টয়ের আপত্তি বড় তীব্র। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেও, একমাত্র সন্তানলাভের উদ্দেশ্য ছাড়া, দৈহিক মিলনে তাঁর সায় নেই। ঝলমলে আঁটসাঁট পোশাক পরে যে-সব তরুণী পুরুষদের আগ্রহ আকর্ষণ করে, তিনি তাদের নিন্দা করেছেন। আরও ধিক্কার দিয়েছেন সেইসব মেয়েকে, সারাক্ষণ পুরুষদের আশকারা দিয়ে তারপর চূড়ান্ত ব্যাপারটার ঠিক পূর্বমুহূর্তে যারা হঠাৎ সাধু সেজে পিছিয়ে যায়, এবং পুরুষদের একেবারে বোকা বানিয়ে ছাড়ে। পড়ে মনে হয়, দোষ সর্বদা মেয়েদেরই। তারাই পুরুষদের বিভ্রান্ত করে, প্রলোভিত করে।

পুস্তিকাটি পড়বার পরে এলোমেলোভাবে আমার চিত্তে যে-সব ভাবনা-চিন্তার উদয় হয়েছিল, আজ আর তাকে ফুটিয়ে তোলা যাবে না। এইটুকু শুধু মনে পড়ে যে, হলুদ রঙটা আমার কাছে চূড়ান্ত বেহায়াপনার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল। ঠিক করলুম, হলুদ পোশাক আর কখনও পরব না। আর আঁটসাঁট যে-সব পোশাক পরলে শরীরের, বিশেষ করে বক্ষঃদেশের, রেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে, সেগুলোকেও আমি অন্যায়, আপত্তিকর ও অশ্লীলবোধে বর্জন করলুম। সর্বোপরি প্রতিজ্ঞা করলুম যে, পুরুষদের কখনও আশকারা দেব না। নিতান্তই যদি দিই, তবে শেষমুহূর্তে সাধু না সেজে চূড়ান্ত ব্যাপারটা পর্যন্ত এগিয়ে যাব। যদিও চূড়ান্ত ব্যাপার বলতে যে ঠিক কী বোঝায়, সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণাই তখন আমার ছিল না। তৃপ্তি বলতে যে এক্ষেত্রে কী বোঝানো হয়েছে, সে-বিষয়েও আমি তখন নেহাতই অজ্ঞ।

নানান রকমের ভাবনা-চিন্তার সংস্পর্শে এসে আমার চিত্ত তখন তোলপাড় হচ্ছে। এতদিন যেন একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ছিলুম, ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম একটা কানাগলির মধ্যে। হঠাৎ তার থেকে বেরিয়ে এসে একটা মস্ত বড় জায়গার মধ্যে

তখন মুক্তি পেয়ে গেছি। আমার চিত্ত খুবই গ্রহিষ্ণু। প্রত্যহ কিছু-না-কিছু নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে, নতুন-কিছুর সন্ধান পেয়ে যাচ্ছি, নতুন চিন্তার সংস্পর্শে আসছি, কখনও বিভ্রান্ত হচ্ছি, কখনও আবার নতুন করে ভেবে দেখছি সবকিছু। কতকিছু বুঝবার রয়েছে, গ্রহণ করবার রয়েছে, মিলিয়ে নেবার রয়েছে। কোন্‌টা সত্য, আমি জানতে চাই। তৌলদণ্ডে ওজন করে সবকিছুকে আমি বিচার করতে চাই। মনের উপরে ওই বয়সে খুব সহজেই ছাপ পড়ে। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার অভিঘাতে আমার মানসিক ভারসাম্য তখন নিয়ত বিচলিত হচ্ছিল, নতুন করে তাকে আবার ফিরে পাবার দরকার ঘটছিল। দ্বিধায়-দ্বন্দ্বে আমি তখন নিয়ত দোল খাচ্ছি, সংশয়ে জর্জর হচ্ছি, বুঝতে পারছি না, কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা বেঠিক। হাজারটা প্রশ্ন আমার সামনে, আমি তার উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। অন্ধকারের মধ্যে আমি তখন উত্তর আর ব্যাখ্যা খুঁজে ফিরছি। ওই অবস্থায় এমন কাউকে আমার বন্ধু হিসেবে পাবার দরকার ছিল, যে আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারবে, অসংকোচে আমার সমস্যাগুলো যাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব। অন্তরঙ্গ বন্ধু যে আমার ছিল না, তা নয়। অনেককেই বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলুম। কিন্তু তাদের অবস্থাও তো আমারই মতো। মায়ের শরণ নেওয়া ছাড়া তাই আর কোনও গত্যন্তর তখন আমার ছিল না।

কলেজ আমাদের বাড়ির খুব কাছেই। ক্লাস শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই হেঁটে বাড়ি ফিরতুম। দিদির কলেজ দূরে। সে তাই শেঠীদের গাড়িতে করে ফিরত। তার জন্যে তার ফিরতে খুব দেরিও হত। শেঠীদের বাড়ির মেয়েদের স্কুলের ক্লাস যতক্ষণ না শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ ফেরার উপায় নেই। বাড়িতে ফিরে মাকে তাই একা পাওয়া যেত। আমার মনের কথা মাকে তখন উজাড় করে বলতুম। কলেজে রোজ যা দেখি, সেখানে নিত্য যে-সব অভিজ্ঞতা হয়, সব আমার বলতে ইচ্ছে করত। সব রকমের উত্তেজনা আর আনন্দের কথা, ছেলেদের আর মেয়েদের কথা, তাদের ঠাট্টাতামাশা আর দুষ্টুমির কথা, অধ্যাপকদের কথা, অর্থনীতি আর সাহিত্যের কথা—সব, সব। সবই আমার ভাল লাগে, সবকিছুর মধ্যেই আমি একটা অর্থ খুঁজে পাই, সারাক্ষণ তাই বকর-বকর করতুম। মা কিন্তু তার মধ্যে কোনও অর্থই খুঁজে পেতেন না। ভাবতেন, অর্থহীন বাচালতা ছাড়া এ আর কিছুই নয়। ছেলেবেলা থেকেই সবাই আমাকে বাক্যবাগীশ বলে জানে। মা ভাবতেন, বাচ্চা-বয়সের সেই বকবকানি আমার আর গেল না। আগ্রহভরে কত কথাই না বলতুম আমি। কিন্তু মা একেবারে উদাসীন। কী বলছি না-বলছি, সে সম্পর্কে কোনও আগ্রহই তাঁর নেই। ভাবতেন যে, মেয়েটা একদম বোকা, নয়ত ছেলেমানুষ, এখনও কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হল না। মাঝেমাঝে উপদেশ দিতেন। বলতেন যে, যে-ভাবে আমি কথা বলি, তা আর আমার শোভা পায় না। সাধারণত অবশ্য চুপ করেই থাকতেন; এমন একটা ভাব দেখাতেন যে, বুঝতে পারতুম, আমার কথায় কোনও আগ্রহই তাঁর নেই। কোন্‌টায় আমি বেশী বেদনা পেতুম? তাঁর ঔদাসীন্যে, না তাঁর তিরস্কারে? কী জানি।

বন্ধুবান্ধবদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে এর আগে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে মিশিনি। আগ্রায় কিন্তু যেমন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে, তেমনি তাদের বাড়ির অন্যান্য লোকজনদের সঙ্গেও খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করবার সুযোগ ঘটেছিল। বিশেষ করে ডালির মায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, আমার মায়ের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটা আমার চোখে খুব প্রকট হয়ে ধরা পড়তে থাকে।

যে-সব মেয়ে, এমন কী যে-সব ছেলেও, আমাদের সঙ্গে পড়ত, ডালির মা তাদের প্রত্যেকের নাম জানতেন। যাকে বলে স্বাধীন জেনানা, তা তিনি ছিলেন না, ঘোমটা দিতেন, ডালির বাবার সহকর্মীদের সামনে তিনি আসতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও

কলেজের অধ্যাপকদের বিষয়ে মোটামুটি খবর তিনি রাখতেন। কলেজে আমরা কীসব দুষ্টুমি করতুম, এবং শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্সের যে-সব মেয়ে আমাদের সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট পড়ত, কীভাবে আমরা তাদের পিছনে লাগতুম, তা তাঁর জানা ছিল। তিনি জানতেন, কোন্ ছেলেটা কোন্ মেয়ের জন্যে খেপে গেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি কোনও খবরই তাঁর অজানা ছিল না। এ নিয়ে তিনি আমাদের প্রশ্ন করতেন, ঠাট্টা করতেন, মাঝেমধ্যে আমাদের পিছনেও লাগতেন। আমাদের কথা কিংবা কাজের সমালোচনাও মাঝেমধ্যে করতেন তিনি, কিন্তু কখনও তা ঠিক তিরস্কারের মতো শোনাত না। ডালির মায়ের প্রকৃতি ছিল যেমন শান্ত, তেমনি নম্র। তেমনি ছিল তাঁর সহানুভূতি। মনে হত, তাঁর কাঁধে মাথা রেখে খানিক কাঁদলেই দুঃখ কেটে গিয়ে আমাদের মন আবার হাল্কা হয়ে যাবে। তাঁকে কিছু বলে বোঝাবার দরকার হত না: আমাদের মুখ দেখেই তিনি সব বুঝে নিতে পারতেন।

আমার মা কেন অন্যরকম? কিছুই কেন তাঁর মনে ধরে না? মিসেস শেঠী তো তাঁর স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে বার হন; ঘর-গেরস্থালির কাজে তিনি যে খুব বিব্রত, এমন তো মনে হয় না। কিন্তু সেই তিনিও তো তাঁর ছেলেমেয়েদের নিতান্ত শারীরিক কিছু চাহিদার প্রতি নজর রেখেই মনে করেন না যে, তাঁর দায় মিটল। তাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের অন্যান্য দিকেও তো তাঁর বেশ আগ্রহ। দাম্পত্য জীবনের বাইরেও তো তাঁর নিজস্ব একটা অস্তিত্ব রয়েছে। প্রতিবেশীদের প্রত্যেককে তিনি চেনেন। প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ও মধুর। তাঁদের সুখ-দুঃখের তিনি অংশীদার। ডালির মায়ের জীবন তাঁর জীবন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ডালির মা একেবারেই অন্তঃপুরচারিণী। ঘর-সংসারের কাজে তাঁকে অষ্টপ্রহর ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তো নিজস্ব একটা জীবনকে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন। পাড়ার গিন্নীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ অন্তরঙ্গ। কখনও তাঁকে মুখ ভার করে বসে থাকতে দেখি না। এই সময়েই প্রথম আমি লক্ষ্য করি যে, ঘর-গৃহস্থালির প্রায় কোনও কাজই আমার মা করেন না। প্রচুর চাকর-বাকর আমাদের। কাজকর্ম যা করবার তারাই করে। মা শুধু তাদের রোজকার ভাঁড়ারটা বার করে দেন। আর হ্যাঁ, কী জানি কেন, তরকারিটাও কুটে দেন বটে। সেকেলে পরিবারে তিনি মানুষ হয়েছেন, রান্নার তালিমও বেশ ভালই পেয়েছিলেন, অথচ, মায়ের তৈরী বিশেষ কোনও পদ কখনও খেয়েছি বলে আমার মনে পড়ে না। সেলাই-ফোঁড়াই-এমব্রয়ডারির কাজও মাকে শেখানো হয়েছিল, কিন্তু তাতে যেন কোনও আগ্রহই তাঁর আর ছিল না। মাঝেমধ্যে উল বুনতেন, বাস্, ওই পর্যন্ত, অন্য কোনও গৃহকর্মে কখনও তাঁকে লিপ্ত হতে দেখিনি। তিনিও কেন, ডালির মা কি মিসেস শেঠীর মতো, পাড়ার গিন্নীদের সঙ্গে ভাব করেন না? কেন একটু হাসিখুশী হয়ে থাকেন না? সারাক্ষণ কেন মুখ ভার করে শুয়ে থাকেন? ডালির মা যেন চিরহরিৎ এক পুষ্পলতা। আর আমার মাকে সেক্ষেত্রে শীতের দিনের পাতা-ঝরা গাছের মতো দেখায়। মাঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ আর কঠিন একটি বৃক্ষ যেন দাঁড়িয়ে আছে।

বাবা বাড়িতে খুব কমই থাকেন। ঠাকুমার সঙ্গেও আমার সম্পর্ক কখনও খুব ঘনিষ্ঠ হয়নি। মাও নির্লিপ্ত, উদাসীন। এইসব কারণে নিজেদের সংসারের সঙ্গে আমার বন্ধন দিনে-দিনে শিথিল হয়ে যেতে লাগল। মায়ের সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতুম আমি, কিন্তু তাতে কোনও ফল হত না। নিজেরই মধ্যে তিনি মগ্ন। অন্য ব্যাপারে তাঁর না আছে কোনও আগ্রহ, না আছে কোনও অনুভূতি। এ যে কতবড় অন্যায়, তা তিনি বুঝতেও পারতেন না। মরিয়া হয়ে আমি তাঁর আগ্রহ, তাঁর স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করতুম। কিন্তু মাথা কোটাই সার, ধমক ছাড়া আর কিছু আমার জুটত না। ফল যা হবার, তা-ই হল। ধীরে-ধীরে, নিজেরই

অজ্ঞাতসারে, সবরকমের মায়া-মমতার বাঁধন থেকে নিজেকে আমি মুক্ত করে নিতে চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু বাঁধন কি সহজে ছেঁড়ে। অন্তরের কোন্ অন্তস্তলে একটু-একটু করে ঘৃণা জমতে লাগল। ভীষণভাবে আহত হয়েছে আমার অহমিকা। ভালবাসা আর ঘৃণার টানাপোড়েনে আমি তাই সারাক্ষণ তখন আলোড়িত হচ্ছি। ফলে, নিতান্ত তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়েও মায়ের সঙ্গে আমার সংঘাত ঘটতে লাগল।

পরিবারের অন্যদের সঙ্গে আমার যোগ-সম্পর্ক শিথিল হয়ে গিয়েছিল। হয়নি শুধু দিদির সঙ্গে। আরও আপন করে তাকে আমি পেতে চাইছিলুম। তখন তো আর নিতান্ত শিশু আমি নই। তার সহচরী; এমন সঙ্গী—সব রকমের কথা যাকে বলা যায়। একই রকমের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা এগোচ্ছি; দুজনেই চেষ্টা করছি নিজের-নিজের জীবনের তাৎপর্য খুঁজে নিতে। এই সঙ্গতি আমাদের মধ্যে একটা ঐক্য রচনা করেছিল। কেউ কাউকে চোখের আড়াল করতে পারি না; যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ছি, ততক্ষণ আমাদের কথা যেন আর ফুরোতে চায় না। হেন বিষয় নেই, যা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয় না। শুধু এক আমাদের পারিবারিক অশান্তি ছাড়া। যেন আমাদের মধ্যে এইরকমের একটা অনুল্লেখিত চুক্তি ছিল যে, বাড়ির এই অশান্তি, মাঝে-মাঝেই যার চেহারা অতি কদর্য হয়ে দাঁড়ায়, এ নিয়ে কোনও কথাই আমরা বলব না। নেহাতই এক-আধবার হয়ত ব্যাপারটার আমরা উল্লেখ করেছি।

এই যেমন কথায়-কথায় দিদিকে একবার বলেছিলুম যে, বাড়িতে এই যে এত ঝগড়াঝাঁটি চলে, এতে আমার খুব খারাপ লাগে। বলেছিলুম যে, বড় হয়ে আমি মায়ের মতো হব না। এর চেয়ে বরং বিয়ে না করাই ভাল। সেদিনকার আলোচনার কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। খুব উত্তেজিত হয়েছিলুম, ভিতরে-ভিতরে খুব অসহায় বোধ করছিলুম। দিদি কিন্তু ধীরস্থির। বলল যে, এটা নেহাতই বোকার মতো কথা হল। আমার উপরে এই ঝগড়াঝাঁটির প্রতিক্রিয়া যে ভাল হচ্ছে না, তা যদি আমি না-বুঝতুম, তাহলে না হয় আমার কথার একটা মানে হত, হয়ত সেক্ষেত্রে আমার একটা ক্ষতির আশঙ্কাও থাকত। কিন্তু ব্যাপারটাকে যখন ক্ষতিকর বলে বুঝতে পেরেছি, তখন আর আমি এর দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছি কেন? ব্যাপারটা যে ক্ষতিকর, সেটা বুঝে গেলে তো আর ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। শুনে, আমি আমার কথাটা তাকে বুঝিয়ে বলতে যাচ্ছি, কিন্তু দিদি তার সুযোগই আমাকে দিল না। আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল যে, আমার আশঙ্কাটা নেহাতই অলীক। এই একই বিষয়ের সূত্রে দিদি আমাকে বলেছিল যে, তার প্রতিক্রিয়াটা একেবারে উল্টো রকমের। সে যখন বড় হয়ে বিয়ে করবে, তখন তার আচরণ হবে সম্পূর্ণ আলাদা, আমাদের সংসারের পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের পরিবেশে তার বাচ্চাদের সে মানুষ করে তুলবে। রাগ করে দিদিকে বললুম, “তোর কী মুশকিল হয়েছে জানিস? তোর অনুভূতি আমার মত এত তীব্র নয়।” তাতে দিদিও ভীষণ রেগে গেল। প্রতিবাদ করে বলল যে, অনুভূতি শুধু আমারই আছে, তার নেই, এমন কথা আমি যেন না ভাবি। বলল, এ-সব ব্যাপার তারও খুব খারাপ লাগে, কিন্তু সব-কিছুকেই সে যুক্তিসম্মতভাবে ভেবে দেখবার পক্ষপাতী। শুনে, চুপ করে রইলুম। কিন্তু এটা আমি নিশ্চিত বুঝে গিয়েছিলুম যে, কোনও-কিছুই তার চিত্তে দাগ কাটে না। অন্তত আমার ক্ষেত্রে যতটা গভীরভাবে কাটে, তার ক্ষেত্রে ততটা গভীরভাবে কাটে না। আমার চেয়ে সে অনেক কম সংবেদনশীল।

* * *

কলেজ-জীবনের টান আমার ক্ষেত্রে দিনে-দিনে প্রবল হয়ে উঠছিল; পিছনে পড়ে যাচ্ছিল বাড়ির জীবন। এই সময় একটা বিতর্ক-প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করা

হয়। আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা। শুধু আগ্রার কলেজ নয়, যুক্তপ্রদেশের সমস্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা তাতে যোগ দেবে। অর্থাৎ বেশ বিরাট ব্যাপার। বিনা দ্বিধায় আমি প্রতিযোগিতায় আমার নাম দিয়ে দিলুম। আমাদের কলেজ থেকে মোট দু'জন প্রতিযোগী বাছাই করা হবে। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার আগে তাই আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা প্রাথমিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হল। বিতর্কের বিষয়: "এই সভার মতে, গণতন্ত্রের তুলনায় স্বৈরতন্ত্রই ভারতের পক্ষে বেশী উপযোগী।"

কেউ এ-কথার সপক্ষে বলবে, কেউ বিপক্ষে। প্রতিযোগীরা সাধারণত তাদের বলবার কথাগুলো আগে লিখে ফেলত, তারপর সেই কথাগুলো মুখস্থ করে সভাস্থলে সেগুলো এমনভাবে বলে যেত যে, মনে হত, যেন তক্ষুনি-তক্ষুনি তারা একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলছে। এটাই ছিল রীতি। আমি ঠিক করলুম, স্বৈরতন্ত্রের সপক্ষে বক্তৃতা দেব। তার মানে এই নয় যে, আমি স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাস করি, মোটেই তা নয়, বরং গণতন্ত্রেই আমার বিশ্বাস অতি প্রবল। কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের তুলনায় গণতন্ত্রের সপক্ষে বলা তো অনেক সহজ, অনেকেই তাই গণতন্ত্রের সপক্ষে বক্তৃতা দিতে চায়, স্বৈরতন্ত্রের সপক্ষে বক্তৃতা দেবার মতো লোকই জুটতে চায় না। এই কারণেই আমি স্বৈরতন্ত্রের সপক্ষে বক্তৃতা দেব বলে ঠিক করেছিলুম।

কাকা তখন আমাদের বাড়িতে আছেন। এককালে তিনি খুব ভাল বিতর্ক করতে পারতেন। বক্তৃতাটাকে তৈরী করে নেবার ব্যাপারে তাঁর কাছে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গেল। কীভাবে বক্তৃতা দিতে হয়, সে-বিষয়েও তিনি অনেক উপদেশ-পরামর্শ দিলেন। গোপনে তিনি সভাস্থলে হাজিরও হয়েছিলেন। পরে আমাকে বলেওছিলেন যে, আমিই সবচেয়ে ভাল বলেছি। বিচারকমণ্ডলীও সেই রায়ই দিলেন। তাতে আমি খুব গর্ববোধ করেছিলুম। কিন্তু আমাদের কলেজের প্রতিনিধি করে যে-দুজন ছাত্রকে প্রতিযোগিতায় পাঠানো হবে, তাদের নামের তালিকা প্রকাশিত হতে দেখি, ও মা, আমার নাম তাতে নেই। বিস্মিত হয়ে ইউনিয়নের সভাপতিকে জিজ্ঞেস করলুম যে, এর অর্থ কী। তাতে তিনি বললেন যে, একমাত্র ডিগ্রী-ক্লাসের ছাত্ররাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার অধিকারী, আমি তো ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের ছাত্রী, তাই আমি প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারব না। আমি তো হতভম্ব। জিজ্ঞেস করলুম, তাই যদি হবে তো আদৌ আমাকে বাছাই-প্রতিযোগিতায় বক্তৃতা দিতে দেওয়া হল কেন?

তাতে তিনি নির্বিকারভাবে বললেন, "তাতে আর কী হয়েছে। ছেলেরা তোমার বক্তৃতা শুনতে চেয়েছিল, তাই তোমাকে ডেকেছিলুম। তাতে তো আর তোমার কোনও ক্ষতি হয়নি।"

ভীষণ চটে গিয়েছিলুম সেদিন। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার! রাগ পড়বার পরে অবশ্য বুঝেছিলুম যে, আমার উপরে এরা একটা চালাকি করেছে বটে, কিন্তু সত্যিই এতে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইনি। বরং এরই ফলে আমি সকলের নজরে পড়লুম। ওই এক বক্তৃতাতেই গোটা কলেজে আমার প্রতিষ্ঠা একেবারে পাকা হয়ে গেল। সবাই আমাকে জানল। সকলের শ্রদ্ধা আর সমাদর আমি পেলুম।

স্বৈরতন্ত্রের সপক্ষে বলবার জন্যে যাকে বাছাই করা হয়েছিল, সে বি.এ. ফাইন্যালের ছাত্র। ছেলেটি একদিন আমার কাছে এসে অনুরোধ করল, আমার বক্তৃতার খসড়াটা আমি যেন তাকে দিয়ে দিই। ওটা তো আর আমার কোনও কাজে লাগবে না, অথচ ওর থেকে কিছু-কিছু অংশ তুলে নিয়ে সে তার নিজের বক্তৃতায় কাজে লাগাতে পারবে। আমার মনের একটা অংশ বিদ্রোহ করে বলল, না, ওকে দিও না। কিন্তু কলেজের প্রতিও আমার একটা আনুগত্য আছে তো। সেই আনুগত্যই প্রবল হয়ে উঠল। খসড়াটা এনে ওর হাতে তুলে দিলুম। কিন্তু ছেলেটার তাতে কোনও লাভ হল না। এর চেয়ে সে

নিজের খসড়া অনুযায়ী বক্তৃতা দিলেই বরং ভাল হত। তা না করে দুটো খসড়ারই খানিক-খানিক অংশ নিয়ে সে একটা জগাখিচুড়ি বানিয়ে ছাড়ল। প্রথম পুরস্কার, দ্বিতীয় পুরস্কার, শীল্ড—সবই পেল আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানকার ছাত্ররা বেশ ভাল বক্তা। খুব ধীরস্থিরভাবে বক্তৃতা দেয়। আমার অবশ্য বারবার মনে হতে লাগল যে, সুযোগ পেলে তাদের হাত থেকে আমি ট্রফি ছিনিয়ে আনতে পারতুম।

কলেজে নকল-পার্লামেন্টের অনুষ্ঠান হত। সে ভারী উত্তেজনার ব্যাপার। হাউস অব কমন্সের খুঁটিনাটি প্রতিটি নিয়ম আর কেতা আমরা মেনে চলতুম। স্পীকার একেবারে পাথরের মতো চুপ করে বসে থাকতেন। একদম হাসতেন না। আমরা মাঝে-মাঝে টেবিল চাপড়াতুম, কিন্তু হাততালি দিতুম না। একমাত্র উদ্ধৃতি দেওয়া ছাড়া, কাগজ দেখে কাউকে কিছু পড়তে দেওয়া হত না। রীতিমত গুরুগম্ভীর ব্যাপার। গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায়, সেটা যেন আমার চোখের সামনে একেবারে মূর্ত হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবতুম, একদিন আমি ট্রেজারি বেঞ্চে বসব।

আগ্রা কলেজে খেলাধুলা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থার ভার ছিল ডঃ প্রসাদের উপরে। বাবার তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কথায়-কথায় একদিন এই প্রসঙ্গ উঠল যে, কলেজের সাধারণ-জীবনের সঙ্গে মেয়েদের যোগ বড় কম, বিশেষ করে খেলাধুলোয় কোনও অংশই তারা নিতে পারে না। ডঃ প্রসাদ তাতে বললেন যে, কলেজের বদলে বরং শহরের অন্য কোনও জায়গায় মেয়েরা মিলিত হতে পারে, সেক্ষেত্রে মেয়েরা যে-সব খেলা পছন্দ করে, তার সাজসরঞ্জাম তিনি জোগাড় করে দেবেন। তা মেয়েরা বলল, তারা হকি খেলতে চায়। আমাদের বাড়ির চত্বরটা সবচেয়ে প্রশস্ত; তাই সেখানেই গড়ে উঠল আগ্রা কলেজ লেডিজ স্পোর্টস ক্লাব। চটপট এসে গেল খানকয় হকি স্টিক আর একটা বল। কিন্ত সেণ্ট জনস্ কালেজের কিছু মেয়েকে দলে টেনেও দেখা গেল যে, এগারো জনের দল কিছুতেই হয় না। আরও কিছু-কিছু মেয়েকে আমরা অনক বলে-কয়ে রাজী করালুম বটে, কিন্তু তাতেও দেখি, এক-এক দলে বড়জোর চারজন কি পাঁচজন মেয়ে। তার চেয়েও বড় সমস্যা, হকি খেলার নিয়মকানুন আমরা কেউ জানি না। কীভাবে স্টিক ধরতে হয়, তাও না। তখন কাকাকে গিয়ে ধরে বসলুম যে, খেলাটা আমাদের শিখিয়ে দিতে হবে। মেয়েদের দঙ্গলে ভিড়তে তিনি কিছুতেই তো রাজী হন না। শেষ পর্যন্ত অনেক পীড়াপীড়ি করায় রাজী হলেন। তিনি চান, পুরোপুরি আইন মেনে আমরা খেলি। কিন্তু তা কি আর আমাদের পক্ষে সম্ভব? তখনও আমরা স্টিক ধরতেই শিখিনি। তিচ্চির স্টিক তো একদিন কাকার স্টিকের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেল যে, তক্ষুনি সে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল, আর কাকা পড়লেন তার উপরে। কাকা তো মহা অপ্রস্তুত। ওদিকে তিচ্চিরও চশমা ভেঙেছে। খেলাও সেদিনকার মতো খতম। পরের দিন তিচ্চি আবার নতুন চশমা পরে খেলতে এল। কাকার একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ, তিনি আর আমাদের সঙ্গে মাঠে নামবেন না। অনেক কষ্টে তাঁকে রাজী করালুম। কিন্তু সেদিনও সেই একই কাণ্ড। আবার ভাঙল তিচ্চির চশমা। বাস্, কাকা সেই যে মাঠ ছাড়লেন, আর তাঁকে মাঠে নামানো গেল না। আমাদের হকি খেলারও ওইখানেই ইতি।

ব্যাপারটা নিয়ে ডঃ প্রসাদের সঙ্গে আলোচনা হল আমাদের। হকি খেলতে অনেক মেয়ে চাই। অত মেয়ে তো আর জোগাড় করা সম্ভব নয়, তাই ঠিক হল, টেনিস খেলা হবে। গাধার পিঠে চাপিয়ে রাজ্যের মাটি এনে আমাদের বাড়ির পিছনদিককার চত্বরে ফেলা হল; তৈরী হল 'মাড কোর্ট'। কলেজ একটা জাল আর কিছু পুরনো বল দিল। উৎসাহের ঝোঁকে আমরা সবাই একটা করে র‍্যাকেট কিনে ফেললুম। স্ক্রিন নেই তো রয়েই গেল। এবারে খেলা শেখাবার ভার পড়ল বাবার উপরে। টেনিস খেলার রহস্য

তিনি আমাদের বুঝিয়ে বলতে লাগলেন। এককালে তাঁর টেনিসে বেশ নাম ছিল, এখনও মাঝেমধ্যে খেলেন। খেলার নিয়মকানুন কী, সবিস্তারে তিনি আমাদের বললেন। এক হাতে র‍্যাকেট আর অন্য হাতে বল, বাউণ্ডারি লাইনে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের উপরে ভর দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি, সার্ভ করেই পা টান করে দাঁড়াব, এই দৃশ্যটা এখনও আমি কল্পনা করতে পারি। মুশকিল হল এই যে, যতই চেষ্টা করি, বল কিছুতেই র‍্যাকেটে লাগে না। র‍্যাকেট আর বাঁ পায়ের কাজের মধ্যে একটা সমন্বয়ের ব্যাপার আছে তো, সেটা কিছুতেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। বাবা তো চটে লাল। বললেন, এটা আমার দুষ্টুমি ছাড়া আর কিছুই নয়, মন দিয়ে তাঁর কথাই আমি শুনিনি। বললুম, কক্ষনো তা নয়। কিন্তু বাবা সে-কথা শুনলেন না। চটেমটে কোর্ট থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

তখন নিজেরাই যেটুকু পারি চেষ্টা করতে লাগলুম। আস্তে আস্তে উন্নতিও হতে লাগল। দেওয়ালে বল মেরে-মেরে তখন খুব প্র্যাকটিস করতুম। তা ছাড়া আমরা সবাই ব্যাডমিণ্টন খেলতুম তো, টেনিস রপ্ত করতে তাই দারুণ-কিছু অসুবিধে হল না; শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, অন্যের কোর্টে বল পাঠাতে পারছি। একদিকে যেমন ঠিকমতো সার্ভ করছি, অন্যদিকে তেমনি অন্যের সার্ভিস ফিরিয়ে দেওয়াও খুব কঠিন হচ্ছে না। কিন্তু খেলায় আমরা নতুন তো, তাই বলের গতি ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না, কোর্ট থেকে বল প্রায়ই দূরে গড়িয়ে চলে যায়। একে তো আমাদের না আছে স্ক্রীন, না আছে বল কুড়িয়ে দেবার লোক, তার উপরে আবার আমাদের চত্বরটাও মস্ত বড়, বল কুড়িয়ে আনতেই তাই দম কাবার। খেলি আর কতটুকু, বেশির ভাগ সময় ওই বল কুড়োতে দৌড়ে বেড়াই। তাতে ব্যায়াম হয় ঠিকই, কিন্তু তাকে তো আর টেনিস বলে না। ফলে যা হয়, আমাদের উৎসাহ আস্তে-আস্তে ঝিমিয়ে এল। ঠিকমতো টেনিস খেলার জন্যে যে যোগ্যতা চাই, সেটা আর আয়ত্ত করা হল না।

ডালির ভাই আর শেঠী-বাড়ির ছেলেরা ক্রিকেট খেলত। আমিও মাঝে-মধ্যে ওদের সঙ্গে ভিড়ে যেতুম। যতক্ষণ না আর-আর খেলার সঙ্গীরা এসে পড়ছে, ততক্ষণ আমার সঙ্গে খেলতে ওদের আপত্তি হত না। আমার বেশ মজাই লাগত। একদিন তো ব্যাট করছি। হঠাৎ একটা বল ফসকাতেই সোজা সেটা আমার নিতম্বের হাড়ে এসে লাগল। দারুণ যন্ত্রণা, চোখে যেন সর্ষের ফুল দেখতে লাগলুম। কিন্তু বাচ্চাদের সামনে তো আর কাঁদতে পারি না, সেটা খুব অসম্মানের ব্যাপার, তাই দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হাতে ব্যাট আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর, সুযোগ মিলবামাত্র, এমনভাবে চলে এলুম, যেন কিছুই হয়নি। ফলে মুখরক্ষা হল।

*　　*　　*

মথুরায় যদি স্থায়ীভাবে থাকতে হত, তাহলে নিশ্চয় জায়গাটা আমার ভাল লাগত না। কিন্তু মাঝে-মধ্যে যেতুম তো, তাই বেশ ভালই লাগত। গত দেড় বছরে বার-ছয়েকের বেশী আমরা মথুরায় গিয়েছি। কখনও দু-চার দিনের জন্য, কখনও-বা আরও লম্বা ছুটি নিয়ে। সেখানকার বিখ্যাত সমস্ত মন্দির আমি দেখেছি। মন্দিরে যেতে আমার খুব ভাল লাগত। কিন্তু হাতজোড় করে বিগ্রহের সামনে নত হতে আমার বড় অস্বস্তি হত। কেমন যেন বোকা-বোকা লাগত নিজেকে। নিজেকে বোঝাতুম যে, এ তো আর কিছুই নয়, একটা প্রথা মাত্র, সবাইকে যা কিনা পালন করতে হয়, অন্য-কোনও তাৎপর্য এর নেই। কিন্তু শরীর সে-যুক্তি মানতে চায় না। এমন কী, মন্দির-পুরোহিতের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবেও না।

আমাদের নিজেদের মন্দির; এ-সব সমস্যা নেই। মনের আনন্দে তার চত্বরে

আমি ঘুরে বেড়াই। দিনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের পুজোর্চনার অনুষ্ঠান হয় সেখানে। তখন আমার উপস্থিত থাকা চাই-ই। পুজো-আচ্চায় আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু এইসব আচার-অনুষ্ঠান, কিংবদন্তী, পুরাণ-কথা—এ আমার ভালই লাগে। একদিকে আমি যে অজ্ঞাবাদী, আবার অন্যদিকে সেই আমিই যে ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠান ও আচারের রহস্যে ডুব দিচ্ছি—এর মধ্যে কোনও বিরোধ আছে বলে আমার মনে হয় না মন্দিরের কৃষ্ণমূর্তি অষ্টধাতু দিয়ে গড়া। মথুরায় তো কত মন্দির, কিন্তু এত সুন্দর কৃষ্ণমূর্তি আর একটিও নেই। কিন্তু পিতলের রাধা-মূর্তিটিকে সেই তুলনায় বিচ্ছিরিই বলতে হয়। দুটি মূর্তির মধ্যে বৈষম্য এত প্রকট যে, লোকের চোখে না-পড়ে পারে না। খোঁজ নিয়ে জানলুম, মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে রাধা আর কৃষ্ণ দুজনেরই ছিল অষ্টধাতুর মূর্তি। তা একদিন পুরোহিত যখন বিগ্রহ দুটিকে স্নান করাচ্ছেন, সেই সময়ে রাধার মূর্তিটি তাঁর হাত ফসকে পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। ভাঙা মূর্তি জোড়া দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে কী হবে? তাই নিয়ে তো পণ্ডিতদের মধ্যে মহা তর্ক বেধে গেল। কৃষ্ণমূর্তি ভাঙেনি, কিন্তু একইসঙ্গে যে রাধা-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, সেটি ভেঙেছে, অর্থাৎ সেটি আর জীবন্ত নয়। তাহলে কি নতুন একটি রাধা-মূর্তি বানিয়ে অটুট বিগ্রহটির সঙ্গিনী হিসাবে তাকে প্রতিষ্ঠা করা হবে? নাকি দুটি মূর্তিই আবার নতুন করে বানানো হবে? তাই যদি হয়, তবে পুরনো কৃষ্ণমূর্তিটিকে কী করা হবে? সেটি তো আর ভাঙেনি। তর্ক নাকি এতদূর গড়িয়েছিল যে, বারাণসী আর কাশ্মীরীদের পুণ্য-নগর মাটান থেকে পাঁতি আনতে হয়। শেষ পর্যন্ত সেই পুরনো কৃষ্ণমূর্তিটির পাশে এই নতুন রাধামূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল। তার আগে যথাবিহিত পুজা-প্রার্থনা ইত্যাদি করে নেওয়া হয়েছিল, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

গ্রীষ্মকালে, দিনের কাজকর্ম শেষ হবার পরে, আমরা সবাই ছাতে চলে যেতুম। ঘুমোতুম সেখানেই। ছাতের উপরে সারি-সারি চারপাই পাতা থাকত। ব্রিজ খেলার পরেই বাবার মস্ত নেশা ছিল তর্ক আর আলোচনায়। মথুরার বাড়িতে থাকতেন বাবা সুধানন্দজী। কীভাবে, কোন্ সূত্রে তিনি সেখানে এসে জুটেছিলেন, তা আমি জানি না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, মথুরায় গেলেই তাঁকে দেখতে পেতুম। আমার এক বিধবা মাসীও তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে সেখানে থাকতেন। একজন স্বামী থেকে বিচ্ছিন্না, অন্যজন কুমারী। আমার দিদিমাও ইতিমধ্যে স্থায়ীভাবে সেখানে এসে উঠেছিলেন। তা ছাড়া আরও বেশ-কিছু লোক সেখানে থাকত। কেউ বা স্থায়ীভাবে, কেউ বা দু-চার দিনের জন্য। আসলে এই বাড়িটা ছিল দুঃস্থ আর অনাথাদের আশ্রয়স্থল। তা যে-কথা হচ্ছিল। ছাতে গিয়ে, বিছানায় শুয়ে কিংবা বসে, নানান রকমের ধর্মীয় আলোচনা হত। তার মধ্যে একটা প্রসঙ্গ প্রায়ই উঠত। ব্যক্তি-মানুষের উদ্ধার কীভাবে সম্ভব। আলোচনার সময় যে যা বলতেন, আমি খুব মন দিয়ে শুনতুম, এবং তার থেকে একটা সিদ্ধান্তও করতুম। নিজে কিছু বলতুম না। তবে সুধানন্দজীকে যখন একলা পাওয়া যেত, তখন তাঁকে নানান রকমের প্রশ্ন করে জ্বালিয়ে মারতুম। নিঃসঙ্গ মানুষ, আমার সঙ্গ তাঁর ভালই লাগত, আমাকে নানারকম জ্ঞানও তিনি দিতেন, কিন্তু তাঁর কথাবার্তা আমার বিশেষ পছন্দ হত না।

দিল্লিতে ছেলেবেলায় নানীর সঙ্গে সেই যে একবার এক মাতাজীর কাছে গিয়েছিলুম, তিনিও তখন মথুরায় বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন। নিজের বাড়িতে ভক্তদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে দিন কাটান। আমার মাসতুতো বোনও তাঁর মস্ত ভক্ত। তাঁর কাছে যেতে আমার বিশেষ উৎসাহ হত না। একে তো বোকা-বোকা কথাবার্তা, তার উপরে চেহারাও বিচ্ছিরি। কী জানি কেন, আমার মনে হত

যে, আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সৌন্দর্যেরও একটা যোগ থাকা চাই। তা সে যাই হোক, তাঁর সম্পর্কে নানারকম গল্প শুনতুম তো; সে-সব শুনতে আমার ভালই লাগত।

অধ্যাত্মসাধনার প্রথম কথাই হল বৈরাগ্য। আসক্তি পরিহার করা চাই। ক্ষুৎ-পিপাসা-শীত-গ্রীষ্মের বোধকে জয় করতে হবে। তবেই সম্ভব হবে ইন্দ্রিয়কে জয় করা। মাতাজী যখন পুরোপুরি সন্ন্যাসিনী হয়ে ওঠেননি, আমার মাসী তখন তাঁর কাছে থাকতেন। তাঁর কাছে শুনেছি, যৌগিক সংযমসাধনার অঙ্গ হিসেবে মাতাজী একবার গোটা শীতকালটা কোমর-অবধি জলের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। তারপর যা করলেন তা আরও ভয়ংকর। মে আর জুন মাসে মথুরায় তাপাঙ্ক তো ছায়াতেও ১১২° ডিগ্রীর নীচে নামে না, সেই মারাত্মক গরমের মধ্যে মাতাজী নাকি গোটা গ্রীষ্মকালটা কাটালেন তাঁর বাড়ির খোলা ছাতে। ভর-দুপুরে তাপাঙ্ক যেখানে কিনা ১২০° ডিগ্রীরও উপরে গিয়ে ওঠে। একবার তিনি নাকি সর্বরকম আহার্য পরিত্যাগ করেছিলেন; সারাদিনে শুধু এক গেলাস দুধ ছাড়া আর কিছুই তিনি খেতেন না। শুধু ওই দুধ খেয়েই তিনি নাকি তিন মাস না তিন বছর দিব্যি কাটিয়ে দিলেন। তা ঐহিক দুঃখকষ্ট কি পরিবেশ যে-অবস্থায় মানুষকে প্রভাবিত করে, সেই অবস্থা তো তিনি পেরিয়ে এসেছেন, তাই এখন তিনি যেভাবে খুশি জীবনধারণ করতে পারেন, ইচ্ছেমত খাওয়া-দাওয়া করতে পারেন, দামী-দামী শাড়ি-গয়না পরতে পারেন, তাতে আর তাঁর উপরে কোনও প্রভাব পড়বার আশংকা নেই। কী খাচ্ছেন, কী পরছেন, তাতে আর তাঁর কিছু আসে যায় না। সর্বরকম অভাব-কষ্টের বিরুদ্ধে নিজের চিত্তকে তিনি দারুণ রকমের কঠিন করে ফেলেছেন যে। ভক্তেরা তাঁকে কী খেতে দিল, কী পরতে দিল, সে দিকে কোনও হুঁশই তাঁর নেই। বাহ্যিক পরিবেশের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে অন্তর-চেতনার রাজ্যে তিনি এখন বেঁচে আছেন। কিন্তু তাঁর ভক্তেরা তো আর সেই পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি, মাতাজীর জন্যে নানা রকমের বিলাস-দ্রব্য জুগিয়ে তাই তারা আনন্দ পায়। তা পাক, মাতাজীর তাতে কোনও ক্ষতি হবার নয়।

এ-সব কথা আমার মনে খুব গভীরভাবে দাগ কাটত। এই একটা বদ্ধমূল বিশ্বাস আমার জন্মেছিল যে, ত্যাগের পথেই শক্তিমান হওয়া যায়। তা সেই শক্তিকে যে-নামই দেওয়া হোক। নিজের উপরে এই নিয়ে কিছু পরীক্ষাও তখন চালিয়েছি। গান্ধীজীর জন্মদিনে আমি সেবারে চব্বিশ ঘণ্টা অনশন করলুম; তার মধ্যে শুধু জল ছাড়া আর কিছু আমি খাইনি। গান্ধীজীর পরবর্তী জন্মদিনে উপবাস করলুম তিন দিনের জন্য। তাতে আমার কিছু ক্ষতি হল না। পাছে পিত্ত পড়ে, তাই মাঝে-মাঝে চা কি লেবুর রস খেতুম। তিন দিন উপবাস করে আছি, অথচ দৈনন্দিন কাজকর্ম কোনওটাই বাদ দিচ্ছি না, নিয়মিত কলেজ করছি, খেলছি, বেড়াচ্ছি, এতে একটা মস্ত-বড় সাফল্যের আনন্দ পাওয়া গিয়েছিল। কী যে তৃপ্তি পেয়েছিলুম, তা বলবার নয়। দেহকে কষ্ট দিয়ে যে এক ধরনের লাভ হয়, এই সত্যে আমার বিশ্বাস জন্মেছিল। তাই বলে মাতাজীর সম্পর্কে যে-সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনতুম, এই যেমন আমার মাসী বলতেন যে, মাতাজীকে একেবারে স্বচক্ষে তিনি শূন্যে উড়ে বেড়াতে দেখেছেন, সে-সব আমি বিশ্বাস করতুম না।

বাবা সুখানন্দজীও তাঁর অল্পবয়সের নানা গল্প বলতেন। নানা অলৌকিক ক্ষমতার গল্প। কিন্তু তাঁর কথায় আমার প্রত্যয় হত না। যোগবলে লভ্য নানা ক্ষমতার কথা তিনি শোনাতেন; বলতেন, যোগাভ্যাস করলে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যেও সব একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। আমার যে মাসতুতো বোন তখন মাতাজীর

কাছে থাকত, তার সম্পর্কেও সুখানন্দজী অনেক অদ্ভুত গল্প বলতেন। সুখানন্দজীর কাছে যোগাভ্যাস করে সে নাকি মাটিতে বসা অবস্থাতেই তিন-চার ফুট শূন্যে উঠে যেতে পারত। তা একদিন সে তো পদ্মাসনে বসে শূন্যে উঠে গিয়ে ধ্যান করছে, এমন সময় তার দিদি এসে ভুল করে হঠাৎ সেই ঘরে ঢোকে। দিদি তো আর বোনের যোগবলের কথা জানে না, বোনকে ওই অবস্থায় দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সে তো মহা চেঁচামেচি লাগিয়ে দিল। বোনের ধ্যান তাতে ভেঙে যায়, ফলে মাটিতে পড়ে গিয়ে সে খুব জখম হয়।

দিদিও ওই একই বাড়িতে থাকেন। কিন্তু যতই তাঁকে জিজ্ঞেস করি যে, কথাটা সত্যি কিনা, তিনি 'হ্যাঁ'-ও বলেন না, 'না'-ও বলেন না।

প্রেম-ভক্তিমার্গ, কর্মমার্গ আর জ্ঞানমার্গ, হিন্দু দর্শনে এই তিন মুক্তিপথের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি একেবারে অন্ধ বিশ্বাসের সামিল; তাতেই নাকি চটপট মুক্তি মেলে। তা আমার মনে হয়, মেয়েরা হয়ত এইজন্যেই এই পন্থার পক্ষপাতী। অন্যদিকে, আধুনিক চিন্তা-ভাবনার পটভূমিকায় যাঁরা প্রাচীন দর্শনকে বিচার করে দেখেন, তাঁদের অনেকেই বেছে নেন কর্মযোগের পথ। ইদানীং কালে টিলক আর গান্ধীজী কর্মযোগের কথা প্রচার করেছেন। আধুনিক মানুষদের, তাদের অনেকেই পুরুষ, এই পন্থা খুব ভাল লাগে। এ নিয়ে এত আলোচনা আমি শুনেছি যে, নিজেও আমি এ বিষয়ে ভেবে দেখতে বাধ্য হতুম। যতই ভাবতুম, ততই মনে হত, যার-যার কাজের মধ্যে দিয়েই মুক্তি মেলে। প্রেমমার্গে কোনও আস্থাই আমার ছিল না। অন্যদিকে, আমার মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগত, কর্মমার্গ আর জ্ঞানমার্গের মধ্যে সত্যিই কি একটা বিভেদ-রেখা টানা সম্ভব? আমার কাছে তারা একে অন্যের সহযোগী, পরস্পরের পরিপূরক। জ্ঞান ছাড়া কর্ম সম্ভব হবে কীভাবে? ব্যাপারটার তো কোনও অর্থই হয় না। এ সম্পর্কে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে যে-সব কথাবার্তা শুনতুম, তার অনেকটাই আমার মনের মধ্যে গেঁথে যায়। এ সম্পর্কে আমি নিজেও চিন্তা-ভাবনা কিছু কম করতুম না। ধর্মীয় যে-সব আলোচনা হত, তাতে করে হিন্দু ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা আমার জন্মায়। আর-কিছু না হোক, তার মধ্যে চিন্তা-ভাবনার অনেক খোরাক মিলত।

সেই যে আমার মায়ের এক কাকার কথা বলেছিলুম, এককালে তিনিই ছিলেন আমার মায়ের অভিভাবক, তা তিনিও মাঝে-মাঝে মথুরায় এই বাড়িতে এসে থাকতেন। ধর্মীয় আলোচনা শুরু হলে আর রক্ষে নেই, তক্ষুনি তিনি তর্কে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, আর আবহাওয়াও অমনি তপ্ত হয়ে উঠত। ব্যাপার দেখে খুব মজা লাগত আমার। আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা নিয়ে তিনি সন্ন্যাসী হননি, কিন্তু বৈরাগ্যের প্রতীক হিসেবে তিনি গেরুয়া ধরেছিলেন। নিজেকে তিনি বলতেন কর্মযোগী। যে-সব মেয়ে অন্ধ-বিশ্বাসের পথ আঁকড়ে ধরে, তাদের তিনি খুব ঠাট্টাবিদ্রূপ করতেন। কিন্তু যেমন তাঁর সর্বব্যাপারে, তেমনি তাঁর কর্মযোগেও একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। বাড়ির সবাই তাঁকে বাবাজী বলত। তা দুই বাবাজীতে তো ধুন্ধুমার লড়াই লেগে যেত। অন্য সবাই তখন একেবারে চুপ। দুজনে দুজনকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করছেন, সে খুব মজার ব্যাপার। তবে লড়াই বেধে গেলে ধর্মীয় আলোচনা চাপা পড়ে যেত, সেটা আমার ভাল লাগত না। এ-সব লড়াই আসলে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ থেকে লাগে তো; এটা আমার খুব খারাপ লাগত।

সেবারেই হোক কি তার পরে কখনও হোক, মনে পড়ে, প্রসঙ্গত খুব জোরের সঙ্গে বাবাজীকে একদিন আমি বলেছিলুম যে, অল্প কিছুদিনের জন্যে পরিপূর্ণভাবে বাঁচাতেই আমার বিশ্বাস; বার্ধক্যকে আমি ঘৃণা করি। বাবাজী আমাকে জিজ্ঞেস

করলেন, কত বছর বয়সে মানুষ বুড়ো হয় বলে আমার ধারণা। তাতে, আমার উত্তরের অর্থটা কী দাঁড়াতে পারে, সেদিকে খেয়াল না করে আমি বললুম, "যে-কোনও মানুষের পক্ষে পঞ্চাশ বছর বাঁচাই তো যথেষ্ট।" শুনে বাবাজী তো হাঁ হয়ে গেলেন। তার কারণ, তাঁর বয়স তখন ষাটের কাছাকাছি। আমার চোখে তাঁকে বেশ বুড়োই দেখাত। আমার উত্তরটা যে অতি গর্হিত ঠেকতে পারে, এমন কথা আমার মনেই হয়নি।

আর-একদিনের কথা মনে পড়ে। দুই বাবাজীকে সঙ্গে নিয়ে তাজমহলের অন্দরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। মাঝখানে আমি, দুইদিকে দুই বাবাজী। তাঁরা আগ্রায় বেড়াতে এসেছিলেন, তাই আমি তাঁদের ওই বিশ্ববিখ্যাত স্মৃতিসৌধটি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলুম। সুখানন্দজী আমার বাঁ দিকে। তাজমহলের সৌন্দর্য আর মহিমায় তিনি তো একেবারে অভিভূত। নিষ্কলঙ্ক শ্বেতমর্মর, তাব শোভা যেন এই সৌধকে এক অপার্থিব মহিমা দিয়েছে। কীভাবে যে তার প্রশংসা করবেন, সুখানন্দজী তা যেন বুঝেই উঠতে পারছিলেন না। কথাই খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। অন্য বাবাজীটি দেশপ্রেমিক এক সমাজবাদী। তিনি আমার ডান দিকে। তাঁর প্রতিক্রিয়া একেবারে উলটো। নিজের ব্যক্তিগত মহিমা বাড়াবার জন্যে, প্রজাদের বঞ্চিত করে, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলে এই সৌধ বানিয়েছেন, সম্রাটকে তার জন্যে যে কী ভাষায় ধিক্কার দেবেন, তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না সেইটে। তাঁর মতে, সম্রাট নিতান্ত নির্বিবেক লোক, স্ত্রীকে ভালবাসতেন বলে শ্রমিকদের শোষণ করে এই সৌধ তুলেছেন; তার উপরে আবাব তাঁব এই ভয ছিল যে, ভবিষ্যতে কেউ এই রকমের একটা সৌধ বানিয়ে ফেললে তাঁর মহিমা খর্ব হবে। সেই কারণে, যে-সব শিল্পী এই সৌধ নির্মাণ করেছিলেন, নির্মাণকার্য শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সম্রাট তাঁদের হাত কেটে ফেলেন। এই একটা অন্তঃসারশূন্য অট্টালিকা নির্মাণ করতে খরচ তো আর নেহাত কম হয়নি, সেই টাকায প্রজাদের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়াবার জন্যে কত ভাল-ভাল সব কাজ করা যেতে পাবত। তা এই বাবাজীটির কাছে তাজ একটা নিদারুণ বিভীষিকাব ব্যাপার। নারীর প্রতি ভালবাসাব মতন তুচ্ছ একটা ব্যাপার, তারই জন্যে কিনা হাজার-হাজার শ্রমিকের রক্ত শোষণ করা হয়েছে। এই তাজ সেই শোষণের স্মারক।

আগ্রায থাকতে কতবার যে তাজে গিয়েছি। প্রথম যখন আগ্রায় আসি, তখন গিযেছিলুম নিজেরা দেখতে। তারপরে এটা যেন একটা রুটিন হয়ে দাঁড়াল। বাড়িতে কেউ আত্মীয়স্বজন বেড়াতে এলেই তাকে তাজ দেখাতে নিয়ে যেতে হয়। জ্যোৎস্না-রাতে তাজে যেন হাজার হাজার লোকের মেলা বসে যায়। তখনও তাজ দেখেছি, আবার চন্দ্রহীন রাতে তারাব আলোতেও চাঁদ দেখেছি। দেখেছি বর্ষা-দিনের পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘেব পটভূমিকাতেও। সূর্যোদয়েব সময় দেখেছি। আবার সূর্যাস্তের সময়েও দেখেছি। রাত দুটো থেকে ভোর পাঁচটা, এই ক' ঘণ্টা ছাড়া দিন-রাত্রিতে এমন সময় বোধ হয় নেই, যখন আমি তাজ দেখিনি। মানুষের অফুরন্ত মিছিলে মিশে গিয়ে তাজ দেখেছি। বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখেছি। একেবারে অপরিচিত মানুষের সঙ্গেও দেখেছি। কারও দরকার হলে আমরা একজন গাইড ঠিক করে দিতুম। গাইডদের বলা প্রতিটি কাহিনী আমি জানতুম, প্রতিটি বর্ণনা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এমনও হয়েছে যে, গাইড মুখ খুলবার আগেই আমি গড়গড় করে সব বলতে লেগে গেছি। তাতে একজন গাইড একবার খুব রেগে গিয়ে বলেছিল যে, তার এলাকায় অন্যায়ভাবে আমি নাক গলাচ্ছি। যাই হোক, যে-কথা বলছিলুম। এতজনের সঙ্গে এতবার তাজ দেখেছি, কিন্তু দুই সঙ্গীর একেবারে পরস্পরের বিপরীত এই প্রতিক্রিয়া—এমন অভিজ্ঞতা আর কখনও আমার হয়নি।

মাঝে-মাঝেই মথুরায় যেতুম; কিন্তু তার আশপাশের জায়গাগুলোকে ইতিপূর্বে

দেখা হয়নি। সেবারে বড়দিনের সময় মথুরায় যাওয়া হল, হাতে বেশ কয়েকদিনের ছুটি রয়েছে, তাই সবাই ঠিক করলুম যে, গোটা অঞ্চলটা বেশ ভাল করে ঘুরে দেখব। যাতায়াতে তা প্রায় একশো কুড়ি মাইল। প্রতিটি জায়গা রাধাকৃষ্ণের লীলা-কাহিনীতে ভরা। গিরি-গোবর্ধন দেখলুম। ছোটখাটো পাহাড়। প্রধান দেবতা হিসেবে পুজো পাননি, ইন্দ্র তাই রেগে গিয়ে প্রবল বর্ষণ নামিয়েছিলেন, কৃষ্ণ সেই সময় কড়ে-আঙুলে এই পাহাড়টিকে ধারণ করে মথুরার লোকদের রক্ষা করেন। সেখান থেকে গেলুম নন্দগাঁওয়ে। এই গ্রামেই জীবন কেটেছিল নন্দ আর যশোদার; এইখানেই দুই নবজাত শিশু কৃষ্ণ আর যোগমায়াকে অদল-বদল করে নেওয়া হয়েছিল; এইখানেই কৃষ্ণ তাঁর বালকবয়সে গোরু চরাতেন। বৃন্দাবনেও সেবারে গিয়েছিলুম। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে কৃষ্ণ সেখানে গোরু চরাতে যেতেন। সেখানেই তিনি গোপীদের নিয়ে একটানা বাহান্ন দিন নৃত্য করেছিলেন। সেই 'মহা-রাস' উপলক্ষে কৃষ্ণ করেছিলেন কী, বাহান্ন দিনকে একটি অতিদীর্ঘ রাত্রিতে পরিণত করেছিলেন; ফলে, নন্দগাঁও আর বৃন্দাবনের মানুষরা টানা বাহান্ন দিন ঘুমিয়ে রইল, তাদের স্ত্রীরা যে নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করে কৃষ্ণের সঙ্গে গিয়ে নৃত্যলীলায় যোগ দিয়েছে, তা তারা টেরও পেল না। রাধাকৃষ্ণের লীলার সঙ্গে জড়িত আরও অনেক জায়গায় সেবারে গিয়েছিলুম। যেখানেই যাই, পুরাণ, লোককথা, কাহিনী-কিংবদন্তী, ধর্ম আর দর্শনের ছড়াছড়ি। পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে সব একাকার হয়ে গেছে।

* * *

কবে কিংবা কীভাবে যে ব্যাপারটা প্রথম জেনেছিলুম, আজ আর তা মনে নেই, তবে ১৯৩৮ সনের জানুয়ারিতেই আমি আঁচ করেছিলুম যে, এই রকম একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। ভীষণ ধাক্কা লেগেছিল আমার মনে। তার কারণ, মায়ের যে আবার বাচ্চা হতে পারে, তা আমি কল্পনা করতে পারিনি। ভাবতেই বিচ্ছিরি লেগেছিল। কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল, মায়ের বাচ্চা হবে কিনা। তাতে আমি ভারী অস্বস্তি বোধ করেছিলুম; ব্যাপারটা জানা সত্ত্বেও মিথ্যে করে বলেছিলুম যে, আমি জানি না। কেন যে আমার এই রকমের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, বোঝা শক্ত। হেতুটা নিশ্চয় ঈর্ষা নয়। কেননা, বাড়ির মধ্যে আমিই সবচেয়ে ছোট থাকব, এমনটা আমি কখনও চাইনি। ছোট থেকে যে আমার বিশেষ-কিছু সুবিধে হচ্ছে, তা আমার মনে হত না। বাড়িতে আর-একটা বাচ্চা হলে মায়ের স্নেহ-মমতা আর আগের মত পাওয়া যাবে না, এমন আশঙ্কাও আমার ছিল না, কেননা ও-বস্তু আমি আগেই হারিয়েছিলুম। আসলে আমার মনের মধ্যে হয়ত এই নিয়ে নানা জটিল চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়ে থাকবে। যার ফলে আমার মনে হয়েছিল যে, বুড়ো বয়সে এই যে আমার বাবা-মায়ের আবার বাচ্চা হতে যাচ্ছে, এটা খুবই অমর্যাদাকর একটা ব্যাপার। আসলে কিন্তু, আমার চোখে তাঁদের যতই বুড়ো ঠেকুক, আমার মায়ের বয়স তখন মাত্রই সাঁইত্রিশ বছর, অর্থাৎ তাঁর যৌবন তখনও যায়নি। তবে, যে-বাচ্চা হতে চলেছে, আমার সঙ্গে তার বয়সের পার্থক্য দাঁড়াবে পনর বছরেরও বেশী। যা কিনা একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার।

এর অনেক দিন বাদে দিদিকে একবার জিজ্ঞেস করি যে, মায়ের যে আবার বাচ্চা হবে, এই কথাটা প্রথম জানবার পর তার মনের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল। দিদি তাতে অবাক হয়ে বলল, "কেন, আমি বেশ খুশীই হয়েছিলুম। বিশেষ করে যখন শুনলুম যে, ছেলে হয়েছে, তখন তো আমি আহ্লাদে আটখানা। ভাবলুম যে, যাক, এতদিন আমাদের ভাই বলতে কিছু ছিল না, এবারে একটি ভাই হল।" দিদির কথা শুনে আমি আর কিছু বললুম না। শুধু চুপ করে ভাবতে লাগলুম যে, প্রতিটি ব্যাপারেই আমাদের

প্রতিক্রিয়ায় এমন পার্থক্য ঘটে কেন।

বাচ্চা হবার ব্যাপার নিয়ে প্রবীণরা অতি খোলাখুলিভাবে কথা বলতেন। এ-ব্যাপারে কোনও সঙ্কোচই তাঁদের ছিল না। দেখে আমার অবাক লাগত। আর-কিছু না হোক, অল্পবয়সী অবিবাহিত মেয়েদের সামনে এ-সব কথা বলবার সময় তাঁরা একটু সামলে-সুমলে চলবেন তো, কিন্তু তাও তাঁরা চলতেন না। এই উপলক্ষে দিদিমা তখন মধুরা থেকে আগ্রায় এসে আমাদের সঙ্গে আছেন। তা তিনি আর ঠাকুমা দেখতুম আমাদের উপস্থিতিকে গ্রাহ্যই করতেন না; কবে তাদের বাচ্চা হয়েছিল, কবে তাদের বাচ্চা কীভাবে নষ্ট হয়ে যায়, সবিস্তারে এবং বেশ উৎসাহের সঙ্গে এ-সব কথা তাঁরা বর্ণনা করতেন। গলাটা একটু নামিয়ে তাঁরা কথা বলতেন বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হত না, ঘরসুদ্ধ সবাই তাঁদের কথা শুনতে পেত। এবং সেই কথায় সহসা ছেদ পড়ত না। অস্বস্তিতে আমার কর্ণমূল লাল হয়ে উঠত। কে কবে মরা বাচ্চা বিইয়েছিলেন, তার ন্যক্কারজনক অনুপুঙ্খ বর্ণনা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগত না। কিন্তু কে কী মনে করছে, সেদিকে তাঁদের কোনও ভ্রূক্ষেপই যেন নেই, বসে বসে অবিশ্রান্ত তারা এইসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতেন। সে-সব কথা না-শুনে কোনও উপায়ও আমার ছিল না। আমাদের বয়সী মেয়েদের তো একা একঘরে ঘুমোতে দেওয়া হত না, তাই দিদি আর আমি একই ঘরে ঘুমোতুম, তা ঠাকুমা আর দিদিমাও সেই ঘরেই থাকতেন, ফলে বাধ্য হয়েই তাঁদের এইসব কথা আমাকে শুনতে হত। ভিতরে-ভিতরে খুব রেগে যেতুম, কিন্তু কানে তুলো গুঁজে তো আর থাকা যায় না, তাই শেষপর্যন্ত আশ্রয় নিতুম বইয়ের। বই যেন এক দুর্ভেদ্য দুর্গ, তার মধ্যে আশ্রয় নিলে আর ভাবনা নেই, কোনও কথাই আর তার মধ্যে এসে ঢুকতে পাবে না।

* * *

কলেজের লাইব্রেরিয়ান একদিন ঠাট্টা করে আমাকে বলেছিলেন, "এত সব বই তো আর তুমি পড়বে না, পড়বার কোনও ইচ্ছেও তোমার নেই, তবে আর কষ্ট করে এগুলো লাইব্রেরির থেকে বাড়িতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছ কেন?" কথাটার অর্থ আমার বোধগম্য হল না; তাই সরলভাবে বললুম, "কিন্তু আমি পড়ি তো।"

প্রতি শনিবার কলেজ থেকে বাড়ি ফিরবার সময় লাইব্রেরি থেকে একখানা বই নিই, তারপর সোমবার সকালে কলেজে এসেই ফিরিয়ে দিই সেখানা। সপ্তাহের অন্যান্য দিনও যে বই নিই না, তা নয়। পাঠক হিসেবে আমি মনোযোগী, শুধু পাতা উলটোই না, প্রতিটি বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি। আমি প্রকৃতিপ্রেমিক নই, প্রাকৃতিক দৃশ্যের দীর্ঘ বর্ণনা আমার ক্লান্তিকর লাগে, লেখকের উদ্দেশে বলতে ইচ্ছে করে, "অর্থহীন এইসব বর্ণনা দিয়ে পাতা ভরাচ্ছ কেন বাপু, গল্পটাকে দয়া করে এগিয়ে নিয়ে যাও না।" উপন্যাস সম্পর্কে আমার প্রত্যাশা এই যে, তাতে একটা কাহিনী আর প্রচুর সংলাপ থাকা চাই, ধোঁয়াটে সব বর্ণনা কিংবা স্বগতোক্তির সেখানে স্থান নেই। প্রকৃতির বর্ণনা যেখানে একেবারে অসহ্য, সেখানে মাঝে-মাঝে দু-চার পাতা বাদ দিয়ে পড়তুম, নয়তো কোনও-কিছু বাদ না-দিয়ে বই পড়াই আমার স্বভাব। সপ্তাহান্তে যে ছুটি পাই, মোটামুটি আয়তনের একখানা উপন্যাস শেষ করবার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। এই সময়ে আমি ধ্রুপদী সব উপন্যাসগুলি পড়তে শুরু করেছিলুম। একটার-পর-একটা বই পড়ে যাই। তাই বলে যে অন্যান্য কাজে অবহেলা করতুম, তা নয়। বাড়ির কাজকর্ম যথাসময়ে করি; খেলাধুলো করি; বেড়াতে যাই; বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিই; কিন্তু এত সবের পরেও দেখি যে, দেড়দিনের মধ্যেই এক-একখানা উপন্যাস শেষ হয়ে যাচ্ছে।

অথচ এমনভাবে আমি পড়তুম যে, কেউ কখনও আমাকে বইয়ের পোকা ভাবেনি। বই পড়তে যে আমার এত আগ্রহ, বাড়ির লোকেরা সে-কথা জানতই না। কোনও কাজেই তো ফাঁকি দিচ্ছি না, আর-সব কাজ ফেলে রেখে অসময়ে বইয়ের মধ্যে ডুবে আছি, এমনটা কেউ কখনও দেখেনি। ফলে, আমার সম্পর্কে সেই যে একটা ধারণা আমাদের বাড়িতে গড়ে উঠেছিল, তার আর কোনও পরিবর্তন ঘটল না। হৈচৈ করে তো আর বই পড়ি না, চুপচাপ পড়ে যাই। কিন্তু, বাড়ির লোকের চোখে না পড়লেও, আমার এই বই পড়বার অভ্যাসটা লাইব্রেরিয়ানের চোখ এড়ায়নি। এত এত বই পড়ছি, এ যেন তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। চমকপ্রদ বইয়ের দিকে আমার ঝোঁক ছিল না। সাধারণত লোকে যা পড়ে থাকে, তা-ই পড়তুম। তবে ছাত্রদের মধ্যে পাঠ্যবই ছাড়া অন্য সব বই পড়বার ঝোঁক বিশেষ ছিল না তো, এই কারণেই লাইব্রেরিয়ানের চোখে আমি একটু আলাদা রকমের মেয়ে বলে গণ্য হয়েছিলুম।

এমন কোনও মাপকাঠি আমার ছিল না, যা দিয়ে আমি তখন সাহিত্যের বিচার করতে পারি। সবটাই ছিল ব্যক্তিগত ভাল লাগা-না-লাগার ব্যাপার। যা আমার ভাল লাগত, তা-ই পড়তুম। যা লাগত না, তা পড়তুম না। লেখকের নাম দেখে আমি বই বাছাই করতুম না। এ-ব্যাপারে কোনও পূর্ব-সংস্কার ছিল না তো, তাই পড়তে ভাল না-লাগায় অনেক নামী লেখকের বইও আমি বাতিল করেছি, আবার সেই তুলনায় অখ্যাত অনেক লেখকের বই পড়েও মুগ্ধ হয়েছি। এই একটা ব্যাপার সেই সময়ে আবিষ্কার করি যে, বিখ্যাত নানা বইয়ের যাঁরা লেখক, তাঁদের অনেকেই অমন অসামান্য বই আর দ্বিতীয়টি লিখতে পারেননি। কারও একখানা বই হয়ত আমার দারুণ ভাল লাগল; স্বতঃই মনে হত, তাঁর পরের বইখানা হয়ত আরও ভাল হবে। কিন্তু হা হতোস্মি, প্রায়ই দেখতুম যে, পরের বইটি আগের বইয়ের তুলনায় অনেক খারাপ। জর্জ এলিয়টের কথাই ধরা যাক। এই ভদ্রমহিলার লেখা 'মিল অন দি ফ্লস' পড়ে তো আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু 'রমোলা' পড়তে বসে শতখানেক পৃষ্ঠার পরে আর আমি এগোতে পারিনি। কিংবা শার্লোট ব্রন্টের কথাই ধরুন। তাঁর 'জেন এয়ার' অতি আশ্চর্য বই। কিন্তু অন্য-সব উপন্যাস আমার বিশেষ ভাল লাগেনি। কিংবা থ্যাকারে। তাঁর 'ভ্যানিটি ফেয়ার' অবশ্যই একখানা কালজয়ী বই। কিন্তু অন্যান্য সব বইয়ের এমন কী নামও তো আমাদের মনে পড়ে না। ভাবতুম, কেন এমন হয়। তখন তো ভাল বুঝতুম না, কিন্তু এখন বুঝতে পারি যে, কোনও উপন্যাসের মধ্যে যে-গুণটা আমার সবচেয়ে ভাল লাগত, তা হল আবেগের নিবিড়তা। যার মধ্যে এই গুণের সন্ধান পেতুম, তা-ই আমার কাছে ভাল উপন্যাস। হয়ত সেই কারণেই দস্তয়েফস্কির 'ইডিয়ট' আর এমিলি ব্রন্টের 'য়ুদারিং হাইট্‌স' পড়ে আমি অভিভূত বোধ করেছিলুম। অন্য কোনও বই পড়ে অতটা অভিভূত আমি হইনি। আবেগের ওই নিবিড়তাকে কি বেশীদিন ধরে রাখা যায় না? একখানা বই লেখবার পরেই কি সেই আবেগ থিতিয়ে যায়? যাই হোক, সাহিত্যপাঠে আমি তখন এতই মগ্ন যে, কলেজের পড়াশুনোর কিছু ক্ষতি হচ্ছিল। ভাল করে প্রস্তুত না-হয়েই ফার্স্ট ইয়ারের বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে দিলুম।

* * *

এপ্রিলের শেষ তারিখে আমাদের কলেজে গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি শুরু হয়ে যায়। সেই দিনই আমার ভাই ভূমিষ্ঠ হল। জন্মের আট ঘণ্টা পরে ভাইকে আমরা দেখতে গেলুম। গোলগাল বাচ্চা, দারুণ সুন্দর দেখতে। দেখবামাত্র আমার খুব ভাল লেগে গেল। তাই বলে হাসপাতালে এসে মায়ের পরিচর্যা করবার কোনও উৎসাহ আমার ছিল না।

একান্নবর্তী পরিবার-প্রথার জের তখনও ঠিকমত কাটেনি বলেই হোক, কিংবা হাসপাতাল কি নার্সিং হোমে যাওয়ার যে-রীতি মধ্যবিত্ত সমাজে তখনও ঠিক চালু হয়নি, তার সম্পর্কে নানা সন্দেহ ছিল বলেই হোক, হাসপাতালে কোনও রোগীকে সাধারণত একলা ফেলে রাখা হত না, রোগীর কেউ-না-কেউ নিকটজন এসে দিবারাত্রি তার কাছে থাকত। ঠিক হল, মা যে ক'দিন হাসপাতালে আছেন, বাড়ির লোকেরা পালাক্রমে এসে সেই ক'দিন তাঁর কাছে থাকবেন। মা ছিলেন প্রাইভেট ওয়ার্ডে। নার্সিংয়ের ব্যবস্থা সেখানে ভালই। সুতরাং আমাদের এসে থাকবার কোনও দরকারই ছিল না। হাসপাতালে এসে বসে আছি, অথচ করবার কিছু নেই, আমার তাই খুব অস্বস্তি হত। রোজ অন্তত কয়েক ঘণ্টা এসে হাসপাতালে বেকার বসে থাকতে হচ্ছে, এটা আমার একটুও ভাল লাগত না। অথচ এর হাত থেকে পরিত্রাণও নেই। কলেজে তো গ্রীষ্মের ছুটি চলছে, তাই পড়াশুনোর অজুহাত দেখাব, তারই বা উপায় কী।

বাচ্চা নিয়ে মা যখন বাড়ি ফিরলেন, আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। বাচ্চাটার দেখাশোনা করতে আমার ভালই লাগত। সবচেয়ে ভাল লাগত তাকে চান করিয়ে দিতে। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, হাসপাতাল থেকে বাড়িতে আসবার দিন কয়েক বাদেই মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর বাঁ স্তনে একটা ফোঁড়া হয়েছিল। দিদি আর আমি, দুজনে তাঁর শুশ্রূষা করতুম। ফোঁড়ার উপরে মাঝে-মাঝে গরম পুলটিস লাগাতে হত; মনে পড়ে যে, একটা পর্যায়ে তাতে পালাক্রমে গরম আর ঠাণ্ডা সেঁকও দিতে হয়েছিল। মায়ের বুক তখন অনাবৃত, ওই অবস্থায় তাঁর এত কাছে বসে আছি, এতে আমার ভারী অস্বস্তি বোধ হত। কোনও রকমের নগ্নতাই আমি সহ্য করতে পারি না। এমন কী, নিজের নগ্নতাও আমার কাছে দুঃসহ। আমাদের বাথরুমে তো আয়না ছিল না, তাই নগ্ন চেহারা প্রতিবিম্বিত হবে, এমন আশঙ্কাই ছিল না সেখানে; তবু একেবারে বিবস্ত্র হয়ে স্নান করতে আমার খুব অস্বস্তি হত। এমন কী নিজস্ব বাথরুমেও, বছরের পর বছর, অন্তর্বাস খুলে আমি স্নান করতে পারিনি; ওই শুধু গা মুছবার সময়—নেহাতই অল্পক্ষণের জন্যে—অন্তর্বাস খুলে রাখতুম। যতক্ষণ না আবার শুকনো জামাকাপড় পরে নিচ্ছি, ততক্ষণ নিজের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারতুম না। নগ্নতা সম্পর্কে এই সংস্কার যে কবে থেকে, তা আমি জানি না। তবে সংস্কারটা একেবারে মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, মায়ের একটা অপারেশন না-করিয়ে উপায় নেই। হাসপাতালে তখন নির্ভরযোগ্য সার্জন ছিলেন মাত্র একজনই। কিন্তু তিনি পুরুষ। নারীশরীরের অমন একটা গোপন অঙ্গে অস্ত্রোপচারের ভার কিনা একজন পুরুষের হাতে ছেড়ে দিতে হবে, শুনে তো বাবা একেবারে হতবাক্। কিন্তু মাকে এ নিয়ে অযথা উদ্বিগ্ন হতে দেখিনি। তাঁর কথা, সার্জন পুরুষ না মেয়ে, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই; দেখতে হবে, সার্জন হিসেবে সে দক্ষ কিনা। শেষ পর্যন্ত মায়ের ইচ্ছাই জয়যুক্ত হল।

পরের দিনই হাসপাতাল থেকে মা আবার বাড়িতে ফিরলেন। তবে বাচ্চাকে খাওয়াবার কি তার দেখাশোনা করবার সামর্থ্য তাঁর তখন ছিল না। ভাইয়ের লালন-পালনের পুরোপুরি দায়িত্ব অতএব, তখনকার মতো, আমি আর দিদিই নিয়ে নিলুম। ঠাকুমা আর দিদিমা অবশ্য এ-ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতেন। তা ছাড়া শৈশবে যে মহিলা আমার দেখাশোনা করতেন, তিনিও ছিলেন।

হৃষ্টপুষ্ট স্বাস্থ্যবান বাচ্চা, ভোর চারটেয় সে তারস্বরে কান্না জুড়ে দেয়, তক্ষুনি তাকে খাওয়ানো চাই। আমাদের কাউকে সেই সময়ে ঘুম থেকে উঠে, বোতলে দুধ পুরে, বোতলটা তার মুখে লাগিয়ে দিতে হত। আমার পক্ষে এটাই সবচেয়ে দুরূহ কাজ। আমি রাত জাগতে পারি, কিন্তু অত ভোরে উঠতে পারি না। অত সাত-সকালে

উঠতে সারাটা দিন কেমন যেন ক্লান্ত লাগে। একদিন তো ব্রেকফাস্ট-টেবিলে বসে ক্লান্তিতে ঝিমোচ্ছি, তাই দেখে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী। আমি কিছু বলবার আগেই মা বললেন, "আর বোলো না! একদিন একটু সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠতে হয়েছে, বাস্, তারই জন্যে এত কাণ্ড!" কীভাবে আমার আঁতে ঘা দিতে হয়, মা যে সেটা ভালই জানতেন, তাতে আর সন্দেহ কী!

গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে ডালি তার বাবা-মা'র সঙ্গে কলকাতায় চলে গেছে। শেঠীরা গেছে জয়পুরে। কলেজ আর লাইব্রেরি বন্ধ। গ্রীষ্মের ছুটি যেন সেবারে আমার আর কাটতেই চায় না। রাতের পরে দিন আসে, দিনের পরে রাত, একঘেঁয়ে ভাবে সময় কাটতে থাকে। কলেজ খুলবার পরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

* * *

"বছরের পর বছর একজন মুসলমানকে আমরা কলেজ ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টের পদে বসিয়ে রেখেছি, এটা আমাদের হিন্দু সমাজের কলঙ্ক। আমি একজন হিন্দু। আপনিও তাই। সুতরাং ভোটটা এবারে অতি অবশ্য আমাকেই দেবেন।"

কথাগুলো ঠিক শুনেছি তো? কেউ এ-সব কথা ভাবতে পারে? এমন বেহায়ার মতো সে-কথা বলতে পারে? নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। উত্তেজিত হলে কিংবা রেগে গেলে আমার মুখ লাল হয়ে যায়। নিমেষে আমার সারা মুখ লাল হয়ে গেল। ভিতরে-ভিতরে ভীষণভাবে রেগে গিয়েছিলুম। সেই রাগটা কীভাবে প্রকাশ করব, বুঝে উঠতে পারছিলুম না। তাই চুপ করে রইলুম। এমন গ্লানিকর কথা এর আগে কখনও শুনিনি। ভাবছিলুম, কীভাবে ওকে ভর্ৎসনা করা যায়। ব্যাপারটাকে আমি ব্যক্তিগত একটা অপমান হিসেবে নিয়েছিলুম। আমার মনে হচ্ছিল, লোকটা আমাকে নিশ্চয় ভীষণ সংকীর্ণমনা এবং গোঁড়া মনে করে, তা নইলে আমাকে এ-সব কথা বলবার সাহস ওর হবে কেন! কেউ যে এ-সব কথা ভাবতে পারে, এটাই তো একটা লজ্জাকর ব্যাপার। তার উপরে আবার আমাকেও ও ওরই মতো অনুদার ভাবছে। এই অপমান সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। রাগে আমি ফেটে পড়লুম। ভীষণভাবে তিরস্কার করলুম লোকটাকে। বললুম যে, তার সঙ্গে কোনও সম্পর্কই আমি রাখতে চাই না। লোকটা আমার ভোট পাবে বলে আশা করেছিল কি করেনি, তা আমি জানি না। তবে এইভাবে যে ওকে তিরস্কৃত হতে হবে, তা নিশ্চয় ও ভাবেনি।

দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যার খবর যে আমি একেবারেই রাখতুম না, তা অবশ্য নয়। কাগজ খুললেই তো সেই সমস্যার খবর চোখে পড়ত। তিরিশের দশকের গোড়ার দিকে কানপুরে গণেশশংকর বিদ্যার্থীকে কীরকম বীভৎসভাবে হত্যা করা হয়েছিল, তাও আমার অজানা ছিল না। আমি শুনেছিলুম যে, যাদের বাঁচাবার জন্যে তিনি চেষ্টা করছিলেন, তারাই তাঁকে হত্যা করেছিল। উপরন্তু, ভারতে যে শাসনতন্ত্র তার আগের বছর চালু হয়, শুধু তার বিষয়েই যে আমাদের পড়তে হত, তা নয়, পৌরবিজ্ঞানের ক্লাসে ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসও ছিল আমাদের পাঠ্য বিষয়। তা মিণ্টো-মর্লি সংস্কারের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার বীজ উপ্ত হয়েছিল, শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে তার কিছু-না-কিছু উল্লেখ থাকতই। পরবর্তী প্রতিটি শাসনতন্ত্রে পৃথক-নির্বাচনব্যবস্থাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল মুখ্য বিষয়। সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

গত বছর আমাদের কলেজ ম্যাগাজিনে 'প্রবলেম অব্ লোভ্স অ্যান্ড ফিশেস' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। লেখক একজন মুসলিম ছাত্র। প্রবন্ধটি আমার

খুবে ভাল লাগে। তার কারণ, সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে নেহাতই ধর্মীয় সমস্যা হিসেবে না-দেখে মূলত অর্থনৈতিক একটি সমস্যা হিসেবে সেখানে দেখানো হয়েছিল। আমার কথা, ধর্ম নেহাতই ব্যক্তিগত ব্যাপার; অন্যত্র তার জের টানতে নেই। কলেজ ইউনিয়নের নির্বাচনে কেন ধর্মের জের টানা? এর তো কোনও অর্থই হয় না। হিন্দু ছেলেটির এই গোঁড়ামিকে আমি ব্যক্তিগত একটি বিচ্যুতি বলে গণ্য করেছিলুম; তার কথায় মধ্যে আমি, আসন্ন ঘটনার কোনও অশুভ ইঙ্গিত সেদিন দেখতে পাইনি। একটি মুসলমান ছাত্রই যে সেবারে আমাদের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হয়েছিল, তাতে আমি খুশীই হয়েছিলুম।

'বাড'-এর ফলাফল বেশ ভালই হচ্ছিল। ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের প্রথম বছরের পরীক্ষায় যে চারটি পুরস্কার দেওয়া হয়, তার মধ্যে তিনটিই সেবারে আমরা পাই। ইংরেজীতে পেল বাসন্তী, হিন্দীতে পেলুম আমি, আর ভূগোলে পেল ডালি। চতুর্থ পুরস্কার দেওয়া হয় সাধারণ জ্ঞানের জন্য। সেটাও যে দখল করা গেল না, তার জন্যে আমাদের ভারী দুঃখ। আমার বিবেচনায়, ইংরেজী, হিন্দী কি ভূগোলে পুরস্কার পাবার চেয়ে সাধারণ জ্ঞানে পুরস্কার পাবার মূল্য অনেক বেশী; হিন্দীতে পুরস্কার না পেয়ে সাধারণ জ্ঞানে পুরস্কার পেলে আমি অনেক বেশী খুশী হতুম। যাই হোক, চারটের মধ্যে তিনটে পুরস্কারই আমরা পেয়েছি। এ নেহাত কম কথা নয়। 'বাড'-এর স্থান একেবারে গোটা ক্লাসের শীর্ষে। কলেজে আমাদের খাতির যেন রাতারাতি বেড়ে গেল।

আমরা তিনজনেই খুব বন্ধু ছিলুম তো, তাই একের সাফল্যে অন্যে গর্ববোধ করতুম। আমাদের মধ্যে যে-কেউ কোনও পুরস্কার কিংবা স্বীকৃতি পাক, ধরে নিতুম যে, আমরা তিনজনেই তা পেয়েছি। আগের বছর অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো থেকে ডালিকে যখন দিল্লি যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, তখন একা ডালি নয়, আমরা তিনজনেই সমান উৎফুল্ল হয়েছিলুম। যেন সম্মানটা আমাদের তিনজনেরই; তিনজনেই আমন্ত্রিত হয়েছি। রেডিয়োতে গান গাওয়ার জন্যে ডাক পাওয়া,—ব্যাপারটা সম্মানজনক, তাতে আর সন্দেহ কী। ইদানীং অবশ্য ব্যাপারটা খুব মামুলী হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তখন তো আর এমন ছিল না। শুধু আমরা তিনজন বলেই বা কথা কী, গোটা কলেজই তো ডালির এই আমন্ত্রণের খবর শুনে দারুণ উত্তেজিত। ডালির যেদিন গান গাইবার কথা, কলেজে সেদিন সকালবেলার প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের আসর একেবারে ফাঁকা। ওই সময়েই বেতারে ডালির গান প্রচারিত হবে; কলেজে যাব কী, আমরা সবাই তখন গান শুনতে উৎসুক। এ যখনকার কথা, ঘরে ঘরে তখনও রেডিয়ো-সেট হয়নি; খুব কম বাড়িতেই তখন রেডিয়ো-সেট দেখতে পাওয়া যেত। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কারও-কারও বাড়িতে রেডিয়ো-সেট ছিল; দল বেঁধে আমরা সবাই সেখানে গিয়ে হাজির হলুম।

* *

আমার চিত্ত তখন উর্বরা জমির মতো। যতই হেলাফেলায় ছড়িয়ে দেওয়া হোক, প্রতিটি বীজ সেখানে অঙ্কুরিত, পল্লবিত হয়ে উঠতে থাকে। আমার উদ্যম তখন আত্মপ্রকাশের জন্যে নতুন নতুন পথ খুঁজে নিতে চাইছে। এর আগের বছরে আমরা একটা "নারী সাহিত্য সমিতি" চালু করেছিলুম। বাসন্তীর দুই জ্ঞাতি-বোন আগ্রা কলেজে পড়ত। তাদের একজন আমার দিদির সহপাঠিনী। তা বাসন্তীরা তিন বোন, শেঠীদের বাড়ির তিন মেয়ে, আমরা দুই বোন আর ডালি—এই ক'জনেই ছিলুম সেই সমিতির সবচেয়ে উৎসাহী কর্মী। সবসময়ে আমরা চেষ্টা করতুম, কী করে আরও নতুন-নতুন মেয়েকে এই সমিতির মধ্যে টানা যায়। সমিতির সদস্য-সংখ্যা বাড়ত-কমত।

বাড়তে বাড়তে কখনও কুড়ি ছাড়িয়ে যেত, আবার কমতে-কমতে কখনও স্রেফ আমাদের ওই ন'জনে এসে ঠেকত। সমিতির বৈঠক হত পনর দিন অন্তর-অন্তর। আমাদের অনেকের মধ্যেই তো প্রতিভা অনেক সময় সুপ্ত থাকে। সেই প্রতিভা সেখানে মুক্তি পেত। রামায়ণী আবৃত্তি থেকে শুরু করে তুমুল বিতর্ক আর আলোচনা কত কিছুই করছিলেন তাদের মধ্যে বেশ-একটা বুদ্ধিদীপ্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে। আমরা গিয়ে গেলুম। অনেকেই বেশ উৎসাহ-ভরে প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা লিখতে শুরু করলুম। সে-সব লেখা যে নিতান্ত বাজে হত, তাও নয়।

এর আগের বছর আমরা একটা ছোটগল্প-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করি। আগ্রা কলেজে যিনি ইংরেজীর প্রধান অধ্যাপক, সদ্য তিনি তখন অক্সফোর্ড থেকে ফিরেছেন। নিজের ছাত্রমহলে তিনি তখন কিছুটা উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতে চাইছিলেন। চেষ্টা করছিলেন তাদের মধ্যে বেশ-একটা বুদ্ধিদীপ্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে। আমরা গিয়ে তাঁকে ধরে বসলুম যে, আমাদের এই প্রতিযোগিতায় তাঁকে বিচারক হতে হবে। সব শুনে তিনি তো মহা খুশী; বললেন যে, এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার তিনিই দেবেন। পুরস্কার হিসেবে আমি সেবারে বেশ-কিছু বই পেয়েছিলুম। অধ্যাপক সুন্দরমের বিচারে আমার লেখা ছোটগল্পই সেরা বলে গণ্য হয়েছিল।

অধ্যাপক সুন্দরম সেবারে আগ্রা কলেজে এক সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য, শুধু আগ্রা কলেজের ছাত্ররাই তার সদস্য হতে পারত, আমার তাতে যোগ দেবার কোনও অধিকার ছিল না। তবে লুকিয়ে-চুরিয়ে সেই সমিতির সভায় আমি হাজির থাকতুম। মিস গিব্‌স নামে আমাদের কলেজে একজন অধ্যাপিকা ছিলেন, সেণ্ট জন্‌'স কলেজের মেয়েদের হোস্টেলের তিনি ওয়ার্ডেন. তা এই সময়ে তিনি ঠিক করেন যে, ডেভিস হোস্টেলের ছাত্রীদের জন্যেও তিনি এইরকমের একটা সমিতি গড়ে তুলবেন। আমরা তো বাইরে থেকে পড়তে আসি, কিন্তু আমাদেরও তিনি সমিতিতে যোগ দিয়ে তার সমস্ত কাজে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। অর্থাৎ আমার চতুর্দিকে তখন সাহিত্যিক উৎসাহ-উদ্দীপনার ছড়াছড়ি।

আমাদের আকাঙ্ক্ষা ক্রমে ক্রমে বেড়েই যাচ্ছিল। ঠিক করলুম, নিজেদের একটা কাগজ চাই, তিন মাস অন্তর-অন্তর সেটা বার করা হবে। পয়সা-কড়ি তো নেই, তাই ছাপিয়ে বার করতে পারব না, নিজেরা হাতে লিখে বার করব। আমাদের মধ্যে ডালি ছাড়া আর কেউ ছবি আঁকতে জানে না। হাতে-লেখা পত্রিকায় তার আঁকা কয়েকখানা ছবি আর স্কেচ ছিল। আর আমরা লিখলুম প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, কৌতুককণা ইত্যাদি হরেক রকমের রচনা। সে-সব পত্রিকা উই'য়ের ভোজ্য হয়েছে, না আগ্রার কোনও বাড়িতে ধুলো-ময়লা-জঞ্জালের তলায় সেগুলি চাপা পড়ে আছে, জানি না।

আমাদের কলেজে জনাকয় ছাত্রের কবিতায় বেশ হাত ছিল। হিন্দী-সাহিত্য কবিতায় এত ঐশ্বর্যশালী, অথচ গদ্যে সে এত দীন কেন, বুঝতে পারতুম না। হিন্দী ঔপন্যাসিক-দের মধ্যে প্রেমচাঁদই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সেই প্রেমচাঁদের লেখাও আমার বিশেষ ভাল লাগত না। সন্দেহ নেই, হিন্দী কথাসাহিত্যের তিনি একজন পথিকৃৎ, এবং তার জন্য তাঁর যেটুকু সম্মান প্রাপ্য, তা আমি তাঁকে অবশ্যই দেব। বলব যে, সাহিত্যকে তিনি জনসাধারণের মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে এসেছিলেন, গ্রাম-জীবনের সুন্দর ছবি এঁকেছিলেন, এবং এই রকমের আরও অনেক-কিছু করেছিলেন। তবে কিনা শেষ পর্যন্ত ওই পথিকৃৎই তিনি রয়ে গেলেন; অন্তত আমার তো তাঁকে কখনই একজন বড়-মাপের ঔপন্যাসিক বলে মনে হয়নি। তাঁর অনুভূতি খুব নিবিড় নয়। তর্জমায় তো আমি শরৎচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস পড়েছি। প্রেমচাঁদের উপন্যাসের চেয়ে তার স্থান অনেক ঊর্ধ্বে।

যে-সময়ের কথা বলছি, হিন্দী কবিতায় তখন 'ছায়াবাদ' বা অতীন্দ্রিয়বাদ বলে

একটা ব্যাপার খুব চলছিল। হিন্দী কবিতায় অতীন্দ্রিয়বাদ কিছু নতুন জিনিস নয়; তবে তার যে আধুনিক কিংবা চূড়ান্ত চেহারা তখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, সেটা অনেকটা চিত্রশিল্পের সুররিয়্যালিজমের সগোত্র একটা ব্যাপার। আমার মনে অনেক সময় প্রশ্ন জাগত যে, এই যে সব কবিতা লেখা হচ্ছে, কবিরা নিজেই এর অর্থ বোঝেন কিনা। যাই হোক, 'ছায়াবাদ' তো ছিলই, তার উপরে ইদানীং আবার হিন্দী কবিতায় আর-একটা প্রবণতা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কবিরা তার নাম দিয়েছিলেন 'নিরাশাবাদ'। তা কবিরা হঠাৎ নৈরাশ্যের এত ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন কেন বুঝে উঠতে পারতুম না।

কলেজের এক অনুষ্ঠানে একদিন এক ছাত্র-কবি একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন। কবিতাটির নাম 'পথবিহীন'। নৈরাশ্যে ভরা কবিতা। তা আমি তো ছিলুম দুর্মর আশাবাদী, তাই কবিতাটি শুনে আমি ভীষণ চটে গেলুম, এবং বাড়িতে ফিরে উত্তেজনার মাথায় তার উত্তরে আর-একটা কবিতা লিখে ফেললুম। আমার এই কবিতাটিতে 'পথবিহীন'-এর কবির প্রতি ভর্ৎসনা ছিল। আমি বলেছিলুম যে, আসলে তাঁর উদ্যম নেই; জীবনের পথ খুঁজে নিতে তো চেষ্টা করতে হয়, তিনি সেই চেষ্টা না-করেই 'পথ নেই' 'পথ নেই' বলে কাঁদুনি গাইছেন।

এ-সব কবিতা সাধারণত প্রেমিকাকে উদ্দেশ করে লেখা হয়। সেটাই প্রচলিত রীতি। 'পথবিহীন'-এর কবিও তা-ই লিখেছিলেন। ফলে আমি যখন তার একটা উত্তর লিখে বসলুম, তখন স্বতই আমাকে তাঁর প্রেমিকার ভূমিকা নিতে হল। 'পথবিহীন' কবিতাটি শুনে আমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলুম, সেই ক্রোধটাকে প্রকাশ করবার জন্যই উত্তেজনার মাথায় আমি তার উত্তর লিখি, অন্য কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না। ডালি আমার কবিতাটি শুনে তার একটা অনুলিপি চাইল। আমিও একটা অনুলিপি করে তাকে দিয়ে দিলুম। 'পথবিহীন' যার লেখা, সেই ছাত্র-কবিটি প্রায়ই ডালির বাবার কাছে আসত। তা পরের বারে সে আসতেই ডালি বেশ গর্বিতভাবে আমার জবাবী কবিতাটি তার হাতে তুলে দেয়। ব্যাপারটার তাৎপর্য যে কী দাঁড়াতে পারে, ডালি তা ভেবে দেখেনি। ছাত্র-কবিটি আমার জবাব পড়ে সিদ্ধান্ত করলেন যে, আমি তাঁর প্রেমিকা হতে চাই। নেহাতই ভুল-বোঝাবুঝির ব্যাপার, তবে রক্ষে এই যে, ব্যাপারটা বেশী দূর গড়ায়নি। এই নিয়ে একটা জটিলতার সৃষ্টি হতে পারত। সেটা না-হওয়ায় আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

আগেই বলেছি, প্রকৃতি আমাকে কখনও বিশেষ অনুপ্রাণিত করেনি। কিন্তু কবিতায় যেন তারই ছড়াছড়ি। আমার সেটা ভাল লাগে না। পাহাড় কিংবা নদীর চেয়ে নরনারীর জীবন আমাকে অনেক বেশী টানে। প্রকৃতির শোভা দেখে অনেকের মনে খুব ভাবের উদয় হয়। আমার হয় না। দুয়ের মধ্যে কোনও সমন্বয়ের সূত্র আমি খুঁজে পাই না। হিন্দী যে বইখানা আমাদের পাঠ্য ছিল, তাতে একটা কবিতা পড়েছিলুম। নীতি-কবিতা। তাতে প্রকৃতির কাছ থেকে মানুষকে শিক্ষা নিতে বলা হয়েছিল। সদ্য-উন্মোচিত কুঁড়িটিকে দেখে শিখে নাও যে, কী করে হাসতে হয়... এই রকমের সব কথা ছিল তাতে। আমি তাতে এতই বিরক্ত বোধ করি যে, কবিকে উদ্দেশ করে—বলা বাহুল্য, আমার নোটবইয়ের মধ্যে—তক্ষুনি তার একটা জবাব লিখে ফেলি। তাতে আমি বলি যে, অর্ধস্ফুট কুঁড়িটি যে শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ একটি পুষ্প হয়ে ওঠে, কবির সে-কথা মনে রাখা ভাল। কবি, তুমি শুধু কুঁড়ির শোভা দেখছ কেন? ফোটা-ফুলের পাঁপড়ি কীভাবে একটা-একটা করে খসে যায়, এবং তাজা ফুলটা কীভাবে শুকিয়ে যায়, তা কি তুমি দেখবে না? এই রকমের আরও কয়েকটা জবাব আমি লিখেছিলুম। বলা বাহুল্য, সে-সব জবাব আমার

নোটবইয়ের মধ্যেই বন্দী হয়ে থাকত। কোনও-কিছু পড়ে বিরক্ত কিংবা অভিভূত বোধ করলেই তক্ষুনি আমি নোটবই খুলে তার জবাব লিখতে বসে যেতুম। লিখতুম নিজেরই তৃপ্তির জন্য। সে-সব লেখা বড়-একটা কাউকে দেখাতুম না। আমার কবিতা ছাপা হোক, এমন কী কেউ তা শুনুক কিংবা দেখুক—এমন কোনও ইচ্ছাই আমার ছিল না। কবিতা লেখাকে আমার মনে হত অতি সহজ কাজ; এবং—সেই কারণেই—উপন্যাস রচনার তুলনায় তাকে অনেক নিরেস কাজ বলে আমার মনে হত। নিজের অনুপ্রেরণায় সেইসময়ে বিশেষ-কিছু লিখিনি। আর-কারও লেখা পড়ে কিংবা শুনে যে প্রতিক্রিয়া হত, সেটাকেই প্রকাশ করতুম।

বাবা বলতেন, দু রকমের বই হয়। গুরুত্বপূর্ণ বই আর উপন্যাস। কী পড়ব না-পড়ব, সে-বিষয়ে আমার উপরে কখনও কোনও বিধিনিষেধ জারী করা হয়নি। এ-ব্যাপারে কারও কাছে কোনও পরামর্শও পেতুম না। তা বাবা হঠাৎ লক্ষ করলেন যে, আমার বই পড়বার অভ্যাস খুব বেড়ে গেছে। বাস্, অমনি শুরু হয়ে গেল তাঁর সমালোচনা। কী না, রাজ্যের নভেল পড়ে আমি সময় নষ্ট করছি। উপন্যাসকে তিনি আচার-চাটনির সঙ্গে তুলনা করতেন। বলতেন, একটু-আধটু আচার-চাটনির যে দরকার নেই, তা নয়, ভোজ্যের স্বাদ তাতে বাড়ে, কিন্তু তাই বলে তো আর থালা-থালা আচার-চাটনি খেয়ে পেট ভরানো যায় না। এত বেশী উপন্যাস পড়লে চিত্ত বড় ফুরফুরে হয়ে যাব, এবং সেই লঘু চিত্ত দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনও চিন্তা কিংবা কাজ করা চলে না। বাবা শুধু সমালোচনাই করতেন। উপন্যাসের বদলে অন্য কী পড়ব, তা বলতেন না। শুধু বলতেন, পাঠ্যবই পড়ো। ঊর্মিলা বড় চপল, গুরুত্বপূর্ণ কোনও-কিছুর সম্পর্কেই ওর কোনও আগ্রহ নেই, সারাদিন ও শুধু আচার-চাটনি খেতে চায়—এইসব কথাই যেন তাঁর মুখের লব্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথম-প্রথম এ-সব কথা আমি গা করতুম না। কিন্তু পরে এ-সব কথা অসহ্য ঠেকতে লাগল। বিশ্ববিখ্যাত এক-একখানা উপন্যাস, তাকে কিনা চাটনির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। শুনে সহ্য হত না। আমি যে চপল, এমন কথা শুনলেই আমি রেগে যেতুম। বাবা যদি স্পষ্ট করে বলতেন, উপন্যাস পড়া আমার চলবে না, তাও বরং সহ্য হত। কিন্তু এই ব্যঙ্গবিদ্রূপ, এ একেবারে অসহ্য।

কাকে গাম্ভীর্য বলা হয়, আর কাকে চপলতা, এবং এ দুয়ের মধ্যে সীমারেখাই বা কোথায় টানা হবে, বুঝে উঠতে পারতুম না। মনে হত, দুয়ের মধ্যে বস্তুত কোনও বিরোধও নেই, এরা একে অন্যের পরিপূরক। যে-মানুষ কাজের গুরুত্ব বোঝে, তাকে কি কখনও একটু লঘু হতে নেই! বিদুষী হলেই যে আমাকে গোমড়ামুখো হতে হবে, তার অর্থ কী? জ্ঞানের চর্চাও তো আসলে সবকিছুকে ভাল করে জানবার ও বুঝবার একটা উপায় মাত্র। অজ্ঞানের তমিস্রাজাল যখন ছিন্ন হচ্ছে, এবং চিত্তের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে নতুন-নতুন ধ্যানধারণার ক্ষেত্র, মানুষ হিসেবে তখন তো আমাদের আরও মধুর, আরও নম্র, আরও স্ফূর্ত হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। যে-মানুষ হাসিখুশী নয়, স্ফূর্তিযুক্ত নয়, যার দৃষ্টি থেকে মাধুর্য বিকিরিত হয় না, এবং মাঝেমধ্যে যে একটু আমুদে হয়ে উঠতে শেখেনি, তাকে আমি সম্পূর্ণ-মানুষ বলি কীভাবে? এই যে আমরা বই পড়ি, চিন্তা করি, নতুন-নতুন জ্ঞান আহরণ করি, এতে তো আমাদের চিত্তের সীমানা আরও প্রসারিত হয়, জীবন সম্পর্কে আরও বেড়ে যায় আমাদের আগ্রহ। এই পড়াশুনো এই চিন্তাবৃত্তির অনুশীলন, এই জ্ঞানার্জন, এরই মাধ্যমে আরও ব্যাপ্ত, আরও প্রসারিত হবার সুযোগ পাই আমরা; জীবনকে আরও ভালবাসতে, আরও উপভোগ করতে শিখি। গাম্ভীর্য, আমি দেখেছি, অনেকক্ষেত্রেই আসলে অজ্ঞতাকে ঢেকে রাখবার একটা ছল মাত্র। বাইরে থেকে দেখে যাদের খুব

ভারিক্কি বলে মনে হয়, ভিতরে-ভিতরে তাদের অনেকেই অতি বোকা; নির্জীব, নিষ্ক্রিয় তাদের চিত্ত। কার চাল-চলন কতটা ভারিক্কি, সেটা দেখে লাভ নেই; দেখতে হবে, কে কোন্ বিষয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কতটা সচেতন। জ্ঞানের চর্চা করে যাব, কিন্তু কখনও গোমড়ামুখো হব না, এই ছিল আমার সংকল্প। "চিন্তায় গম্ভীর হব, কিন্তু আচরণের ফুল্লতাকে নষ্ট হতে দেব না"—একেই আমি লক্ষ্য বলে জেনেছিলুম; ঠিক করেছিলুম, সমস্ত জীবন এই লক্ষ্যে আমি অটল থাকব। এটা আমার ভঙ্গিমাত্র নয়, অনেক চিন্তাভাবনা করে এই সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছেছিলুম। আমার বাবা-মা যদি শুধু আমার আমুদে চেহারাটাই দেখতে পান, আমার ভিতরটা যদি তাঁদের চোখে না পড়ে, তো উপায় কী, তার জন্যে দুঃখ করা নিরর্থক। কিন্তু আমি হাল ছাড়ব না, আমি বিশিষ্ট হয়ে উঠব। আমি তাঁদের দেখিয়ে দেব যে, নেহাত মামুলী মেয়ে আমি নই, আমারও কিছু মূল্য আছে।

সেই যে একটা চোঙের মতো খেলনা আছে, যাতে চোখ রাখলে সুন্দর সব নকশা চোখে পড়ে; এবং যাকে একটু ঝাঁকিয়ে নিলেই নকশাগুলো পালটে-পালটে যায়, যেন সেই রকমের একটা খেলনার ভিতর দিয়ে আমার জীবনকে আমি দেখছিলুম। যতই তাকে ঝাঁকুনি দিতে থাকি, ততই আরও সুন্দর-সুন্দর নকশা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠতে থাকে। মনে হচ্ছিল, আমার ভবিষ্যৎ আমারই হাতে। আমার ইচ্ছেমতো তাকে আমি একটু-একটু করে গড়ে নেব। এখনও আমার বয়স কম। বড় হযে কী হব, এখনও তা আমি সঠিক জানি না। শুধু এইটুকু আমি জানি যে, আমার আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। সেই আত্মবিশ্বাসই আমার রক্ষাকবচ; কেউ তাকে কেড়ে নিতে পারবে না।

* * *

১৯৩৯ সনের ৩০শে জানুয়ারি। সব কাগজেই সেদিন মোটা হরফে একই রকমের ব্যানার হেডলাইন ছাপা হয়েছিল; সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। খবরের কাগজ আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তুম না, ওই হেডলাইনের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিতুম মাত্র। কংগ্রেসের মধ্যে কী-সব বিবাদ-বিসম্বাদ চলছে, তার খবর আমি রাখতুম না। আমি জানতুম, কংগ্রেস হল একলক্ষ্য—এবং সেই লক্ষ্য হল দেশের স্বাধীনতাঅর্জন—নিবদ্ধদৃষ্টি সংহত একটি প্রতিষ্ঠান, তার মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের কোনও অবকাশই নেই। তার মধ্যেও যে বাম, দক্ষিণ, মধ্যপন্থা ইত্যাদি সব ব্যাপার রয়েছে, তা আমি জানতুম না। জানবার কোনও আগ্রহও আমার ছিল না। কংগ্রেসের মধ্যে যে একটা সংকট দেখা দিয়েছে, এবং সেবারকার সভাপতি-নির্বাচন যে মোটেই একটা মামুলী ব্যাপার নয়, সেই সংকটেরই কেন্দ্রবিন্দু, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অচেতন ছিলুম। এই খবরটাও আমি রাখতুম না যে, গান্ধীজী সেবারে সুভাষচন্দ্রের সভাপতি হওয়ার বিরোধী ছিলেন। আগের দশদিন পর্দার আড়ালে যে নাটকের অভিনয় হয়ে যায়, তার কিছু-কিছু খবর তো কাগজে প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু তাও আমি পড়িনি। ২৯শে জানুয়ারি তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। সুভাষচন্দ্র পেলেন ১,৫৮০ ভোট, আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পেলেন ১,৩৭৫ ভোট। সুভাষচন্দ্রের চমকপ্রদ বিজয়ে গান্ধীজী মন্তব্য করলেন, 'এই পরাজয়ে আমি আনন্দিত।" গান্ধীজীর বিবৃতি আমি পড়েছিলুম কিনা, তা আমার মনে নেই। পড়লেও তার তাৎপর্য আমি হয়ত বুঝিনি। আসলে, এই কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাইনি আমি। বিবাদ-বিসম্বাদের খবর তো আমি রাখতুম না, এটা আমার কাছে নেহাতই একটা খবর মাত্র। কিন্তু কলেজে গিয়ে দেখি, মেয়েদের কমনরুম একেবারে

তোলপাড়। বাঙালী মেয়েরা দারুণ উল্লসিত। যেন এটা তাদের ব্যক্তিগত একটা জয়ের ব্যাপার। গান্ধীজী আর নেহরু তো সুভাষচন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁদের একেবারে উচিত-শিক্ষা হয়েছে, এইরকমের একটা ভাবও দেখলুম। আমি তাতে একটু বিস্ময়বোধ করছিলুম। তার কারণ, ওই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটাকে আমি ভেবে দেখিনি। আমি কিছু বলতে চাইছিলুম, কিন্তু তারা আমাকে থামিয়ে দিল। বলল, "তুমি কাশ্মীরী, তাই নেহরুর পক্ষ তো তুমি নেবেই!" শুনে আমি তো হতভম্ব। এমন কী, দুঃখ কিংবা রাগ, কোনওটাই আমার হল না। জানি আমি কাশ্মীরী; বাড়িতেও দেখেছি যে, 'আমরা' বলতে কাশ্মীরীদের বোঝানো হয়, আর 'ওরা' বলতে অন্যদের। কিন্তু নেহরু একজন কাশ্মীরী বলেই যে আমি তাঁর খুব অনুরক্ত, তা নয়। এমনও নয় যে, সুভাষচন্দ্র একজন বাঙালী বলেই আমি তাঁর বিরোধী কিংবা তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। অনেক ভেবেও এই প্রাদেশিক মনোভাবের অর্থ আমি বুঝে উঠতে পারলুম না। অনেক করে সেদিন আত্মসমীক্ষা করেছিলুম। ভেবে দেখেছিলুম, আমার মধ্যেও প্রাদেশিক মনোভাব আছে কিনা। কই, নেই তো। বিস্মিত হয়ে ভেবেছিলুম, কেন নেই। কেন অন্যেরা যে-ভাবে এ-সব জিনিসকে দেখে, আমি সেভাবে দেখি না। নিজের কাছে এই প্রশ্নের কোনও উত্তরই আমি পাইনি। শুধু এইটুকু বুঝেছিলুম যে, এইটেই ব্যাপার, আদৌ কোনও কাশ্মীরিয়ানা আমার মধ্যে নেই। তখন আবার প্রশ্ন জাগল যে, অন্যের মধ্যে কি এমন কোনও সহজাত বৃত্তি আছে, যা থেকে আমি বঞ্চিত? নাকি আমার মানসিক গঠনটাই এমনি যে, এইসব সংকীর্ণতা আমার পছন্দ হয় না? নাকি ডালিব বাবার শিক্ষাই এর জন্য দায়ী? খুব সরল অথচ জোরালো ভাষায় নাগরিকতার ধারণাটা তিনি আমাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন; সেই উদার শিক্ষাই কি আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে? যুক্তপ্রদেশে আমি বড় হয়ে উঠেছি। নিজেকে আমার তাই আর কাশ্মীরী বলে মনে হয় না। মনে হয়, আমি এখানকারই মানুষ। কিংবা কে জানে, বাড়ির পরিবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলুম বলেই হয়ত কাশ্মীরী পরিচয়ের বিরুদ্ধেও আমার বিদ্রোহ। হয়ত! হয়ত! হয়ত!

* * *

আমাকে যে নির্বাচন করা হবে, তা আমি জানতুম। মথুরার একটি কলেজ থেকে হিন্দীতে এক আন্তঃ-কলেজ বিতর্ক-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখান থেকে সেণ্ট জন্স্ কলেজের কাছে অনুরোধ আসে, বিতর্কে যোগদানের জন্য দুজন ছাত্রকে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বাবাকে যখন বললুম, মথুরায় একটা বিতর্ক-প্রতিযোগিতা হবে, তাতে যোগ দেবার জন্যে আমাদের কলেজ থেকে আমাকে নির্বাচন করা হয়েছে, তখন ভাবিনি যে, এতে তিনি আপত্তি করবেন। কিন্তু বাবার চরিত্রে এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ছিল যে, সহজে তিনি কোনও-কিছুতে সম্মত হতেন না। না, বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় আমার যোগদানে তাঁর আপত্তি নেই। মথুরায় কোথায় থাকব, সেটাও কোনও সমস্যা নয়। প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তারা আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন; তা ছাড়া, দরকার হলে, নানীর কাছেও আমি থাকতে পারি। কাকা বললেন, মোটরে করে তিনি আমাকে মথুরায় পৌঁছে দেবেন, তারপর প্রতিযোগিতার শেষে আবার তিনিই মথুরা থেকে আমাকে ফিরিয়ে আনবেন। সুতরাং যাতায়াত নিয়েও কোনও সমস্যার সৃষ্টি হল না। বাবা তবু ইতস্তত করতে লাগলেন। বললেন, সামনেই পরীক্ষা; এখন যদি এইসব নিয়ে মাতামাতি করি তো পড়াশুনোর খুব ক্ষতি হবে। আসলে আমার পরীক্ষার তখনও দু' মাস বাকী। আর মথুরা তো আগ্রার খুব কাছেই, একটা দিনের বেশী সময় আমার এতে লাগবে না। বাবা তবু নানান

রকমের ওজর-আপত্তি করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাঁর সম্মতি পাওয়া গেল।

আমরা যে প্রতিযোগিতায় যোগ দেব, আমাদের কলেজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মথুরার কলেজকে তা জানানো হয়েছিল। কিন্তু সত্যিই যে আমরা যাব, উদ্যোক্তারা তা হয়ত ভাবতে পারেননি। হয়ত সেই কারণেই প্রতিযোগিতার দিন বেলা চারটে নাগাদ আমরা যখন মথুরায় গিয়ে হাজির হলুম, তখন তাঁরা একটু যেন অবাকই হয়ে গেলেন। মথুরার বাইরের অন্য কোনও কলেজ কোনও প্রতিযোগী পাঠায়নি। বাইরের প্রতিযোগী বলতে শুধু আমরাই। তাই বেশ বড়-মাপে আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হল। প্রতিযোগীদের মধ্যে একমাত্র আমিই মেয়ে। অন্য যে-ছাত্রটি সেন্ট জন'স কলেজ থেকে এসেছিল, সেও বেশ সুন্দর বক্তৃতা দিল। আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে গর্বিতভাবে শীল্ড গ্রহণ করলুম আমরা।

প্রতিযোগিতার পরে পুরস্কার বিতরণ, তারপর চায়ের মজলিশ, অনুষ্ঠান শেষ হতে-হতে রাত হয়ে গেল। ঠিক করলুম, রাতটা আমরা নানীর কাছেই কাটাব। মথুরার সেই বাড়িতে পৌঁছে দেখি, সেখানেও জোর উত্তেজনা। ব্যাপার আর কিছুই নয়, আমার সেই মাসতুতো বোন এক 'কথা'-অনুষ্ঠানের সূচনা করেছিলেন। এ-সব অনুষ্ঠানের রীতি এই যে, রামায়ণের কোনও একটা অংশ পড়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করতে হয়, তারপর এক মাসের মধ্যে গোটা রামায়ণ পাঠ শেষ করা চাই। তা আমরা যেদিন মথুরায় গিয়েছিলুম, 'কথা'-অনুষ্ঠানের সেদিনই ছিল সমাপ্তি-দিবস। সেই উপলক্ষে খুব ঘটাপটা হচ্ছিল। আসরের শেষদিকে আমরা বসে পড়লুম। আগ্রা থেকে মোটরে করে মথুরা আসবার ক্লান্তি, তারপর প্রতিযোগিতা আর পুরস্কার লাভের উত্তেজনা, সব মিলিয়ে সারাটা দিন যেন ঝড়ের মধ্যে কেটেছে। শরীর আর বইছিল না। ভীষণ অবসন্ন বোধ করছিলুম। ঘণ্টা বাজছে, শাঁখ বাজছে, পুরোহিতেরা সমস্বরে মন্ত্রপাঠ করছেন, তার মধ্যে কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, কিছুই আমার মনে নেই। ধাক্কা মেরে কে যেন আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। জেগে উঠে বুঝতে পারলুম না, আমি কোথায়। কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করছিলুম। তারপর সব বুঝতে পারলুম। অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। কে যেন আমার হাতে কিছুটা ঘি তুলে দিয়ে মহা-আহুতির অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে বলল। পবিত্র একটা অনুষ্ঠান চলছে, তার মধ্যে এইভাবে ঘুমিয়ে পড়াটা খুব অন্যায় নিশ্চয়, কিন্তু কী করব, ইচ্ছে করে তো আর অন্যায় করিনি।

এটা কি একটা অসার দম্ভ, নাকি নেহাতই ছেলেমানুষী একটা আনন্দ? যেটাই হোক, সকালবেলার প্রার্থনা-সমাবেশে রেভারেন্ড সুলি যখন কলেজের তরফে শীল্ড জিতেছি বলে আমার নাম ঘোষণা করলেন, তখন দারুণ উৎফুল্ল হয়েছিলুম। কেউ যদি একে দম্ভ বলে তো আমার বয়েই গেল। আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল।

* * *

আমাদের বাড়িতে সেদিন একটা ডিনার-পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। এ-সব ব্যাপারে এর আগে আর বাবার কখনও এতটা আগ্রহ দেখিনি। নিজে তিনি সব-কিছুর তত্ত্বাবধান করছিলেন। আমাদের সেরা সোফাটিকে লনের মধ্যে বার করে আনা হয়েছে। সামনে পেতে দেওয়া হয়েছে গালিচা। বাড়িটা যেন আলোয় ঝলমল করছে। কী একটা মামলা উপলক্ষে সার তেজবাহাদুর সপ্রু আগ্রায় এসেছেন। উঠেছেন 'লরিজ'-এ। আগ্রায় সেটাই সেরা হোটেল। আজ রাত্তিরে বাবা তাঁকে আমাদের বাড়িতে খেতে বলেছেন। সেই উপলক্ষেই এত সমারোহ।

আগ্রায় থাকতে সার তেজের নাতনী আর আমি এক ইশকুলে পড়েছি। আমাদের

দুজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্বও হয়েছিল। মাঝেমধ্যেই ওদের বাড়িতে যেতুম। সার তেজ থাকতেন মূল-দালানে। তার দু' দিকে দুটো লাগোয়া দালান। তাতে তাঁর দুই ছেলে থাকেন। বিকেলে চায়ের পর্ব সমাধা হবার পরে, বৃহৎ পরিবারের সকলের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে, সার তেজ এসে মাঝখানের চত্বরটায় বসতেন। আমাকে দেখলেই তিনি তাঁর পাশে আমাকে ডাকতেন, কথাবার্তা বলতেন। দারুণ মজা করে গল্প বলতেন তিনি। এমনভাবে তাঁর ইশকুল-জীবনের কথা বলতেন যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের বয়সের ব্যবধানটা পর্যন্ত আমরা ভুলে যেতুম। মনে পড়ে, কথায়-কথায় একবার তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, ইশকুলে পড়বার সময় সর্বদা তিনি অঙ্কে ফেল করতেন। সার্ তেজের তখন অনেক বয়স; তাঁর কথাবার্তা আর চালচলনে যেন প্রাচীন যুগের একটা মহিমা বিচ্ছুরিত হত। এলাহাবাদ থেকে চলে আসবার আগে তাঁর কাছে আমরা বিদায় নিতে গিয়েছিলুম। দ্বিধাভরে আমি আমার অটোগ্রাফের খাতাটা বাড়িয়ে ধরেছিলুম তাঁর দিকে। খাতাটা তিনি ঠেলে সরিয়ে দিলেন; বললেন, আমার খাতায় তিনি সই দেবেন না। তাতে আমি ভীষণ আহত বোধ করি। দুঃখে, অভিমানে আমার চোখে প্রায় জল এসে যায়। তখন হাসতে হাসতে আবার তিনি খাতাটা তাঁর হাতে নিয়ে বললেন, "তুমি তো আমাকে চিরকালের জন্য ছেড়ে যাচ্ছ, তাহলে তোমাকে সই দেব কেন?"

একটু বাদেই সার্ তেজ আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে তাঁর অল্পবয়সী একটি নাতি। বয়সে আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। ছেলেটিকে দেখে মনে হয়, কোনও কারণে সে একটু ক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। সার তেজের মুখও থমথম করছিল। কী হয়েছে, বুঝতে পারলুম না। সার তেজ তো খুবই হাসিখুশী মানুষ, তাঁর এই নাতিটিকেও তো আমরা একটু ছটফটে বলেই জানি। ব্যাপার কী, একটু পরে তা জানা গেল।

নাতিটিকে হোটেলে রেখে সকালবেলায় সার তেজ আদালতে গিয়েছিলেন। নাতিকে বলে গিয়েছিলেন, সে যেন খেলাধুলো করে সময় কাটায়। তা ছেলেটি তো হোটেলের চত্বরে ঘুরতে ঘুরতে একসময় সুইমিং পুলের কাছে এসে উপস্থিত। আগ্রায় তখন গরম চলছে; ছেলেটি ভাবল, সুইমিং পুলে নেমে সাঁতার কাটলে নেহাত মন্দ হয় না। কিন্তু যেই নামতে যাবে, হোটেলের একজন কর্মচারী তাকে আটকে দিল। ব্যাপার কী, জিজ্ঞেস করতে লোকটা অতি রুক্ষভাবে তাকে বলল যে, সুইমিং পুলটা শুধুই শ্বেতাঙ্গদের জন্য, ভারতীয়দের ওতে সাঁতার কাটতে দেওয়া হয় না। ছেলেটি তাতে খুবই অপমানিত বোধ করে ও সরাসরি ম্যানেজারের কাছে গিয়ে হাজির হয়। ম্যানেজার তো খুবই সৌজন্যসহকারে তার কথা শুনলেন; তারপর অতি বিনম্র ভাষায় তাকে বললেন যে, কর্মচারীটি কিছু অন্যায় বলেনি, সুইমিং পুলে সত্যিই ভারতীয়দের নামতে দেবার হুকুম নেই।

ঘটনার বিবরণ শুনে আমরা একেবারে নির্বাক। প্রত্যেকেই বিচলিত বোধ করছিলুম। ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের কথা বাবার কাছে এর আগেও অনেক শুনেছি। যুবক-বয়সে তাঁরা দেখেছেন যে, প্রতিটি রেলগাড়িতে আলাদা কামরা থাকত। সে-সব কামরায় শুধু সাহেবরাই উঠতে পারে। ভারতীয়েরা সে-সব কামরায় ঢুকলে বিনাবাক্যে তাদের বার করে দেওয়া হত। কিন্তু সে তো অনেক কাল আগের ব্যাপার। এই ১৯৩৮ সনে, এগারোটির মধ্যে আটটি প্রদেশেই যখন কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার শাসন চলছে, তখনও কি এইরকমের বৈষম্য চলতে পারে নাকি? তাও সার তেজের মতো এমন বিখ্যাত ও প্রতিষ্ঠাবান লোকের বিরুদ্ধে? কথাটা যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলুম না।

কেউ-কেউ বললেন, এখুনি সার তেজের এই হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে আসা উচিত। নিমন্ত্রিত অতিথিদের প্রত্যেকেই বললেন, সার তেজকে অতিথি হিসেবে পেলে তিনি

কৃতার্থ হবেন। কিন্তু স্যার তেজ তাতে রাজী হলেন না। বললেন, পরদিন সকালেই তো তিনি হোটেল থেকে চলে যাচ্ছেন, একটা মাত্র রাত্রির জন্যে তবে আর জায়গা বদল করে লাভ কী। মনে হল, তাঁর মতটা এইরকম যে, হোটেল ছাড়া তো নেহাতই একটা ফাঁকা আপত্তির ব্যাপার, তাতে কোনও লাভ হবার নয়, কিছুই তাতে পালটাবে না। কিন্তু তবু আমার মনে হয়েছিল যে, অন্তত প্রতিবাদ হিসেবেও তাঁর হোটেল ছাড়া উচিত, কিংবা যা-ই হোক একটা কিছু করা উচিত।

*　*　*

বসন্তকালে কামোজাইয়ের বিয়ে হয়ে গেল। আগ্রা থেকে চলে গেল সে। কামোজাই ঠিক আমাদের বন্ধু ছিল না। মাঝেমধ্যে আমাদের সঙ্গে গল্প করত, খেলা করত, এই পর্যন্ত। নম্র শান্ত মেয়ে। সে চলে যাওয়ায় বিষন্ন হয়েছিলুম ঠিকই। তবে খুব-একটা কিছু কষ্ট পাইনি। প্রায় এই সময়েই আমাদের সমাজেও একটা বিয়ে হয়। সেই বিয়েটা আমার মনের উপরে খুব গভীরভাবে একটা দাগ কেটে দিয়েছিল।

রাজাভাই আগ্রা শহরের একজন গণ্যমান্য লোক। বিশেষ করে আগ্রার কাশ্মীরী সমাজে সবাই তাঁকে চেনে, সমীহ করে। আড়ালে তাঁকে আমরা বলতুম 'দাড়িওয়ালে'। শহরের যেটা পুরনো পাড়া, সেই চিলি-ইণ্টে তাঁর বাড়ি। রবিবারে কি অন্য-কোনও ছুটির দিনে আমরা তাঁর বাড়িতে যেতুম। আমার মুখের তো কোনও আগল নেই, যেখানে যেটা বলবার নয়, দুমদাম বলে ফেলি। সেটা সবাই জানত। রাজাভাইয়ের সেটা খারাপ লাগত না। আমার পষ্টাপষ্টি কথা বলা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ এসব তিনি উপভোগই করতেন। আর সেইজন্যেই তিনি এমনভাবে আমাকে প্ররোচিত করতেন, যাতে রেগে গিয়ে আমি কিছু-একটা বলে ফেলি। তা আমি বলতুমও। কেউ আমাকে একবার একটু খোঁচালেই হল, পাল্টা-জবাব দেবার জন্যে আমি যেন একেবারে মুখিয়ে থাকতুম। রাজাভাই বলতেন যে, আমি তাঁর বাড়িতে ঢুকবামাত্র বাড়িটা যেন কাঁপতে থাকে। ঠাট্টা করে তিনি আমার নাম দিয়েছিলেন 'ভূচল'। অর্থাৎ ভূমিকম্প। ও-বাড়িতে সবাই আমাকে 'ভূচল' বলেই ডাকত। আমি যে একটু মুখফোড় ছিলুম, সেটা সত্যি। কিন্তু তাই বলে যে আমি দুর্বিনীত কিংবা অভব্য ছিলুম, তা নয়। রাজাভাই আমাকে সত্যিই খুব ভালবাসতেন।

আগ্রারই একটি মেয়ের সঙ্গে রাজাভাইয়ের ছেলের এইসময়ে বিয়ের কথা পাকা হয়ে যায়। কন্যাপক্ষও কাশ্মীরী সমাজের লোক, আমাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও খুব ভাল। কনেরা দুই বোন। একই দিনে তাদের বিয়ে হবার কথা। অন্য বোনটির বিয়ে হবে লাহোরের এক ছেলের সঙ্গে। সেখান থেকেই বরযাত্রীরা আসবে। অর্থাৎ আমাদের সমাজে তখন বলতে গেলে প্রায় বিয়ের হিড়িক লেগেছে। হঠাৎ এই ব্যাপারটা যেন আমার বাবা-মাকে একটু সচেতন করে তুলল। যেন হঠাৎ তাঁদের মনে পড়ে গেল যে, আমরাও আর নেহাত ছোটটি নই, দিব্যি বড় হয়ে উঠেছি। আমার বয়স তখন সতেরো চলছে, আর দিদি আমার চেয়ে দু' বছরের বড়। অর্থাৎ বিয়ের যুগ্যি ছেলেদের বাপ-মা যে-বয়সের মেয়েদের উপরে সন্ধানী নজর রাখেন, আমাদের তখন সেই বয়স। আমাদের বাবা আর মা হঠাৎ বুঝতে পারলেন যে, আসন্ন এই বিয়ে উপলক্ষে কাশ্মীরী সমাজের বিস্তর লোক আগ্রায় এসে জমায়েত হবে। এবং যাঁদের বিয়ের যুগ্যি ছেলে রয়েছে, তাঁরা হয়ত আমাদের দেখেও কিঞ্চিৎ কৌতূহলী হতে পারেন। কিন্তু নাম যার 'ভূচল', সে কি এত সহজে বশ্যতা স্বীকারের পাত্র? আমার মতো দস্যি মেয়েকে তো আর রাতারাতি একটি লাজুক তরুণী করে তোলা সম্ভব নয়।

ধরাছোঁয়ার অতীত এই সমাজটা আসলে কী বস্তু? সমাজ চায়, তার নিয়মকানুন,

প্রথা-রীতি আমরা মান্য করে চলব। কিন্তু কেন সে-সব মান্য করব আমি? সমাজ বলতে যা-ই বোঝাক, আমি তার বিরুদ্ধে। বিয়ের যুগ্যি ছেলেদের মায়েরা আমার সম্পর্কে কী ভাববেন না-ভাববেন, তাতে আমার বয়েই গেল। আমি তাঁদের নজর কাড়তে চাইনে। কাড়বার দরকারও আমার নেই। অনেক দিন আগেই আমি ঠিক করে ফেলেছি যে, কক্ষনো আমি বিয়ে করব না।

বিবাহ-অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেল। মা আমাকে এক সময় বলেছিলেন, মাথার উপরে আঁচল টেনে দাও। ভাবতে এখন অবাক লাগে যে, মায়ের কথা আমি অমান্য করিনি। কিন্তু ঘোমটা দিয়ে আমাকে নিশ্চয়ই খুব হাস্যকর দেখাচ্ছিল, সেইজন্যেই মা হয়ত নিজেই আমাকে ফের ঘোমটা নামিয়ে নিতে বললেন। কী পরে বিয়েবাড়িতে যাব, তাই নিয়েই দেখা দিল আসল সমস্যা। ভাল পোশাক পরতে আমি ভালবাসি। কিন্তু যে-ধরনের জীবন আমরা যাপন করি, যে-ধরনের লোকেদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা, তাতে তো দামী জামাকাপড় দিয়ে আলমারি ভরাবার কোনও দরকার করে না। এ-সব ব্যাপারে তাই আমরা একটু উদাসীনই ছিলুম। ফলে এখন সমস্যায় পড়তে হল। মায়ের হঠাৎ খেয়াল হল যে, যা পড়ে বিয়েবাড়িতে যাওয়া চলে, এমন পোশাক আমাদের নেই। মা তো তাই নিয়ে মহা হুলুস্থুলু বাধিয়ে দিলেন। কিন্তু দোষটা তো আর আমাদের নয়, তাঁরই। আমরা কী পরব না-পরব, সে-সব তো সর্বদা তিনিই ঠিক করে দেন, এ নিয়ে কোনও কথা বলবার উপায়ই তো আমাদের নেই। আমাদের জামাকাপড় যে তেমন ভাল নয়, তা জন্যে তিনিই দায়ী। 'বরাত'-এর দিনে কন্যাপক্ষ অনুরোধ করল, বিয়ের ভোজে আমাদের পরিবেষণ করতে হবে। এটা অনেক কালের প্রথা। কাশ্মীরী সমাজে যখন আনুষ্ঠানিক ভোজের ব্যবস্থা হয়, তখন বাইরের কেউ সেখানে উপস্থিত থাকতে পারে না। চাকর-বাকরদের প্রবেশ সেখানে নিষিদ্ধ। ফলে, আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবদেরই পরিবেষণের ভার নিতে হয়।

আমি পরেছিলুম জামদানী কাজ-করা উজ্জ্বল একখানা কমলা-রঙের শাড়ি। দেখতে মন্দ নয়, তবে সুতী কাপড়। বিয়েবাড়িতে মেয়েরা সাধারণত আরও দামী কাপড় পরে আসে, তারপর পরিবেষণের ঠিক আগের মুহূর্তে সেখানা পালটে একখানা কমদামী শাড়ি পরে নেয়। পরিবেষণের সময় কাপড়ে ঝোল-টোল লেগে যাবার আশঙ্কা থাকে তো, তাই তখন সুতী কাপড় পরলে কেউ কিছু ভাবে না। তা আমি তো সুতী কাপড় পরেই বিয়েবাড়িতে গিয়ে হাজির। নিমন্ত্রণকর্তা আমাকে দেখে বললেন, কী ব্যাপার, এত তাড়াতাড়ি আমি শাড়ি পালটে নিয়েছি কেন, ভোজের আসর বসতে এখনও তো প্রায় এক ঘণ্টা বাকী। আমি চুপ করে রইলুম। বললুম না যে, শাড়ি পালটাবার কোনও প্রশ্নই এক্ষেত্রে ওঠে না; যেটা পরে এসেছি, সেটাই আমার সেরা শাড়ি।

* * *

হোটেলের একটা ঘরের মধ্যে আমি বসে ছিলুম। কিন্তু তখনও আমার মাথা ঘুরছিল। তখনও মনে হচ্ছিল, রেলের সেই ইণ্টার-ক্লাস কামরাতেই যেন আমি বসে আছি। আগ্রা থেকে রেলে চড়ে বোম্বাইয়ে এসেছি আমরা। সময় লেগেছে চব্বিশ ঘণ্টা। সেই চব্বিশ ঘণ্টা ক্রমাগত আমাকে একইভাবে দুলতে হয়েছে, কানে বেজেছে একইরকমের একটানা শব্দ। তার রেশ তখনও কাটেনি। মাথা ঘুরছিল। মনে হচ্ছিল, ভাবনাগুলো কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেছে। যে-ঘরে এসে আমরা উঠেছি, সেটা বিশেষ সুবিধার নয়। চারদিকে তাকিয়ে আমার যেন আরও খারাপ লাগতে লাগল।

দোষ বোম্বাইয়ের নয়। বোম্বাইয়ে যাব, ভাবতেই তো রোমাঞ্চিত হয়েছিলুম।

বোম্বাই আমার কাছে উত্তেজনার আর প্রত্যাশার ভরা ঝলমলে এক মহানগর। তার সম্পর্কে আমার আগ্রহ তখনও বিন্দুমাত্র কমেনি। ইতিমধ্যে আমার চোখে পড়েছে আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি। দেখেছি অনেক-তলা দোকানবাড়ি, কাঁচের শো-কেসে পণ্যের বাহার, ভিড়, জনস্রোত আর যানবাহন, আলোর বাহার আর রূপের জলুস। সবই আছে। হোটেলের জানলায় দাঁড়াবামাত্র এই শহরের দ্রুত-ধাবমান জীবনের একটা আন্দাজ মিলে যায়। দারুণ প্রত্যাশা নিয়ে বোম্বাইয়ে এসেছিলুম। মহানগর আমাকে হতাশ করেনি। আসল কথা, আগ্রার জীবন তো নেহাতই শান্ত, সেইখান থেকে হঠাৎ নিক্ষিপ্ত হয়েছি বোম্বাইয়ের সুবিপুল প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যে। তারই অভিঘাতে আমার স্নায়ুগুলো কেমন যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল। আমরা উঠেছিলুম ধোবিতালাওয়ের একটা হোটেলে। বোম্বাইয়ের যে-সব পাড়ায় ভিড় সবচেয়ে বেশী, এটা তারই একটা। হোটেলবাড়ির গড়নটা একেবারে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মতো। বাড়ির কাছে ভিড় যেন উপচে পড়ছে। অবস্থানটা এমন যে, ট্রাম আর বাস এই বাড়িটাকে বেড় দিয়ে চলে যায়। ট্রাম আর বাসের এটাই টার্মিনাস। ফলে ভিড় এখানে কোনওসময়েই যেন কমতে চায় না। সত্যি বলতে কী, শহরের অন্যান্য এলাকায় ভিড় যখন কমতে থাকে, তখন যেন এখানকার ভিড় আরও বেড়ে যায়। সমস্ত ট্রাম আর বাস তখন একটার-পর-একটা এখানে এসে পৌঁছয়। তাদের রাত্রির আশ্রয় এই ধোবিতালাওয়েই।

কে আমাদের এই হোটেলটা সুপারিশ করেছিল, কেনই বা এখানে এসে উঠলুম, সে-সব কথা এখন আর আমার মনে নেই। তবে আমার সন্দেহ এই যে, এটার নাম যেহেতু হোটেল কাশ্মীর, তাই নামটা শুনবামাত্র বাবার এটা পছন্দ হয়ে গেছে। তা নয়তো এখানে উঠবার অন্য আর কী কারণ থাকতে পারে? এমন অল্প-পয়সার হোটেল তো বোম্বাইযের অন্য পাড়াতেও অনেক পাওয়া যেত। সে-সব পাড়ার পরিবেশ এখানকাব তুলনায় অনেক ভাল। তবে হ্যাঁ, সে-সব হোটেলের মালিকের পদবীটা হয়ত কাশ্মীরী হত না, কাশ্মীরী খাবারও সেখানে হয়ত মিলত না। খাবারের কথায় বলি, কাশ্মীরী নামের খাবার এরা খাওয়ায় বটে, তবে যে-ধরনের রান্নায় আমরা অভ্যস্ত, তার সঙ্গে এর মিল নেহাতই নামমাত্র।

ঘরটা মন্দ নয়। মস্ত ঘর, প্রচুর জায়গা, ঘরের সামনে বিশাল ব্যালকনি। তবে আসবাবপত্র নড়বড়ে; বিছানাপত্রও নেহাতই শস্তা, তাতে রুচির বালাই বলতে কিছু নেই। পেয়ালা, পিরিচ, গেলাস, বাটি ইত্যাদি সব এক-একটা এক-এক মাপের, এক-এক ডিজাইনের, একটার সঙ্গে অন্যটার কোনও মিল নেই। ছুরি-কাঁটা-চামচ ইত্যাদিও দারুণ নোংরা। একদিন সকালে দেখি, হোটেলের এক বেয়ারা তার হাতে একটা ইলেকট্রিক বার্ণার নিয়ে, লোহার একটা খাটের উপরে সেটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে মহানন্দে গান গাইছে। অদ্ভুত দৃশ্য। জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপার কী। তাতে সে বলল যে, ছারপোকা মারছে। সপ্তাহে একবার সে এইভাবে ছারপোকা মারে।

আগ্রায় বাবার এক ব্যবসায়ী বন্ধু ছিলেন। বোম্বাইয়ে তাঁর কারবারের একটা শাখা-অফিস আছে। বাবা বোম্বাইয়ে ছুটি কাটাতে আসছেন, এই কথা শুনে তিনি তাঁর বোম্বাই-অফিসকে বলে দিয়েছিলেন যে, তারা যেন আমাদের সুখ-সুবিধার দিকে একটু নজর রাখে। তা আমরা যেদিন বোম্বাইয়ে এসে পৌঁছই, তার পরের দিন সকালে একখানা মোটরগাড়ি আমাদের হোটেলের সামনে এসে উপস্থিত। বিশাল গাড়ি, শোফারটিও তকমা-আঁটা। এই রকমের শস্তা একটা হোটেল থেকে বেরিয়ে ওই রকমের ঝকঝকে একটা গাড়িতে ঢুকব, ভাবতে আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। চালক একেবারে টান হয়ে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে, মুখখানা সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন, আমরা নীচে নামতেই সে অতি কায়দাদুরস্তভাবে গাড়ির দরজা খুলে ধরল। আমি

অবশ্য বুঝতে পারছিলুম যে, আড়চোখে একবার দেখে নিয়েই আমাদের ওজনটা সে ঠাহর করে ফেলেছে। বুঝতে পেরে গেছে যে, এ-সব গাড়িতে যারা চড়ে থাকে, আমরা তাদের গোত্রের লোক নই। যাই হোক, গাড়িটা পেয়ে যাবার ফলে আমাদের সুবিধেই হল। সেইসঙ্গে এমন একজন লোকও পেলুম, শহরটা যে চেনে। দ্রষ্টব্য সব জায়গাগুলো সে আমাদের দেখিয়ে দিতে পারবে। নিজেরা বোম্বাই দেখতে বেরোলে আর রক্ষে ছিল না। পথ হারিয়ে ঘুরে মরতে হত।

মাইলের পর মাইল শুধু দোকান আর দোকান। অসংখ্য রকমের দোকান। অসংখ্য রকমের পণ্য দিয়ে বোঝাই। ওঃ, আমার হাতে যদি প্রচুর পয়সা থাকত, তাহলে আমি কত-কিছুই না কিনতুম। ১৯৩৯ সনের গ্রীষ্মকালের কথা। জিনিসপত্রের দাম সেই বছরেই ছিল সবচেয়ে কম। অসংখ্য রকমের প্রচুর জিনিস, দামেও শস্তা। ঠিক হয়েছিল, আমরা প্রত্যেকে দুখানা করে শাড়ি কিনব। শাড়ির দাম খুব শস্তা দেখে মা তো দারুণ উত্তেজিত। খোঁজ করতে লেগে গেলেন, কোথায় কতটা শস্তায় শাড়ি পাওয়া যায়। যুক্তিবুদ্ধি বলে, সবকিছুরই দাম যখন এত শস্তা, তখন দু-চার পয়সা বেশী দিয়ে একটু ভাল জিনিস কেনাই তো উচিত। কিন্তু মায়ের প্রতিক্রিয়া তার একেবারে বিপরীত। পয়সা বাঁচাবার জন্যে একেবারে সবচেয়ে শস্তা দামের শাড়ি তিনি কিনতে লাগলেন। আমার জন্যে যে-দুখানা শাড়ি কিনলেন, তার একটার রঙ সাদা, অন্যটার ফিকে-সবুজ। নকল সুতোয় তৈরী জিনিস, তার মধ্যে লম্বালম্বি রুপোলী জরি টানা। সেইসঙ্গে দুটো পাড়ও কেনা হল। একটা কালো-রুপোলী, অন্যটা সবুজ-সোনালী। শাড়ির উপরে বসিয়ে নেওয়া হবে। দোকানে যে কত ভাল-ভাল সব শাড়ি ছিল। তা নয়, মা নেহাতই শস্তা জিনিস কিনলেন। তাতে আমার যে একটু দুঃখ হয়নি, তা নয়। অন্যদিকে, মা তো বলতে গেলে নতুন শাড়ি আমাকে কিনেই দেন না, তাই দু-দুখানা শাড়ি পেয়ে খুব ভালও লাগছিল। শাড়ি যদি নতুন হয়, তবে তার উপরে পুরনো পাড়ও বসিয়ে নেওয়া চলে। তাতে শাড়িটা একেবারে অন্যরকম দেখাবে। এর আগে কখনও একসঙ্গে দুখানা শাড়ি আমার জন্যে কেনা হয়নি। তাই আমি যে খুব উৎফুল্ল হব, সেটা স্বাভাবিক।

কেনাকাটা সেরে আমরা শহর দেখতে বার হলুম। মালাবার হিল! কী সুন্দর দেখতে! ড্রাইভটাও কী চমৎকার! রাস্তার পাশে বিশাল বিশাল বাড়ি। সর্বাধুনিক স্থাপত্যের চমৎকার সব নিদর্শন। বাড়ির সামনে প্রশস্ত, বর্ণাঢ্য বাগান। যেন পথচারীদের উদ্দেশে তারা তাদের বিলাসের কথা ঘোষণা করছে। পিছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে আছি। গাড়ির জানালায় আমার চোখ। দেখছি, জীবন কত সচ্ছল, কত সুন্দর হতে পারে। হঠাৎ যেন নিজেকে বড় সুখী বলে মনে হচ্ছিল। রাত্তিরে আবার সমুদ্র দেখবার জন্যে মালাবার হিলের দিকে বেড়াতে গেলুম। সাত মাইল দীর্ঘ অর্ধবৃত্তাকার সমুদ্রতট। রাত্তিরে সেই সমুদ্রতট আলোয় ঝলমল করছিল। আলোর ওই মালাকে বলা হয় "কুইন্‌স নেকলেস"। কে এই নাম রেখেছিল, জানি না। তবে সার্থক নাম। গোটা দৃশ্যের শোভা যেন এই নামের মধ্যেই ফুটেছে।

এলিফ্যান্টা গুহার কথা শুনেছিলুম। সেখানেও আমরা বেড়াতে যাই। স্টীমারে চড়ে এলিফ্যান্টায় পৌঁছতে ঘণ্টা দুই লাগল। সমুদ্রকে যে কী ভালই লাগছিল। এই একটা ব্যাপার দেখলুম যে, স্থলের তুলনায় সমুদ্রের শোভা আমার বেশী ভাল লাগে। এলিফ্যান্টার ভাস্কর্য কিন্তু আমার চিত্তে কোনও ছাপই ফেলতে পারল না। পাথরের মূর্তির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সময় নষ্ট না করে দ্বীপের সর্বত্র আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলুম।

সমুদ্রটাকে ভাল লেগে যাবার জন্যেই হোক কি হোটেলটায় ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে

গিয়েছিল বলেই হোক, বাবা হঠাৎ ঠিক করে ফেললেন যে, ওখানে আর নয়, এবারে তিনি সমুদ্রের ধারে এসে মাসখানেক কাটাবেন। সেই অনুযায়ী পয়লা মে তারিখে আমরা জুহুর পাম বীচ হোটেলে এসে উঠলুম। সমুদ্রের ধারে তালপাতায়-ছাওয়া ডজন দুয়েক কটেজ, এই নিয়ে হোটেল। তা ছাড়া একটা রেস্তোরাঁও আছে। সপ্তাহান্তিক ছুটির দিনে সেটা সরগরম হয়ে ওঠে।

এমন জায়গায় এর আগে কখনও থাকিনি। দৃশ্যাবলীও চমকে দেবার মতো। সপ্তাহান্তে যুবক-যুবতীদের ভিড় জমে যায়। যুবকদের পরনে স্নানের জাঙিয়া, যুবতীদের পরনে দু-ফালি সুইম-স্যুট। ওই অবস্থাতেই তারা নির্বিকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভারতবর্ষ দরিদ্র দেশ, লেংটি-পরা যুবাবৃদ্ধ এখানে বিস্তর চোখে পড়ে। অর্ধনগ্ন ভিখিরী কিংবা গরিবঘরের ছেলে আমি আশৈশব দেখছি। বাবাও তো কতসময়ে শুধু একটা ধুতি কিংবা পাজামা পরে বাড়িতে বসে থাকেন, গায়ে একটা গেঞ্জি পর্যন্ত থাকে না। কিন্তু এর সঙ্গে কি তার তুলনা হয়? এ একেবারে অন্য রকমের ব্যাপার। অল্পবয়সী নরনারীরা ঝলমলে উজ্জ্বল সুইম-স্যুট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শরীরটাকে আমি স্বভাবতই যতটা সম্ভব ঢেকে রাখবার চেষ্টা করি, আর ওরা সেক্ষেত্রে যেন ইচ্ছে করেই ওদের শরীরের প্রতিটি অংশকে প্রকট করে তুলেছে। ওই অবস্থায় সাঁতার কাটছে কিংবা রোদ পোহাচ্ছে। দেখে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। অনেক সময়ে তো ওরা ভিজে-গায়েই রেস্তোরাঁয় চলে আসে। গা বেয়ে জল ঝরতে থাকে। তোয়ালে দিয়ে গাটা একবার মুছে পর্যন্ত নেয় না। ওই অবস্থাতেই রেস্তোরাঁয় বসে আইসক্রিম খায়, কিংবা বিয়ারের পাত্রে চুমুক মারে। আরও অবাক লাগে, যখন দেখি, ওই অবস্থাতেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ওরা নাচছে। গায়ের সঙ্গে লেপটে আছে ভিজে সুইম-স্যুট, তবু ওদের অস্বস্তি নেই। সমুদ্রের জলে কি এমন কোনও জাদু আছে নাকি, আঠার মতো যা ওদেরকে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে দেয়? খোলা আকাশের নীচে রেস্তোরাঁ। তার মৃদু আলোর পটভূমিকায় ওদের সিলুয়েটের মতন মূর্তি যখন দেখি, তখন শরীর দুটোকে আলাদা করে চেনা যায় না। দুটো শরীরকে এক বলে মনে হয়। বাস্তবের মানুষ বলে ওদের মনেই হয় না। মনে হয় যেন চলচ্চিত্র দেখছি। কিন্তু ওদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আমার না-ই থাক, মস্ত একটা সমস্যার ওরা সৃষ্টি করেছিল। মা আর দিদি পুরোপ্রস্থ জামাকাপড় পরেই স্নান করতেন। কিন্তু আর-কেউ যেহেতু তা করে না, তাই জামাকাপড় পরে স্নানে নামতেও আমার অস্বস্তি হত। শরীর অনাবৃত করতে আমার দারুণ সংকোচ, তাই সংক্ষিপ্ত ওই স্নানের পোশাক থাকলেও আমি তা পড়তুম কিনা সেটা সন্দেহের ব্যাপার। প্রশ্নটা অবশ্য আদৌ এক্ষেত্রে ওঠেনি, তার কারণ স্নানের পোশাক কিনে অকারণে অর্থব্যয় করতে আমার মা-বাবা মোটেই রাজী ছিলেন না। অন্যদিকে পুরোপ্রস্থ জামাকাপড় পরে স্নানে নামতেও আমার অস্বস্তি বোধ হয়। এই দু-তরফা অস্বস্তির ফল দাঁড়াল এই যে, সমুদ্রতীরে থাকা সত্ত্বেও সমুদ্রে আমার নামা হল না। কলঘরে ঢুকে শাওয়ার খুলে স্নান করতুম। জুহুতে মোট একত্রিশ দিন ছিলুম। তার মধ্যে একদিনও আমি সমুদ্রে নেমে স্নান করিনি।

সমুদ্র যেন আমার সমস্ত অস্তিত্বকে একেবারে জুড়িয়ে দিত। তীরে বসে অনন্ত জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকতুম। যখন জোয়ার আসত, তখন ভারী আনন্দ হত আমার। ঢেউগুলো ক্রমেই ফুলে-ফেঁপে বড় হয়ে উঠছে, তারপর বেলাভূমির উপরে এসে আছড়ে পড়ছে। আমার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে জলকণা। মনে হত যেন পরম মমতায় আমার শরীরে কেউ হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। যেমন জোয়ারের সময় সমুদ্রকে আমার ভাল লাগত, তেমনি ভাল লাগত ভাটার সময়েও। দিনে দেখতুম, রাত্তিরে দেখতুম,

জ্যোৎস্নায় দেখতুম, অন্ধকারে দেখতুম, সবসময়েই সমুদ্রকে আমার ভাল লাগত। ভাল লাগত তার প্রতিটি রূপভঙ্গি, প্রতিটি মেজাজ। কটেজে আমার বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সমুদ্রের স্বর শুনতুম। সমস্ত মন যেন জুড়িয়ে যেত, শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তুম আমি।

আমাদের মালপত্রের মধ্যে ছিল কুমিরের চামড়ার মাঝারী সাইজের একটা স্যুটকেশ। তাতে বই বোঝাই। পাম বীচ হোটেলে সপ্তাহান্তে একটু ভিড় লেগে যায়। অন্য সময়ে পরিবেশ একেবারে শান্ত। বই পড়বার পক্ষে আদর্শ। বাবা তাঁর নিজের পছন্দমত সব বই এনেছিলেন। কিন্তু আমিও তার মধ্যে আমার পছন্দসই অনেক বই পেয়ে গেলুম। এর আগে ডিকেন্সের বই আমি পড়েছি। কিন্তু পিকউইক পেপার্স তখনও পড়া হয়নি। মনে পড়ে, জুহুতে ওই বইখানা পড়তে পড়তে আপন মনেই আমি হাসতুম। তবে একটা কথা স্বীকার করি। ইংরেজী রসিকতার তাৎপর্য মাঝে-মাঝে ঠিক বুঝে উঠতে পারতুম না।

সেই সময়েই মার্গট অ্যাসকুইথের আত্মজীবনী পড়ি। বইখানা আমার দারুণ ভাল লেগেছিল। বিস্মিত হয়েছিলুম, শ্রদ্ধাবোধ করেছিলুম। এমন অকপটভাবে নিজের জীবনের কথা কি লেখা সম্ভব? পড়ে মনে হয়েছিল, লেখিকা যেন সর্বরকমের সংস্কার থেকে মুক্ত। তেজী লেখা। রসবোধও অসাধারণ! এর আগে আমি গান্ধীজীর আত্মজীবনী পড়েছি। সেও অতি অকপট রচনা। তবে কিনা গ্রন্থ হিসেবে তার জাতই আলাদা। কবে কার সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলেন, খোলাখুলি মার্গট অ্যাসকুইথ তা জানিয়েছেন। এবং জানিয়েছেন এতই স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে যে, আমি তো মুগ্ধ। ভদ্রমহিলা একইসঙ্গে ছিলেন প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, সাহসিকা এবং ধীমতী।

মোটা একখানা বই টেনে নিয়ে বাবাকে বললুম, "এটা আমি পড়তে পারি?" তাতে অবাক হয়ে বাবা বললেন, "বাঃ, পড়বে বই কী।"

বই পড়বার ব্যাপারে বাবার কাছে অনুমতি নেবার অভ্যাস আমার ছিল না। অনুমতি চাইব, এমন একটা প্রত্যাশা যে তাঁর ছিল, তাও নয়। তবে ইতিপূর্বে তো আমি উপন্যাসই বেশী পড়েছি। এটা সেক্ষেত্রে রাজনীতি-বিষয়ক বই। পড়ে বুঝতে পারব কিনা, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলুম না। বইখানার নাম 'ইনসাইড ইয়োরোপ'। বেশ মোটা বই। নাম আর আয়তন দেখে সন্দেহ হল, কী জানি, বুঝতে কিংবা উপভোগ করতে পারব কিনা। এইজন্যেই আমি বাবাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলুম। এটা ঠিক অনুমতি প্রার্থনার ব্যাপার নয়। যাই হোক, বইখানা এতই প্রাঞ্জল যে, বেশ-একটু বিস্মিত হয়ে যাই। পড়তে বেশ ভালও লাগে। কই, এমন কিছু তো এখানে নেই, যা আমি বুঝতে পারি না। বলা বাহুল্য, জন গান্থার একজন উদ্ভুদরের রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত নন। তা না-ই হোন, গল্প-উপন্যাস ছাড়া অন্য জাতের বইও যে আমি পড়তে পারি, এবং পড়ে উপভোগ করতে পারি, এইটে আবিষ্কার করে সেদিন বড় আনন্দ হয়েছিল।

কেনাকাটা করবার জন্যে কিংবা দ্রষ্টব্য নানান জায়গা দেখবার জন্যে জুহু থেকে মাঝে-মাঝে আমরা শহরে চলে আসতুম। সেক্ষেত্রে আমাদের বাইরে কোথাও খেয়ে নিতে হত। ফলে, সর্বদা আমরা এমন-সব দোকান খুঁজে বেড়াতুম, যেখানে বেশ শস্তায় খাওয়া যায়। সেই সময়ে আমরা লক্ষ করি যে, শহরের প্রতিটি অঞ্চলে ইরানী রেস্তোরাঁ রয়েছে। দাম মোটামুটি শস্তা, খাবারও অতি সুস্বাদু। শহরে এলেই বাবা তাই আমাদের ইরানী রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতেন।

আয়নার বিলাসটা তখন খুব চালু হয়েছে। এইসব ইরানী দোকানে দেখতুম আয়নার ছড়াছড়ি। অনেকক্ষেত্রে তো গোটা দেওয়াল জুড়েই আয়না বসানো। তা এই আয়নার জন্যে আমার আর দিদির বড় অস্বস্তি হত। আমরা মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়ে,

একটু আড়াল-আবডাল ভালবাসি, রেস্তোরাঁয় বড়-একটা যাই না, গেলেও কোনো-একটা ঘেরাটোপ-দেওয়া ঘরের মধ্যে বসি, যাতে অন্যে আমাদের দেখতে না পায়। এইসব ইরানী রেস্তোরাঁয় তেমন কোনও আলাদা ঘরের ব্যবস্থা নেই। একেবারে সর্বসমক্ষে বসে খেতে হয়। তার উপরে চতুর্দিকে আয়না। প্রতিটি আয়নায় আমাদের প্রতিবিম্ব ফুটে ওঠে। অসংখ্য লোক আমাদের দেখতে পায়। তাতে বড় বে-আবরু লাগে, বড্ড অস্বস্তি বোধ হয়। ফলে অত সুস্বাদু খাবারও আমি ঠিক আনন্দ করে খেতে পারতুম না। পরিচারকরাও বড্ড নোংরা। তার উপরে আমি তো শুদ্ধ মার্জিত উর্দু শুনতে অভ্যস্ত, ওদের 'বোম্বাইয়া' হিন্দুস্থানী আমার কানে কেমন যেন অমার্জিত আর রুক্ষ ঠেকে।

বোম্বাইয়ে আমার এক জ্ঞাতি-ভাই থাকতেন। পৌঁছেই তাঁকে আমরা খবর দিয়েছিলুম। তাঁর স্ত্রীটি তরুণী সুন্দরী, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। খুব আমুদেও বটে। কী কিনব, কী কী দেখব, ইত্যাদি সব ব্যাপারে আমরা তাঁর পরামর্শ নিতুম। তাঁরই কাছে শুনলুম যে, বোম্বাইয়ে একটা অসম্ভব ভালো রেস্তোরাঁ হয়েছে। সেখানে একবার যাওয়াই চাই, না গেলে আমাদের বোম্বাইয়ে আসা সার্থক হবে না। সেখানে সবকিছুরই দাম যে একেবারে গলাকাটা, তা তিনি বলে দিয়েছিলেন। তবে একইসঙ্গে বলেছিলেন যে, তা হোক, ব্যবস্থা এত ভাল যে, পয়সাটা সার্থক হবে। শুনে বাবাকে আমরা ধরে বসলুম যে, সেখানে নিয়ে যেতে হবে। তা খরচার দিকটা ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত ঠিক হল দুপুর কিংবা রাত্তিরের খাওয়ার বদলে বরং সেখানে গিয়ে একদিন বিকেলের চা খাওয়া চলতে পারে। গিয়ে দেখি, পেল্লায় বাড়ি। লিফ্‌টে করে উপরে উঠতেই মস্ত একটা ঘরে নিয়ে, সবচেয়ে ভাল কোণটাতে আমাদের বসানো হল। ঘরটা খুব সুন্দর করে সাজানো, পরিচারকদের প্রত্যেকের মুখে হাসি লেগে আছে, প্রত্যেকের পরনে কড়া-ইস্ত্রি ফিটফাট পোশাক। ঘরের মধ্যে পুরু গালচে পাতা, টেবিলের ঢাকনা, পর্দা ইত্যাদিও নিখুঁত; স্ফটিকের সব সুন্দর-সুন্দর ফুলদানিতে ফুলের গাছ। মৃদু বাজনা বাজছিল; কিন্তু কোত্থেকে যে বাজনার শব্দটা আসছে, সেটা বোঝা যাচ্ছিল না। বিলাস যেন উপচে পড়ছে। আমরা তো বেশ আয়েস করে বসলুম। আমাদের হাতে একটা মেনু ধরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু তার উপরে চোখ বুলিয়েই আমরা তো হতবাক্। নিজেদের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। দাম যে একেবারে অবিশ্বাস্য। সামান্য মাখন-মাখানো টোস্ট, তার দামও দেখলুম দারুণ রকমের চড়া।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ির নীচের তলাতেও তো একটা রেস্তোরাঁ রয়েছে, দুটি রেস্তোরাঁর মালিকও তো একই লোক, এবং ব্যবস্থাপনাও তো একই লোকের হাতে, তাহলে নীচের তুলনায় উপরে সব জিনিসের দাম এত বেশী কেন? দু' জায়গায় কি দু' রকমের খাবার পরিবেষণ করা হয়?

ওয়েটার তাতে স্মিত হেসে বলল, "না। একই হেঁসেল থেকে এখানে খাবার আসে। তবে কিনা পরিবেশটা এখানে আলাদা।"

বাবা বললেন, "বাস্? খাবার যখন একই, তখন আমি দাম বেশী দিয়ে এখানে খাব কেন? নীচে গিয়ে চা খেলেই তো হয়।"

শুনে ওয়েটারের মুখে একটা বিচ্ছিরি হাসি ফুটে উঠল। বলল, "সে আপনার অভিরুচি।"

বাবা তো ভীষণ চটে গিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন। আমরাও অগত্যা তাঁর পিছন-পিছন চললুম। এবারে আর লিফ্‌টের জন্যে অপেক্ষা না করে সিঁড়ি দিয়েই নীচে নামলুম আমরা। আমার যে কী ভীষণ অপমান লাগছিল, তা বলবার নয়।

ওয়েটারের মুখে ওই যে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠেছিল, সেই হাসিটা আমি অনেক দিন ভুলতে পারিনি। একটাও কথা বলছিলুম না আমি। কিন্তু বাবার উপরে ভীষণ রাগ হচ্ছিল। এইরকম লজ্জাজনকভাবে নীচে নেমে আসার চেয়ে বরং উপরে বসে এক কাপ করে চা খেয়ে নিলেই হত। তার জন্যে যদি পরের দিন উপোস করে কাটাতে হত, তবে তাতেও আমি রাজী। নীচের তলায় কাফেটেরিয়া। হাতে ট্রে নিয়ে সেখানে কিউয়ে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু উপরতলার সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে আমার পা যেন আর সরছিল না।

বাইরে বেরুবার উৎসাহ আমার একেবারে সর্বৈব উবে গিয়েছিল। জুহুর সেই কটেজে পড়ে থাকতেই আমার স্বস্তিবোধ হত। ভাল জায়গায় যাবার মতো সামর্থ্য আমাদের নেই, তাই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে লাইন লাগিয়ে ধাক্কাধাক্কি করতে হবে। তার চেয়ে বরং যেখানে আছি, সেখানে থাকাই ভাল। আগে জানতুম না যে, এমন অনেক জায়গা আছে, যা আমাদের নাগালের বাইরে। জেনে ভীষণ খারাপ লাগছিল।

* * *

এর পরের কয়েক সপ্তাহ আমরা যাযাবরের মতো এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতে থাকি। বোম্বাই থেকে আমরা মহাবালেশ্বরে যাই। মাঝখানে দুটো দিন কাটাই পুনায়। মহাবালেশ্বর তখনকার বোম্বাই প্রদেশের গ্রীষ্মাবাস। লাল পাথরের অনুচ্চ পাহাড়ের উপরে শহরটা। প্রচুর ধুলো। সেই ধুলোও লালরঙা। যখন ধুলো ওড়ে, তখন সবকিছুকেই লাল দেখায়। বাস থেকে নেমে টার্মিনাসে আমরা মালপত্তরের উপরে বসে রইলুম। বাবা গেলেন আশ্রয়ের সন্ধানে। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরে এসে তিনি বললেন যে, মোটামুটি ভাল একটা আস্তানা খুঁজে পাওয়া গেল না।

বাস-টার্মিনাসের কাছেই লাল-পাথরের বেশ হাল-ফ্যাশনের একটা বাড়ি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, ওটা একটা হোটেল। পুনা থেকে একটি ভৃত্য আমাদের সঙ্গে এসেছিল। মালপত্র আর বাচ্চা-ভাইটাকে তার জিম্মায় রেখে হাঁটতে হাঁটতে আমরা সেই হোটেলে গিয়ে হাজির হলুম। না, এমন কোনও ঘর তাদের নেই, যাতে আমাদের সকলের কুলিয়ে যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, পাশাপাশি আলাদা দুটো ঘর আছে বটে। দুটোর সঙ্গেই অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম। দুটো ঘরের মাঝখানে একটা দরজাও আছে। অর্থাৎ অতি সুন্দর ব্যবস্থা। দেখলুম, সবকিছুই একেবারে আধুনিক-কেতাসম্মত। জানালা থেকে যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তাও চমৎকার। সব দেখেশুনে বাবা জিজ্ঞেস করলেন, খরচা কীরকম পড়বে। না, অত টাকা দেবার সামর্থ্য আমাদের নেই। হাঁটতে হাঁটতে আবার টার্মিনাসে ফিরে এলুম। ধাক্কা মেরে মেরে বারবার যেন আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল যে, এমন অনেক জিনিস এবং জায়গা আছে যা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে। অথচ, এমন লোকও তো বিস্তর দেখছি, সে-সব জিনিস কিনবার কিংবা সে-সব জায়গায় থাকবার মতো পয়সার যাদের অভাব নেই। ভাল আর আধুনিক, আমার কাছে দুটো শব্দই সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। তা দেখতেই পাচ্ছিলুম যে, ও-সব জিনিস যারা উপভোগ করতে পারে, আমরা তাদের সগোত্র নই। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি আহত বোধ করছিলুম। বাড়ির অন্য-সবাইকে কিন্তু এজন্যে আদৌ বিচলিত বলে মনে হল না। তাতে আমার অবাক লাগছিল। আবছামতো জানতুম যে, আমরা মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ। হঠাৎ সেই সত্যটা যেন দারুণভাবে প্রকট হয়ে উঠল। ছোট-ছোট টুকরো-টুকরো ঘটনা, তারই মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ হল আমার উপলব্ধি। আমার বুর্জোয়া পটভূমি সম্পর্কে তখন আমি তীব্রভাবে সচেতন। 'বুর্জোয়া' শব্দটার সঙ্গে তখনও অবশ্য আমার ভাল করে পরিচয় ঘটেনি।

পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে শেষপর্যন্ত একটা হোটেলের সন্ধান পাওয়া গেল। বিরাট ঘর। বিশেষ সুন্দর অবশ্য নয়, আধুনিকও বলা যায় না। তবে খুব, খুবই পরিচ্ছন্ন। ঘরে ঘরে খাবার পেঁৗছে দেওয়া হয় না, খাবার সময় একটি ভৃত্য আমাদের ডাকতে এল। খাবার ঘরটা দেখে তো আমরা বিস্মিত। পুরনো ভারতীয় কেতায় মেঝেতে বসে খেতে হয়। সামনে কাঠের ছোট-ছোট জলচৌকি। তার উপরে পরিষ্কার ঝকঝকে 'থালি' এনে রাখা হল। সাদাসিধে খাবার, কিন্তু বেশ সুস্বাদু। সবচেয়ে ভাল লাগল পরিবেশনের কেতা। হোটেল-বাড়িতে ওই যে এক রকমের শুষ্ক নৈর্ব্যক্তিক ব্যবহার মেলে, সে-রকমের নয়। বেশ হার্দ্য আর আন্তরিক। এটাও যে একটা হোটেল-বাড়িই, তা আমাদের মনেই হল না। মনে হল যেন পুরনো আর অন্তরঙ্গ কোনও বন্ধুর বাড়িতে বসে খাচ্ছি। যাতে আমরা খুশী হই, তার জন্যে কারও চেষ্টার ত্রুটি নেই। এটা আমাদের প্রত্যাশায় ছিল না। সরল, ঘরোয়া সেই পরিবেশ আমাদের সত্যিই খুব ভাল লেগেছিল। অনেক বছর বাদে আবার মেঝেয় বসে খাওয়া হল। কী আন্তরিক ব্যবহার এঁদের। আগের দিনে যে অতিথিপরায়ণতা দেখা যেত. এবং ইদানীং যা একান্তই দুর্লভ হয়ে উঠেছে, তাঁর ছোঁয়া পেয়ে আমরা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলুম।

একদিন আমরা চড়ুইভাতি করতে কাছাকাছি একটা জায়গায় যাই। সেদিনকার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। সেদিন যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তার থেকে একটা জীবনদর্শনের সূত্র খুঁজে নেওয়া কিছু শক্ত নয়। তখন অবশ্য দর্শন-টর্শনের কথা ভাবিনি। শুনেছিলুম, মাইল পনর দূরে একটা জলপ্রপাত আছে। সবাই এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে তার বর্ণনা দিতে লাগল যে, ঠিক করলুম, সেখানে একদিন যেতেই হবে। যাবার জন্যে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করা হল। ফলে সেখানে গিয়ে পেঁৗছতে তা ঘণ্টা তিনেকেরও বেশী সময় লেগেছিল। গিয়ে কিন্তু জলপ্রপাতের সন্ধান পেলুম না। ভাবনা হল, ঠিক জায়গায় এসেছি তো? গাড়ির চালককে তখন জিজ্ঞেস করলুম, কোথায় জলপ্রপাত? তাতে সে আঙুল তুলে যে জলধারা দেখিয়ে দিল, প্রস্থে তা ইঞ্চি-ছয়েকের বেশী হবে না। পাহাড়ের গা বেয়ে তিরতির করে একটা ক্ষীণ জলস্রোত নেমে আসছে। ও হরি, এর নাম জলপ্রপাত! চওড়া একটা হোস-পাইপে জল ছাড়লেও তো এর চেয়ে ভাল দেখাবে! কিংবা কে জানে, ভুল হয়ত আমাদেরই। তখনও বর্ষা নামেনি তো, তাই প্রপাত একেবারে শুকনো খটখটে হয়ে গেছে। তবে এমনও বিচিত্র নয় যে, জলপ্রপাতের সৌন্দর্যের কথাটা সবাই দশগুণ বাড়িয়ে বলেছে। যাই হোক, নিরাশ হয়েছিলুম বললে খুব কমই বলা হয়। হোটেলের রাঁধুনী আমাদের জলপ্রপাত-দর্শন উপলক্ষে যত্ন করে পুরী ভেজে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল। চুপচাপ সেই পুরী খেতে বসে গেলুম। বাবা সারাক্ষণ গজগজ করতে লাগলেন। দূর দূর, এরই জন্যে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে, তিন ঘণ্টার পথ ঠেঙিয়ে এতদূরে আসা? এর নাম জলপ্রপাত? লোকগুলোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? ফিরতি পথেও বাবা সারাক্ষণ গজগজ করছিলেন।

যেতে আসতে ছ' ঘণ্টা। ছ' ঘণ্টা সময় ব্যয় করে তিরতিরে ওই জলধারা দেখতে যাওয়া যে অতি হাস্যকর ব্যাপার, কে তা অস্বীকার করবেন। কিন্তু জলধারার কথা বাদ দিয়ে যদি শুধু পথের কথা ভাবা যায়? নিবিড় বনানীর মধ্য দিয়ে চলে গেছে পথ। ছ' ঘণ্টা সেই সুন্দর পথ দিয়ে আমরা চলেছিলুম। কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই। দু' পাশে সুন্দর সব গাছের সারি। সারাটা পথ তারই ছায়ায় ঢাকা। যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি মনোরম। চিত্ত যেন জুড়িয়ে যায়। তারই মধ্যে দিয়ে উঁচুনিচু করে এগিয়ে চলেছে আমাদের ঘোড়ার গাড়ি। এমন চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য তো বড়-একটা চোখে

পড়ে না। সত্যি বলি, পৃথিবীতে যত জায়গায় যত সুন্দর পথ রয়েছে, মহাবালেশ্বরের পথের শোভা তাদের কারও চাইতেই কম নয়।

যেমন পথ-চলার ব্যাপারে, তেমনি জীবনের ব্যাপারেও—জীবনও তো আসলে পথ-চলাই—দেখা যাবে যে, গন্তব্যটা হয়ত কিছুই নয়, ওই পথ-চলাটাই জরুরী। পথটাকে ভুলে গিয়ে যদি শুধু লক্ষ্য নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই, তবে শেষপর্যন্ত হয়ত দেখব যে, বস্তুত কোথাও আমরা পৌঁছতে পারিনি। সে বড় মনস্তাপের ব্যাপার হবে। আর সেইজন্যেই, গন্তব্যের জন্যে অধৈর্য না হয়ে, যাত্রাপথকে উপভোগ করতে-করতে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। পথের শেষে হয়ত কিছুই নেই: হয়ত ওই ক্ষীণ জলধারা দেখে যে হতাশা আমাদের হয়েছিল, শেষপর্যন্ত সেই হতাশাই আমাদের লভ্য। কিন্তু, এ কী, বেশ তো গল্প বলছিলুম, হঠাৎ এত দর্শন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন? কারণটা কি এই যে, আমার অবচেতনে—যতই ক্ষীণভাবে হোক—তখনই এই জীবন-দর্শনের ছাপ পড়েছিল? কী জানি!

* * *

মহাবালেশ্বর থেকে আমরা আমেদনগরে আমার এক মাসীর বাড়িতে যাই। মেসোমশায় আর্মি-অফিসার। ১৯৩৪ সনে এঁকেই আমি কসৌলিতে আমার এক মামার কাঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম। সেই হাস্যকর দৃশ্যের কথা আগেই বলেছি। মেসোমশায়ের বয়স তখন অনেক কম।

মাসী আর মেসোমশায়, দুজনেই অতি সুন্দর দেখতে। এমন সুন্দর চেহারার দম্পতি খুব কমই দেখা যায়। মাসীর রূপ অবশ্য কোমল ধরনের, দেখলেই ধীরস্থির বলে মনে হয়। মেসোমশায় সেক্ষেত্রে প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। উৎসাহে-উদ্দীপনায়-তেজে-উদ্যমে সর্বদা যেন টগবগ করে ফুটছেন। এর আগে কখনও নববিবাহিত তরুণ দম্পতির এত সান্নিধ্যে থাকিনি। মনে হচ্ছিল, তাঁরা যেন একাত্ম, দুজনেই দুজনের আনন্দের সমান অংশীদার। আমাদের সামনে অবশ্য বেশী মাখামাখি করতেন না; কিন্তু দেখলেই বোঝা যেত যে, পরস্পরকে তাঁরা খুব নিবিড়ভাবে ভালবাসেন। সারা বাড়িতে যেন সেই ভালবাসার একটি মৃদু সৌরভ ছড়িয়ে আছে।

রাত্তিরে আমরা সবাই যখন শুয়ে পড়েছি, মেসোমশায় তখন নিঃশব্দে আমাদের ঘরে এসে মৃদু গলায় দিদিকে আর আমাকে ডাকতেন। আমরাও অমনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তুম। তারপর চারজনে মিলে মাঝরাত্তির পর্যন্ত চলত গল্পগুজব আর হাসিঠাট্টা। মেসোমশায় অনেক সময় মজা করে আমাদের বিপদে ফেলতেন। তা তার শোধ নেবার জন্যে আমি একদিন করলুম কী, তাঁর চুলের মধ্যে চিউয়িং গাম আটকে দিলুম। কিছুতেই আর চুল থেকে তাকে তিনি ছাড়াতে পারেন না। ওদিকে পরদিন ভোরেই তাঁকে প্যারেডে যেতে হবে। তিনি তো মহা মুশকিলে পড়লেন। আমি এদিকে ব্যাপার দেখে হেসে কুটিপাটি। শেষে আর কী করেন, উপায়ান্তর না দেখে কাঁচি দিয়ে একগুচ্ছ চুল কেটে ফেললেন। তারপর সিঁথিটাকে এমনভাবে পালটে নিলেন, যাতে ব্যাপারটা কেউ বুঝতে না পারে। সবাই মিলে এই রকমের নানা মজা চলত। কথায়-কথায় একদিন তাঁকে বলেছিলুম যে, বিয়ে করবার কোনও ইচ্ছেই আমার নেই। তাতে তিনি বললেন যে, হয় আমি বোকা, নয়ত একদম অজ্ঞ। তিনি বলেছিলেন, দূর-সম্পর্কের ভাইদের মধ্যে কাউকে আমার বিয়ে করা উচিত। শুনে তো আমি হতভম্ব। নিজের ভাই আর তুতো-ভাইদের মধ্যে কোনও পার্থক্যই আমরা করতুম না। তুতো-ভাইদের কাউকে বিয়ে করবার প্রস্তাবটা তাই বিচ্ছিরি লাগল। তাতে মেসোমশায় বললেন যে, আমাদের সমাজের যে রীতি-প্রথা, তাতে বাইরের পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা

করার সুযোগ বড় একটা মেলে না। সুতরাং যে-সব মেয়ে একটু স্বাধীনচেতা, অর্থাৎ বাপ-মায়ের-ব্যবস্থা-করে-দেওয়া বিয়েতে যাদের সম্মতি নেই, তাদের পক্ষে তুতো-ভাইয়েদের মধ্যে কাউকে বেছে নিয়ে বিয়ে করা ছাড়া আর উপায় কী! পরে এ নিয়ে ভেবে দেখেছিলুম. কিন্তু যতই ভাবি, ততই যেন বিচ্ছিরি লাগে।

* * *

মাঝপথে একটা স্টেশনে আমরা নেমে পড়লুম। এখান থেকে নাকি অজন্তা আর ইলোরায় যাবার খুব সুবিধে। পরে দেখি, ভুল করেছি, বিশ্ববিখ্যাত ওই স্থান দুটিতে যাবার বিশেষ কোনও সুবিধে এখান থেকে নেই। যাই হোক. অনেক কষ্টে তো অজন্তায় যাবার একটা গাড়ি শেষপর্যন্ত জোগাড় করা গেল; কিন্তু ইলোরায় যাবার কোনও ব্যবস্থা হল না। অন্তত অজন্তার গুহাচিত্রাবলী যে দেখতে পেয়েছিলুম, সেই আমাদের মস্ত ভাগ্য। চারুকলার সমঝদার হবার জন্যে রুচির যে প্রস্তুতি চাই, সেটা আমার ছিল না বললেই হয়; বলতে কী শিল্পের জগতে সেই আমার প্রথম প্রবেশ। তা হোক. অজন্তা গুহাবলীর চিত্রসম্ভার দেখে তবু আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম। তার পরে আর কখনও অজন্তায় যাবার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু সেই চিত্রাবলী আমার মনের মধ্যে এখনও উজ্জ্বল। যতই দিন যাচ্ছে, ততই যেন তাদের আরও বেশী ভাল লাগছে।

সেবারে আমাদের শেষ দ্রষ্টব্য জায়গা ছিল নাসিক। দেখে একেবারে হতাশ হয়েছিলুম। সেখানে আমরা দেড়দিন ছিলুম, তারপরে ফিরতি পথের ট্রেন ধরে জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আগ্রায় ফিরে আসি। আমাদের পরীক্ষার ফল ইতিমধ্যে বেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই ফলের কথা জানিয়ে আত্মীয়স্বজনেরা আমাদের যে চিঠি লিখেছিলেন, তা আমাদের হস্তগত হয়নি। চিঠিগুলো নিশ্চয়ই হরেক ঠিকানায় ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছিল। কবে কীভাবে খবরটা প্রথম পাই আমার মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, খবরটা জেনে আমরা সবাই খুব মুষড়ে পড়েছিলুম। আমি সেই আগের মতই দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছি। কিন্তু দিদি পাশ করেছে তৃতীয় বিভাগে।

আগ্রায় পৌঁছে বাবা একটা আধা-সরকারী চিঠি পান। তাতে তাঁকে জানানো হয়েছিল যে ওই বছরেই তাঁকে—খুবসম্ভব লখনউয়ে—বদলি করা হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের আগ্রার কলেজে ভর্তি হয়ে আর লাভ কী। কোথায় ভর্তি হওয়া যায়, তাই নিয়ে তো ক'দিন খুব আলোচনা চলল। কথায়-কথায় বাবা হঠাৎ বলে বসলেন, কমলার আর পড়াশুনো করে লাভ নেই, যে-মেয়ে তৃতীয় বিভাগে পাশ করেছে, তাকে পড়িয়ে টাকা নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। এর চেয়ে নিষ্ঠুর কথা আর কী হতে পারে। একে তো দিদি নিজেই খুব কষ্ট পাচ্ছিল, তার উপরে বাবার এই কথায় যেন কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল। বাবার এই এক অদ্ভুত স্বভাব। আমাদের জন্যে অর্থব্যয়ে সত্যিই যে তাঁর আপত্তি ছিল, তা নয়। বস্তুত, টাকাপয়সার ব্যাপারে তাঁকে উদারই বলতে হয়। কিন্তু কী জানি কেন, হঠাৎ এক-এক সময় অনর্থক তিনি অর্থের প্রসঙ্গ তুলতেন। এ যেন তাঁর একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

শেষপর্যন্ত ঠিক হল, জুলাইয়ে যখন কলেজ খোলে, তখন আমরা লখনউয়ে যাব। সেখানে আমার এক কাকার কাছে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। আগেও তো ছেলেদের সঙ্গে এক কলেজে পড়েছি, তাই ব্যাপারটা নিয়ে আর কোনও আপত্তি উঠল না; ভেবেচিন্তে বাবা-মা ঠিক করলেন যে, মেয়েদের কলেজে ভর্তি না হয়ে বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই ভাল। লখনউয়ে তখন মেয়েদের কলেজ একাধিক। তার মধ্যে ইসাবেলা থোবর্ন কলেজের খুব নামডাক। ওটা নাকি উত্তর-ভারতে একেবারে সেরা মেয়ে-কলেজ। কিন্তু

মা এই কলেজের উপরে বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। তার কারণ, ওটা মিশনারী কলেজ। আমি অপ্রসন্ন ছিলুম অন্য কারণে। এলাহাবাদের ক্রসথোয়েটে ফি বছর যে অলিম্পিক-অনুষ্ঠান হয়, তাতে লখনউয়ের ইসাবেলা কলেজের মেয়েরাও যোগ দিতে আসত। তখন দেখেছি যে, তারা বড্ড দেমাকী। আমাদের যেন মানুষ বলেই গ্রাহ্য করত না। খেলাধুলোয় আমরা বিশেষ পটু ছিলুম না তো। সেই কারণে তারা আমাদের খুব অবজ্ঞা করত। এক বছর কিন্তু খেলাধুলোয় আমরা খুব ভাল ফল দেখিয়েছিলুম। তাতে খুশী, ইসাবেলার মেয়েরা এত অভব্য যে, আমাদের জয়ধ্বনিতে যোগ না দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। লখনউয়ে আর-একটা যে মেয়েদের কলেজ ছিল, তার নাম মহিলা বিদ্যালয়। তা নামটাই আমার কানে এত বিচ্ছিরি ঠেকল যে, তক্ষুনি ঠিক করলুম, আর-যেখানেই পড়ি, ওখানে পড়ব না।

কোথায় পড়ব, তার তো মীমাংসা হল। কিন্তু তারপর যে আলোচনা শুরু হল, তা বড় কিম্ভূত। হঠাৎ সকলের মনে পড়ে গেল যে, লখনউয়ের কাশ্মীরী-সমাজ বেশ বড়। এদিকে আমার কাকার বাড়ি তো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেকটা দূরে, অত দূরে থেকে একা-একা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাব, সেটা কি ভাল দেখাবে? এ নিয়ে নানান জনে নানান মন্তব্য করতে পারে, তাতে সমাজে আমাদের সুনাম নষ্ট হবার আশঙ্কা। রামসেবক আমাদের পুরাতন ভৃত্য, পঁচিশ বছরের উপর হল সে আমাদের বাড়িতে কাজ করছে। কে যেন বললেন, তাকেও আমাদের সঙ্গে লখনউয়ে পাঠানো হোক। সে আমাদের সঙ্গে করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে, সারাটা দিন সেখানে বসে থাকবে, তারপর ক্লাস শেষ হবার পরে আবার আমাদের সঙ্গে করে বাড়িতে ফিরবে। শুনে আমি আর দিদি দুজনেই বিদ্রোহ করলুম। বললুম, এ-সব চলবে না। আরও অনেক মেয়ে নিশ্চয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, এবং নিশ্চয় তারা একাই যাতায়াত করে। প্রত্যেকে যদি ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে কলেজে যেত, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে তাহলে ভৃত্যের ভিড় লেগে যেত। যত ছাত্রী, তত ভৃত্য! এইসব যুক্তি দেখিয়ে আমরা সাফ বললুম যে, ও-সব সমাজ-টমাজ বুঝি না, আমরা এখন আর কচি খুকীটি নই, বড় হয়েছি, একা-একাই চলাফেরা করতে পারব।

এর আগে আর কখনও বাড়ির থেকে দূরে গিয়ে থাকিনি। বাড়ির পরিবেশ যে আমার খুব পছন্দ, তা নয়; কিন্তু দূরে যাবার সম্ভাবনা যখন দেখা দিয়েছে, তখন হঠাৎ যেন বাড়িকেই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় বলে মনে হতে লাগল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব, সেণ্ট জন'স কলেজের তুলনায় সেখানকার পরিবেশ নিশ্চয় আরও অনেক বেশী বুদ্ধিদীপ্ত, এ-সব কথা ভেবে আমার উত্তেজনা হচ্ছিল ঠিকই, অন্যদিকে, বাড়ির থেকে দূরে গিয়ে অচেনা পরিবেশে দিন কাটাতে হবে, এই কথা ভেবে একটু ভয়-ভয়ও করছিল। ট্রেন যখন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগোচ্ছে, তখন আমি কাঁদিনি। কিন্তু যে নূতন জীবন আর নূতন অভিজ্ঞতার স্বপ্ন আমি দেখতুম, তার দিকে যখন পা বাড়ালুম, তখন খুব-একটা কিছু আনন্দও আমার হচ্ছিল না।

সেণ্ট জন'স কলেজে এত ভিড় ছিল না; সেখানে আমাদের ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা ছিল চল্লিশেরও কম; তার ফলে সেখানকার পরিবেশে একটা ঘরোয়া আন্তরিকতার সৃষ্টি হতে পেরেছিল। এখানে সেটা আদপেই নেই। যে ক্লাসে আমি পড়ি, সেটা চারটে সেকশনে বিভক্ত এবং প্রতি সেকশনে ছাত্রসংখ্যা প্রায় একশো। অর্থাৎ গোটা ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা চার শো। তার মধ্যে মেয়ের সংখ্যা মাত্র পাঁচ। আমি সেই পাঁচজনের একজন। ব্যাপার দেখে আমি তো থ। মেয়েদের কলেজে এম.এ. পড়ানো হয় না। তাই যে-সব মেয়ে বি.এ. পাশ করে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে ভর্তি হতে চায়, আগে থাকতেই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসে। তবে মেয়েদের জন্যে আলাদা কলেজ রয়েছে তো, তাই যে-সব অভিভাবক সহশিক্ষার পক্ষপাতী নন, মেয়েদের তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড়-একটা পাঠাতে চাইতেন না।

সহশিক্ষার ব্যাপারটা আমার কাছে নতুন কিছু নয়। তবে ঠিক এই ধরনের পরিবেশে আমি অভ্যস্ত ছিলুম না। আমাদের ক্লাসে মোট একশো কুড়ি জন অর্থনীতি নিয়ে পড়ত। তাদের মধ্যে মেয়ে বলতে ছিলুম একমাত্র আমি। এই একশো কুড়িজনকে আবার দুটি শাখায় ভাগ করা হয়েছিল। শিক্ষার মাধ্যম তখনও ইংরেজী। অথচ বিষয় হিসেবে ইংরেজী ইতিমধ্যে ঐচ্ছিক হয়েছে। এক্ষেত্রেও দেখতে পেলুম যে, মোট যে তিরানব্বুই জন ইংরেজী নিয়ে পড়ছে, তাদের মধ্যে একমাত্র আমি মেয়ে। একমাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানেই আমি একজন সহপাঠিনী পেয়েছিলুম। তার সংগে অবশ্য আমার মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। মেয়েটি বিবাহিতা, বয়স পঁয়ত্রিশেরও বেশী, ইতিমধ্যে দুটি বাচ্চাও তার হয়েছিল। মাঝখানে প্রায় বছর কুড়ি তাকে পড়াশুনো বন্ধ রাখতে হয়েছিল, তার পরে আবার নতুন করে পড়াশুনো শুরু করেছে। তবে দুজনের মধ্যে এত অমিল হলে কী হয়, তার সংগে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। সবাই তাকে বলত কুলসম্ আপা। হাসিখুশী, মিষ্টি মেয়ে। স্বভাবটি একেবারে শিশুর মতো, ছলনা-টলনার ধার ধারে না। আইন-সভার সদস্যা হিসেবে নির্বাচিত হবার জন্যে অবশ্য একটু ছলনার আশ্রয় তাকে নিতে হয়েছিল। ১৯৩৮ সনে তো মুসলিম আর অ-মুসলিমদের জন্যে পৃথক নির্বাচন-কেন্দ্রের ব্যবস্থা ছিল, যে নির্বাচনকেন্দ্র মুসলিমদের জন্যে নির্দিষ্ট, কোনও অ-মুসলিম প্রার্থী সেখান থেকে দাঁড়াতে পারত না। তা কুলসম্ আপা যে-কেন্দ্রে দাঁড়ায়, সেখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছিলেন এক আধুনিকা মুসলিম মহিলা। তাঁকে হারাবার জন্যে কুলসম্ আপা নাকি 'বোরখা' পরে তার ভোটদাতাদের সামনে হাজির হত। যাতে তাকে দেখে সবাই ভাবে যে, কুলসম্ খুব ধর্মভীরু, পবিত্র কোরানের নির্দেশ একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলে। ওই কারসাজি করেই কুলসম্ নাকি নির্বাচনে জিতে যায়। কিন্তু নির্বাচনে জিতবার পরে সে মহা সমস্যায় পড়ে গেল। 'বোরখা' পরতে তার একদম ভাল লাগে না, কিন্তু যখনই তাকে নির্বাচন-কেন্দ্রে যেতে হয়, তখনই অন্তত জনসমক্ষে তার বোরখা না-পরে বেরোবার উপায় নেই। যাই হোক, কুলসমের সংগে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। আর যে তিনটি মেয়ে আমাদের সংগে পড়ত, তারা গোঁড়া, রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা। ছেলেরা তাদের মধ্যে একজনের নাম দিয়েছিল 'টু মিলিয়ন বি.সি.'। কেন দিয়েছিল, তা বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি। মেয়েটির বাবা রোজ সকালে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে দিতেন, এবং যতক্ষণ না তার ক্লাস শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ ঠায় বসে থাকতেন।

যতক্ষণ না আবার মেয়েকে সংগে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন, ততক্ষণ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই তাঁর কাটত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বারান্দায়, মেয়েদের ঘরের সামনে, একটা চেয়ার পাতা; সারাটা দিন ভদ্রলোক সেই চেয়ারে ঠায় বসে আছেন। সে এক করুণ দৃশ্য। মনে হত, আমাদেরও তো চাকরকে সংগে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবার কথা হয়েছিল, ভাগ্যিস তাতে আমরা রাজী হইনি। কেন যে এরা মহিলা বিদ্যালয়ে না গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, বুঝতে পারতুম না। খুবসম্ভব এরা যে-যে বিষয় নিয়ে পড়ছে, মহিলা বিদ্যালয়ে তা পড়াবার ব্যবস্থা নেই। যাই হোক, ওদের বিষয় আর আমার বিষয় আলাদা, তাই এক লেডিজ' কমনরুম ছাড়া অন্যত্র আমাদের দেখাসাক্ষাৎ খুব কমই হত।

লখনউয়ে পড়তে এসে আমি যেন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলুম। আগ্রায় আমার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল, সবাই আমাকে চিনত। এখানে আমি একেবারেই অখ্যাত। ছাত্রীদের অধিকাংশই এসেছে ইসাবেলা থোবর্ন কলেজ কিংবা মহিলা বিদ্যালয় থেকে তাদের নিজেদের এক-একটা গোষ্ঠী রয়েছে। আমি সেক্ষেত্রে বাইরের মেয়ে; সেই গোষ্ঠীর মধ্যে ঢোকা আমার পক্ষে শক্ত ব্যাপার। তা ছাড়া স্নাতকোত্তর ক্লাসের ছাত্রীদের একটু নাক-উঁচু ভাব রয়েছে, নীচের ক্লাসের মেয়েদের সংগে তারা বন্ধুভাবে বড়-একটা মেশে না। আগ্রায় আমার কত বন্ধু ছিল। এখানে সেক্ষেত্রে সারাক্ষণ নিজেকে বড় নিঃসংগ মনে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে মনে হয় যেন নির্বাসনে এসেছি।

আমরা ছিলুম কাকা-কাকীমার কাছে। তাঁরা আমাদের অপরিচিত নন। সত্যি বলতে কী, বাবার দিকের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে এ'দেরই আমি সবচাইতে বেশী চিনতুম। আমরা যখন সাজাহানপুরে ছিলুম, আমার এই কাকা আর কাকীমা তখন একবার মাস আষ্টেকের জন্যে বিদেশে যান; সেইসময়ে তাঁরা তাঁদের তিনটি শিশুসন্তানকে আমার মায়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। তা বেশ কিছুদিন তারা আমাদের বাড়িতে ছিল। পরে তাদের দাদু তাদের ফৈজাবাদে নিয়ে গিয়েছিলেন। এলাহাবাদেও তারা বেশ-কিছুদিন আমাদের সংগে থেকেছে। আমাদের এই কাকাকে তখন এক জেলা-শহরে বদলি করা হয়েছিল। সেখানে মেয়েদের ইশকুল ছিল না, তাই আমার খুড়তুতো দুটি বোন আমাদের কাছে রয়ে গেল। এলাহাবাদে তারা সেণ্ট মেরি'জ কনভেন্টে ভর্তি হয়েছিল। দুই বোনের বয়সের ব্যবধান দু' বছর। বড়টি আমার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। তা একসংগে খুব খেলাধুলো করতুম আমরা; সারাক্ষণ হৈহৈ করতুম। 'মারি ক্যুরি' চিকিৎসা বলতে যে ঠিক কী বোঝায়, তা আমি জানি না, তবে মাকে ওই চিকিৎসা করাবার জন্যে আমাদের বাড়িতে একটা জিঙ্কের টব আমদানি করা হয়েছিল। এ যখনকার কথা বলছি, টবটা তখন বেকার পড়ে থাকত। তা আমরা সেটা জল দিয়ে ভর্তি করে নিয়ে তিনজনে তার মধ্যে খুব ঝাঁপাঝাঁপি করে চান করতে লেগে যেতুম। সেটাই ছিল সবচেয়ে ফুর্তির ব্যাপার।

বড় মেয়েটির জলবসন্ত হতে আমার কাকীমা তাকে শুশ্রূষা করবার জন্যে এলাহাবাদে এসেছিলেন। সে যদি ভাল হয়ে উঠল, তো ছোটটিকে রোগে ধরল। ফলে কাকীমাকে সেবার বেশ কিছুদিন—তা প্রায় মাস তিনেক—আমাদের বাড়িতে থাকতে হয়। পরে কাকীমা তাঁর তিনটি সন্তানকেই নৈনীতালের এক কনভেন্টে পাঠিয়ে দেন। ১৯৩৭ সনে আমরা তো নৈনীতালে বেড়াতে গিয়েছিলুম। তখন রবিবারে-রবিবারে আমরা তাদের ইশকুল থেকে নিয়ে আসতুম; একসংগে খেলাধুলো করতুম। এসব কথা বলছি এইটে বোঝাবার জন্যে যে, এই পরিবারটির সকলের সংগেই আমাদের সম্পর্ক ছিল বেশ ঘনিষ্ঠ।

আমার এই কাকীমা তো বিদেশে গিয়েছিলেন; তাই আমাদের পরিবারে সবাই

তাঁকে 'আধুনিকা' ভাবতেন। এটা ভাববার আর-একটা কারণ এই যে, তখনও—অন্তত আমাদের মহলে—প্রসাধনের ঘটাপটা চালু হয়নি; অথচ কাকীমা ছিলেন খুবই প্রসাধনপটীয়সী। উপরন্তু, মফস্বলের যে-সব ছোটখাটো শহরে অফিসারদের গিন্নীরা বড়-একটা বাইরে বার হতেন না, আমার এই কাকীমা সেখানেও তাঁর স্বামীর সঙ্গে ক্লাবে যেতেন, টেনিস আর ব্রিজ খেলতেন। পুরুষদের দঙ্গলের মধ্যে একা তিনি মহিলা, কিন্তু তাই নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র অস্বস্তি নেই। ক্লাবে যখন মেয়েদেরও যাবার অধিকার রয়েছে, তখন সেই অধিকারকে তিনি প্রতিষ্ঠা দেবেনই, এই ছিল তাঁর মনোভাব। অন্যেরা সেই অধিকার-রক্ষায় আগ্রহী কি নয়, তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। তাঁর চালচলন, পোশাক-প্রসাধন, সবকিছুর থেকেই যেন আধুনিকতা বিচ্ছুরিত হত। আর সেই কারণেই আমার চোখে তিনি ছিলেন অসামান্যা।

কাকার এই বাড়িটা আমাদের বাড়ির চেয়ে অনেক সুন্দর। তা ছাড়া আমাদের বাড়ির তুলনায় অনেক ছিমছাম করে সাজানো। বেয়ারা এসে ডাইনিং টেবিলে খাবার পরিবেষণ করে। তার পোশাকও একেবারে কেতাদুরস্ত। এই রকমের আরও অনেক ব্যাপার এ-বাড়িতে চোখে পড়ত, আমাদের বাড়িতে যা কখনও দেখিনি। আমার কাকীমার ড্রেসিং টেবিলে কত অসংখ্য রকমের স্নো-পাউডার-রুজ-লিপস্টিক ইত্যাদি যে ছড়িয়ে পড়ে থাকত, সে-সব প্রসাধন-দ্রব্যের কিছু আবার আমার একেবারেই অচেনা; কী করে যে তা ব্যবহার করতে হয়, তাও জানতুম না। কাকা খুব সুপুরুষ। এমন একরকমের মানুষ থাকে, যাদের চেহারা থেকে যৌবন কিছুতেই বিদায় নিতে চায় না। আমার কাকা ছিলেন সেই রকমের মানুষ। নানান ব্যাপারে ছাত্রদের কিছু-কিছু কনসেশন দেওয়া হয় তো, তা আমার কাকাকে এতই ছোকরা-ছোকরা দেখাত যে, শুনেছি, অনেক সময় তাঁকে ছাত্র ভেবে কনসেশন দেবারও প্রস্তাব হয়েছে। কাকীমা সেক্ষেত্রে প্রসাধন-দ্রব্যের সহায়তায় এবং চাল-চলনে নিজেকে বেশ তরুণী করে রাখতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁদের দুজনকে বেশ মানাত।

আমার খুড়তুতো ভাইবোন বলতে দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে। তারা সবাই লা মার্টিনিয়ারে পড়ত। দেশে অনেক তথাকথিত ইংরেজী ইশকুল আছে তো; এটাও সেই রকমের একটা ইশকুল। খুড়তুতো ভাইবোনেরা অনর্গল ইংরিজী বলে। আমি তখন ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছি। কিন্তু তাতে কী, ইংরেজী বলার ব্যাপারে বাচ্চা-বাচ্চা ওইসব ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমি এঁটে উঠতে পারতুম না। আমার খুড়তুতো ভাইয়ের বয়স তখন বছর দশেক। তা সেও অতি অক্লেশে আমার ইংরেজীর ভুলত্রুটি ধরে আমাকে ঠাট্টা করত। ওরা যে হিন্দী জানে না, তা নয়। বেশ বলতেও পারে। কিন্তু বলে না। শুনতুম, ইংরেজীটাই ওদের সহজে আসে। শুনে আমার অস্বস্তি হত। একদিকে ভাবতুম যে, এই যে এরা সদাসর্বদা ইংরেজী বলে, এ ভারী অন্যায়; অন্যদিকে আবার বয়সে আমি ওদের চেয়ে বড়, পড়িও উঁচু ক্লাসে, তবু যে আমি ওদের মতো ইংরেজী বলতে পারি না, এই নিয়ে খুব গ্লানি বোধ করতুম। বলতে কী বি.এ. ক্লাসে ইংরেজী আমার অন্যতম পাঠ্য বিষয়। ইংরেজী সাহিত্যে আমার জ্ঞান ওদের চেয়ে অনেক বেশী। তবু যে ওদের মতো অনর্গল ইংরেজী বলতে পারি না, এইটে ভাবতে কী যে বিশ্রী লাগত, তা বলবার নয়।

আধুনিক চলন-বলন দেখে তো কাকীমার প্রতি আকৃষ্ট বোধ করতুম, তা সেই আধুনিকতাই আমাদের জীবনে একদিক থেকে একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। বিকেলে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে আসবার পরে কাকা আর কাকীমা ক্লাবে চলে যেতেন, ডিনারের আগে তাঁরা বাড়ি ফিরতেন না। মেয়ে দুটিও গানের ইশকুলে গান শিখতে যেত, আর ছেলেটি যেত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খেলতে। ফলে

বিকেলের চা আর রাত্তিরের ডিনারের মধ্যবর্তী সময়টা আমাদের বড় নিঃসঙ্গ লাগত। অপরিচিত পরিবেশে একা-একা সময় কাটাতে কী খারাপই যে লাগত আমাদের। হঠাৎ যেন একটা নিঃসঙ্গতার বোঝা ঝুপ করে আমাদের উপরে নেমে আসত।

কাকীমা সেটা বুঝতে পারতেন। বাড়িতে একা-একা সময় কাটাতে হয়, একটু গল্পগুজব আমোদ-আহ্লাদ করব, তার উপায় নেই, কাকীমা এই সমস্যার একটা বিহিতও করলেন। তাঁরা ছ' বোন, চার ভাই। বোনেদের মধ্যে তিনজন থাকতেন তাঁর বাড়ির ঠিক পিছনের রাস্তার পরপর তিনটি বাড়িতে। মাঝখানে পাঁচিল। বড্ড উঁচু। অত উঁচু না হলে পাঁচিল টপকেই আমরা পিছনের বাড়িতে চলে যেতে পারতুম। ঘুরে যেতেও অবশ্য মিনিট পাঁচেকের বেশী লাগত না। তিন বোনের একজনের ছ' মেয়ে, তিন ছেলে; আর-এক জনের দুই মেয়ে; আর তৃতীয় জনের পাঁচ ছেলে, এক মেয়ে। তা সেইসব ছেলেমেয়ের মধ্যে কয়েকজন আমাদেরই বয়সী। কাকীমা বলতেন, বাড়িতে একা-একা বসে থেকে কী হবে, ওদের সঙ্গে গিয়ে ভাবসাব করে নাও। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, ওরা সবাই কনভেন্ট কি ইংরেজী ইশকুল থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। ফলে ওদের সঙ্গে আমাদের ঠিক মেলে না। এমনিতে অবশ্য খুবই ভদ্র, গেলে খুব খুশীও হয়, কিন্তু ওই যা বললুম, ঠিক মিলমিশটা যেন হতে চায় না। প্রায়ই আমরা তাদের বাড়িতে বেড়াতে যেতুম, ওরাও তাদের মাসীর বাড়িতে প্রায়ই বেড়াতে আসত, তার ফলে আমাদের সঙ্গে ওদের কিছুটা বন্ধুত্ব যে হয়নি, তাও নয়, কিন্তু সেটা ওই নেহাতই যেন উপর-উপর একটা সম্পর্ক তার মধ্যে কোনও গভীরতা ছিল না। ওদের সঙ্গে মেলামেশা করতুম ঠিকই, কিন্তু তাতে আমাদের নিঃসঙ্গতাই যেন আরও প্রকট হয়ে উঠত। ওরা সবাই দেখতুম ইংরেজীতেই কথাবার্তা কয়। অথচ ইংরেজী তখনও আমাদের কাছে নেহাতই বিদেশী ভাষা। যে-সব বই কি ছবি নিয়ে তারা আলোচনা করত, সেগুলি যেন আরও বিদেশী; তার নামও ইতিপূর্বে আমরা শুনিনি। মাঝেমধ্যে তারা আবার ইংরেজী গান গাইত; ভাষার চাইতে তার সুর যেন আরও দুর্বোধ লাগত আমাদের। কোত্থেকে যে এ-সব গান তারা শেখে, কিছুই বুঝতুম না। তাদের সঙ্গে একটা মিষ্টি সম্পর্ক রাখতুম ঠিকই, একসঙ্গে খেলাকাটা করতেও যাব হতুম, কিন্তু ওই যে বলেছি, সবটাই আসলে উপর-উপর ব্যাপার, তাতে যেন ঠিক প্রাণের ছোঁয়া লাগত না।

কাকীমা যে ক্লাবে যেতেন, তার কাছেই আমার বাবার এক মামার বাড়ি। স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বউ আর তিন নাতি-নাতনী নিয়ে তিনি সেখানে থাকতেন। বৃদ্ধ মানুষ। আমরা তাকে মামুজী বলতুম। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল বেশ চিত্তাকর্ষক। শুনেছি যৌবনকালে তিনি খুব টগবগে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সেইসময়ে বিলেতে গিয়ে কিছুদিন খুব ফুর্তিতে কাটিয়েছিলেন। কিন্তু যৌবনে তো আর তাঁকে আমরা দেখিনি; তাঁর বার্ধক্যের মধুর ব্যক্তিত্বটাই আমাদের চোখে পড়ত। মামুজী ছিলেন খাঁটি 'লখনৌয়া'; তাঁর কথাবার্তা, চালচলন সবকিছু থেকেই যেন সেকালের মাধুর্য বিচ্ছুরিত হত। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বেশ সুন্দরী। তিনিও অতি নম্র আর মধুর স্বভাবের মহিলা। তবে সংসারটা যে তাঁরই ইচ্ছায় চলে, তা নিয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ ছিল না। কাকীমা ঠিক করলেন, ক্লাবে যাবার পথে মাঝেমধ্যে আমাদের তিনি মামুজীর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাবেন, তারপর ফিরতি-পথে আবার সেখান থেকে আমাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে ফিরে আসবেন। তা বাড়িতে একা-একা ভাল লাগত না তো, তাই মাঝেমধ্যেই আমরা মামুজীর বাড়িতে যেতুম। তা ছাড়া আমরা জানতুম যে, এটা আমাদের কর্তব্যও বটে। বাবা তাঁকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করতেন। ঠাকুর্দা যখন মারা যান, আমাদের সংসারে তখন টাকাপয়সার খুব টানাটানি, সেই সময়ে টাকাপয়সা দিয়ে

মামুজী খুবে সাহায্য করেছিলেন, তাতেই তখনকার মতো একটা সুরাহা হয়। আমার তিন কাকার প্রত্যেকেই ওই মামুজীর আশ্রয়ে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন। আমরাও অনেক সময় তাঁর বাড়িতে এসে ছুটি কাটিয়েছি।

মামুজীরা ছিলেন খুবই অতিথিবৎসল মানুষ। তাদের বাড়িতে এলে একটা আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া যেত। মনে হত, আমরা আসায় সত্যিই এঁরা খুশী চতুর্দিকের ঘটনা সম্পর্কে আগ্রহী। তাঁর সান্নিধ্য আমার খুব ভাল লাগত। মামুজীর দুই নাতনী তো সম্পর্কে আমার বোন হয়। তারাও লা মার্টিনিয়ারে পড়ত। কিন্তু বয়সে তারা আমার খুড়তুতো বোনেদের চেয়েও ছোট। আর মামুজীর নাতিটির তখন ইশকুলে যাবার বয়সও হয়নি। একটি তরুণও অবশ্য মামুজীদের বাড়িতে থাকতেন। সম্পর্কে তিনি মামুজীর ভাইপো; সেই সুবাদে বাবার তিনি দূর-সম্পর্কের ভাই। সেই বছরেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে বি.এ. পাশ করে বেরিয়েছেন। বেশ ঝকঝকে, প্রাণবন্ত লোক। প্রচুর পড়াশুনো করেছেন; উপরন্তু চতুর্দিকেব ঘটনা সম্পর্কে আগ্রহী। তাঁর সান্নিধ্য আমার খুব ভাল লাগত। মামুজীর পবিবারের লোকেরা থাকতেন বাড়িতে দোতলায়। আর ইনি থাকতেন একতলায়। অনেক সময় আমি দোতলা থেকে একতলায় নেমে তাঁর ঘরে গিয়ে নানান বিষয়ে গল্প করতুম। তবে ছেলেবেলা থেকেই আমাকে তিনি দেখছেন তো; এমনভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতেন যেন তখনও আমি নেহাতই শিশু। ফলে তাঁকে ঠিক বন্ধু হিসেবে পাওয়া যেত না। তা ছাড়া, তাঁর বয়সী অন্যান্য কিছু ছেলেকেও অনেক সময় তাঁর ঘরে দেখতে পেতুম। তখন নিজেকে অনেকটা অনধিকাব-প্রবেশকারিণী বলে মনে হত। অস্বস্তি হত। বুঝতে পাবতুম না, ঘরের মধ্যে আমি থাকব, না ঘর থেকে চলে যাব। চলে যাবার উদ্যোগ করলে তিনি আপত্তি করতেন না। তাতে মনে হত, আমার সেখানে না থাকাটাই তাঁর মনঃপূত, বন্ধুদের সঙ্গে একান্তে কথা বলবেন, এইটেই তাঁর মনোগত বাসনা। উপরন্তু আমি সচেতন ছিলুম যে, নীচে বসে অনাত্মীয় একদল পুরুষেব সঙ্গে গল্প করছি, এটা হয়ত উপবতলার বয়স্ক মানুষদের ঠিক অভিপ্রেত নয। তবু হয়তো আরও ঘন-ঘন নীচে নামতুম। কিন্তু সেটা সম্ভব হত না এইজন্যে যে, দিদি আমার সঙ্গে নীচে নামতে চাইত না। একা গেলে দৃষ্টিকটু দেখাবে, সেটা বুঝতে পারতুম। তাই কী আর করা, উপরে বসে সেইসব আত্মীস্বজনদের সঙ্গে গল্প কবতে হত, যাঁদেব একজনও আমার সমবযসী নয; কেউ-বা আমার চেয়ে অনেক বড়, কেউ-বা অনেক ছোট।

ফলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে, প্রচুর সঙ্গী-স্বজনের দ্বারা পরিবৃত হয়েও আমরা নিঃসঙ্গ বোধ করতুম। মনে হত, আমরা যেন নোঙর-ছেঁড়া নৌকো, উদ্দেশ্যহীনভাবে ভেসে বেড়াচ্ছি। আগ্রার কথা মনে পড়ত। মনে পড়ত, সেখানে কত ঘনিষ্ঠ সব বন্ধু ছিল আমাদের। জীবন তখন এত ছন্নছাড়া ছিল না। সেই তুলনায় জীবন এখন কত শূন্য হয়ে গেছে। শূন্যতার একটা বোধ আমাদের ঘিরে ধরছে। এই সব কথা ভাবতুম আর বিষণ্ণ বোধ করতুম। আমি আর দিদি পরস্পরের দিকে তাকাতুম। কেউ কাউকে কিছু বলতুম না। কিন্তু দুজনেই জানতুম, কী আমরা বলতে চাই। পরস্পরের চোখ দেখেই সেটা বুঝতে পারতুম আমরা। এতই বিচ্ছিন্ন বোধ করতুম আমরা, এতই নিঃসঙ্গ, যে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার জন্যও যেন বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করতুম না আমরা। মনের কথাটাকে ভাষায় প্রকাশ করতে হয়ত ভয় পেতুম। কিংবা হয়ত ভাবতুম যে, তার কোনও প্রয়োজনও নেই। এই নিঃসঙ্গতা দিদিকে আর আমাকে পরস্পরের কাছে টেনে আনতে পারত। কিন্তু তা আনেনি। বরং এই নিঃসঙ্গতাই যেন পরস্পরের থেকে আমাদের আরও দূরে ঠেলে দিতে লাগল। যে যার আপন বিচ্ছিন্নতার

মধ্যে, বিচ্ছিন্নভাবে নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলুম আমরা। আমরা তা নিয়ে আলোচনা করতুম না। কিন্তু বুঝতে পারতুম, সেই নিঃসঙ্গতা আমাদের চিত্তকে গ্রাস করে নিচ্ছে। আমাদের অন্তরঙ্গতা বড় অদ্ভুতভাবে সেদিন খানখান হয়ে গিয়েছিল। সেই নষ্ট সম্পর্ক আর কখনও জোড়া লাগেনি।

মনে পড়ে, নিঃসঙ্গতার বোধ যখন চারদিক থেকে আমাকে চেপে ধরেছে, তখন একদিন হিন্দীতে একটি কবিতা লিখেছিলুম। তার বক্তব্য মোটামুটি এই রকমের যে, চারদিকে জল থাকা সত্ত্বেও সমুদ্রবক্ষে পরিত্যক্ত মানুষটির তৃষ্ণা যেমন মেটে না, ঠিক তেমনি আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা পরিবৃত হওয়া সত্ত্বেও আমি নিঃসঙ্গ। কবিতাটা কাউকে আমি দেখাইনি। এমন কী, দিদিকেও না। কিন্তু এই কবিতা লিখে আমার চিত্তের বোঝা যেন অনেকটা নেমে গেল; আমি একটু হাল্কা বোধ করতে লাগলুম। বাইরে থেকে তখনও আমাকে লঘুচিত্ত মনে হত বটে, কিন্তু মোটামুটি এই সময় থেকেই আমার অন্তর-দৃষ্টি খুলে যায়। বাইরে না তাকিয়ে আমি মনের মধ্যে দৃষ্টিপাত করতে শুরু করি।

দিদির চরিত্র অনেকটা লাজুক লতার মতো। তার একটা অবলম্বন চাই, যাকে আশ্রয় করে সে বেড়ে উঠতে পারবে। অবলম্বনটা সরিয়ে দিলেই দেখা যাবে, সে শুকিয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমার ধাত অনেক কঠিন। আমি সেই কাঁটাগাছের মতো, বিনা যত্নেই যে বেড়ে উঠতে পারে। কাঁটাগাছেও ফুল ফোটে। কিন্তু সেই ফুল বড়-একটা কারও চোখে পড়ে না। কাঁটার আড়ালেই সে গোপন রয়ে যায়।

* * *

নৃতাত্ত্বিক ডঃ মজুমদারের কথা মনে পড়ে। সদ্য তিনি তখন অর্থনীতি বিভাগে যোগ দিয়েছেন। নৃতত্ত্বের জন্য আলাদা কোনও বিভাগ তখন ছিল না; অর্থনীতির অংশ হিসেবে তখন নৃতত্ত্ব পড়ানো হত। অধ্যাপক হিসেবে ডঃ মজুমদার তখন নেহাতই নবীন। তাঁর সংকোচ তখনও কাটেনি। মনে হত, মেয়েদের সামনে নৃতত্ত্ব পড়াতে তিনি একটু অস্বস্তি বোধ করছেন। তাঁর পড়াবার বিষয় ছিল সামাজিক নৃতত্ত্ব। তার মধ্যে মাঝেমাঝেই গোষ্ঠী-বিবাহ, বহুস্বামী-গ্রহণ ইত্যাদি সব প্রসঙ্গ এসে যেত। ক্লাসের মধ্যে আমার উপস্থিতিতে তিনি তখন বিব্রত বোধ করতেন, প্রথাগুলিকে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারতেন না। আমি একেবারে নির্বিকার মুখে ক্লাসের মধ্যে বসে থাকতুম, আর লক্ষ করতুম, এ-সব প্রথা নিয়ে আলোচনার সময় তাঁর মুখ কীভাবে লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠছে। আমার দিকে চোখ পড়বামাত্র তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিতেন, তৎক্ষণাৎ তাঁর সারা মুখে লজ্জার রক্তাভা ছড়িয়ে পড়ত, অতঃপর সোজাসুজি সামনের দিকে তাকিয়ে গড়গড় করে তিনি বক্তৃতা দিয়ে যেতেন। বক্তৃতা শেষ হবার পরে আবার একবার আমার দিকে তাকাতেন তিনি। আবার তাঁর মুখ রক্তিম হয়ে উঠত। আবার তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। তাঁর এই আচরণে আমিও যে বিশেষ স্বস্তিবোধ করতুম না, সে-কথা বলাই বাহুল্য; এতে করে যেন ক্লাসের মধ্যে আমার উপস্থিতি সম্পর্কে ছেলেরা আরও বেশীমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠত। ডঃ মজুমদারের আচরণে আমার কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তীব্র চোখে তা লক্ষ করত তারা। তা সে যাই হোক, বিষয় হিসেবে নৃতত্ত্ব আমার খুব ভাল লাগত। সামাজিক নানা মূল্যবোধ ও আচরণ-বিধির প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতটা কী, নৃতত্ত্ব পড়ে তা আমি বুঝতে পারি। এ সম্পর্কে আমার পুরনো ধারণাগুলি ভেঙে যেতে থাকে। ফলে আমি গভীরভাবে আলোড়িত হতে থাকি ও এই নিয়ে আমার মনে নতুন-নতুন নানা চিন্তার উদয় হয়। আমার অবচেতনায় অনেক সংস্কার তো এতদিন বদ্ধমূল হয়ে ছিল। প্রধানত এই সামাজিক

নতত্ত্ব পড়বার ফলেই সেইসব সংস্কারের শিকড় ক্রমে-ক্রমে আলাদা হয়ে যেতে থাকে।

অর্থনীতি বিভাগের দুজন লেকচারারের কথাও মনে পড়ছে। পাছে কেউ মনে করেন যে, আমি তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছি, তাই তাঁদের নাম করব না। একটা ব্যাপারে এঁদের মধ্যে খুব মিল ছিল; দুজনের একজনও দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলনে বিশ্বাস করতেন না। একটুও না থেমে একেবারে গড়গড় করে এঁরা বক্তৃতা দিয়ে যেতেন। ফলে, গোটা বক্তৃতাটাকেই যেন যতিহীন অতিদীর্ঘ—তা এক-একটা পিরিয়ডের মেয়াদ তো নেহাত কম ছিল না, পুরো পঞ্চাশ মিনিট—একটি বাক্য বলে মনে হত। বক্তৃতা দেবার সময়ে কণ্ঠস্বরের একটু উত্থান-পতন ঘটবে তো, তাও তাঁদের ঘটত না। একঘেঁয়ে একটানা বক্তৃতা, শুনতে শুনতে যেন ঘুম পেয়ে যেত। ডায়াসের যে-দিকটায় আমি বসতুম, সেদিকটায়—আমার ঠিক চোখের সামনেই—ছিল মস্ত একটা জানালা। জানালার ওদিকে খেলার মাঠ। বসে বসে দেখতুম, সারাক্ষণই সেখানে একটা-না-একটা খেলা চলছে। হয় হকি, নয়তো ফুটবল, নয়তো ক্রিকেট। সারাক্ষণ সেই খেলা দেখতুম; বক্তৃতার একটা কথাও আমার কানে ঢুকত না। ডঃ মজুমদার যেমন পড়াতে পড়াতে মাঝেমধ্যে আমার দিকে তাকাতেন, ভাগ্যিস এই অধ্যাপক দুজনের কেউ সেভাবে তাকাতেন না, নয়তো ভীষণ মুশকিলে পড়তে হত, আমার দিকে তাকালেই তাঁরা বুঝতে পারতেন যে, কিছুই আমি শুনছি না, সারাক্ষণ আমি অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছি। পড়া শুনতে আমি যে চেষ্টা করতুম না, তা নয়; কিন্তু যতই চেষ্টা করি, দেখতে পেতুম যে, তাঁদের কথায় মনোনিবেশ করতে পারছি না। দুজনের মধ্যে একজন পড়াতেন আর্থিক নানা নীতি আর ব্যাংকিং; অন্যজন পড়াতেন অর্থনীতির সাধারণ সূত্রগুলি। তবে দুজনের মধ্যে ঠিক কে যে কোন্‌টা পড়াতেন, তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়; তার কারণ, মন দিয়ে আমি একদিনও তাঁদের বক্তৃতা শুনিনি। ক্লাসের মধ্যে বসে থেকেও ক্লাসের মধ্যে আমি নেই; মন যে কীভাবে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র ঘুরে বেড়ায়, ভাবলে সত্যি অবাক লাগে। বলতে কী, অনেক সময় তাঁদের বক্তৃতার একটা বিন্দুও না-বুঝে আমি পাতার পর পাতা একেবারে যান্ত্রিকভাবে, নোট নিয়েছি। আমার মন রয়েছে অন্যদিকে, অথচ আঙুলগুলো নোট নিচ্ছে, বিষয়ের বিসর্গ না বুঝে অনেকে যেমন টাইপ করে যায়, এও একেবারে তেমনি ব্যাপার।

বি বি মুখার্জীর গলা ছিল খুব জোরালো। ফলে তিনি যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কিংবা বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনের বিষয়ে পড়াতেন, তখন কিন্তু কারও পক্ষে অমনোযোগী হবার কিংবা জানালার দিকে চোখ রাখবার উপায় ছিল না। তাঁর বিষয় ছিল আন্তর্জাতিক অর্থনীতি। ইন্টারমিডিয়েটে আমার অর্থনীতি ছিল বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বিষয়ে তখন কিছুই পড়ানো হয়নি, ফলে এ-বিষয়ে কিছুই আমি জানতুম না। বিষয়টার প্রতি আকর্ষণ বোধ করতুম, অধ্যাপক মুখার্জী পড়াতেনও খুব সহজ-সরল করে, তবু বিষয়টাকে যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারতুম না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগে, অন্তত নীতি হিসেবে, এই একটা ব্যাপার মেনে নেওয়া হয়েছিল যে, আগার চেয়ে গোড়া অনেক জরুরী, অর্থাৎ ছাত্রদের পড়াশুনোর ভিতটাকে একেবারে পোক্ত করে দেওয়া চাই। এই নীতি অনুযায়ী নামজাদা সব অধ্যাপকেরাও নীচের দিকের কিছু ক্লাস অন্তত নিতেন। অধ্যাপক সিদ্ধান্তের কথাই ধরা যাক। তিনি যে শুধু ইংরেজী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন, তা তো নয়, আর্টস্‌ ফ্যাকালটিরও তিনিই ছিলেন ডীন। তবু সপ্তাহে অন্তত তিন দিন তিনি নতুন ছাত্রদের ক্লাস নিতেন। ইংরেজীতে আমাদের মোট চারটি সেকশন। তার মধ্যে একটি সেকশনের ছাত্রদের তিনি পড়াতেন। অন্য তিন সেকশনের ছাত্রছাত্রীদের

ইংরেজীর ভিত পোক্ত করবার কী ব্যবস্থা হয়েছিল, তা আমি জানি না। তবে, আমার ভাগ্য ভাল, অধ্যাপক সিম্ধান্ত যে-সেকশনের ক্লাস নিতেন, আমি ছিলুম সেই সেকশনেরই ছাত্রী। অধ্যাপক সিম্ধান্তের তখন খুব নামডাক। সেটা বিচিত্র নয়, কেননা কেম্ব্রিজে তিনি ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর ট্রাইপস্ পেয়েছিলেন। ছাত্ররা সবাই তাঁকে খুব শ্রম্ধা করত, এবং তাঁর নির্দেশ কেউ কখনও লঙ্ঘন করত না। তিনি যে একজন যোগ্য শিক্ষক ছিলেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই; তবে ছাত্রদের যে তিনি বিশেষ অনুপ্রাণিত করতে পারতেন, এমন আমার মনে হয় না। অবশ্য ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন, লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন এমন শিক্ষক কেই বা ছিলেন!

ইনটারমিডিয়েট ক্লাসে শেকস্পীয়রের 'টেমপেস্ট' পড়েছিলুম। গোটা নাটকটা নয়, তার একটা সংক্ষেপিত সংস্করণ আমাদের পড়ানো হত। এ-সব বই সংক্ষেপিতভাবে পড়াবার চেয়ে গর্হিত কাজ আর কী হতে পারে? শেকস্পীয়র পড়লুম, অথচ তাঁর ভাষার শোভার অনেকটাই আমার অজানা রয়ে গেল, এর কি কোনও অর্থ হয় নাকি? বেশ তো, শেকস্পীয়রকে পুরোপুরি উপলব্ধি করবার যোগ্যতা যে-সব ছাত্রের হয়নি, তাঁর রচনা তাদের আদৌ না-পড়লেই হয়। তাই বলে সংক্ষেপিত সংস্করণ পড়িয়ে, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাবার কোনও মানে হয় না। সত্যি বলতে কী, 'টেমপেস্ট'-এর সেই সংক্ষেপিত সংস্করণ পড়ে শেকস্পীয়র সম্পর্কে আমার আগ্রহ একেবারে উবে গিয়েছিল। অধ্যাপক সিম্ধান্তের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, তিনি আবার সেই লুপ্ত আগ্রহকে ফিরিয়ে আনলেন। তিনি আমাদের 'জুলিয়াস সীজার' পড়াতেন। তারই ফলে শেকস্পীয়র সম্পর্কে আবার আমি শ্রম্ধাশীল হয়ে উঠি।

সি. জি. রায়ের কথা মনে পড়ে। তাঁর চোখের রঙ ছিল হাল্কা নীল। ভাল দেখতে পেতেন না, তাই একটা আতস কাঁচ নিয়ে তিনি আমাদের গিবনের আত্মজীবনী পড়াতেন। তাঁর ক্লাস যে আমাদের ভাল লাগত না, তার জন্যে তাঁকে দোষ দিলে অন্যায় হবে। আদৌ কোনও শিক্ষকের পক্ষে কি ওই শুকনো, নীরস আত্মজীবনীকে মনোগ্রাহী করে পড়ানো সম্ভব? "প্রেমিকের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলে, পুত্রের মতো নির্দেশ পালন করলুম আমি"—গোটা বইয়ের মধ্যে এই একটি মাত্র লাইন আমার মনে আছে। বাদবাকী বইয়ের একটি লাইনও মনে রাখার যোগ্য নয়। গিবন অবশ্যই মস্ত লেখক, কিন্তু তাই বলে তাঁর আত্মজীবনীকে আমি একখানা মহান গ্রন্থ বলে স্বীকার করতে রাজী নই। ইংরেজী সাহিত্যের ভাণ্ডারে কত সব ভাল-ভাল বই রয়েছে। সে-সব ছেড়ে কেন যে এই আত্মজীবনীখানাকে আমাদের পাঠ্য হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল, কে জানে।

আমার কাকা আর কাকীমা যে ক্লাবে যেতেন, সি জি রায়ও ছিলেন সেই একই ক্লাবের সদস্য। আমি তাঁদের ভাইঝি, এইটে জেনে সি. জি. রায় আমার সম্পর্কে খুব আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ইংরেজীর জেনারেল ক্লাসে আমাদের অনেকসময় 'এসে' কি 'প্রিসি' লিখতে হত। অধ্যাপক রায় শুনেছিলেন, আমি সেণ্ট জন'স কলেজে পড়তুম। তাই শুনে তিনি ধরে নিয়েছিলেন, ইংরেজীটা আমি এতই ভাল জানি যে, এমন-কী তাঁর টিউটোরিয়ালে যাবারও কোনও দরকার আমার নেই। তা ক্লাসে যে-সব 'এসে' আমি লিখতুম, তা তো আর বিশেষ উঁচুদরের হত না। ফলে আমার সম্পর্কে তাঁর আশাভঙ্গ হতে বিশেষ দেরি হয়নি।

যে নীতি অনুযায়ী অধ্যাপক সিম্ধান্ত আমাদের ইংরেজীর ক্লাস নিতেন, সেই একই নীতি অনুযায়ী অধ্যাপক মেননও আমাদের 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' পড়াতে শুরু করলেন। অধ্যাপক সিম্ধান্তের মতো অতো উঁচুদরের অধ্যাপক তিনি না হতে পারেন, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান' বিভাগে তিনি তখন রীডার; অধ্যাপক ডঃ রায়ের ঠিক পরেই তাঁর স্থান। অধ্যাপক মেননের সঙ্গে পরিচয় ঘটবামাত্র ছাত্ররা তাঁর সম্পর্কে

শ্রদ্ধা বোধ করত। তিনি যে থোরাটে চিন্তাভাবনার ধার ধারেন না এবং নিজের বিষয়ে তিনি যে একজন পারঙ্গম ব্যক্তি, তাঁর সান্নিধ্যে এলেই সে-কথা বুঝতে পারা যেত। ছাত্রদের মধ্যে কে পড়াশুনোয় ফাঁকি দিচ্ছে, তা নিয়ে তিনি আদৌ মাথা ঘামাতেন না। তাঁর মনোভাব অনেকটা এই রকমের ছিল যে, অনিচ্ছুক ছাত্রদের জোর করে ক্লাসে বসিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না, তার চেয়ে তাদের বরং হাজিরা-খাতায় 'উপস্থিত' বলে চিহ্নিত করে অতঃপর ক্লাস থেকে সরে পড়তে দেওয়াই ভাল। প্রকাশ্যে সে-কথা তিনি বলতেনও। খোলাখুলি বলতেন যে, যারা তার ক্লাসে থাকতে চায় না, অক্লেশে তারা বেরিয়ে যেতে পারে। ক্লাসভর্তি ছাত্র, কিন্তু পিছনের বেঞ্চির ছেলেরা কাটাকুটি খেলছে, এর চেয়ে অল্প-কিছু মনোযোগী ছাত্র ক্লাসে থাক, তাতেই তিনি খুশী। মজা এই যে, তাঁর পড়াবার গুণে জটিল বিষয়ও অতি চিত্তগ্রাহী হয়ে উঠত, ফলে তাঁর ক্লাসে কারও 'প্রক্সি' দেবার দরকার হত না, ক্লাস থেকে কেউ সরেও পড়ত না। শৃঙ্খলা নিয়ে তাঁকে কখনও মাথা ঘামাতে হয়নি। সর্বদাই তাঁর ক্লাসে পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা বিরাজ করত। ভাল পড়াতেন; তাঁর আসল শক্তি ছিল সেইখানে। বিশেষ করে মেয়েরা তাঁর খুব ভক্ত ছিল। আড়ালে তাঁকে তারা বলত 'মেনন ডার্লিং'। কথাটা অধ্যাপক মেননের কানে কখনও পোঁছয়নি। পোঁছলে যে তিনি অতিশয় বিব্রত বোধ করতেন, তাতে সন্দেহ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা বলতে মাত্র একজনই ছিলেন। মিসেস নারায়ণ আমাদের নানা দেশের সংবিধানের বিষয়ে পড়াতেন। পড়ানোব ব্যাপারে তাঁর বেশ দক্ষতা ছিল। তা ছাড়া রসবোধও কম ছিল না। অল্পবয়সী অধ্যাপিকা; ক্লাসভর্তি ছাত্রদের পড়াচ্ছেন; রসবোধটুকু না থাকলে তিনি খুব অস্বস্তিতে পড়তেন নিশ্চয়। যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের প্রথম বছরে যাঁদেব কাছে আমি পাঠ নিয়েছিলুম, তাঁদের কথা এখানে বলা গেল।

* * *

এই সময়ে একদিন একটা চিঠি পেয়ে একেবারে তাজ্জব হয়ে যাই। চিঠিতে একটি মেয়ের বিয়ের খবর ছিল। মেয়েটি সেণ্ট জন'স কলেজে আমাদের সঙ্গে পড়ত। চিঠিতে ওই সেণ্ট জন'স কলেজেরই এক অধ্যাপকের সঙ্গে তার বিয়ের খবব জানা গেল। আমরা যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন এই মেয়েটি এসে আমাদের কলেজে ভর্তি হয়। ওই অধ্যাপকই তার ভগ্নীপতি। এর বছর খানেক আগে অধ্যাপকের স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। তাতে ভদ্রলোক খুব সমস্যায় পড়ে যান। তাঁর সংসার কে দেখবে? তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর শিশু-সন্তানটিকেই বা লালন-পালন করবে কে? কী আর করেন, শ্যালিকাকে তিনি আগ্রায় নিয়ে এলেন। বলা বাহুল্য, শ্যালিকার সঙ্গে ভগ্নীপতির বিয়ে এদেশে আইনবিরুদ্ধ বা প্রথাবিরুদ্ধ নয়। তবু, খবরটা শুনে আমার বিচ্ছিরি লাগল। মনে হতে লাগল, এটা নেহাতই ব্যভিচারের ব্যাপার। দিদি কিন্তু আদৌ বিস্মিত হল না। বুঝতে পারল না. আমি এতে এত অসুখী বোধ করছি কেন। সত্যিই আমি অসুখী বোধ করেছিলুম; তবে কেন করেছিলুম, তার কোনও সহজ ব্যাখ্যা নেই।

* * *

বিকেলের চায়ের পাট শেষ হয়েছে। ড্রইংরুমে, রেডিয়ো-সেটটাকে ঘিরে, আমরা বসে ছিলুম। একগাদা লোক; বেতারে সেদিন কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল নিশ্চয়। সেই অনুষ্ঠানে হঠাৎ ছেদ পড়ল। কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। তারপর গম্ভীর

একটি ঘোষণা শুনলুম—মিত্রপক্ষ জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছে।' শুনে আমরা তো হতবাক্। ব্যাপারটা যে একেবারে অপ্রত্যাশিত, তা নিশ্চয় বলা যায় না; কিন্তু সত্যিই যে ঘটবে, তাও হয়তো আমরা ভাবতে পারিনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তাহলে সত্যিই বেধে গেল! রেডিয়ো-সেটের সামনে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলুম আমরা। তারপর, কী জানি কেন, দল বে'ধে সবাই হজরতগঞ্জের দিকে রওনা হলুম। হজরতগঞ্জই হচ্ছে লখনউ শহরে বিকিকিনির সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। যুদ্ধের খবর ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে। খবরের কাগজের হকাররা দু'-পাতার 'টেলিগ্রাম' বিক্রি করছে। আমাদের মতো আরও অনেকে সেদিন—কিছু না-ভেবেচিন্তে যেন-বা সহজাত বৃত্তির তাড়নায়—হজরতগঞ্জে এসে ভিড় জমিয়েছিলেন। সর্বত্র দেখলুম লোক গিজগিজ করছে। সবাই 'টেলিগ্রাম' কিনছে, পড়ছে, উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম আমরা। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে ভালই লাগছিল। তারপর বাড়ি ফিরলুম। আমাদের উত্তেজনা তখনও কাটেনি। দিদি তো 'আন্তর্জাতিক রাজনীতি'র ছাত্রী। এসব ঘটনার তাৎপর্য সে আমার চেয়ে ভাল বোঝে। ফলত সে আমার চেয়ে অনেক বেশী উত্তেজিত। সত্যি বলতে কী, যুদ্ধ-ঘোষণার তাৎপর্য তখনও আমি পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি।

এর পরে যখন কাগজে পড়লুম যে, জার্মানি আর সোভিয়েট ইউনিয়ন পোল্যান্ডকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিচ্ছে, তখন যেমন বিস্মিত তেমনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলুম। তবে, এর মাসখানেক আগেই যে এই দুটি দেশের মধ্যে একটা বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তাও আমি জানতুম না।

দূরে ইউরোপে যুদ্ধ চলছে। সেই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি ততটা ভাবিত ছিলুম না, যতটা ভাবিত ছিলুম আমার দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে। ভারতের তরফেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ব্রিটেন। কিন্তু এইভাবে ভারতকে যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়া কি ব্রিটেনের পক্ষে উচিত হয়েছে? ভারতের কি এই অবস্থায় যুদ্ধেব উদ্যোগে সাহায্য করা উচিত?

এ-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে অকটোবর মাসে যুক্তপ্রদেশ বিধানসভার অধিবেশন হল। দল বে'ধে আমরা সেদিন বিধানসভায় গিয়েছিলুম। এর আগে বিধানসভার কথা বইয়ে পড়েছি। গ্যালারিতে বসে সেই প্রথম সেই সভা দেখলুম। পন্থজীকে সহজেই চেনা গেল। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকেও। তবে অন্যদের চিনতে পারলুম না। বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে এর আগে এলাহাবাদে বারকয়েক দেখেছি। তবে আমার মনে তিনি বিশেষ দাগ কাটতে পারেননি। সেদিন অবশ্য ট্রেজারি বেঞ্চেও তাঁকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। রূপ দেখে যেন চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

দারুণ একটা প্রত্যাশা নিয়ে সেদিন বিধানসভার অধিবেশন দেখতে গিয়েছিলুম। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সেখানে অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ভীষণ উত্তেজনা আমার মনে। ভাবছিলুম, না জানি কত তর্ক-বিতর্ক হবে, বক্তৃতার বান ছুটবে। সে-সব কিছুই কিন্তু হল না। আমি তো আর জানতুম না যে, সিদ্ধান্ত যা নেবার, তা কংগ্রেস দল ইতিমধ্যেই নিয়ে নিয়েছে। বিধানসভায় এখন সেই অনুযায়ী একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেওয়া হবে মাত্র। আসলে এটা একটা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মনে পড়ে, ভীষণ হতাশ হয়ে সেদিন ফিরে এসেছিলুম। আমাদের সেণ্ট জনস কলেজে তো নকল-পার্লামেন্টের অধিবেশন বসত। বলতে কী, সেখানকার পরিবেশও এর চেয়ে গুরুগম্ভীর। সত্যিকারের বিধানসভার এই সদস্যদের চেয়ে আমাদের আচরণে যেন ব্যাপারটার গুরুত্ব আরও বেশী ফুটত। এই আসলের চেয়ে সেই নকলই যেন ছিল বেশী সত্যি।

*   *   *

রেডিয়োতে তো শিশুদের জন্য আলাদা অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা থাকে, আমার খুড়তুতো বোন মাঝেমাঝে তাতে অংশগ্রহণ করত। কাকীমা তাকে একা-একা রেডিয়ো-অফিসে যেতে দিতেন না, একদিন তিনি আমাকে তার সঙ্গে যেতে বললেন। আমার এই খুড়তুতো বোন আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট। তার বয়স তখন তের। সেই অনুপাতে তখনই সে কিন্তু বেশ লম্বা, শরীরের গড়নও বেশ পুরন্ত। ফলে তাকে আর আমাকে প্রায় একবয়সী বলেই মনে হত। আমি তো তার অভিভাবক হিসেবে সঙ্গে গিয়েছিলুম। কিন্তু আমাকে দেখে তার অভিভাবক বলে কারও মনে হয়েছিল কিনা, তাতে সন্দেহ করি।

তা রেডিয়ো-অফিসে গিয়ে শুনি, সেখানে একটা সংকট দেখা দিয়েছে। কী, না অনুষ্ঠানের প্রধান ভূমিকায় যে মেয়েটির নামার কথা, সে বলে পাঠিয়েছে যে, আসতে পারবে না। এখন উপায়? কী করে এই সংকটের থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, অনুষ্ঠানের পরিচালক আর তাঁর সহকারী তখন তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁদের মধ্যে একজন আমার কাছে এসে তাঁর সঙ্গে আমাকে আর-একটা ঘরে যেতে বললেন। গেলুম। তখন তিনি হিন্দীতে লেখা গুটিকয়েক ছত্র আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন যে, আমাকে সেটা পড়ে শোনাতে হবে। শোনালুম। শুনে নিজেদের মধ্যে তাঁরা কী-সব বলাবলি করলেন। তারপব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, অনুপস্থিত মেয়েটির পার্টটা নিয়ে আমি তাঁদেব সাহায্য কবতে রাজী আছি কিনা। অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের কোনও যুক্তিই আমি খুঁজে পেলুম না।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে আমাকে একটু একান্তে ডেকে নিয়ে তাঁরা বললেন যে, আমার কণ্ঠস্বব খুবই স্বাভাবিক, এবং মাইক্রোফোনে আমার গলার কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে না। এই বলে তাঁরা আমার খুব-খানিকটা প্রশংসা করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন যে, পনর দিন অন্তব-অন্তর এইরকমের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আমার ইচ্ছে আছে কিনা। এটা একটা নতুন ধরনের অনুষ্ঠান, অল্পবয়সী মেয়েদের জন্যে সদ্য শুরু করা হয়েছে, এতে অংশ নিলে ফী-মাসে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা পাওয়া যাবে। অংকটা আমার যদ্দুর মনে পড়ছে—পঞ্চাশ। এমন আকস্মিকভাবে এই রকমের একটা প্রস্তাব আসবে, এ আমাব কল্পনায় ছিল না। আমি তো যাকে বলে থ হয়ে গেলুম। রেডিয়োর স্টুডিয়োতে সেই আমার প্রথম পদার্পণ। তাও নিজে কোনও অনুষ্ঠানে অংশ নিতে যাইনি, গিয়েছিলুম আমার খুড়তুতো বোনের সঙ্গী হিসেবে। এই প্রস্তাবের জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলুম না। কে জানে এ ব্যাপারে আমার বাবা-মায়ের প্রতিক্রিয়া কী হবে। তাঁরা তো রক্ষণশীল মানুষ। প্রস্তাবটা গ্রহণ করায় তাঁদের আপত্তি হবে না তো? দশহরার ছুটি শুরু হতে তখন আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকী। ছুটিতে আমি আগ্রায় যাব। বাবা-মায়ের কাছে প্রস্তাবটা তখন পেশ করা যাবে। চিঠি লিখেও যে তাঁদের অনুমতি আনিয়ে নেওয়া যায়, এ-কথা তখন আমার মনেই পড়েনি। আমি শুধু এইটুকু বুঝতে পারছিলুম যে, তাঁদের অনুমতি না নিয়ে চুক্তিপত্রে সই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মনের উত্তেজনা মনের মধ্যেই চেপে রেখে, একটু-বা দ্বিধাগ্রস্তভাবে, অনুষ্ঠান-সূচীর পরিচালককে আমি বললুম যে, ছুটির পরে লখনউয়ে ফিরে আমি তাঁদের সঠিক বলতে পারব, তাঁদের প্রস্তাবে রাজী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব কিনা। এক মাসও বাইরে থাকব না, তার আগেই আমি ফিরে আসব। তিনি তাতে রাজী নন। বললেন যে, চুক্তিপত্র তৈরী করা হয়ে গেছে, এখন আমি একটা সই করে দিলেই হয়, এই একটা সামান্য ব্যাপার, এতে মনস্থির করতে এত সময় লাগবে কেন? তাতে

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করলুম যে, সই করলেও তো এর ঠিক পরের অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত থাকতে পারছি না, পরের অনুষ্ঠানে আর-কাউকে দিয়ে তাঁদের কাজ চালিয়ে নিতে হবে, সেক্ষেত্রে দিন কয়েক দেরি করে সই করলেই বা ক্ষতি কী? পরের অনুষ্ঠানের আগেই আমি ফিরে আসব। ব্যাপারটা ওইখানেই থেমে রইল। বিদায় নেবার আগে বলে এলুম যে, দশহরার ছুটিতে আগ্রায় গিয়ে বাবা-মাকে ব্যাপারটা বলব, তারপর ছুটির পরে লখনউয়ে ফিরে এসেই আমার উত্তরটা তাঁদের জানিয়ে দেব।

আমার বয়স তখন মাত্র সতেরো। ওই বয়সেই এমন চমৎকার একটা সুযোগ পেয়ে যাওয়া, এ কি কম ভাগ্যের কথা! এই ধরনের সুযোগের স্বপ্নই তো আমি দেখেছি। প্রশংসার কথাগুলো তখনও যেন আমার কানের মধ্যে বাজছিল। মনের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা নিয়ে সেদিন আমি রেডিয়ো-অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম। ক্রমাগত ভাবছিলুম যে, মা আর বাবা নিশ্চয়ই এতে কোনও আপত্তি তুলবেন না। নিশ্চয় এতে তাঁদের সম্মতি পাওয়া যাবে।

*　*　*

দিদি আর আমি আগ্রায় যাচ্ছি। সঙ্গে কোনও অভিভাবক নেই। রেলের কামরায় বসে যতই এই কথাটা চিন্তা করি, ততই যেন মজা লাগে। এমন অভিজ্ঞতা এই আমাদের প্রথম হল। আমাদের সঙ্গে যে আদৌ কেউ নেই, তা অবশ্য নয়। কাকার এক পিওন আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। সে আমাদের আগ্রায় পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে। টুণ্ডলায় গাড়ি পালটাতে হবে তো, বিশেষ করে সেইজন্যেই কাকা আমাদের সঙ্গে একজন লোক দিয়েছেন। কিন্তু সে তো আর এই কামরায় নেই। সে আছে অন্য কামরায়। কয়েকটা স্টেশন পরে-পরে সে এসে দেখে যায় যে, না, আমাদের কোনও বিপদ-আপদ ঘটেনি। জিজ্ঞেস করে, আমাদের জল কি চা কি খাবার-দাবার লাগবে কিনা। যেন ও-সব জিনিস আমরা নিজেরাই জোগাড় করে নিতে পারি না!

কী মজা! কী আনন্দ! আমরা আবার আগ্রায় আমাদের বাড়িতে ফিরে এসেছি! সকলে বলল যে, আমি মাথায় বেড়েছি। আমাকে এখন আগের চেয়ে ঢ্যাঙা দেখাচ্ছে। তা মাথায় ইতিমধ্যে অন্তত ইঞ্চিখানেক বেড়েছিলুম নিশ্চয়। তা ছাড়া আমি এখন নতুন কায়দায় চুল বাঁধি। দেখে তো সবাই অবাক। এ আবার কীভাবে চুল বেঁধেছিস? চুল খুলে আবার নতুন করে বেঁধে সবাইকে দেখাতে হয়। হ্যাঁ, আমার চুলও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। এখন আর আমি বব্‌ ছাঁটি না। বব্‌-এ আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

কাজের আর অন্ত নেই। কতজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। বলতে হবে, অ্যাদ্দিন কীরকম ছিলুম। জিজ্ঞেস করতে হবে, আমরা যখন ছিলুম না, আগ্রায় তখন কী-কী ঘটেছে। আগে যে-সব জায়গায় যেতুম, দল বেঁধে আবার সেখানে যাওয়া হল। আগের মতো পথে-পথে ঘোরা হল। আগে যা-যা করেছি, আবার তার সবই করা চাই, নইলে শান্তি হয় না। কলেজ তখন বন্ধ। তবু সবাই দল বেঁধে কলেজে গেলুম। দেখলুম সেই বাড়িগুলোকে, আমাদের অনেক স্মৃতি যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেন্ট জন'স! কী ভালই না বাসতুম এই কলেজকে! আজও বাসি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে এই কলেজ আমার অনেক বেশী আপন।

আমরা এসেছি শুনে বন্ধুবান্ধবরা সবাই এসে জড় হয়েছিল। সবাই তাদের বাড়িতে যেতে বলে। খেতে বলে। আমি যা-যা খেতে ভালবাসতুম, ডালির মা সব রান্না করে আমাকে খাওয়ালেন। যত বলি, আর খিদে নেই, তিনি শোনেন না। জোর

করে খাওয়ান।

আগ্রায় কি সেবারে বারো দিন ছিলুম? না মাত্র বারো ঘণ্টা? ছুটিটা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, টেরও পেলুম না। দিদি আর আমি লখনউয়ে ফিরে এলুম।

* * *

টেলিফোন ধরে বসে আছি। অন্য প্রান্তে যিনি টেলিফোন তুলেছিলেন, তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন কেন? ভুল-লোকের সঙ্গে কথা বলছি না তো? নাকি ঠিক লোকের সঙ্গেই বলছি, কিন্তু তিনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," ভদ্রলোক বললেন, "চিনতে পেরেছি বই কী! কী বললেন? আপনার বাবা-মা রাজী হয়েছেন? বাঃ, বেশ ভাল কথা। আচ্ছা, ঠিক আছে, পরে আপনাকে টেলিফোন করে জানাব। এখন একটু ব্যস্ত আছি। আচ্ছা, তবে ওই কথাই রইল। নমস্কার।"

কথা বলবার ধরন দেখেই বুঝতে পেরে গিয়েছিলুম যে, পরে আর তিনি টেলিফোন করবেন না। অনুমানটা মিথ্যে হয়নি। সত্যিই তিনি আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন না। কিন্তু তা যদি না-ই করবেন, তাহলে সেদিন অত উচ্ছ্বসিতভাবে আমাকে প্রশংসা করলেন কেন? কী অর্থ এর? এ কি নেহাতই একটা মৌখিক ভদ্রতার ব্যাপার, যাকে আমি সত্যি বলে ধরে নিয়েছিলুম? কিন্তু তা ই বা কী করে হয়? ওরা যে ভীষণ পীড়াপীড়ি করছিলেন আমাকে। ওঁরা যে তক্ষুনি আমাকে চুক্তিপত্রে সই করতে বলছিলেন। এখন তাহলে ওঁরা পিছিয়ে যাচ্ছেন কেন? কী যে ব্যাপার, কিচ্ছু বুঝতে পারলুম না।

কিন্তু বুঝবার জন্যে বেশীদিন আমাকে অপেক্ষা করতে হয়নি। দিন কয়েক বাদেই আবিষ্কার করা গেল যে, আমার বদলে আর-একটি মেয়েকে ওঁরা নিয়ে নিয়েছেন, এবং ইতিমধ্যে সে অনুষ্ঠানের কাজ শুরুও করে দিয়েছে। হতাশ হয়েছিলুম ঠিকই, কিন্তু নিজেকে বোঝালুম যে, এ কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তা ছাড়া, কাজটা যাকে দেওয়া হয়েছে, তার যোগ্যতা হয়তো আমার চেয়ে বেশী। সেক্ষেত্রে আমাকে না-নিয়ে তাকেই তো নেওয়া উচিত। দোষ তো আমারই। আমিই তো চটপট চুক্তিপত্রে সই করিনি। এই সব ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু পরে শুনলুম, আমাকে না-নিয়ে এই মেয়েটিকে নেবার কারণ এই নয় যে, আমার চেয়ে সে বেশী যোগ্য, নেহাত মুসলমান বলেই তাকে নাকি নেওয়া হয়েছে। শুনে বড় কষ্ট হল। আমাদের সরকারী দফতরগুলোতে কি সাম্প্রদায়িকতার বীজ এমন ভাবেই ঢুকেছে? বেতারও তার প্রভাব থেকে মুক্ত নয়? কথাটা বিশ্বাস করতেও আমার কষ্ট হচ্ছিল। প্রাণপণে নিজেকে বোঝাচ্ছিলুম যে, না না, কথাটা সত্যি নয় সাম্প্রদায়িক মনোভাব সত্যিই এমন কিছু ব্যাপ্ত হয়ে যায়নি।

* * *

মেয়েদের কমনরুমের এককোণে আমি বসে থাকতুম। কত মেয়ে আসছে, কত মেয়ে যাচ্ছে, ফ্যানের ঠিক তলায় চুপচাপ বসে বসে তাদের দেখতুম আমি। এই একটা ব্যাপার লক্ষ করতুম যে, চেহারা দেখেই বলে দেওয়া যায়, কে কোন্ কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছে। শেষ পর্যন্ত এটাই যেন আমার অবসর কাটাবার একটা উপায় হয়ে দাঁড়াল। শহরের যেটা ঘিঞ্জি এলাকা, সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই মধ্যবিত্ত, এবং তাদের বেশির ভাগই হিন্দু। মহিলা বিদ্যালয়ও ওই ঘিঞ্জি এলাকায়।

আই. টি. অর্থাৎ ইসাবেলা থোবর্ন কলেজ সেক্ষেত্রে ভিড়ের থেকে দূরে, নতুন গড়ে ওঠা একটা এলাকায়। আমেরিকান মিশন এই কলেজ চালায়। প্রিনসিপ্যাল আমেরিকান; কয়েকজন অধ্যাপক-অধ্যাপিকাও তা-ই। মহিলা বিদ্যালয়ের চেয়ে আই. টি. অনেক ভাল কলেজ। সেখানে পড়াটা বেশ খরচার ব্যাপারও বটে। খেলাধুলো এবং পাঠ্যবহির্ভূত অন্যান্য সব ব্যাপারেও আই. টি. কলেজের খুব নামডাক। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, বিত্তবান ঘরের মেয়েরা সাধারণত সেইখানেই পড়তে যেত। সেখানকার মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ অনেক ভাল, চালচলনও অনেক বেশী কেতাদুরস্ত। দেখলেই বোঝা যেত যে, হ্যাঁ, এরা আই টি. কলেজের মেয়ে। মহিলা বিদ্যালয়ের মেয়েদের সঙ্গে তাদের গুলিয়ে ফেলবার কোনও প্রশ্নই উঠত না। মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যেও অমন মেয়ে এক-আধটা চোখে পড়ত বটে, তবে তারা ব্যতিক্রম।

লখনউয়ে তখন 'মুসলিম কলেজ ফর গার্লস' বলেও মেয়েদের একটি কলেজ ছিল। পরে এই কলেজের কথা আমি জানতে পারি। সেখানে শুধু মুসলিম মেয়েরাই পড়তে পারত। শুনেছি সেখানে পবিত্র কোরান পড়ানো হত। পর্দাপ্রথা মেনে চলবার জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল সেখানে। তিন কলেজে তিন রকমের ছাত্রী, দেখলেই বোঝা যেত কে কোন্ কলেজ থেকে বেরিয়েছে। মুসলিম কলেজ প্রতিষ্ঠানটি ছিল একটু গোঁড়া প্রকৃতির। শুধুই মুসলিম মেয়েদের জন্যে যে আলাদা করে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা দরকার, এই মনোভাবের মধ্যেই আসলে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রয়েছে। কিন্তু তা হোক, কলেজটা যে একটা প্রয়োজন মিটিয়েছে, তাও ঠিক। বস্তুত এই কলেজটা না থাকলে অধিকাংশ মুসলিম মেয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের কোনও সুযোগই পেত না। যা বলছিলুম, মুসলিম কলেজের মেয়েদেরও একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলে তাদের কেমন দেখাত, অনেক সময় এ-কথা ভেবেছি। তবে বড়-একটা তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসত না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কাজকর্মে আর অনুষ্ঠানে আই. টি কলেজের মেয়েদের ভূমিকাটাই সবচেয়ে স্পষ্ট করে সকলের চোখে পড়ত। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল তাজিনের ভূমিকা। এ যে বছরের কথা বলছি সেই বছরে তাজিনই ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি। ছাত্রীদের মধ্যে কেউ-কেউ বেশ রুজ-লিপস্টিক মেখে, উঁচু গোড়ালির জুতো পরে, দিব্যি সেজেগুজে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসত। তাদের প্রসাধন আর সাজগোজের ঘটাপটা নেহাত কম ছিল না। তাজিন যে একদম ও-সবের ধার ধারত না, তা অবশ্য নয়। কিন্তু, ঠোঁটে একটু লিপস্টিক ছোঁয়ালেও, কি চুলে একটু গন্ধতেল মাখলেও, সব মিলিয়ে তাকে দেখলে মনে হত যে, চেহারাটাকে চটকদার করে তোলায় তার আদৌ আগ্রহ নেই। পায়ে চপ্পল, শাড়ির আঁচলটা সর্বদাই অগোছালো, পান চিবুতে-চিবুতে ছেলেদের সঙ্গে এতই সহজভাবে মেলামেশা করত যে, দেখে আমার খুব ভাল লাগত। সেই ভাল-লাগার মধ্যে একটু ঈর্ষার ভাবও যে ছিল না, তা নয়। তাজিনের মধ্যে বিন্দুমাত্র আড়ষ্টতা ছিল না, ছেলেদের সঙ্গে বেশ-একটা প্রীতির সম্পর্ক সে গড়ে তুলেছিল। এ যেন খুবই সহজ, স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি তো অবাক হয়ে যেতুম। কখনও গিয়ে কোনও ছেলের ঘাড়ে বন্ধুর মতো হাত রাখছে, কখনও লনের ও-দিকে কোনও ছেলেকে চেঁচিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, কিংবা হয়তো এক ছুটে লন পেরিয়ে তার পিঠে গিয়ে একটা চাপড়ই মেরে বসল। ভারী প্রাণোচ্ছল ছিল তাজিন, উৎসাহ-উদ্দীপনায় সর্বদা যেন টগবগ করত। বড় ঘরের মেয়ে। সংস্কৃতি, সহবত, রুচি—এ-সব ওদের রক্তে মিশে রয়েছে। চমৎকার বক্তৃতা দিত। ছাত্র ফেডারেশনের সে ছিল একজন সক্রিয় কর্মী। আমি অবশ্য এই ছাত্র-সংগঠনের কথা তখন বিশেষ-কিছু জানতুম না।

তাজিনের বাবা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তবে মেয়ের মধ্যে যে-সব গুণ দেখতুম, বাবার মধ্যে তার একটিও ছিল না। তিনি মুখ খুললেই একটা-না-একটা হাস্যকর বিভ্রাট ঘটিয়ে বসতেন। মনে আছে, বেনেট হলের এক ছাত্র-সমাবেশে একবার তিনি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। তাঁর ঠিক পিছনেই বসে ছিল তাজিন। দু' হাতে মুখ লুকিয়ে ফিসফিস করে বলছিল "কী বলতে গিয়ে কী যে বলে ফেলেন বাবা! আশা করি আজ আর কোনও বিভ্রাট বাধিয়ে বসবেন না।" কথাটা শুনে বুঝতে পেরেছিলুম যে, সমস্যাটা একা আমার নয়, অন্যান্য বাড়ির ছেলেমেয়েদের কাছেও বাপ-মা একটা মস্ত সমস্যা।

মেয়েদের কমনরুমে একটা লাইব্রেরি ছিল। নামেই লাইব্রেরি। আসলে একটা বুক-কেসে কিছু বই থাকত, এই পর্যন্ত। তাও বিষয় অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা হত না। সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি—হরেক বিষয়ের বই গাদাগাদি করে রাখা হত সেখানে। প্রথম বছরটা তো আমি দারুণ অস্বস্তিতে ছিলুম। সারাক্ষণ কেমন যেন মনে হত যে, এখানে ঠিক স্বাভাবিকভাবে নিশ্বাসটা পর্যন্ত নিতে পারছি না। আড়ষ্ট হয়ে থাকতুম। এমন কী, আমার বই পড়বার অভ্যাসটা পর্যন্ত এই সময়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আগ্রা থেকে ফিরে আসবার পরে সেই আড়ষ্টতা একটু-একটু করে কেটে যেতে থাকে ও বই পড়বার আগ্রহটা আবার জেগে ওঠে। কমনরুমের ওই বুককেস্‌টা তখন আমার খুব কাজে লেগেছিল। তারই মধ্যে মিখাইল শলোকভ, আঁদ্রে মালরো, আঁদ্রে মোরোয়া ইত্যাদি সব বিখ্যাত লেখকের বইয়ের সন্ধান পেয়ে যাই। তবে, জন স্ট্রেচির 'দি থিয়োরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস অব সোশ্যালিজম' গ্রন্থখানাই আমার মনের উপরে সবচেয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। আগ্রায় পৌরবিজ্ঞানের ক্লাসে ডালির বাবা যা বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার বেশী আর একটি কথাও আমি জানতুম না। বাবা আমাকে বার্নার্ড শয়ের "ইনটেলিজেণ্ট উয়োম্যান'স গাইড টু সোশ্যালিজম." বইখানা পড়তে দিয়েছিলেন। কিন্তু 'বুদ্ধিমতী মহিলাকে' আমার নিতান্তই নির্বোধ বলে মনে হয়েছিল। বুদ্ধিমতী মহিলাটির প্রতি শয়ের বাগ্‌বিন্যাস আমার একটুও মনঃপূত হয়নি। স্ট্রেচির বইখানা কিন্তু সুন্দরভাবে লেখা। পরিষ্কার, প্রাঞ্জল রচনা। তার মধ্যে বেশ গভীরতাও রয়েছে। এমন একটা বয়সে বইখানা আমি পড়েছিলুম, নতুন-নতুন চিন্তাভাবনা যখন মনের উপরে গভীরভাবে দাগ কেটে দেয়। আমি তো তখন নতুন চিন্তা, নতুন মূল্যবোধই খুঁজে ফিরছি। স্ট্রেচির বইখানা পড়বার পরে আমার সামনে যেন নতুন চিন্তার জগৎ খুলে গেল। এর আগে পর্যন্ত সেই জগতের অস্তিত্বের খবর আমি জানতুম না।

* * *

যা-কিছু আধুনিক, তার প্রতি সবসময়েই আমি আকৃষ্ট হয়েছি; যা-কিছু হাল-ফ্যাশানের, পেতে চেয়েছি তাকেই। আমার কাকীমা তো মাঝেমধ্যে ককটেল-পার্টির আয়োজন করতেন। তার জলুস আমাকে মুগ্ধ করত। কাজ-করা কাচের ডিক্যানটার, তার মধ্যে শেরি কিংবা ভার্মুথ, স্ফটিকের পানপাত্রের ঠুনঠুন শব্দ, সোডা সাইফন, রুপোর ট্রে-তে চমৎকারভাবে সাজিয়ে-রাখা আনুষঙ্গিক সব টুকরো-খাবার, দেখে দেখে আমার আশ যেন আর মিটত না। শুধু এই পার্টি কেন, হাল-ফ্যাশানের আর উঁচু মানের জীবনযাত্রার আভাস যার মধ্যে রয়েছে, তার সবকিছুর প্রতিই আকর্ষণ বোধ করতুম আমি। আকৃষ্ট হতুম কাকীমা যে সমাজের কথা সর্বক্ষণ বলতেন, তার প্রতিও। মনে হত, সেই সমাজে বাক্য আর আচরণে সবাই স্বাধীন। সেখানে যে যা করতে চায়, তা-ই করতে পারে। কিন্তু এ-সব মনে হওয়া সত্ত্বেও একটা কথা ভেবে

সে একটু অস্বস্তি বোধ করতুম, তাও ঠিক।

আমাদের তো একটা আলাদা সমাজ রয়েছে, বাড়িতে সর্বদা সেই সমাজের কথা শুনি। আমাদের সমাজ বলতে যাদের বোঝায়, মূলত তাঁরা কাশ্মীরের লোক। একদা কাশ্মীরে ছিলেন, পরে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকায় দুই শতাব্দী কি তারও বেশী দিন ধরে বসবাস করা সত্ত্বেও পুরনো সব রীতি-প্রথার প্রতি তাঁদের আনুগত্য বিশেষ কমেনি। আদি-বাসভূমিতে যে-সব রীতিপ্রথা তাঁদের মেনে চলতে হত, এখনও সেগুলো তাঁরা মেনে চলেন কিংবা মেনে চলবার চেষ্টা করেন। তাঁদের বিয়ে-থাওয়া ইত্যাদি হয় নিজেদের সমাজেরই মধ্যে; ফলে একটা গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য তাঁরা বজায় রাখতে পেরেছেন। এই যে সমাজ, একে আমি চিনি। একটি মানবগোষ্ঠীর উপরে এই সমাজের কর্তৃত্বের কথা, এর বিধি-নিষেধের কথা আমার জানা আছে। সেক্ষেত্রে কাকীমা এই যে সমাজের কথা বলেন, এটা আবার কোন্ সমাজ? আমি বুঝতে পারতুম যে, সমাজ নেহাত একটা-দুটো নয়, অনেক। এবং তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু রীতি-প্রথা আর বিধিনিষেধ রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলতে পারি, কাকীমা যে সমাজের কথা বলেন, বাবা-মায়ের সমাজের থেকে সেটা আলাদা-কিছু। আবার বাবা-মায়ের সমাজও ঠিক একটা সমাজ নয়, দুটো সমাজ। তবে অনেক ব্যাপারে সেই দুই সমাজের মধ্যে মিল রয়েছে।

আমাদের সমাজ—আমার সর্বদাই মনে হত—অপরিসর ও সংকীর্ণ। ফলে ব্যক্তি-মানুষের স্বাধীনতা সেখানে খর্ব হয়। শেষ বিচারে দেখা যাবে যে, যে-সব বিধিনিষেধ আমাকে মেনে চলতে বলা হত, তার উদ্দেশ্য মাত্র একটিই, হবু-শাশুড়ীকে খুশী করা। তা আমি যদি সংকল্প করি যে, কখনো আমি বিয়ে করব না, তবে আর কাউকে খুশী করবার দরকার কী? সেক্ষেত্রে তো আমি আমার ইচ্ছেমতো চলতে পারি। বস্তুত, বিয়ে করব না, এই সিদ্ধান্ত আমি নিয়েই নিয়েছিলুম। ফলে খুব সহজেই আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তবে, কাকীমার 'সমাজ' আমার বাবা-মায়ের সমাজের চেয়ে সত্যিই আরও স্বাধীন কিনা, মাঝেমধ্যে এই প্রশ্নও আমার মনে জাগত। সমাজ এটা পছন্দ করবে না, সমাজে ওটা অচল, এই ধরনের কথা তো দেখি কাকীমার মুখে লেগেই আছে। আমাদের সমাজের মৌলিক বিধি-বিধান কী, তা আমি ততদিনে জেনে গেছি। আমাদের কাকীমার 'সমাজ'কে সেই তুলনায় অনেক আবছা বলে মনে হয়। কিন্তু, বাইরে থেকে যতই আধুনিক ঠেকুক, তার মধ্যেও যদি এতরকমের বিধি-নিষেধ থাকে, তাহলে আর সেই সমাজে ঢুকবার চেষ্টা করে লাভ কী?

* * *

কাকে যেন বিদায় দেবার জন্যে কাকীমার সঙ্গে আমরা স্টেশনে গিয়েছিলুম। বাইরে রেলওয়ে-হলে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় চোখে পড়ল যে, লম্বা কিন্তু তেজী ভঙ্গিতে পা ফেলে এক ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। পরনে খাদি কুর্তা, চুড়িদার পায়জামা আর জহর-কোট। ভদ্রলোকের চেহারায় এমন-একটা ব্যক্তিত্বের ব্যাপার ছিল, যা খুব সহজেই মানুষের নজর কাড়ে। স্বতই আমার দৃষ্টি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। সুন্দর, প্রাণোচ্ছল মুখশ্রী। ভাল করে তাঁকে দেখবার আগেই আমার কাকীমা সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "আরে! জহরী ভাই!"

ফিরে তাকালেন ভদ্রলোক। কাকীমাকে চিনতে পেরে তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন। আমার খুড়তুতো বোনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন কাকীমা। ভদ্রলোকও অমনি হাত বাড়িয়ে আমার খুড়তুতো বোনকে কাছে টেনে নিলেন। শুভেচ্ছা বিনিময় আর কথাবার্তায় কয়েক মুহূর্ত কাটল। তারপরে ভদ্রলোক সেই আগের মতই লম্বা

কিন্তু সতেজ ভঙ্গিতে পা ফেলে সেখান থেকে চলে গেলেন। আমার খুড়তুতো বোন কাকীমাকে জিজ্ঞেস করল, "মা, উনি কেন শুধু আমাদেরই আদর করলেন?" তারপর আমাদের দেখিয়ে, "ওদের কেন আদর করলেন না?" উত্তরে কাকীমা বললেন, "উনি তো আর ওদের আত্মীয় নন, আমাদের আত্মীয়।"

খুড়তুতো-বোন আর কাকীমার কথাবার্তায় আমার আচ্ছন্নভাবটা কেটে গেল। সত্যিই যেন এতক্ষণ আমি আচ্ছন্ন হয়ে ছিলুম। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখছিলুম সেই মানুষটিকে। ভিড়ের মধ্যে যখন তিনি মিশে গেলেন, তখনও আমি যেন চোখ ফেরাতে পারছিলুম না। ধাতস্থ হতে আমার সময় লাগছিল। ব্যক্তিত্ব যাঁর চুম্বকের মতো সর্বজনকে কাছে টানে, সেই মানুষটিকে তো আগেও একবার আমি দেখেছি। কিন্তু আজকের সঙ্গে সেদিনকার ছবিটি আমি মিলিয়ে নিতে পারছিলুম না। আগের বারে তাঁকে আগ্রায় দেখেছিলুম। তাঁর স্মৃতি আমার চিত্তপটে তখনও লেগে ছিল। সেই স্মৃতি খুব মধুর নয়। সেদিন আমি হতাশ হয়েছিলুম। সেক্ষেত্রে আজ তো নেহাতই কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাঁকে দেখলুম। কিন্তু কাছে-থেকে এই দেখার অভিজ্ঞতা একেবারে অন্যরকম। আজ তাঁর উদ্ভাসিত হাসি যেন সেদিনকার হতাশার অনেকটাই মুছে দিল। আগ্রার ছাত্রসভায় তাঁর কথা শুনে শুধু তাঁর উপরে নয়, সাধারণভাবে গোটা কংগ্রেস দলের উপরেই আমার একটা অভিমান জন্মে গিয়েছিল। প্রথম অভিজ্ঞতার ছাপ সহজে মুছতে চায় না। সেদিনকার কথা আজ আবার স্পষ্ট মনে পড়ল।

বিরাট সেই হলের মধ্যে গাদাগাদি করে আমরা বসে ছিলুম। ঘোষণা করা হয়েছিল যে, নেহরু আগ্রায় আসবেন। সেই উপলক্ষে আগ্রার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে তাঁকে সংবর্ধনা জানাবার আয়োজন করা হয়েছিল। কিছু টাকাও আমরা সংগ্রহ করেছিলুম। ঠিক করেছিলুম, এই টাকাটা নেহরুর হাতে তুলে দেব। অঙ্কটা হয়ত তেমন বড় নয়। তবে যত টাকা জোগাড় হবে বলে প্রথমটায় ভেবেছিলুম, পরে দেখা যায় যে, তার চেয়ে বেশীই জোগাড় হয়েছে। তাই নিয়ে আমাদের মনে স্বভাবত একটু গর্বও ছিল। তার আগে আর কখনও নেহরুকে আমি দেখিনি। জানতুম যে, তিনি মস্ত বড় জাতীয় নেতা। মহাত্মাজীর পরেই তাঁর স্থান। তাই দারুণ উত্তেজিতভাবে তাঁর প্রতীক্ষায় ছিলুম। ভিড় ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। একটি আসনও খালি ছিল না। কে যেন গিয়ে আরও কিছু ফোল্ডিং চেয়ার নিয়ে এল; তারপর যেখানে যেখানে পারল, পেতে দিল সেগুলো। কিন্তু তাতেও সকলের স্থান সংকুলান হল না। ভিড় ক্রমেই বাড়তে লাগল। হলের পিছন দিকে একগাদা লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোক-চলাচলের পথের উপরে একগাদা লোক বসে আছে। জানালার উপরেও বসে আছে অনেকে। যে যেখানে পেরেছে, একটু ঠাঁই করে নিয়েছে। দরজাগুলোতেও ঠাসাঠাসি ভিড়। হাওয়া আসছে না। ভিড়ের চাপে, ভিড়ের তাপে হলঘরটা তেতে উঠেছে। সে প্রায় দমবন্ধ অবস্থা। তারই মধ্যে আমরা নেহরুর জন্যে অপেক্ষা করছি। নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। পনের মিনিট। আধ ঘণ্টা। পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তবু তাঁর দেখা নেই। জনতা অস্থির হয়ে উঠেছে। সবাই সবাইকে জিজ্ঞেস করছে, ব্যাপার কী, সভা শুরু হচ্ছে না কেন? কেউ কোনও উত্তর দিতে পারছে না। প্রথমে ফিসফিস করে কথা বলছিল সবাই। তারপর তাদের গলা ক্রমে চড়তে লাগল। প্রত্যেকে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। আরও মিনিট কুড়ি কাটবার পর ঘোষণা করা হল, নেহরু আসছেন। আমরা তখন দারুণ উত্তেজিত। সবাই ভাবছি, ব্যাপার কী, নেহরু কি কোথাও আটকা পড়ে গেছেন। শুনেছিলুম, তিনি ঘড়ি ধরে চলেন, দারুণ সময়নিষ্ঠ মানুষ। আজ তাহলে তাঁর দেরি হবার কারণ কী? স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এখন আমার মনে হয় যে, ছাত্রেরা সেদিন খুবই সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিল। আজকালকার দিনে এমনটা ঘটলে তো

দক্ষযজ্ঞ বেধে যেত। ইঁটপাটকেল ছোঁড়া হত, জানলা-দরজা ভাঙা হত। আমরা কিন্তু যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়েছিলুম। চেঁচামেচি হচ্ছিল বটে, কিন্তু শৃঙ্খলা তাই বলে নষ্ট হয়নি। বলতে কী, নেহরু এসে গেছেন, কয়েকবার এই গুজবও রটেছিল তো, তা গুজব রটবার সঙ্গে-সঙ্গেই সবাই অমনি শান্ত হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত, নির্ধারিত সময়ের প্রায় আড়াই ঘন্টা বাদে, তিনি এলেন। ডায়াসে হঠাৎ তাঁকে দেখতে পেলুম সবাই। দেখে সে কী আনন্দ আমাদের। সে কী উল্লাস। একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে সবাই সমস্বরে তাঁর জয়ধ্বনি দিতে লাগলুম: "নেহরুকী জয়", "নেহরু জিন্দাবাদ"। সেই সমস্বর জিন্দাবাদের মধ্যে অন্য-কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। তারই মধ্যে একটি ছাত্র দেখলুম, অল্প দু-চার কথায় নেহরুজীকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানিয়ে, টাকার তোড়াটা তাঁর হাতে তুলে দিল। বিনাবাক্যে নেহরু তাঁর হাত থেকে তোড়াটা নিয়ে নিলেন, তারপর হাত বাড়িয়ে মাইকটাকে টেনে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন। দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি খুব রেগে গেছেন। কিন্তু সভায় তখনও এতই গণ্ডগোল হচ্ছিল যে, তাঁর কথাগুলো শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না। একটু বাদেই অবশ্য সবাই বসে পড়ল। গোলমালও থেমে গেল। আমিও বুঝবার চেষ্টা করতে লাগলুম যে, তাঁর এত রেগে যাবার কারণ কী। কী এমন দোষ করেছি আমরা যে, তিনি এমন রেগে গেলেন? কোন্ অপরাধে তিনি আমাদের এত বকাঝকা করছেন? আগ্রায় সেদিন আর-এক জায়গায় মস্ত একটা জনসভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল; সেখান থেকে সরাসরি এই ছাত্রসভায় তিনি এসেছেন। অন্য সভাটা নাকি খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এখানে আসতে চাননি। তাঁর কথা শুনবার জন্যে যদি এতই আমরা ব্যাকুল, তো সেই সভাতেই তো আমরা যেতে পারতুম, তা আমরা যাইনি কেন? মস্ত একটা জনসভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তবু আমরা আলাদা করে এই ছাত্রসভার ব্যবস্থা করেছি কেন? কেন আমরা এত স্বাতন্ত্র্যবাদী? পনর মিনিট বাদে-বাদে এখান থেকে ছাত্ররা সেই সভায় গিয়েছে, সেখানে গিয়ে বারবার তাঁকে তাড়া দিয়েছে, অকারণে তাঁকে বিরক্ত করেছে। অথচ সেই সভাটার গুরুত্ব এই ছাত্রসভার থেকে অনেক বেশী। এইসব কথা বলে, ভীষণ ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে, যেমন ঝড়ের মতো সভায় এসে ঢুকেছিলেন, ঠিক তেমনি ঝড়ের মতোই আবার সভার থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

একে তো কণ্ঠস্বর অতি ক্রুদ্ধ, তার উপরে তোড়ে কথা বলছিলেন। ফলে, ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হতে আমার একটু সময় লাগল। সত্যি বলতে কী, শহরে যে বড় মাপে আর-একটা সভার আয়োজন করা হয়েছে, এবং সময়ের অভাবে যে দুটো সভাকে যুক্ত করবার একটা প্রস্তাব হয়েছিল, আমরা (অর্থাৎ অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরা) তা জানতুম না। নেহরুর হাতে যে বিশেষ সময় নেই, তাই কি আমরা জানতুম? তা হলে আমাদের এত বকলেন কেন তিনি? দু' ঘন্টার উপরে তাঁর প্রতীক্ষায় ধৈর্য ধরে আমরা বসে আছি, তার পুরস্কার হিসেবে বকুনি ছাড়া আর কিছুই আমাদের জুটল না। ভেবেছিলুম, এতক্ষণ ধরে আমাদের বসিয়ে রেখেছেন, তার জন্যে তিনি দুঃখপ্রকাশ করবেন। কিন্তু তা না করে তিনি আমাদের বকতে শুরু করে দিলেন। এটাই যে আমাদের প্রাপ্য ছিল, এমন আমার মনে হয় না। ভীষণ খারাপ লেগেছিল আমার। ছেলেমেয়েরা যে-বয়সে কাউকে-না-কাউকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে চায়, বীরের আসনে বসিয়ে পুজো করতে চায়, আমার তখন সেই বয়স। কিন্তু নেহরু সেদিন আমাকে নিরাশ করেছিলেন।

* * *

আমার দুই খুড়তুতো বোন ঠিক করেছিল, বড়দিনের ছুটিতে আমাদের সঙ্গে

তারা আগ্রায় যাবে। অন্য যে-কোনও সময়ে তারা যদি আগ্রায় গিয়ে ছুটি কাটাতে চাইত, তো তাতে আমরা খুশীই হতুম। কিন্তু সেবারে তাদের সঙ্গে নিয়ে আগ্রা যেতে আমাদের একটুও ইচ্ছে করছিল না। বাবার বদলি তখন আসন্ন। তার মানে আগ্রার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে এই হয়ত আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। এই সময়ে আমরা একটু একা থাকতে চাইছিলুম। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে, তাদের কাছে বিদায় নেবার জন্যে, একটু নিভৃতি চাইছিলুম। বাইরের কেউ আগ্রায় গিয়ে আমাদের গল্পগুজবে বিঘ্ন ঘটাক, ঠিক এই সময়ে এটা আমরা চাইছিলুম না। তা ছাড়া, এই ছুটির মধ্যেই পিপোর বিয়ে হবে। কত কথা আছে তার সঙ্গে। বাইরের কারও উপস্থিতি কি এই সময়ে বাঞ্ছনীয়? ভাবতেই খারাপ লাগছিল। খুড়তুতো বোন দুটিকে ঠিক এই সময়ে আগ্রায় নিয়ে যাবার কোনও ইচ্ছেই আমাদের ছিল না। কিন্তু মুখ ফুটে কি এ-সব কথা বলা যায়? এটা-ওটা অজুহাত দেবার চেষ্টা করতে লাগলুম। তাতে লাভ হল না। অথচ স্পষ্ট করে যদি বলি যে, ওদের এই সময়ে আগ্রা যাওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়, তাহলে খুড়তুতো বোন দুটি তো কষ্ট পাবেই, কাকা আর কাকীমাও ক্ষুণ্ণ হবেন। সম্পর্কটা নষ্ট হবে। অগত্যা কী আর করি, ব্যবস্থাটাকে মেনে নিতে হল। খুড়তুতো বোন দুটিকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর দিদি আগ্রায় গিয়ে পেঁছিলুম। যেতে এতই দেরি হল যে, পিপোর সঙ্গে আর নিভৃতে একটু কথাবার্তা বলবারও সময় পাওয়া গেল না। ওদের বাড়িতে তখন প্রচুর লোক। অতিথি-অভ্যাগতের ভিড় লেগে গেছে। সবাই খুব ব্যস্ত। সামনেই বিয়ে; তাই কারও দম ফেলবার সময় নেই।

পিপোর বিয়েতে অনুষ্ঠানটা হয়েছিল খুব সাদাসিধে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অনুষ্ঠান চুকে-বুকে গেল। প্রথা অনুযায়ী বর-কনেকে বাসর-ঘরে এনে বসিয়ে দেওয়া হল। ঘরের মধ্যে কনের বোন আর বন্ধুদের ভিড়। প্রায় সকলেই তরুণী। প্রবীণারা একটু দূরে বসে মজা দেখছেন। কনের বোনেরা তাদের জামাইবাবুকে নিয়ে নানা রকমের ঠাট্টাতামাসা করে তো। বাসর-ঘরে সেইসব চলছিল।

কীভাবে এই বিয়ে ঠিক হল, কিছুই জানতুম না। বিয়ের আগে পিপোর সঙ্গে তার হবু-বরের হয়তো এক-আধবার দেখাসাক্ষাৎ হয়ে থাকতে পারে। পিপো তখন মুখ ফুটে তার সঙ্গে কথা বলেছে কী? তাও আমি জানি না। জানি না, এই বিয়েতে পিপোর সম্মতি ছিল কিনা। সে কি এই ছেলেটিকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল, নাকি—ভারতীয় মেয়েদের ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়ে থাকে—অগত্যা এই বিয়েকে সে মেনে নিয়েছে? ভালবেসে বিয়ে করবার ব্যাপার এটা নয়। বড়জোর পিপোর সম্মতি নিয়ে হয়ত এই বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। অর্থাৎ পিপো যদি স্পষ্ট করে বলত যে, না, এই বিয়েতে তার মত নেই, তাহলে হয়ত এই ছেলের সঙ্গে তাকে বিয়ে দেওয়া হত না। পিপোর মনের কথা জানবার জন্যে আমার খুব কৌতূহল হচ্ছিল। সে কি এখন ভবিষ্যতের কথা ভাবছে? নাকি অতীতের কথা? নাকি এই মুহূর্তে সে কিছুই ভাবছে না? কোন্‌টা সত্যি, জানতে আমার দারুণ ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু জানবার সুযোগ কোথায়?

পরস্পরের কত কাছে ওরা বসে আছে। হাঁটুতে হাঁটুতে ছোঁয়াছুঁয়ি। দেখে আমার অদ্ভুত লাগছিল। পিপোকে খুব শান্ত দেখাচ্ছিল, মুখেচোখে এতটুকু উত্তেজনার চিহ্ন নেই। কিন্তু চোখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে, তার মনের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছে। চোখ দুটো লাল। খানিক আগে খুব কান্নাকাটি করেছে, তাতে সন্দেহ নেই। তখন অবশ্য পিপোর চোখে জল ছিল না। পিপোর কাঁধে আলতোভাবে বাঁ হাত রেখে বর বসে আছে। ভঙ্গি দেখলে মনে হয় যেন সব্বাইকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, সে-ই এখন

পিপোর মালিক। পিপোকে সে অধিকার করেছে, পিপোর উপরে তার প্রভুত্ব নিয়ে কোনও তর্কের অবকাশ নেই। ভাব দেখে আমার কী জানি কেন খুব খারাপ লাগছিল। খুব রাগ হচ্ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, পিপোর কাঁধ থেকে ওর হাতখানাকে ঠেলে সরিয়ে দিই। দুজনকে পাশাপাশি দেখে আমার সেদিন যে অনুভূতি হচ্ছিল, ঠিক তেমন অনুভূতি এর আগে কখনও হয়নি। অচেনা একজন লোকের সংগে একটা মেয়ে সাতবার অগ্নি-প্রদক্ষিণ করল, পুরুতমশাই এমন কতকগুলো সংস্কৃত মন্ত্র আওড়ালেন, যার অর্থ পর্যন্ত তারা বুঝতে পারল না, হবন-কুণ্ডের মধ্যে কিছু চাল আর ঘি নিক্ষেপ করা হল, বাস্, অমনি একটি ছেলে আর মেয়ের ভাগ্য একেবারে চিরতরে নির্ধারিত হয়ে গেল! চিরকালের জন্য তারা স্বামী-স্ত্রী! সবাই হাসছে, সবাই ঠাট্টাতামাশা করছে, কিন্তু আমি ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিলুম, ভাবছিলুম যে, এ কী বিচ্ছিরি প্রথা! ভাবছিলুম যে, লোকে যাকে পবিত্র ভাবে, অর্থহীন সেই অনুষ্ঠানের জোরেই অচেনা একটা লোক একটি মেয়ের শরীর আর মনের দখল পেয়ে যায়! এই মানুষটি এখন সুন্দর আর কোমল এই মেয়েটির প্রভু, অধীশ্বর! এই মেয়েটি এতকাল আমার বন্ধু ছিল। কিন্তু আজ সেই বন্ধুত্বের ইতি হয়ে গেল। কেননা পিপো তো এর পরে আর সেই পিপো থাকবে না। আমার মন কি অসুস্থ? তা নইলে এ-সব অদ্ভুত চিন্তা আমার মাথায় ঢুকছে কেন? এই প্রথা তো হাজার-হাজার বছর ধরে চলে আসছে। আর কারও তো এ নিয়ে কোনও অস্বস্তি হচ্ছে না, তবে আমারই বা এত মাথাব্যথা কেন? শেষ-ডিসেম্বরের রাত্রি। সবাই শাল-দোশালে নিজেদের বেশ ভাল করে ঢেকেছে। শুধু আমারই গায়ে গরম কাপড় নেই। স্রেফ একটা জর্জেট শাড়ি পরে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছি। তবু আমি ঘেমে উঠছি কেন?

"যখন ছেলেমানুষ ছিলুম, বিয়ে মানেই তখন আমার কাছে একটা দারুণ উত্তেজনার ব্যাপার। হট্টগোল, ঠেলাঠেলি, দামী-দামী পোশাক আর গয়না পরা মেয়েদের ভিড়, আলো, আতসবাজি। 'বরাত' আসছে, 'ব্যাণ্ড' বাজছে। ব্যাণ্ডে তো দিশী সুর শুনতে পাওয়া যেত না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিলিতী গৎ বাজত। কিন্তু সেই বয়সে সবই আমার কাছে সমান। ওই জলুস, ওই আলো—সবই ভাল লাগত আমার। ভাল লাগত, যখন দেখতুম যে, ঘোড়ায় চেপে কিংবা দারুণভাবে সাজানো গাড়িতে বর আসছে। বিয়ে তখন আমার কাছে শুধুই আনন্দ আর উৎসবের ব্যাপার।

বড় হয়ে এই প্রথম আমার খুব ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধুর বিয়ে দেখলুম। আবার তাকালুম বর-কনের দিকে। কনের মনের অবস্থা তখন কেমন, আমি জানতুম না। শুধু দেখছিলুম যে, স্থির শান্ত হয়ে সে বসে আছে। তার মনের মধ্যে হয়ত তোলপাড় হচ্ছে, কিন্তু মুখে তার চিহ্ন ফোটেনি। বরং মুখের উপরে বেশ-একটা খুশী-খুশী ভাবই ফুটেছে দেখলুম। সবাই বলছিল যে, পিপো খুব ভাগ্যবতী, তাই খুব ভাল বর পেয়েছে; দুটিতে মানিয়েছেও বেশ। মনে হচ্ছিল, একমাত্র আমিই এখানে অসুখী। সে কি এইজন্যে যে, আমিই অন্যদের দখল করতে ভালবাসি, এবং দখল ছাড়তে কষ্ট পাই! আমার মনের মধ্যে চকিতে এই চিন্তাটা খেলে গেল। মনে হল, আমি যে এই লোকটিকে সুনজরে দেখতে পারছি না, তার কারণ হয়ত এই যে, চিরকালের জন্যে আমার বন্ধুকে সে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু না, ব্যাখ্যাটা এতই ফ্রয়েড-গন্ধী যে, গ্রহণযোগ্য নয়। এক মুহূর্তের জন্যে নিজেকে আমি আমার বন্ধুর জায়গায় বসিয়ে ব্যাপারটাকে বিচার করতে চেষ্টা করলুম। মনে হল, মেয়ের সম্মতি নেওয়া হোক আর না-ই হোক, বাপ-মায়ের ঠিক-করে-দেওয়া এই ধরনের ধরা-বিয়েরই আমি বিরোধী। কিংবা কে জানে, আমার আপত্তি হয়ত বিয়ে নামক প্রথাটার সম্পর্কেই! মোট কথা,

আমার মন তখন এতই উত্তেজিত যে, ব্যাপারটাকে ভাল করে ভেবে দেখাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

* * *

আমার কোনও ইচ্ছেই সহজে পূর্ণ হয় না। যেটাই পেতে চাই, তা নিয়ে আপত্তি ওঠে। এইটেই বরাবর ঘটতে দেখেছি। তাই বাবা-মাকে যখন বললুম যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তো মেয়েদের জন্যে একটা আলাদা হোসটেল রয়েছে, তা পরীক্ষার ঠিক আগের বছরটা কাকা-কাকীমার কাছে না-থেকে সেই হোসটেলে গিয়ে থাকতে চাই, তখন ভেবেছিলুম, এই নিয়েও তাঁরা বিস্তর ওজর-আপত্তি তুলবেন, চট করে তাঁদের অনুমতি পাওয়া যাবে না। কার্যত দেখলুম, কেন আমি হোসটেলে যেতে চাই, তাও তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন না, প্রস্তাব করবামাত্র রাজী হয়ে গেলেন। এটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, আমি অবাক হয়ে যাই। আসলে, এ নিয়ে দুর্ভাবনা আমারও কিছু কম ছিল না। ভাবছিলুম যে, কাকার বাড়ি থাকা সত্ত্বেও লখনউয়ে আমরা যদি হোসটেলে গিয়ে উঠি, তো কাকীমা তাতে নিশ্চয় আহত বোধ করবেন। হয়ত ভাববেন যে, তাঁদের কাছে থাকতে আমাদের খুব অসুবিধে হচ্ছিল। মা আর বাবা দেখলুম, তা নিয়ে আদৌ ভাবিত নন। ফলে, কাকার বাড়ি থেকে একদিন রাত্তিরে আমরা আমাদের মালপত্র নিয়ে কৈলাস হোসটেলে চলে এলুম।

হোসটেলে একজনের থাকবার মতো ঘর মোট কুড়িটা। তার মধ্যে পাশাপাশি দুটো ঘর আমাদের দিয়ে দেওয়া হল। দুটো ঘরের মধ্যে একটা দরজা। কী যে আনন্দ হয়েছিল সেদিন। একেবারে নিজস্ব একটা ঘর পেয়ে গেছি, এমন কী দিদির সঙ্গেও এক-ঘরে আমাকে থাকতে হচ্ছে না। এমন স্বাধীনতা, এমন শৌখিনতার স্বাদ এর আগে কখনও পাইনি। দারুণ খুশী হয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম। মাঝখানের দরজাটা অবশ্য কেউই বন্ধ করলুম না, ভেজিয়ে রাখলুম মাত্র।

পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন প্রথমটায় একটু দিশেহারা লাগছিল। বুঝতে পারছিলুম না, এ আমি কোথায় শুয়ে আছি। এর আগে তো কখনও আমি বোর্ডিং-বাড়িতে থাকিনি। তাই কী করব, কোথায় যাব, কিছুই ঠাহর হচ্ছিল না। কেমন যেন ধাঁধা লাগছিল।

সেইদিন সকালেই ওয়ার্ডেনের একটা নোটিস জারী হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল, ওয়ার্ডেনের কাছ থেকে অগ্রিম অনুমতি না নিয়ে হোসটেলের কোনও মেয়ে সেদিন থেকে সন্ধ্যা সাতটার পরে বাইরে থাকতে পারবে না। এবং খুব জরুরী কারণ থাকলে তবেই রাত দশটার পরে বাইরে থাকবার অনুমতি পাওয়া যাবে। নোটিশ পড়ে আমার মনে হল, এ ব্যবস্থা ভালই। রাত দশটার পরে বাইরে থাকতে চাইতে পারি, এমন কোনও কারণই আমি খুঁজে পেলুম না। হোসটেলের অন্য মেয়েরা কিন্তু দেখলুম এই নোটিস পড়ে দারুণ চটে গেছে। সারাক্ষণ তারা গজর গজর করতে লাগল; বলল যে, এইভাবে একটু-একটু করে তাঁদের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে এবং এইরকম যদি চলতে থাকে তবে খুব শিগগিরই দেখা যাবে যে, কৈলাস হোসটেল একটি জেলখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হোসটেলে এসে মনে হয়েছিল, একেবারে অচেনা এক জগতে এসে ঢুকেছি। এই পরিবেশের সঙ্গে—অন্তত তখন পর্যন্ত—কোনও পরিচয়ই আমাদের ছিল না। এখানে যারা থাকে, বিশ্ববিদ্যালয়েও সেইসব মেয়েকে আগে দেখেছি। কিন্তু এখানে সেই তাদেরই কেমন যেন অচেনা মনে হয়। আমাদের তো হাউস-কোট বলতে কিছু ছিল না। এরা দেখি হাউস-কোট পরে ঘরের মধ্যে বসে থাকে, এদের চুল অদ্ভুতভাবে

কার্ল-করা। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের কমনর‍ুমেও তো এদের দেখেছি, কিন্তু সেই চেহারার সঙ্গে এই চেহারার কোনও মিল নেই। মনে হয়, দুটো বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েও এদের আমি চিনে উঠতে পারিনি। এরা যেন এমন এক জগতের বাসিন্দা, যার কোনও খোঁজই রাখি না আমি। দিনের মধ্যে অনেকবার তো আমরা খাবার-ঘরে যাই। সেখানে অনর্গল গল্পগুজব চলে। মেয়েদের মধ্যে সেখানে নানা গোপন কথার বিনিময় হয়, এ ওর পিছনে লাগে, ঠাট্টাতামাশা করে। গল্প হয় পুরুষ-বন্ধুদের নিয়ে। কে কার সঙ্গে কবে দেখা করে, দেখাসাক্ষাৎটা কীভাবে কোথায় হয়, হরেক রকমের গল্প। এ সব গল্প বলবার সময় কেউ গলার স্বর একটু নামাবারও কোনও দরকার মনে করে না। এত সহজে-স্বচ্ছন্দে এ-সব গল্প বলে এরা যে, মনে হয়, এ নিয়ে কোনও অস্বস্তি এদের নেই। প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রেম-ভালবাসার খবর রাখে। তাই নিয়ে আমাদের সামনেই এমনভাবে কথাবার্তা বলে যেন আমরাও সব জানি। আমরা কিন্তু কিছু জানি না। যে-সব ছেলের কথা বলে ওরা, তাদের নাম পর্যন্ত এর আগে আমি শুনিনি। আগে আমার ধারণা ছিল, এ-সব ব্যাপার বুঝি শুধু সিনেমার পর্দায় কি উপন্যাসের পৃষ্ঠায় ঘটে। আমাদের জীবনেও যে ঘটতে পারে, সেই বোধই আমার ইতিপূর্বে ছিল না। দুই নিষ্পাপ শিশু যদি নাইট-ক্লাবে গিয়ে ঢোকে, তবে তাদের যে অবস্থা হবে, আমাদের দুজনের অবস্থাও তখন প্রায় সেইরকম।

যাই হোক, আমাদের যেমন পুরুষ-বন্ধু নেই, তেমনি আরও কয়েকটি মেয়েরও যে নেই, এইটে জেনে কিঞ্চিৎ স্বস্তি পাওয়া গেল। এমন মেয়ে আরও অন্তত তিনজন ছিল। তাদের মধ্যে একজন বিবাহিতা; সে ছিল ইসাবেলা থোবর্ন কলেজের ছাত্রী। সেখানে একটা অদ্ভুত নিয়ম ছিল। বিবাহিতা মেয়েদের সেখানে বাইরে থেকে পড়তে দেওয়া হত, কিন্তু কলেজের আবাসিকা হিসেবে থাকতে দেওয়া হত না। ফলে, এই মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী না হওয়া সত্ত্বেও, বিশেষ একটা ব্যবস্থা হিসেবে তাকে কৈলাস হোসটেলে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। আর-একজন ছিল মুসলমান মেয়ে। গোঁড়া পরিবারের মেয়ে। তৃতীয়জন ছিল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী। অল্প কিছুদিন তার সঙ্গে আমি একই ইশকুলে পড়েছিলুম। তার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

লখনউয়ে আসবার পরে আমাদের একটা নতুন নেশায় ধরেছিল। সিনেমা দেখা। আগ্রায় থাকতে বড়-একটা সিনেমায় যাওয়া হত না। বাবা বলতেন, সিনেমা তাঁর ভাল লাগে না। আসল কথা, অবসর-সময়ে তিনি খুব তাস খেলতেন তো, তাই সিনেমায় যাবার সময়ই তিনি পেতেন না। লখনউয়ে আমার কাকার-বাড়ি থেকে ছবিঘরগুলো খুব কাছে; হেঁটেই যাওয়া যায়। বাড়িতে এত ছেলেপুলে, তাদের মধ্যে কেউ-না-কেউ সিনেমার ভক্ত হবে, এ তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার, ফলে যে-বই আমরা দেখতে চাই, সহজেই সেটা দেখা হয়ে যেত, কিসে করে যাব কিংবা কে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবে, তা নিয়ে কোনও সমস্যাই ঘটত না। সেই ছ' মাসে যত ছায়াছবি দেখেছিলুম, সারা জীবনেও তত ছবি বোধহয় দেখা হয়নি। তবে কিনা আমাদের খুড়তুতো ভাইবোনেরা এবং তাদের মাসতুতো ভাইবোনেরা শুধু ইংরেজী ছবিই দেখত, কখনো হিন্দী ছবি দেখত না। ফলে আমাদেরও শুধু ইংরেজী ছবিই দেখা হত।

এ হল তিরিশের দশকের কথা। সেই দশকে ইংল্যান্ড আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সত্যিই —অন্তত আমাদের সময়ের সেরা কিছু ছবি তৈরী হয়েছিল। সে-সব বইয়ের অনেকগুলিই তখন আমাদের দেখা হয়ে যায়। 'ব্যারেট্স অব উইমপোল স্ট্রীট' তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বই নিশ্চয় নয়, তবু সেই বইয়ের কথা সম্ভবত এই কারণে আমার মনে আছে যে, তার কাহিনীটি ছিল মনকে নাড়া দেবার মতো। অভিনেত্রীদের মধ্যে বেটি ডেভিসকে আমার খুব ভাল লাগত। বেটি ডেভিসের কোনও বই-ই আমি বাদ দিতুম না।

অন্যদিকে, অভিনেতাদের মধ্যে আমাদের বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই যদিও ক্লার্ক গেব্‌লকে দারুণ পছন্দ করত, আমার কিন্তু ক্লার্ক গেব্‌লকে বিশেষ ভাল লাগত না। একটু যেন স্থূল-রুচির অভিনেতা বলে মনে হত। আসল কথা, সর্বব্যাপারেই একটু সূক্ষ্মতার দরকার হয়। তাতেই তার স্বাদ বাড়ে। কথাটা প্রেম-ভালবাসার পক্ষেও সত্য। যে মানুষ তার ভালবাসাকে একেবারে বিজ্ঞাপনের মতো প্রকট করে তুলেছে, তাকে পছন্দ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

যে-মেয়েটি ডাক্তারি পড়ত, সেও ছিল খুব ছায়াছবির ভক্ত। তার কাছেই আমি 'জরেজ'-এর নাম শুনি। মেক্সিকোর বিখ্যাত বিপ্লবীর জীবন অবলম্বন করে এই বইখানা তোলা হয়েছিল। তা সেইসময়ে এই রকমের একটা গুজব রটেছিল যে, ছবিখানার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হবে। ফলে তার টিকিট পাবার জন্যে খুব কাড়াকাড়ি লেগে যায়। প্রথম দিনেই ছবিখানা আমরা দেখেছিলুম। দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল, আবার দেখি। কিন্তু টিকিটের তখন এতই চাহিদা যে, বইখানা আর দ্বিতীয়বার আমার দেখা হয়নি। নিষেধাজ্ঞা জারী হতে পারে, এই গুজবটা স্বভাবতই দর্শকের ভিড় বাড়িয়ে দিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশে অবশ্য নিষেধাজ্ঞা জারী হয়নি। তবে অন্য কয়েকটি প্রদেশে হয়েছিল। সে-সব জায়গায় বইখানা দেখানো যায়নি।

মনে পড়ে, বইখানার একটি দৃশ্যে মেরীমাতার মস্ত একটি মূর্তি দেখানো হয়েছিল। শয়ে শয়ে মোমবাতি জ্বলছে, ধূপধুনো পুড়ছে। মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে বসে আছে একটি মেয়ে। প্রার্থনা করছে। প্রার্থনা করতে করতে বারবার সে মেরীমাতার বস্ত্রের প্রান্তভাগ চুম্বন করছিল। তাই দেখে আমার বন্ধুটি তো মহা ক্রুদ্ধ। জোর গলায় সে নিন্দেমন্দ করতে লাগল। বলতে লাগল, "দ্যাখো, দ্যাখো, এও যদি না পৌত্তলিকতা হয়, তবে পৌত্তলিকতা আর কাকে বলে। আমাদের তো ওরা পৌত্তলিক বলে গালাগাল করে, কিন্তু ওদের সঙ্গে আমাদের তাহলে আর পার্থক্য কোথায়? আমাদের ওরা 'পেগ্যান' আর 'হীদেন' বলে গাল দেয়, জগৎ জুড়ে সর্বত্র আমাদের নিন্দেমন্দ করে, কিন্তু ব্যাপারটা একবার দ্যাখো, ওরাও তো, ঠিক আমাদেরই মতো...।" অনেকক্ষণ ধরে বন্ধুটি তো তেড়ে সমালোচনা করতে লাগল। দৃশ্যটা কখন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তার সমালোচনা আর থামতেই চায় না। আমি তো হতবাক্। বন্ধুটি যে এতটাই রেগে যাবে, তা আমি বুঝতে পারিনি। আবছামতো জানতুম যে, ইংরেজরা সর্বত্র বলে বেড়ান, আমরা পুতুল-পুজো করি। কিন্তু ঠিক এই দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুধর্ম আর খ্রীষ্টধর্মের তুলনা আমি কখনও করিনি।

*   *   *

কে যে আমাদের মিছিলে ডাক দিয়েছিল, মনে নেই। শুধু দেখে সেদিন বিস্মিত হয়েছিলুম, ডাকবামাত্র দিদি রাজী হয়েছিল। আর দিদি যখন রাজী হয়েছে, আমার পক্ষে তখন আপত্তির কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ১৯৪০ সনের ২৬শে জানুয়ারি। ছাত্রদের সেদিন মিছিল বার হয়েছিল, সেই মিছিলে আমরা যোগও দিয়েছিলুম। ছাত্র-কবি আলি সর্দার জাফরি এই উপলক্ষে একটি গান রচনা করেছিলেন, সেই গান গাইতে গাইতে মিছিল এগোচ্ছিল। কুচকাওয়াজ করে এগোবার সুরেই গানটি বাঁধা। গানের কথাগুলোও তাৎপর্যময়। বক্তব্য অনেকটা এইরকমের যে, ইউরোপে যুদ্ধ হচ্ছে তো হোক, তাতে আমাদের কী, আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতা চাই, সেই স্বাধীনতা আমরা অর্জন করে নেব। মিছিলে সেই আমার প্রথম যোগদান। এর আগে আর কোনও রাজনৈতিক কি অন্য-কোনও মিছিলে যোগ দিইনি। সবার সঙ্গে সেই পা মিলিয়ে চলা, তার মধ্যে বেশ একটা উত্তেজনা ছিল, যার স্বাদ আগে কখনও পাওয়া

যায়নি। সবার সঙ্গে একাত্ম বোধ করছিলুম। সে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। তবে মিছিলে যোগ দিয়ে সেদিন যতই আনন্দ পেয়ে থাকি, তার পরেও কিন্তু আর কখনও কোনও মিছিলে কিংবা বিক্ষোভে যোগ দেওয়া হয়নি। কেন দিইনি, কে জানে। সুযোগ আসেনি, এমন তো নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে তার পরেও তো তিন বছর পড়েছিলুম। সেই তিন বছরে বহুবার মিছিলে যোগ দেবার সুযোগ এসেছিল।

তবে মিছিলে তার পরে আর যোগ না-দিলেও ছাত্র ফেডারেশনের আয়োজিত এক সম্মেলনে আমরা যোগ দিয়েছিলুম বটে। শুধু যে যোগ দিয়েছিলুম, তা নয়, বিশিষ্ট কয়েকজন ডেলিগেটকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অন্য কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে আমরা রেল-স্টেশনেও গিয়েছিলুম। কিসের জন্যে সেই সম্মেলন, তা অবশ্য আমি জানতুম না। ছাত্র ফেডারেশনের আদর্শ বস্তুত কী, সে-বিষয়েও আমার কোনও ধারণা ছিল না। তবে এটা আমি জানতুম, ছাত্র ফেডারেশনের বেশ কয়েকজন সভ্যই কমিউনিস্ট পার্টির লোক। সেজন্য অবশ্য আমার কোনও অহেতুক দুর্ভাবনা ছিল না। মহিলা-ডেলিগেটদের কেউ-কেউ কৈলাস হোসটেলেরই মূল-বাড়ির লাগোয়া একটি অংশে উঠেছিলেন। বাংলা থেকে যে-সব মহিলা-ডেলিগেট এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন তো দারুণ তেজী। তাঁর রাজনৈতিক আলোচনার ভঙ্গিটি ছিল এতই আক্রমণাত্মক যে, ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলতে আমার বিশেষ উৎসাহ হত না। তাঁর কথাবার্তার ধরন দেখে আমার উৎসাহ একেবারে নিভে যায়।

* * *

উদয়শংকর তাঁর নাচের দল নিয়ে এইসময়ে লখনউয়ে এসেছিলেন। এর আগে মঞ্চে আমি নৃত্যানুষ্ঠান দেখেছি। কিন্তু আলোকসম্পাত, মঞ্চবিন্যাস, সাজসজ্জা ইত্যাদি সহ সত্যিকারের 'ব্যালে' বা সমবেত নৃত্যানুষ্ঠান এর আগে কখনও দেখা হয়নি। উদয়শংকরকে দেখে সেবার বড় ভাল লেগেছিল। সুঠাম, কোমল, নমনীয় শরীর; সেই শরীরের ছন্দোময় সঞ্চরণ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। সৃজনশীল শিল্পী তিনি; নাচের উপস্থাপনা-রীতি ও অন্তর্নিহিত ভাব সম্পর্কে তাঁর মনোভঙ্গির মধ্যে একটা সজীব নবীনতা ছিল। প্রাচীন ও আধুনিক নানা নৃত্য-শৈলীর মধ্যে তিনি সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, দরকার অনুযায়ী লোকনৃত্য-শৈলীকে কাজে লাগাতেও তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। প্রাচীনপন্থীরা তাঁর নিন্দে করতে পারেন, কিন্তু এ-বিষয়ে আমার কোনও সংশয় ছিল না যে, এই যে নবনৃত্যরীতি তিনি উদ্ভাবন করেছেন, ভবিষ্যৎ-কালের নৃত্যশিল্পীরা এর জন্যে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করবেন। অতীতের স্থাণু নৃত্যকলার পরিবর্তন ঘটিয়ে নব-নব সম্ভাবনার দুয়ার তিনি খুলে দিয়েছিলেন; অতীতকালের নৃত্যকলাকে নূতনত্বের ছোঁয়া লাগিয়ে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন।

শৈশব থেকেই আমার নাচ শিখবার বড় ঝোঁক। কিন্তু মা আমাকে নাচ শিখতে দেননি। উদয়শংকরের নাচ দেখতে দেখতে সেদিন বড় আবিষ্ট বোধ করেছিলুম। কল্পনা করছিলুম, সিমকি অথবা অমলা শংকরের জায়গায় আমিই যেন তাঁর নৃত্যানুষ্ঠানের সহযোগিনী। ইচ্ছে করছিল, নৃত্যশিল্পীদের সকলকে একেবারে কাছে গিয়ে দেখি। অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে দিদিকে বললুম, স্টেজের পিছনে গিয়ে সবাইকে দেখব। গিয়ে দেখি, উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে উদয়শংকর একদল লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। আমাদের দেখে প্রশ্ন করলেন, কার সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই। আমরা বললুম, অমলা নন্দীর সঙ্গে। তাই শুনে তিনি অমলা নন্দীর উদ্দেশে বাংলায় বললেন যে, বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। শুনে অমলা নন্দী বেরিয়ে এলেন বটে, কিন্তু আমাদের চিনতে পারলেন না। তাতে আমরা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম।

নিজেদের কেমন বোকা-বোকা ঠেকতে লাগল। যাই হোক, তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে আমি বললুম যে, আগ্রায় জালিদের বাড়িতে তাঁকে আমি দেখেছিলুম, তাঁর সঙ্গে তখন আমার আলাপ-পরিচয়ও হয়েছিল। জালির নাম করায় যেন মন্ত্রের মতো কাজ হল। সম্ভবত আমাকে তিনি চিনতে পারলেন। দিন দুই-তিন সেবারে তিনি জালিদের বাড়িতে ছিলেন। সেই সময়ে অনেকবার তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। যাই হোক, সত্যি-সত্যি তিনি চিনতে পারুন আর না-ই পারুন, খুব সৌজন্যপূর্ণভাবে সেদিন তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। এমনভাবে, যেন আমরা তাঁর অনেক কালের বন্ধু। মিনিট কয়েক কথাবার্তা বলে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে এলুম। আমি তাঁদের দেখতে চেয়েছিলুম। সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। শুধু উদয়শংকর কেন, উজ্রা, জোহরা, সিমকি এবং দলের অন্য-কয়েকজন শিল্পীকেও সেদিন কাছের থেকে দেখা হয়েছিল। কিন্তু মঞ্চে যাঁদের দেখি, মঞ্চের বাইরে তাঁদের দেখে বড়ই হতাশ হয়েছিলুম, মনে পড়ে। মুখের উপরে রঙের পুরু প্রলেপ, ভীষণ কদর্য দেখাচ্ছিল তাঁদের।

* * *

কৈলাস হোস্টেলের ওয়ার্ডেন আমাদের পরিবারের পুরনো বন্ধু। বারাণসীতে থাকতে সেই যে আমি গোপনে-গোপনে একজন মহিলার খুব অনুরাগিণী হয়ে উঠেছিলুম, ইনিই তিনি। বছর দুয়েক আগে হৃদ্‌রোগে তাঁর স্বামীর মৃত্যু ঘটে, তার পরে তিনি এই চাকরি নিয়েছেন। ভদ্রমহিলার দুই ছেলে এলাহাবাদে পড়ে, মেয়েটিকে তিনি কাছেই রেখেছেন। মেয়েটি আমার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। ইশকুলের ছাত্রী। হঠাৎ পিতৃহীন হয়েছে বলেই হোক, কিংবা তার স্বভাব ওই রকমের বলেই হোক, বয়সের তুলনায় মেয়েটির মন দেখতুম অনেক পরিণত। তার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যায়।

ওয়ার্ডেন একদিন আমাদের কয়েকজনকে চায়ের আসরে নেমন্তন্ন করেছিলেন। স্পষ্ট মনে আছে, মিস নারায়ণ সেই আসরে উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতিও। বেশ কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী সেই আসরে এসেছিলেন। আসর বেশ জমে গিয়েছিল। ইউনিয়নের সভাপতি ডি. পি. ধরকে এর আগেও আমি দেখেছি, তবে ইতিপূর্বে তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি। দেখলুম, বেশ চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্বের মানুষ তিনি। এমন একটা প্রাণবন্ত ভাব তাঁর মধ্যে দেখলুম, যা খুব সুলভ নয়। এমন কিছু মানুষ আছেন, স্রেফ ব্যক্তিত্বের মাধুর্যেই অন্যদের যাঁরা জয় করে নেন। ইনিও সেই রকম মানুষ। শান্ত, নম্র গলায় কথা বলেন। কণ্ঠস্বর কখনও উঁচু পর্দায় ওঠে না। দেখে মনে হয়, এমন মানুষের পক্ষে ক্রুদ্ধ কিংবা উত্তেজিত হওয়া সম্ভব নয়।

সেদিন কিন্তু তাঁকে রেগে উঠতে দেখেছিলুম।

ডি. পি ধর ও অন্য কয়েকটি ছাত্রের বাড়ি কাশ্মীরে। হয়তো সেইজন্যই আমাদের সেই সান্ধ্য আসরে সেদিন কথায়-কথায় কাশ্মীরের প্রসঙ্গ উঠেছিল। গৃহকর্ত্রী অমনি কাশ্মীরের প্রাকৃতিক শোভা ও কাশ্মীরী মেয়েদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে শুরু করলেন। তারপর দুঃখ করে বললেন যে, কাশ্মীরী মেয়েরা তাদের আঞ্চলিক পোশাক ছেড়ে শাড়ি পরতে শুরু করেছে। এ খুব আক্ষেপের কথা। কেননা নিত্য যে-সব শাড়ি আমরা দেখতে পাই, তার তুলনায় কাশ্মীরী পোশাক কত বর্ণাঢ্য। যেন ছবির মতো দেখতে।

গৃহকর্ত্রীর কথা শেষ না হতেই ডি. পি. ধর রেগে উঠলেন। তাঁর গলার পর্দা অবশ্য চড়ল না, কিন্তু গৌরবর্ণ সুন্দর মুখখানি রক্তবর্ণ

[illegible] করলাম। ক্ষোভের ভঙ্গিতে তিনি বললেন, "বটেই তো! এই সমতল এলাকার বাসিন্দারা চান যে, কাশ্মীরী মেয়েরা সেই সামন্ততান্ত্রিক আমলের পুরনো রুচি আঁকড়ে ধরেই পড়ে থাকুক। পুরনো আমলের সেই ঝলমলে পোশাকই তারা পরতে থাক। যাতে পাঁচ বছর অন্তর-অন্তর কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়ে সেই পুরনো পোশাক দেখবার আনন্দ থেকে তাঁদের বঞ্চিত হতে না হয়! যাতে সেখানে গিয়ে টকাটক তাঁরা ছবি তুলতে পারেন, এবং ফিরে এসে বন্ধুবান্ধবদের সেইসব ছবি দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন! আসলে সেইজন্যেই তাঁরা চান না যে, কাশ্মীরীদের জীবনে কোনও পরিবর্তন ঘটুক। মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলবার ব্যাপারে পোশাকের ভূমিকা মোটেই তুচ্ছ নয়। কিন্তু এখানকার লোকেরা চান না যে, কাশ্মীরী মেয়েরা শাড়ি পরুক। কেননা, কাশ্মীরী মেয়েরা শাড়ি পরলে ছবি তোলার মজাটাই যে চলে যাবে। শুধু ছবির কথাই তাঁরা ভাবেন। কাশ্মীরের সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের কথা তাঁরা ভুলেও কখনও ভাবেন না। সেখানকার মানুষদের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁদের কোনও মাথাব্যথাই নেই। শুধু ছবির ভাবনাতেই তাঁরা মশগুল!" ডি. পি. ধর এই কথাগুলো যখন বলছিলেন, তাঁর কণ্ঠস্বর তখন একটুও চড়েনি। কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল, দারুণ আবেগের ভরে তিনি কথা বলছেন। বোঝা যাচ্ছিল, জাতীয় সংগ্রামের তিনিও একজন যোদ্ধা; দেশের মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে তিনি অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করেছেন। সেদিন যে প্রশ্ন তিনি তুলেছিলেন, আমার মনে তা গভীরভাবে দাগ কেটে যায়। সত্যিই তো, পোশাকের পরিবর্তনের সঙ্গেও একটা জনগোষ্ঠীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও জাতীয় সংগ্রামের কী নিবিড় যোগসম্পর্ক রয়েছে। বাইরে থেকে যে সব জিনিসকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়, কী অদ্ভুতভাবে পরস্পরের সঙ্গে তারা যুক্ত। দীর্ঘদিন ধরে একটু-একটু করে যে-সব পরিবর্তন ঘটে যায় এইসব আপাত-সরল ব্যাপারের মধ্যেই কীভাবে তাকে প্রকাশ পেতে দেখি।

* * *

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ঘাউস মহম্মদই তখন সবচেয়ে বিখ্যাত। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উইম্বল্ডনের কোয়ার্টার-ফাইন্যালে পৌঁছেছিলেন। তবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় তাঁর নাম থাকলেও, পরীক্ষার সময়ে তাঁর পাত্তা পাওয়া যেত না। হয় তিনি তখন দারুণ ব্যস্ত, নয়ত লখনউয়ে নেই। ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফাইন্যাল ইয়ার পর্যন্ত পরীক্ষা না দিয়েই তিনি প্রোমোশান পেয়েছেন, কিন্তু ওইভাবে তো ডিগরী পাওয়া যায় না। ফলে বছর ছয়েক তিনি বি.এ. ফাইন্যালের ছাত্র হয়েই কাটিয়ে দিলেন।

চা খাবার জন্যে ডাক পড়তে ঘাউস যখন আমাদের টেবিলে এসে বসলেন, তখন আমি দারুণ খুশী হয়েছিলুম। যেমন খুশী, তেমনি উত্তেজিত। ঘাউস তো শুধু নামজাদা টেনিস-খেলোয়াড় নন, মানুষ হিসেবেও ভারী চিত্তাকর্ষক। টেবিলে বসেই আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "কিছু যদি মনে না করেন, তো একটা কথা বলি। উনি আপনার অটোগ্রাফ চেয়েছিলেন, কিন্তু আপনি দেননি, এটা আপনার অন্যায় হয়েছে। কেন ওঁকে অটোগ্রাফ দিলেন না?"

সে এক হাস্যকর ব্যাপার। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীদের এক ক্রিকেট ম্যাচের ব্যবস্থা হয়েছিল। ঠিক ছিল, ছাত্ররা সবাই বাঁ হাতে খেলবে। মেয়েদের অনেকেই তো জীবনে কখনও ব্যাট ধরেনি, তাই সংকোচে তারা জড়সড়। ওদিকে ছাত্ররাও নাছোড়বান্দা। উপরন্তু নারীর সম্মান রাখতে তারা বদ্ধপরিকর। ঠিক করেছিল, বাঁ হাতে খেলে মেয়েদের তারা জিতিয়ে দেবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে সব চেয়ে

সুন্দরী ছিল খাদিজা। ছেলেরা তাকে জিয়ে একটা সেনচুরি করিয়ে তবে ছাড়ল। মেয়েরা জিতল, সে-কথা বলাই বাহুল্য। আমিও দলে ছিলুম, তবে আমিই সবচেয়ে অখ্যাত, নেহাত এগারো জন খেলোয়াড় পাওয়া যাচ্ছিল না, তাই একেবারে শেষ মুহূর্তে দলের মধ্যে আমাকে টেনে নেওয়া হয়। সে-বিষয়ে সচেতন ছিলুম বলেই, একটি ছেলে এগিয়ে এসে যখন আমার অটোগ্রাফ চাইল, তখন তা দিতে আমি রাজী হলুম না। ঘাউসকে সে-কথা খুলে বললুম।

তা ঘাউস বললেন, অটোগ্রাফ প্রার্থীদের কাউকে তিনি কখনও ফিরিয়ে দেননি। হাজার-হাজার মানুষ যখন তাকে ঘিরে ধরেছে, তখনও—কাউকে নিরাশ করতে চাননি বলেই—ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি সই দিয়ে গেছেন। শুনে আমার মজা লাগল। ঘাউসকে বললুম, তাঁর সঙ্গে কি আমার তুলনা হয়? প্রথম কথা বলার মধ্যে একটা আড়ষ্টতা থাকে তো, সেই আড়ষ্টতা ততক্ষণে কেটে গেছে, নিজের সম্পর্কে ঘাউস সেদিন অনেক কথা বলেছিলেন। শুনলুম, মালিহাবাদের এক গোঁড়া পরিবারের ছেলে তিনি। তাঁদের পরিবারে মেয়েদের বয়স বারো কি তেরো হবামাত্র বোরখা পরতে হবে। নিকট-সম্পর্কের ভাইদের কাছেও তখন বোরখা না পরে যাওয়া চলবে না। ঘাউস দেখলুম সরল, মিশুক প্রকৃতির মানুষ। ব্যক্তিগত জীবনের যে গল্প তিনি শোনালেন, সত্যিই তা শ্রোতার মনকে বেশ নাড়া দেয়। বললেন, প্রথম যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন, মেয়েদের দেখে তাঁর তো তখন চৈতন্য লোপ পাবার জোগাড়। বিশেষ করে যারা খুব স্মার্ট মেয়ে, আর চালচলনে কেতাদুরস্ত, তারাই আরও বেশী করে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিত। কে বেশী সুন্দরী, কে কম, অন্তত তিনি বুঝতে পারতেন না। সব মেয়েকেই তাঁর সমান সুন্দরী আর চিত্তাকর্ষক মনে হত। ইচ্ছে করত, প্রত্যেককে থামিয়ে থামিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেন, কিংবা একটু ছুঁয়ে দেখেন। মেয়েদের নাকি মেয়ে বলেই তাঁর মনে হত না; মনে হত, সুন্দর এক-একটি সামগ্রী। তাই ছুঁয়ে দেখবার সাধ হত। শুধু মেয়েদের দেখবেন বলেই ঘাউস নাকি করিডরে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

ঘাউসের স্বীকারোক্তি শুনে ভারী মজা লাগল আমার। ভাবলুম, রক্ষণশীল পরিবারের এই মানুষটি তো বিলেত গিয়েছিলেন এবং দেখেছিলেন যে, চতুর্দিকেই মেয়েদের ছড়াছড়ি। তখন তাঁর প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, কে জানে। ঘাউসকে আমার বেশ ভাল লেগেছিল। ঠাট্টার সুরে নানান সব কথা বলছিলেন তিনি। কিন্তু তারই ভিতর থেকে আসল মানুষটির পরিচয় যেন ফুটে উঠেছিল। ক্লাসের ছেলেদের দেখেছি। তারা ব্যগ্র চোখে তাকায়, মাঝেমধ্যে কুৎসিত নানা মন্তব্য করে। ছেলেগুলোকে তাই খুব বিচ্ছিরি লাগত। কিন্তু ঘাউসের কথা শুনবার পরে তাদের সঙ্গে নিজের সম্পর্কটাকে কিছুটা স্বাভাবিক করে নেওয়া আমার পক্ষে সহজ হয়ে যায়।

দক্ষিণ ভারতীয় একটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে পড়ত। ঘাউসের গল্পের সঙ্গে এই মেয়েটির কোনও সম্পর্ক নেই, তবু তার কথা আমার মনে পড়ছে। একমাত্র লখনউ ছাড়া অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন এম.এ. আর এলএল বি.র 'কমবাইন্ড কোর্স' পড়াবার ব্যবস্থা ছিল না। একটা বছর বাঁচাতে তাই অন্যান্য প্রদেশের অনেক ছাত্রছাত্রী লখনউয়ে পড়তে আসত। কেরলের এই মেয়েটিও সেই একই কারণে লখনউয়ে এসেছিল। থাকত কৈলাস হোস্টেলে। তাকে দেখবার পরে এইটে ভেবে আমার চমক লেগেছিল যে, ছাত্রী-জীবনে এর আগে আর কোনও দাক্ষিণী মেয়ে আমি দেখিনি। দক্ষিণ ভারত সম্পর্কে আমার জ্ঞানও ছিল অতি সীমাবদ্ধ। দক্ষিণ বলতে তো শুধু মাদ্রাজকে বোঝায় না, আলাদা আলাদা অনেক অঞ্চল সেখানে রয়েছে। অথচ, আমাদের কাছে তারা সবাই 'মাদ্রাজী'। অন্যদিকে, উত্তর ভারত সম্পর্কেও দক্ষিণের লোকেরা বিশেষ-কিছু খবর রাখে না। এই মেয়েটি যখন লখনউয়ে পড়তে আসে, তখন তার বাবা-মা নাকি দারুণ

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। সেটা অবশ্য অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়, মেয়ে দূরে যাচ্ছে, বাবা-মা'র পক্ষে তাই উদ্বিগ্ন হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শুনলুম, তাঁদের আসলে উদ্বেগ নাকি দূরত্বের জন্য নয়। অযোধ্যার নবাবদের সম্পর্কে নানা রকমের গল্প তাঁরা শুনেছিলেন, এদিকে লখনউ তো এককালে সেই নবাবদেরই রাজধানী ছিল, উদ্বেগটা প্রধানত তারই জন্যে। দক্ষিণে পর্দাপ্রথা নেই। মেয়েটির মা তবু এক চিঠিতে তাকে লিখেছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সব মেয়েই যদি বোরখা পরে যায়, তবে সেও যেন নিজের জন্যে গোটাকয়েক বোরখা তৈরি করিয়ে নেয়। সবাই বোরখা পরে যাচ্ছে, শুধু সে বাদে, সেটা ঠিক হবে না। চিঠির কথা শুনে আমরা খুব হেসেছিলুম। মেয়েটি অবশ্য বাড়িতে চিঠি লিখে জানিয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে একজনও বোরখা পরে ক্লাসে আসে না, কিন্তু তার বাবা-মা সে-কথা বিশ্বাস করেননি। গান্ধীজী ইতিপূর্বে পুরো দুই দশক ধরে ভারতবর্ষের ঐক্যের কথা সবাইকে বুঝিয়েছেন, তার জন্যে সংগ্রাম করেছেন, অথচ ১৯৪০ সনেও উত্তরে-দক্ষিণে কী বিরাট ব্যবধান।

* * *

দিদির পরীক্ষা চুকে-বুকে গিয়েছিল। মার্চের শেষে সে তাই বাড়িতে ফিরে যায়। আমি তখন বি.এ. প্রথম বর্ষের ছাত্রী। আরও মাসখানেক আমাকে লখনউতে থাকতে হবে, তার আগে বাড়ি যাবার উপায় নেই। দিদি আর আমি একসঙ্গে ব্যাডমিণ্টন আর টেবল টেনিস খেলতুম, একসঙ্গে বেড়াতুম, একসঙ্গে কেনাকাটা করতুম। দিদি চলে যাওয়ায় বড় একা-একা লাগতে লাগল। অথচ যে পরীক্ষার জন্যে আমি লখনউতে রয়ে গেলুম, সেটা নেহাতই ক্লাস-পরীক্ষা। তাতে খুব একটা ভাল ফল করবার দরকার নেই, কোনক্রমে পাশ করতে পারলেই হয়। ক্লাস-পরীক্ষা নিয়ে তাই কেউ মাথা ঘামায় না। আমিও তাই সবসময়ে পড়াশুনোয় ব্যস্ত না থেকে মাঝেমধ্যে মামাজীর বাড়িতে যেতুম। কখনও-কখনও সরাসরি একতলায় আমার সেই মামার ঘরে ঢুকে পড়তুম, উপরে গিয়ে বাড়ির অন্যদের সঙ্গে দেখা করবারও দরকার সবসময়ে বোধ করতুম না।

ডি পি. মুখার্জীর কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। তাঁর ব্যক্তিত্ব যেন চুম্বকের মতো সবাইকে কাছে টানত। এ যখনকার কথা, সমাজতত্ত্ব তখন একটা আলাদা বিষয় বলে গণ্য হত না, অর্থনীতির অঙ্গ হিসেবেই সমাজতত্ত্বের পাঠ নিতে হত। ডি. পি. মুখার্জী আমাদের সমাজতত্ত্ব পড়াতেন। তবে শুধু তারই মধ্যে তিনি গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকতেন না। আসলে তাঁর প্রেক্ষাপট ছিল বিরাট। সমাজতত্ত্ব আর অর্থনীতিতে তিনি পারদর্শী পণ্ডিত; আবার সংগীত, চিত্রকলা ও অন্যান্য সুকুমার শিল্প সম্পর্কেও তিনি কিছু কম খবর রাখেন না। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল বহুমুখী, তার বিস্তার ছিল অতি বিস্ময়জনক। ছাত্রদের মধ্যে অনেকের উপরেই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়েছিল।

আমি যখন লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হই, অস্থায়ী একটা কাজের দায়িত্ব নিয়ে তিনি তখন অন্যত্র রয়েছেন। জানুয়ারি থেকে তিনি আমাদের ক্লাস নিতে শুরু করেন। ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশেরই তো লক্ষ্য ছিল যেন তেন প্রকারেণ একটা ডিগ্রী পাওয়া। ডি. পি. মুখার্জী তাদের আদৌ পছন্দ করতেন না। একদিনকার কথা মনে পড়ছে। তিনি সেদিন আমাদের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত একটা বিষয় পড়াচ্ছিলেন। মিনিট পনর পড়িয়েই বিরক্তিভরে বইখানাকে একপাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে বললেন, "যেটুকু পড়িয়েছি, তোমাদের ডিগ্রী পাবার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট।" বলে ধর্ম এবং ধনতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করে দিলেন। ডি. পি. মুখার্জী ছিলেন বিতর্কমূলক চরিত্রের মানুষ। অধিকাংশ ছাত্রই তো এমন অধ্যাপকদের পছন্দ করত, পাঠ্যতালিকার বাইরে পা বাড়াতে যাঁরা রাজী নন। ডি. পি. মুখার্জীকে তাদের পছন্দ

হত না। পরীক্ষায় যা কাজে লাগবে না, তাই নিয়ে 'সময় নষ্ট' করছেন বলে তাঁকে তারা সমালোচনা করত। অন্যদিকে, সংখ্যায় যতই কম হোক, এমন ছাত্রও কিছু ছিল, যারা অল্পে সন্তুষ্ট নয়, জটিল নানা জিজ্ঞাসার পাথরে যারা বুদ্ধিকে শান দিয়ে নিতে চায়। স্বতই তারা ডি. পি. মুখার্জীর প্রতি আকৃষ্ট হত; টমির মতো লেখকদের সংগে পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন বলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করত। দক্ষ অধ্যাপক আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নেহাত কম ছিলেন না; কিন্তু ডি. পি. মুখার্জী যেমন ছাত্রদের চিত্তকে দীপিত করে তুলতেন, তেমনটা আর কেউ পারেননি। ছাত্ররা যাতে নেহাতই পাঠ্যবইয়ের সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকে, তার জন্যে তিনি হরেক বিষয়ে জ্ঞান আহরণের তৃষ্ণা তাদের মধ্যে জাগিয়ে দিতেন।

কাকা আর আমার মধ্যে ডি. পি. মুখার্জী ছিলেন সেতুবন্ধের মতো। কাকা তাঁর কাছে পুরো তিন বছর পড়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে ডি. পি. মুখার্জীকে তিনি চিনতেন। আমি সেক্ষেত্রে মাত্রই মাস তিনেক তাঁর কাছে পড়েছি। তাও ক্লাসরুমের সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে। কাকার কাছে তাঁর বিষয়ে অনেক গল্প শুনতুম। শুনে শুনে আশ যেন মিটত না। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের বুদ্ধিজীবী মহলও ডি. পি. মুখার্জীর চারপাশে ঘুরতেন। স্থানীয় সেইসব বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে কত যে গল্প করতেন কাকা। ইংরেজী বিভাগের এক অধ্যাপকের গল্প শুনেছিলুম। সদ্য তখন তাঁর একখানা উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। এক তরুণ সাংবাদিকের গল্পশুনেছিলুম। সদ্য তিনি তখন ন্যাশনাল হেরাল্ডে লিখতে শুরু করেছেন। নেহাতই বি.এ. প্রথম বর্ষের ছাত্রী আমি। এ-সব বুদ্ধিজীবীর কাউকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না। শুধু কাকার কাছে তাঁদের গল্প শুনি আর বিস্ময় বোধ করি।

'শোষণ', 'বুর্জোয়া'—একটু-একটু করে এইসব শব্দের সংগে তখন আমার পরিচয় ঘটছে। তবে তখনও আমার দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে এ-সব শব্দ ঢুকে পড়েনি। তরুণ বয়সে আমার কাকা যে কমিউনিস্ট ছিলেন, তা নয়, তবে মার্ক্সবাদ নিয়ে আলোচনা করতে তাঁর ভাল লাগত। আমি তাঁর কথাগুলোকে গোগ্রাসে গিলতে থাকি। কিন্তু কাকার আলোচনা মাঝে-মাঝেই যুক্তির সীমা ছাড়িয়ে যায়। উচ্ছ্বাসের মাথায় ছাত্র-অধ্যাপকদের মধ্যেও তিনি একটা শ্রেণী-বিভাগ করে ফেলেন; বলেন, ছাত্ররা হচ্ছে শোষিত শ্রেণী আর অধ্যাপকেরা শোষক। শুনে আমার ধাঁধা লেগে যায়। ভাবি, তাও কি হয় নাকি? নাঃ, সব-কিছুতেই কাকার বড্ড বাড়াবাড়ি। আমি তো দেখছি, ছাত্র আর অধ্যাপকেরা একই শ্রেণীর লোক। ছাত্ররাও মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষ, অধ্যাপকেরাও ত-ই। দু-চারজন ছাত্র হয়ত শ্রমিক-ঘরের থেকে এসেছে, কিন্তু খুঁজলে কি আর অধ্যাপকও তেমন দু-চারজন পাওয়া যাবে না? শ্রেণী-সংগ্রাম তখন আমার কাছে একটা নতুন তত্ত্ব। তার তাৎপর্য তখনও আমি ভাল করে বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু এটুকু বুঝতুম যে, ছাত্র আর অধ্যাপকদের মধ্যেও শ্রেণী-সংগ্রাম চলছে বললে ব্যাপারটা নেহাতই হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়!

* * *

মা বলতেন, মেয়েদের যে-বই পড়তে ইচ্ছে হয়, পড়ুক, তা নইলে জীবনের নানা রহস্যের ব্যাপার তারা বুঝবে কী করে। তা বই তো আমি ইচ্ছেমতই পড়তুম, কিন্তু জীবনের ওই রহস্যের ব্যাপারগুলো তবু বোঝা হল না। শুধু উপন্যাসই যে পড়তুম, তা নয়। পড়তুম সব রকমের বই। কাকার বাড়িতে থাকতে হ্যাভেলক এলিসের যাবতীয় রচনাও আমি পড়ে ফেলেছিলুম। সেটা অবশ্য গোপনে পড়তে হয়েছিল। খুড়তুতো ভাই-বোনেরা কে কী পড়ছে, কাকীমা সেদিকে কড়া নজর রাখতেন। তা, হ্যাভেলক

ঔপন্যাসের বই পড়া কাকীমার মনঃপূত হবে কিনা, সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলুম না। ফলে বইগুলো আমি লুকিয়ে পড়ে ফেলি। পড়ে কিন্তু বিশেষ-কিছু বুঝে উঠতে পারলুম না। পাখি আর পতঙ্গের আচরণই বা আমাকে কিছু শেখাতে পারল কই? আসলে মানুষ সম্পর্কে আমার এই রকমের একটা ধারণা ছিল যে, অন্যান্য জীবের তুলনায় সে অনেক উন্নত। অন্যান্য প্রাণীর আচরণের সঙ্গে কি তার তুলনা হয়? ফলে কুকুরদের যা-ই আচরণ আমি দেখে থাকি না কেন, মানুষ সম্পর্কে তার থেকে কোনও সিদ্ধান্ত আমি টানতে পারিনি।

হোস্টেলের ঘরে আমার বিছানায় শুয়ে একদিন এইসব কথা-ই ভাবছিলুম। এটা আমি বুঝতে পারতুম যে, রীতি-প্রথা মান্য করে সেকেলে পদ্ধতিতেই কেউ বিয়ে করুক, কিংবা একেলে কায়দায় সাক্ষী রেখে রেজিস্টারে একটা সই করে দিয়েই বিয়ে করুক, নিতান্ত তারই জন্যে তো আর একটি নারীর পেটে বাচ্চা জন্মায় না। আলিঙ্গন কিংবা চুম্বনের দরুনও সেটা হওয়া সম্ভব নয়। অনেক দিন আগে "আনা কারেনিনা" বইয়ের চিত্ররূপ দেখেছিলুম। তার একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ল। আনা সেখানে ভ্রন্স্কিকে বলছে যে, তার কাছে অর্থাৎ ভ্রন্স্কির কাছে সে একটি সন্তান চায়। (কথাটা বইয়ে নেই, শুধু ছবিতেই ছিল।) আনার সেই কথা শুনে তখন আমি খুব বিস্মিত হই। মনে-মনে ভাবি যে, আনা যখন বিবাহিতা মেয়ে, তখন সন্তান তো তার হতেই পারে, সমস্যাটা তাহলে কী? ভ্রন্স্কির কাছে সন্তান চায়, এ-কথার দ্বারা সে কী বোঝাতে চাইছে? তখন আমার বয়স নেহাতই অল্প। তাই ধরে নিয়েছিলুম, বিয়ে হবার পরে আপনা থেকেই সন্তান হতে থাকে। এমনিতেও তো দেখতে পেতুম যে, মেয়েদের বিয়ে হয়, তারপর বাচ্চা হতে বিশেষ দেরি হব না। বিয়ে হয়নি, অথচ বাচ্চা হয়েছে, এমন ব্যাপার কখনও দেখিনি। সন্তান হওয়ার ব্যাপারটাকে তাই বিয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতুম। এখন আমি প্রকৃত সত্যটা জানি। জানি যে, এর মধ্যে পুরুষের একটা ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু ভূমিকাটা যে কী, তখনও পর্যন্ত তা আমি জানতুম না। বইয়ের নানা দৃশ্য আর বাক্য আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেত। একটি পুরুষ একটি মেয়ের উপরে বলপ্রয়োগ করছে, তাকে 'ভোগ করছে'। মাথার মধ্যে এইসব কথা ভনভন করত, কিন্তু কী তাদের অর্থ, তাৎপর্য, তা আমি বুঝতে পারতুম না। শুধু কথা আর কথা। বইয়ে পড়া সব কথা। তারপর হঠাৎ একদিন এক নিমেষে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলুম। আর বুঝতে পারবার সঙ্গে-সঙ্গেই ভেসে উঠল সেই কুকুর দুটোর ছবি। কী বীভৎস! কী জঘন্য! ব্যাপারটা বুঝতে পারবার পরে ভীষণ বিচ্ছিরি লেগেছিল আমার। অন্যদিকে, শেষপর্যন্ত যে বুঝতে পেরেছি, এই উপলব্ধির মধ্যে একটা সন্তোষের ভাবও ছিল।

* * *

বাবার বদলির আদেশ এসে গিয়েছিল। তাঁকে এবারে লখনউয়ে যেতে হবে। মা তাই গোছগাছের উদ্যোগ-আয়োজন করছিলেন। ওদিকে কাকা কিছুদিন থেকেই বলছিলেন যে, দিনকয়েকের জন্য আমরা যেন দিল্লিতে গিয়ে তাঁর কাছে কাটাই। ঠাকুমা, দিদি আর আমি তাই নয়াদিল্লি রওনা হলুম। কাকা যে কারণে দিল্লি যাবার জন্যে আমাদের পীড়াপীড়ি করছিলেন, সেই কারণটা অবশ্য খুবই কৌতুকজনক।

১৯২৯ সনে কাকা আইন পাশ করেন। তারপর থেকে তিনি তাঁর মামার জুনিয়র হিসেবে ফৈজাবাদে ওকালতি করছিলেন। ছোট শহর, উন্নতির বিশেষ কোনও সম্ভাবনা সেখানে নেই। কাকার তাই ফৈজাবাদে মন টিকছিল না। শেষপর্যন্ত তিনি ওকালতি ছেড়ে ব্যবসা ধরলেন। এ যখনকার কথা বলছি, তখন তিনি শেয়ারের দালালি করেন।

নয়াদিল্লিতে তাঁর সদর আপিস। নয়াদিল্লি তখনও নতুন শহর। বাড়ির সংখ্যা কম। ফ্ল্যাট পাওয়া অতি শক্ত ব্যাপার। কাকা অবশ্য ছিমছাম একটি ফ্ল্যাট জোগাড় করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল বাড়িওয়ালাকে নিয়ে। কাকার সম্পর্কে তিনি সন্দিহান। ভদ্রলোকের ইচ্ছে, ভদ্র গৃহস্থ ছাড়া আর-কাউকে তিনি ফ্ল্যাট ভাড়া দেবেন না। কাকার বয়স তখন সাঁইত্রিশ বছর। কিন্তু তখনও তিনি বিয়ে করেননি। ফলে বাড়িওয়ালা তাঁকে যথেষ্ট 'ভদ্র' বলে মানতে চান না। কাকা অবশ্য অনেক করে তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, তিনি খুবই ভদ্র পরিবারের ছেলে; বউ না থাক, তাঁর মা আছেন, দাদা আছেন, ভাই আছে, তা ছাড়া আছে ভাইপো-ভাইঝিরা, এবং তারা সবাই অতিশয় 'ভদ্র'। কিন্তু বাড়িওয়ালার সন্দেহ তবু যায় না। অগত্যা কাকা আমাদের অনুরোধ জানালেন যে, আমরা যেন নয়াদিল্লিতে গিয়ে কয়েকটা দিন তাঁর ফ্ল্যাটে কাটিয়ে আসি, নইলে বাড়িওয়ালা কিছুতেই তাঁকে বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না।

দিল্লিতে আমরা মাঝেমধ্যেই যেতুম। কিন্তু নয়াদিল্লিতে এই আমাদের প্রথম থাকা। এর আগে বাংলোয় থেকেছি। ফ্ল্যাটে থাকার অভিজ্ঞতা এই প্রথম হল। নয়াদিল্লিতে সদ্য তখন অটোমেটিক টেলিফোন ডায়ালিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। দেখে আমরা অবাক। ফ্ল্যাট থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলেই কনট প্লেস। সারি সারি দোকান। সেও কিছু কম উত্তেজনার ব্যাপার নয়। প্রতি সন্ধ্যায় কাকা আমাদের নিয়ে মোটরে করে হাওয়া খেতে বার হতেন। রীজ, বড়লাটের বাড়ি এবং আরও নানা জায়গা তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন।

আমার নানী তো তাঁর এক ভাইপোর কাছে থাকতেন। অনেক সময়ে সেই মামার কাছে আমরা ছুটি কাটিয়েছি। আগে তিনি পুরনো দিল্লির বাসিন্দা ছিলেন। এখন থাকেন নয়াদিল্লিতে। পৈতৃক বাড়ির মায়া কাটিয়ে হাল-ফ্যাশানের নতুন বাড়িতে এসে উঠলেন। পুরনো আমলের সেইসব বাড়ির কথা ভেবে আমি ব্যাকুল বোধ করতুম। অন্যদিকে, এখন তিনি যে নতুন বাড়িতে থাকেন, তার আকর্ষণও আমার কাছে কিছু কম নয়। তাঁর বাড়িতে যেতে তিনি আমাদের খুব যত্ন-আত্তি করলেন। কথায়-কথায় তাঁকে বলেছিলুম, দিল্লিতে তো আমাদের বিস্তর আত্মীয়স্বজন, কিন্তু তাঁরা এতই দূরে-দূরে থাকেন যে, সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা বড় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কথা শুনে মামা তাঁর গাড়িটা আমাদের ছেড়ে দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এবারে আমরা কার সঙ্গে দেখা করতে যাব। ঠিক ছিল, এবারে যাব এক মাসীর বাড়িতে। আমার মা আর এই মামা, দুজনেরই তিনি জ্ঞাতি-বোন। তা সেই মাসীর বাড়িতে যাব শুনে মামা তক্ষুনি মত পালটে ফেললেন। বললেন যে, সেখানে যদি যাই তো তাঁর গাড়িটা আমরা পাব না। পুরনো দিল্লির নোংরা এঁদো গলির মধ্যে তাঁর গাড়ি চলবে, এমন চিন্তা তাঁর পক্ষে দুঃসহ। থাক্ গে, গাড়ি পাব না শুনে আমরা বিন্দুমাত্র ঘাবড়ালুম না; ঠিক করলুম, টোঙ্গায় করে সেখানে যাব। মামা অবশ্য তখনও আমাদের নিরস্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আদৌ আমরা সেখানে যাই, এটাই তিনি চান না। বারবার বলতে লাগলেন যে, এই গরমে সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না, যে গলি দিয়ে সেই বাড়িতে যেতে হয়, সেটা দারুণ নোংরা, দুর্গন্ধে সেখানে টেকা যায় না! আরে দূর দূর, পুরনো দিল্লিতে দেখবার কী আছে, ওখানে আবার কেউ যায় নাকি? মামার কথাবার্তার ধরন দেখে আমি তো স্তম্ভিত। একবার ভাবলুম, মুখের ওপর একটা শক্ত জবাব শুনিয়ে দিই। কিন্তু তা আর শুনিয়ে দিলুম না, রাগ সামলে নিলুম। আমার ভীষণ অবাক লাগছিল। ভাবছিলুম, হা অদৃষ্ট, এও সম্ভব! অর্ধেক জীবন সেই পাড়ায় কাটিয়েছে এই মানুষটি, পাঁচ বছর আগেও সে সেইখানে থাকত, অথচ এরই মধ্যে তার কথার ধরন কী রকম পালটে

গেছে! মামার কথাবার্তা শুনে আমার কী যে বিচ্ছিরি লাগছিল। তাঁর মতে, যে-সব আত্মীয়স্বজন গরিব-পাড়ার বাসিন্দা, তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাবার কোনও অর্থ হয় না। ভাবছিলুম, মামা নিজে যদি না আজ নয়াদিল্লির বাসিন্দা হতেন, যদি আজও সেই পুরনো পাড়াতেই পড়ে থাকতেন তিনি, এবং সেই কারণে আমরা যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না যেতুম, তাহলে তাঁর মনের অবস্থাটা কী হত! এত পালটে যায় মানুষ? তাও এত অল্প সময়ের মধ্যে?

সর্বক্ষণের জন্যে কাকার একটি ভৃত্য ছিল। তবু দুপুরের রান্নার ভার আমাদেরই নিতে হল। আমাদের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারটা ছিল বড় বিচিত্র। একালের মেয়েদের মতো নানা বিদ্যায় আমবা পটীয়সী নই। আমরা পিয়ানো বাজাতে পারি না, নাচতে জানি না, পুষ্পবিন্যাসের বিদ্যা আমরা শিখিনি, আধুনিক গৃহকর্ত্রীর যে-সব গুণ না থাকলেই নয়, তা আমাদের নেই। অন্যদিকে, রান্নাবান্না, ছেলেপুলে মানুষ করা কিংবা রোগীর শুশ্রূষা—তাও আমাদের শেখানো হয়নি। রান্নাবান্নার কাজ শিখতে আমার ভালই লাগত। কিন্তু বাবার তাতে সায় ছিল না। এই নিয়ে তিনি মাকে অনেক সময় বকাঝকা করতেন। অথচ, আমাদের রান্নাবান্না শেখাবার জন্যে মায়ের যে বিশেষ আগ্রহ ছিল, তাও নয়। বস্তুত, কোনদিনই তিনি আমাদের হেঁসেলে টানেননি। রান্না আমরা শিখবই বা কখন? গ্রীষ্মের ছুটিটা দীর্ঘ বটে, কিন্তু গরমের ঠেলায় প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত। আর শীতের ছুটিটা এতই সংক্ষিপ্ত যে, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যেত। আমাদের রান্নাঘরের ব্যবস্থা বরাবরই সেকেলে। মেঝেতে বসে রান্নাবান্না করতে হয়। তার উপরে কাঠের উনুন। ধোঁয়ার ঠেলায় চোখ দিয়ে জল গড়ায়। এই সব কারণে পারতপক্ষে আমাদের রান্নাঘরে যেতে দেওযা হত না। মাঝে-মাঝে অবশ্য বারান্দায় বসে কাঠকয়লাব উনুনে রান্নাবান্না করা হত। সেটা করা হত আমাদেরই শেখাবার জন্য। চতুর্দিকে ঝি-চাকব। তারা আমাদের সাহায্য করবার জন্য তৈরী হয়ে আছে। আমরা রান্না শিখছি। বেশী কিছু শেখা হয়নি। শৌখিন দু-চারটে পদ রাঁধতে পারতুম, এই মাত্র। তা ওই পর্যন্ত আমার দৌড়। রোজকার রান্না কী করে করতে হয়, জানতুম না।

কাকার বাড়িতে প্রাতরাশের পরেই আমরা রাঁধতে লেগে যাই। ঠাকুমা তখন জপ-তপ করেন। জপ-তপ শেষ হবার পরে তিনি আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, কিন্তু আমাদের কাজ ততক্ষণে প্রায় সমাধা হয়ে এসেছে। আমরা সাধারণত একটা তরকারি আর মাংস রাঁধতুম। আর ঠকুমা রাঁধতেন ডাল আর ভাত। রান্না করতে আমার ভালই লাগত। কিন্তু তার চাইতেও ভাল লাগত এইটে ভাবতে যে, হেঁসেলের ভার এখানে সর্বৈব আমাদের হাতে। ভৃত্যটির কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যেত না। বাসন মাজা, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা আর হাটবাজার করা, এই নিয়েই সে ব্যস্ত। ঠাকুমা তো দিদিকেই বেশী ভালবাসতেন। তা সেই ঠাকুমা একদিন বলে বসলেন যে, রান্নার দায়িত্বটা দিদির বদলে আমার হাতে থাকলেই তিনি বেশী নিশ্চিন্ত বোধ করেন। শুনে আমার আনন্দ আর ধরে না।

তখন ভর-গ্রীষ্মকাল। দারুণ গরম। বিকেলেও বাড়ির থেকে বার হওয়া যায় না। আমার আবার দিনে ঘুমোবার অভ্যেস নেই। ফলে আমার সময় যেন আর কাটতে চায় না। শোবার ঘরে, ফায়ারপ্লেসের সামনে, একগাদা বই পড়ে ছিল। তাতে ধুলো জমেছে, ঝুল পড়েছে। দেখেই বোঝা যায়, বইগুলোর যত্ন নেওয়া হয় না। কাকার এখন আর বইয়ের দিকে নজর নেই, ভৃত্যটির কাছেও এগুলো নেহাত জঞ্জাল মাত্র। বইগুলো আমি নেড়েচেড়ে দেখি, তারপর একখানা বই তুলে নিয়ে হঠাৎই এক জায়গায় খুলে সেখান থেকে শুরু করে দিই। পড়তে ভীষণ

ভাল লেগে যায়। ফলে গোড়ার থেকে ফের শুরু করি। এমন চিত্তাকর্ষক বই খুব কমই পড়েছি, শেষপর্যন্ত না পড়ে আমি থামতে পারি না। তারপর আবার সেখানা আদ্যন্ত পড়ি। এই লেখকের নাম আমি ইতিপূর্বে শুনিনি। বইখানা হচ্ছে রোমাঁ রোলাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফে'র অনুবাদ। কীরকম আকস্মিকভাবে যে মহা-শক্তিধর এক-একজন লেখকের বই আমার হাতে এসেছে, এবং লেখক যে বিখ্যাত তা না জেনেই কীভাবে যে সে-সব বই আমি পড়ে ফেলেছি, ভাবলে সত্যি অবাক লাগে। মনে হত, এ-সব লেখককে আমিই যেন আবিষ্কার করলুম। ডি. এচ. লরেন্সের রচনার সঙ্গেও ঠিক এইভাবেই আমার পরিচয়। সত্যি সেটা আবিষ্কারেরই পর্যায়ে পড়ে। আমার এক মাসী যখন তাঁর সুটকেশ গোছাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ একখানা বই আমার চোখে পড়ে যায়। বইখানার নাম "সন্স অ্যান্ড লাভার্স"। নাম দেখেই আমি আকৃষ্ট হই, এবং মাসীকে জিজ্ঞেস করি, বইখানা তিনি আমাকে ধার দিতে পারেন কিনা। মাসী প্রথমটায় একটু ইতস্তত করেছিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন, এত অল্প বয়সে এ-সব বই আমার পড়া উচিত হবে না। শেষপর্যন্ত অবশ্য বইখানা তিনি পড়তে দিলেন।

জাঁ ক্রিস্তফ ফ্রান্সের মর্মবাণীকে আবিষ্কার করেছিল। ভাবতুম যে, ওইভাবে কেউ ভারতের মর্মবাণী আবিষ্কার করে না কেন। 'জাঁ ক্রিস্তফে'র মধ্যে ফ্রান্স যেন জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করে, গোটা দেশটার হৃৎস্পন্দন ওই বইয়ের মধ্যে শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোনও ভারতীয় অথবা বিদেশীর শতো এমন বই নেই। কোনও বইয়ের মধ্যেই তো ভারতবর্ষের প্রাণসত্তা এমন পরিস্ফুট হয়নি। ভারতবর্ষের বিকৃত রূপ পরিবেষিত হয়েছে, এমন বই অবশ্য দেখতে পাই। ভাবি, ভারতবর্ষকে নিয়ে যদি কেউ 'জাঁ ক্রিস্তফে'র মত বই লিখতেন, তবে বড় ভাল হত। আহা, আমি যদি লিখতে পারতুম! কিন্তু অত শক্তি আমার কোথায়?

*   *   *

ইউরোপে ওদিকে যুদ্ধ চলছিল। যুদ্ধের প্রথম পর্যায় তখন উত্তীর্ণ। সংঘর্ষগুলি ক্রমেই আরও রক্তাক্ত হয়ে উঠছে। এপ্রিল মাসে হিটলার ডেনমার্ক দখল করেছিলেন ও নরওয়ে আক্রমণ করেছিলেন। তারপর থেকেই যুদ্ধের আগুন ক্রমে আরও লেলিহান হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু কৈলাস হোস্টেলে তা নিয়ে কারও বিশেষ চিন্তাভাবনা ছিল না, সেখানে সবাই তখন পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। হোস্টেলের কমনরুমে একখানা খবরের কাগজ রাখা হত; সেখানে গিয়ে আমি হেডলাইনগুলোর উপরে একবার চোখ বুলিয়ে আসতুম। এ আর কিছুই নয়, নিজেকে মোটামুটি ওয়াকিবহাল রাখা; খবরগুলি যে আমাকে বিশেষ ভাবিয়ে তুলত, এমন বলতে পারি না। মে মাসে আমি ছিলুম আগ্রায়। সেইসময়ে হিটলারের ঝটিকা-অভিযান শুরু হয়ে যায়। বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবুর্গ, একটার-পর-একটা জায়গায় আক্রমণ চালিয়ে তিনি সেগুলো দখল করে নিলেন। জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী অতঃপর উত্তর ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকে পড়ল। বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে, অবস্থা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। কাগজে রোজই দারুণ উত্তেজনাজনক সব খবর থাকে। তাই নিয়ে সকলে আলোচনাও করেন। বলতে গেলে যুদ্ধই তখন আলোচনার মুখ্য বিষয়। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সেই যুদ্ধের আঁচ তখনও আমাদের গায়ে লাগেনি। দিল্লি গিয়ে কিন্তু মনে হল যে, যুদ্ধের প্রভাবের তো একটা বৃত্ত থাকে, সেই বৃত্তের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছি। কাকা তো শেয়ার বেচাকেনা করেন। তা হিটলারের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় শেয়ারের দামও পড়ে যাচ্ছিল। সেই বিচারে যুদ্ধের ফলাফলের সঙ্গে কাকার ভাগ্য তখন একেবারে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত।

আমার কাকা অতি খোলামেলা স্বভাবের মানুষ। খুব সহজেই তিনি লোকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারেন। বন্ধুবান্ধব আর মক্কেলদের সঙ্গে টেলিফোনে তিনি ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কথা বলে যান, একবার যদি রিসিভার তুললেন তো সহজে নামান না। কথা বলেন, ঠাট্টাতামাশা করেন, এমন কী—গলার পর্দা উঁচুতে না-তুলে—তর্কাতর্কিও নেহাত কম করেন না। হাসিখুশী মানুষ, চট করে উত্তেজিত হবার পাত্র নন। কিন্তু দিনের মধ্যে একবার তো তিনি কলকাতার এক্সচেঞ্জ মার্কেটের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন; তখন তাঁর চেহারা যেন একেবারে পালটে যায়। কুঁজো হয়ে চেয়ারে বসে আছেন, পায়ের বুড়ো আঙুল গদির মধ্যে ডুবে গেছে, টেবিলের দিকে একটু কাত হয়ে নিজের শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখছেন, এবং ওই অবস্থায় ভীষণ চেঁচিয়ে কথা বলে যাচ্ছেন। তাঁর অফিস-ঘর থেকে রান্নাঘর তো বেশ খানিকটা দূরে, কিন্তু রান্নাঘর থেকেও তখন তাঁর গলা আমরা স্পষ্ট শুনতে পেতুম। ফ্ল্যাটের যেখানেই আমরা থাকি না কেন, কাকার উত্তেজিত গলা কানে এলেই আমরা বুঝতে পারতুম যে, কলকাতার সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। হিটলারের প্রতিটি অগ্রগতি, প্রতিটি আক্রমণের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছিল শেয়ার-বাজারের উপরে। মে মাসের শেষে ঘটল ডানকার্কের ঘটনা। কাকার পক্ষে সেটা দারুণ দুর্দিন। গ্রেট ব্রিটেন আর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে ইতালি এই সময়ে হিটলারের সঙ্গে যোগ দেয়। ফলে শেয়ার-বাজারের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। জার্মান ও ইতালীয় বাহিনীর যৌথ অভিযানের সঙ্গে-সঙ্গে শেয়ারের দাম হুহু করে পড়ে যেতে থাকে। কাকার মুখের হাসিটিও সেইসঙ্গে নিভে গেল। রাজনীতির ব্যাপারে আমি অচেতন নই। যুদ্ধের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারতুম। কিন্তু কাকাকে দেখেই তার তাৎপর্য যেন আরও ভাল করে হৃদয়ঙ্গম হল। ১৩ই জুন তারিখে জার্মান বাহিনী প্যারিস দখল করল। কাকার জীবনে সেটাই হল সবচেয়ে সংকটের দিন। কলকাতার স্টক-এক্সচেঞ্জ সেদিন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। কাকাও সেইসঙ্গে হতাশায় নিমজ্জিত হলেন। সর্বদা যে হাসিখুশী মানুষটি ঠাট্টাতামাশা করেন, গল্প করেন, তাঁর কথাবার্তায় সেই প্রাণবন্ত ভাবটা আর আমরা দেখতে পাই না। মুখের উপরে হাসিটিকে তিনি ধরে রাখবার চেষ্টা করেন ঠিকই, কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে, ভিতরে-ভিতরে তিনি ভেঙে পড়েছেন। তার হপ্তাখানেক বাদে নয়াদিল্লি থেকে আমরা লখনউ রওনা হই। মালপত্র নিয়ে বাবা ইতিমধ্যে লখনউয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

* * *

লখনউয়ে এসে বাবা যে বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন, সেটি বেশ ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন। দেখলেই বোঝা যায় যে, সদ্য নির্মিত হয়েছে। এর আগে যে-সব বাংলোয় আমরা থেকেছি, তার ছনের চাল। এই বাড়িটির ছাত কিন্তু পাকা। সামনে অতি সুন্দর ফুলের বাগান। পিছনেও এক টুকরো জমি রয়েছে, সেখানে শাক-সবজি ফলানো যায়। বেশ বড় বাড়ি। দিদি আর আমি তো আস্ত একটা স্যুইটই পেয়ে গেলুম। শোবার ঘর, তার সংলগ্ন ড্রেসিং রুম আর বাথরুম। এ শুধু আমাদেরই। বাড়িতে অতিথি এলে আমাদের ঘরটাই এতকাল তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হত; কিন্তু এখানে আর তার দরকার হবে না। বাবার এক সহকর্মী এই বাড়িটা তৈরী করিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, নিজেই এখানে থাকবেন। ভাড়া দেবার জন্যে বানাননি তো, তাই সর্বরকমের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রেখেছিলেন। সাধারণ ভাড়াবাড়িতে এতসব সুবিধে মেলে না। তার উপরে দেখলুম, বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক একটা রেফ্রিজারেটরও রেখে গিয়েছেন। এটা এখন আমাদেরই কাজে লাগবে। এর আগে এ-বস্তু কখনও ব্যবহার

করিনি।

ভাইটির বয়স তখন দু'-বছর। দিব্যি হাসিখুশী বাচ্চা। মাথাভর্তি কোঁকড়া-কোঁকড়া সোনালী চুল। তাকে নিয়ে খেলা করতে দারুণ মজা লাগে। বছর খানেক তো দূরে ছিলুম। বাড়ির লোকদের সম্পর্কে আমার অভিমান ইতিমধ্যে অনেকটা মিলিয়ে এসেছিল। আপনজনদের কাছে ফিরে এসে আমি তখন খুব খুশী।

* * *

গত বছর শুধুই অস্থিরতা আর উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। এই বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর কোনও নূতনত্বের স্বাদ পাই না। সবই কেমন একঘেয়ে লাগে। একঘেয়ে, গতানুগতিক। এমন কোনও অভিজ্ঞতা হয় না, যাতে আবার নতুন করে প্রেরণা পাওয়া যায়। কী উৎসাহ নিয়েই না এখানে পড়তে এসেছিলুম। সেক্ষেত্রে এখন যেন স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। মনে হয়, কী হবে পড়ে? ক্লাসে যেতে হয়, তাই যাই। লেকচার শুনতে হয়, তাই শুনি। পরীক্ষার জন্যে তৈরী হতে থাকি, কারণ চাকরি করতে হলে একটা ডিগরী পাওয়া দরকার। ক্লাসের পড়ানো সম্পর্কে, অধ্যাপকদের সম্পর্কে আর আমার কোনও মোহ নেই। সমস্ত-কিছু সম্পর্কেই আমি তখন সন্দিহান, নৈরাশ্যবাদী হয়ে উঠেছি। বিশ্ববিদ্যালযের পরিবেশ এর আগেও আমার মনের ক্ষুধা বিশেষ মেটাতে পারেনি। এখন সেক্ষেত্রে পরিবেশটাকে আরও খারাপ লাগে। তার একটা প্রধান কারণ এই যে, অধ্যাপকদের মধ্যে যে-দুজনকে আমার সবচেয়ে ভাল লাগত, তাঁরা আর তখন আমাদের পড়াচ্ছিলেন না। অধ্যাপক সিদ্ধান্ত আর অধ্যাপক মেননের জায়গায় অন্য দুজন অধ্যাপক আমাদের পড়াচ্ছিলেন। অধ্যাপক হিসেবে তাঁরা নেহাতই মামুলী। আদৌ উল্লেখযোগ্য নন।

রাম, শর্মা আব আশীর্বাদম্ যেন আমাদের ইষ্টমন্ত্র। এই তিনজনে মিলে রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের উপরে একখানা বই লিখেছিলেন। কিন্তু বইখানার নাম আমরা করতুম না; বলতুম—'রাম, শর্মা অ্যান্ড আশীর্বাদম্'। লেখকদের নামই যেন বইয়ের নাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা ক্লাসে যা পড়ানো হত, তাতে বই না-পড়লেও দিব্যি চলে যেত। বস্তুত ডঃ শর্মা তো আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্বের ক্লাস নিতেন; তাঁর পড়ানো মানে ওই বইয়ের থেকেই—অর্থাৎ যে-বইয়ের তিনি অন্যতম লেখক—গড়গড় করে পড়ে যাওয়া। ডঃ শর্মার পড়ানোব পদ্ধতি দেখে আমি আর আমার বন্ধুবান্ধবরা অবশ্য একটা ব্যাপারে খুব আশান্বিত হতুম। নিজেদের মধ্যে আমরা বলাবলি করতুম যে, উনিও যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে পারেন, তবে আমরাই বা পারব না কেন? কিংবা ওঁর পক্ষে যদি একখানা বই লেখা সম্ভব হয়, এবং সেই বই যদি ডিগরী ক্লাসের পাঠ্য হতে পারে, তবে আমরাই বা বই লিখতে পারব না কেন, এবং সেই বই-ই বা কেন বিশ্ববিদ্যালযের পাঠ্য হবে না? আমার মনের তখন সেই অবস্থা, সবকিছুকেই মানুষ যখন বাঁকা চোখে দেখে, সবকিছুকেই তার বিদ্রূপের লক্ষ্য করে তোলে। বলতে কী, এই বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গীই তখন আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে সাহায্য করছিল; এটুকুও যদি না থাকত, তাহলে হয়ত আমি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়তুম।

কত রকমের মনোবিকারই না আছে! পড়তে আমি ভালবাসি, তখনও বাসতুম, কিন্তু ওই বিদ্রূপাত্মক মনোভঙ্গীর জন্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে তখন আমি যেতুম না। লাইব্রেরি থেকে বই নেবার কার্ড করিয়েছি, কিন্তু সেই কার্ড যে একদম ফাঁকা, গোটা বছরে একখানা বইও যে আমি পড়তে নিইনি, তাতেই আমার গর্ব। না, রীডিং রুমে তো দূরের কথা, লাইব্রেরির ত্রিসীমানাতেও আমি যাব না! এ-সব কথা আমি গর্ব করে বলতুম। জাঁক করতুম যে, না পড়েই আমি পাশ করে যাব।

গত বছরে কৈলাস হোস্টেলে ছিলুম। তখন এক বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলুম আমি। বাড়িতে চিঠি লিখবার সময়ে প্রসংগত সে-কথা জানিয়েছিলুমও। খুবসম্ভব এও জানিয়েছিলুম যে, বিতর্কের বিষয় হচ্ছে বিবাহবিচ্ছেদ। "সভার মতে হিন্দু নারীদের বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া দরকার"—এই নিয়ে বিতর্ক হবে। কেউ এর পক্ষে বলবে, কেউ বিপক্ষে। তা এ-সব বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় কে কোন্ বিষয়ের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে বলল, সেটা আদৌ ধর্তব্য নয়, বলবার ক্ষমতা কার কীরকম, সেটাই বিচার্য। তাই, আমি এর পক্ষে বলব, না বিপক্ষে, বাড়িতে তা আর জানাবার দরকার বোধ করিনি। কিন্তু পরে শুনলুম, বাড়িতে নাকি এই ব্যাপার নিয়ে খুব আলোড়ন হয়েছিল। বছর দশেক আগে কে একজন কাশ্মীরী মেয়ে নাকি বিবাহবিচ্ছেদের সপক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিল। তাতে সবাই এত ক্ষুব্ধ বোধ করে যে, মেয়েটির জন্য পাত্র জোগাড় করা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত নাকি এমন ঘরে তার বিয়ে হয়, সামাজিক মর্যাদায় কন্যাপক্ষের চেয়ে যারা অনেক নিচু। তা আমার মা সেই মেয়েটিকে চিনতেন। তাই তাঁর আশংকা হল, আমার জন্যে পাত্র জোটানোও হয়ত এর ফলে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। খুবসম্ভব একটা চিঠি লিখে তিনি জানতেও চেয়েছিলেন যে, আমি বিবাহবিচ্ছেদের পক্ষে বলব, না বিপক্ষে। কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা যেহেতু আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাই উত্তরটা তাঁকে আর জানানো হয়নি। সেবারে বাড়ি যাবার পরে মা তো আমাকে সবিস্তারে সেই মেয়েটির দুর্দশার কথা বললেন। শুনে আমার কী যে বিচ্ছিরি লাগল, সে আর বলবার নয়। ঠিক করলুম, আর কখনও বিতর্ক-প্রতিযোগিতায় যোগই দেব না।

হয়ত ছেলেমানুষি, হয়ত বোকামি, কিংবা হয়ত দুই-ই; কিন্তু অস্বীকার করা যায় না যে, তিলে-তিলে নিজেকে ধ্বংস করার মধ্যেও এক ধরনের আনন্দ আছে। সন্দেহ নেই, নিজেকে ধ্বংস করার নেশা আমাকে পেয়ে বসেছিল। ঠিক করেছিলুম, বিতর্ক আর বক্তৃতার প্রতিযোগিতায় যোগ দেব না; ছাত্র-ইউনিয়নের সংগে কোনও সম্পর্ক রাখব না; বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনস্রোত থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখব। নিতান্ত সেইটুকু পড়াশুনো করব, ডিগরী পাবার জন্যে যেটুকু পড়াশুনো না করে উপায় নেই। সন্দেহ নেই, এ একধরনের আত্মহনন। সেণ্ট জন'স কলেজে যখন পড়তুম, কত উচ্চাশা তখন ছিল আমার, কত আকাঙ্ক্ষা। সেই আমি স্বেচ্ছায় সবকিছুর থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছি। এ যেন একটা প্রতিশোধ নেবার ব্যাপার। অথচ, কার উপরে এই প্রতিশোধ, কোন্ উদ্দেশ্য এতে চরিতার্থ হবে, তাও আমি ভেবে দেখছি না। ভেবে দেখবার গরজই আমার নেই। কে জানে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা-পদ্ধতি তখন চালু ছিল, নিজেকে ধ্বংস করার নেশায় মেতে বস্তুত তারই বিরুদ্ধে হয়ত আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছিলুম। কিন্তু সে-বিষয়ে যে আমি সচেতন ছিলুম, তাও নয়। নিজেকে প্রকাশ করবার সমস্ত পথই আমি তখন রুদ্ধ করে দিয়েছি। নিজেকে নিজেরই মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছি। বাইরে আমার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু ভিতরে-ভিতরে আমি পালটে গেছি। নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে নিজেকে বিচার করে দেখছি। বাইরে আমি হাসিখুশী। সেই হাস্যোজ্জ্বল চেহারাটাই সবাইকে আমি দেখাতে চাই। অথচ ভিতরে-ভিতরে আমি অন্য মানুষ। আমার দুঃখ, কেউ আমাকে বোঝে না। গোটা পৃথিবীর উপরেই আমি ক্ষুব্ধ। বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ আমার পরিবারের লোকজনদের উপরে।

*   *   *

বিমলা ছিল সহজ সরল মেয়ে। তবে খুব সতেজ, প্রাণবন্ত। সেকেলে রক্ষণশীল

পরিবারের মেয়ে, কিন্তু নিজে মোটেই গোঁড়া প্রকৃতির নয়। ছোট শহরের, স্কুল-কলেজের সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে সে লখনউয়ে এসেছিল। কিন্তু লখনউয়ে পড়তে এসে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের সঙ্গে খুব দ্রুত সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। বিমলার এক ভাই আমার সঙ্গে সেন্ট জন্‌স কলেজে পড়ত। বিমলা যে লখনউয়ে এসে বি.এ. ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হচ্ছে, সে-কথা তারই কাছে শুনি। বিমলাদের পরিবারের অনেককেই আমি চিনতুম। লখনউয়ে সে কাকার বাড়িতে থাকে। কাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজে পড়ান। বাড়িটা আমাদের পাড়াতেই। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়িতে ইতিপূর্বে বেশ-কয়েকবার তিনি এসেছেন। পারিবারিক বন্ধুত্বের ব্যাপার বললেই হয়। বিমলা এমন-কিছু মেধাবী নয়, তেমন কোনও গর্বও তার নেই। অন্যদিকে, তার মধ্যে সেই সারল্য আর আন্তরিকতা রয়েছে, যা অতি দুর্লভ। বস্তুত, তারই জন্যে তার প্রতি আমি আকৃষ্ট হয়েছিলুম। বিমলাকে দেখে মনে হত, বিয়ের পরে সে অতি নিপুণা গৃহিণী হবে। ঘরকন্নার কাজে আমার তো আদৌ উৎসাহ নেই। বিমলা কিন্তু ঘরকন্নার কাজ ভালবাসত। যেমন পড়াশুনো, তেমনি গৃহকর্ম, দুয়েই তার সমান উৎসাহ। রুচির ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ মিল ছিল না। তবু আমাদের মধ্যে সুন্দর একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পরস্পরের সঙ্গে গল্প করে আমরা কখনও ক্লান্ত বোধ করতুম না; পরস্পরের সান্নিধ্য আমাদের ভাল লাগত।

রিটাকে যখন প্রথম দেখি, তখন তার বয়স আট কি নয়। সেই রিটা এখন মেয়েদের কমনরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তার বয়স এখন আঠারো। ফ্রক-পরা যে মেয়েটিকে আমি দেখেছিলুম, তার পরনে এখন শাড়ি। চুলও এখন আর বব্‌-ছাঁটা নয়। লম্বা চুলে বিনুনি বেঁধেছে। অবাক হয়ে পরস্পরকে আমরা দেখছিলুম। রিটা আর আমার একই বয়স। মাথায় দুজনেই সমান-সমান। আমার চুল অবশ্য অনেক খাটো। ফিতে দিয়ে একটা ফাঁস এঁটে রাখি। আট ন' বছর রিটাকে দেখিনি। এত দীর্ঘ ব্যবধানে অনেক পুরনো সম্পর্কও শিথিল হয়ে যায়। তবু দুজনকেই দুজনের ভাল লেগেছিল নিশ্চয়, তাই নতুন করে আবার আমরা পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলুম। পাঠ্যতালিকার বাইরের বই পড়তে রিটার খুব আগ্রহ। এই ব্যাপারে আমাদের মধ্যে খুব মিল। তারই থেকে বন্ধুত্বের সূচনা। সংকীর্ণ সামাজিক পরিবেশের গণ্ডি ভেঙে সে বেরিয়ে এসেছিল, সামাজিক নানা সংস্কারের বাঁধন থেকে মুক্ত করে নিয়েছিল নিজেকে। দেখলুম, সব ব্যাপারেই তার দৃষ্টি অতি উদার। দুজনেই আমরা বই পড়তে আর মানুষের সঙ্গে মিশতে ভালবাসি। শাড়ি, প্রসাধন ইত্যাদি সব মেয়েলী ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ নেই। ছেলেদের সম্পর্কেও আমরা উদাসীন। রুচির এই মিলটাই ছিল আমাদের বন্ধুত্বের প্রাথমিক ভিত্তি। আবার অন্যান্য বিষয়ে আমাদের মধ্যে অনেক অমিলও ছিল। তার আর আমার পারিবারিক পটভূমি একেবারেই আলাদা। তবে দুজনেরই মনোভঙ্গী ছিল একটু বিদ্রূপাত্মক। আসলে ওই বাঁকা মনোভঙ্গিই যেন আমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রিটা আর বিমলা একই ক্লাসে পড়ত। খুব শিগগিরই তাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বও হয়ে যায়। অর্থাৎ আমরা ত্রয়ী হয়ে দাঁড়ালুম। কী নিয়ে তারা কথাবার্তা বলত, আমি জানি না। তবে এইটে বুঝতুম যে, তাদের মধ্যে বেশ মিল আছে। নয়ত তারা পরস্পরের এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারত না। এই একটা ব্যাপার লক্ষ করতুম যে, তিনজনের যে-কোনও দুজন এক জায়গায় থাকলেই কথাবার্তা বেশ জমে যেত; কিন্তু তৃতীয়জন এলেই হঠাৎ যেন ঝিমিয়ে পড়ত সবকিছু। তিনজনে মিলে আড্ডা দেব, বেড়াব, এইরকমের প্ল্যান অনেক সময় আঁটতুম; কিন্তু, কী জানি কেন, ব্যাপারটা ঠিক জমে উঠত না। ইংরেজীতে এইরকমের একটা প্রবাদ আছে যে, দুজনে বেশ

বন্ধুত্ব জমে, কিন্তু তিনজনে জমে না। ভাবতুম, ওটা নেহাতই কথার কথা; কিন্তু আমাদের দিয়েই বুঝতে পারলুম যে, কথাটা মোটেই মিথ্যে নয়। দুজনে বসে যখন গল্প করছে, যেন কোনও দৈবশক্তি তখন তৃতীয়জনকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেত। যখনই আমাদের তিনজনের কোথাও দেখাসাক্ষাৎ হত, তখনই দেখতুম, খানিক বাদেই একজন সেখান থেকে বিদায় নিচ্ছে। তা রিটা আর বিমলা একই ক্লাসে পড়ত তো, তাই দেখাসাক্ষাৎটাও ওদের মধ্যে বেশী হত। আমি যদি কখনও ওদের মধ্যে গিয়ে হাজির হতুম, খানিক বাদেই বিমলা সেখান থেকে উঠে পড়ত। বলত, "নাও, এবারে তোমরা তোমাদের উচ্চাঙ্গের আলোচনা চালাও, ও-সব তত্ত্বকথা আমার মাথায় ঢুকবে না, আমি চললুম।" কথাটা সে হাসিমুখেই বলত, তাতে কোনও বিরক্তির স্পর্শ লাগত না।

* * *

তাজিন সে-বছর মস্ত একটা ডিগবাজি খেয়েছিল। ছিল ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় সমর্থক; হল লীগপন্থী। খোলাখুলি মুসলিম লীগের সমর্থক হয়ে দাঁড়াল। সাম্প্রদায়িকতাকে আমি বরাবর ঘেন্না করেছি, তাকে অপরাধ বলে, পাপ বলে গণ্য করেছি। তাজিনকে ভোল পালটাতে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। ভাবি, কিসের জোরে মানুষ তাহলে মনুষ্যত্বে আস্থা রাখবে!

গান্ধীজীকেও আমি যেন আর ভাল করে বুঝে উঠতে পারছিলুম না। লবণ-সত্যাগ্রহের সময়ে আমি দারুণভাবে আলোড়িত হই। সেই আন্দোলনের একটা নাটকীয় আবেদন ছিল। যতই বড় হতে থাকি, 'স্বদেশী'র অর্থও ততই ভাল করে আমি হৃদয়ঙ্গম করতে থাকি। ১৯২৯ সনে মনে-মনে আমার মা এই সংকল্প করেছিলেন যে, 'স্বদেশী' ছাড়া অন্য কোনও বস্তু তিনি আর ব্যবহার করবেন না। সেই সংকল্প থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। সংকল্প করেছিলুম আমি আর দিদিও। এবং সেই সংকল্পের মর্যাদাও রেখেছিলুম। বাবা মাঝেমধ্যে বিলিতী জিনিস বাড়িতে নিয়ে আসতেন। তা তিনি তাঁর যা খুশি করুন, আমরা আমাদের সংকল্পে অটল ছিলুম। কিন্তু ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ নামে এই যে একটা নতুন আন্দোলন গান্ধীজী শুরু করবেন বলছেন, এটা আবার কী বস্তু? আমি তো এর কোনও অর্থই বুঝে উঠতে পারলুম না। তার উপরে আবার প্রথম সত্যাগ্রহী হিসেবে নামজাদা কোনও কংগ্রেস-নেতার পরিবর্তে গান্ধীজী যখন বিনোবা ভাবেকে নির্বাচিত করলেন (যাঁর নামই তখনও কেউ শোনেনি), গোটা আন্দোলনটাই আমার চোখে তখন হাস্যকর হয়ে দাঁড়াল। ছাত্র ইউনিয়ন, না ছাত্র ফেডারেশন, প্ল্যানটা যে কাদের মাথা থেকে বেরিয়েছিল, তা আর আজ আমার মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, যখনই কোনও নতুন সত্যাগ্রহী আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করতেন, তখনই একটা হুইশ্‌ল বাজিয়ে দেওয়া হত, এবং অধ্যাপকের লেকচারের মধ্যেই আমরা সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দু' মিনিট মৌনাবলম্বন করতুম। অধ্যাপকদের অনেকেই এই ব্যবস্থাটাকে হাসিমুখে মেনে নিয়েছিলেন; আমরা উঠে দাঁড়াবামাত্র তাঁরাও দু' মিনিটের জন্য বক্তৃতা থামাতেন। কেউ কেউ অবশ্য—তাঁরা যে খুব রাজভক্ত এইটে প্রমাণ করবার জন্যে—পালিয়েই যেতেন। ছেলেরা সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু তাঁদের বক্তৃতা তবু থামত না। ব্যাপারটা অবশ্য শিগগিরই একটা প্রহসন হয়ে দাঁড়াল। গভীর কোনও বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নয়, যেন বা একটা মজার খেলা হিসেবেই আমরা উঠে দাঁড়াতুম।

* * *

বাড়ির গাড়িতে করে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতুম। কিন্তু পেট্রোল দুর্লভ হয়ে ওঠায় ব্যবস্থাটা রদ হয়ে গেল। বাবা বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার জন্যে গাড়ি পাওয়া যাবে না। যুদ্ধের আঁচ সেই প্রথম আমি টের পাই। জার্মানি ইতিপূর্বেই—আগস্ট মাসে—গ্রেট ব্রিটেনকে ঘিরে সমুদ্রে একটা অবরোধ গড়ে তুলেছিল। রুমানিয়া জার্মানির দখলে চলে যাওয়ায় গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে পেট্রোলের আকাল দেখা দেয়। বাবা ভাবছিলেন সাইকেলে চেপে অফিসে গেলে কেমন হয়। কিন্তু যখন বুঝলেন যে, তাঁর পক্ষে সেটা অতি ধকলের ব্যাপার, তখন সাইকেলের বদলে সাইকেল-রিকশায় চেপে অফিসে আর ক্লাবে যেতে শুরু করলেন। বরাদ্দ পেট্রোলটুকু যত্ন করে জমিয়ে রাখা হত, পার্টিতে যাওয়া ইত্যাদি বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া গাড়ি বার করা হত না। এর আগে কোথাও যেতে হলে গাড়িতে লিফ্‌ট পেয়েছি; কিন্তু এখন আর পাই না। বাড়ির সবাই মিলে কোথাও গেলে তবেই গাড়ির সুবিধে মেলে। লখনউয়ে তখনও বাস কিংবা ওইরকমের কোনও সর্বজনের-ব্যবহার্য দ্রুতগামী যানবাহন চালু হয়নি। টোঙ্গা আর রিক্‌শার স্ট্যান্ডও আমাদের বাড়ি থেকে বেশ দূরে। তার উপরে আবার তার ভাড়াও বড্ড বেশী। ফলে কোথাও যেতে হলে হেঁটেই যেতে হয়।

লখনউয়ে প্রথম কফি হাউস চালু হয় ১৯৪০ সনে। বাস্‌, ছাত্রদের জীবনে অমনি একটা মস্ত পরিবর্তন ঘটে গেল। নিতান্ত একটা কফিখানা যে এত বড় একটা পরিবর্তন ঘটাতে পারে, এ আমার জানা ছিল না। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, শহরে যেন একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটে গেছে। পারি শহরে লাতিন কোয়ার্টারের যে ভূমিকা, লখনউয়ে দেখলুম এই কফিখানার ভূমিকা তার থেকে তুচ্ছ নয়।

আমাদের বাড়ি থেকে কৈলাস হোস্টেলের দূরত্ব অন্তত এক মাইল। সেখান থেকে অন্তত দেড় মাইল দূরে কফিখানা। কিন্তু তাতে আমি হতোদ্যম হবার পাত্র নই। বাড়ি থেকে হেঁটে কৈলাস হোস্টেলে চলে যেতুম, তারপর সেখান থেকে এক বন্ধুকে নিয়ে আবার সেই হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতুম কফিখানায়। সেখান থেকেও, বলা বাহুল্য, হেঁটে বাড়ি ফিরতে হত। অর্থাৎ রোজ বিকেলে অন্তত মাইল পাঁচেক পথ তখন আমি হেঁটেছি। আমি যে এতটাঃ শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করতে পারি, আগে তা জানতুম না। এখন জেনে বেশ-একটু তৃপ্তি হয। মনে হয, ক্লেশ স্বীকারের এই ক্ষমতা যেন আমাকে আর-একটু স্বাধীন করে দিয়েছে। আমি আত্মনির্ভর, স্বাবলম্বী, গাড়ির দাসত্ব স্বীকার না করলেও আমার দিব্যি চলে যায়। পরমুখাপেক্ষী না-হওয়াই তো স্বাধীনতা। আমি বুঝতে পারছিলুম যে, এটা একটা অধিবিদ্যামূলক ব্যাপার নয়, এটা একটা দার্শনিক সত্য। সেই সত্যটাকে আমি নিজের জীবনে উপলব্ধি করছিলুম। বুঝতে পারছিলুম, নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করার মধ্যেই মস্ত একটা মুক্তির স্বাদ রয়েছে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ত। দিদিকে কেউ নোয়াতে পারত না, তার কারণ ক্ষুধার দাসত্ব সে স্বীকার করেনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে না খেয়ে থাকতে পারত। সেক্ষেত্রে সহজেই যে আমি অন্যের ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করতুম, তার কারণ, আমি ছিলুম ক্ষুধার দাস, খিদে পেলেই আমি অস্থির হয়ে পড়তুম। এ সবই আমি বুঝতে পারছিলুম। সেইসঙ্গে এই সত্যটাও একটু-একটু করে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে, পয়সাকড়ি কিংবা জিনিসপত্রের চাহিদা আমি যতই কমিয়ে ফেলতে পারব, আমার উপরে বাবা-মা'র কর্তৃত্বও ততই কমে আসবে। যদি তাঁদের কাছে কোনও চাহিদাই আমার না থাকে, তবে তাঁরা আমাকে বশ্যতা স্বীকার করাবেন কীভাবে? আমি বুঝতে পারছিলুম যে, প্রয়োজনের মাত্রা কমিয়ে ফেলেও স্বাধীন হওয়া যায়। যদি কোনও প্রয়োজনই আমার না থাকে, তবে আর আমার কিসের ভয়?

ভিতরে-ভিতরে আমি তখন মত্ত। এই উপলব্ধি যেন আমার মধ্যে এক আশ্চর্য শক্তি সঞ্চার করল। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার আস্থা বেড়ে গেল। তুচ্ছ নানা বিষয়াসক্তি থেকে নিজেকে যদি একবার মুক্ত করে ফেলি, তবে তো আমি ইচ্ছেমতো চলতে পারব। যা করতে চাই, তা-ই করতে পারব। তবে আর আমার কিসের ভয়?

* * *

বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বছর শেষ হয়ে গেল। দিনে-দিনে সপ্তাহ যায়, সপ্তাহে-সপ্তাহে মাস। অথচ একঘেয়ে এই জীবনযাত্রায় কোনও পরিবর্তন ঘটে না। এমন কোনও ঘটনাই ঘটে না, চিত্তকে যা আলোড়িত করতে পারে, কিংবা স্মৃতির মধ্যে যাকে ঠাঁই দেওয়া যায়।

বাড়ির জীবনযাত্রাও গতানুগতিক। একটু-একটু করে তার মধ্যে আমি জড়িয়ে যেতে লাগলুম। সামাজিক দায়দায়িত্ব পালন না করে উপায় নেই, তাই পালন করি। আমাদের আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা কম নয়। তার উপরে আছেন আত্মীয়দের আত্মীয়েরা। রবিবারে-রবিবারে এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে তাঁদের আড্ডা বসে যায়। আমরাও সেখানে জুটে যাই। দুপুরের খাওয়া এগোরোটা নাগাদ চুকে যায়। তারপর বসে মজলিশ। চলে বিকেল অব্দি। খুব তাস খেলা হয়। প্রায় সবাই রামি খেলেন। যাঁরা আর-একটু কড়া খেলার পক্ষপাতী, তাঁদের আলাদা আড্ডা বসে। সেখানে চলে ফ্লাশ কিংবা পোকার। এ যখনকার কথা, পোকার খেলার ফ্যাশনটা তখন একটু-একটু করে চালু হচ্ছিল। খেলার শেষে চা খাওয়া হয়। তারপর যে যার বাড়ি ফিরে যাই। সন্তুষ্ট চিত্তে ভাবতে থাকি, যাক্, সবাই মিলে বেশ একটা দিন আনন্দে কাটানো গেল।

* * *

আমাদের বিবাহ-অনুষ্ঠানে পাত্রের কাছে কন্যাকে সম্প্রদান করা হয়। অর্থাৎ কন্যা হচ্ছে দান করবার সামগ্রী। এবং দানের জিনিস, কে না জানে, ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। রক্ষণশীল, গোঁড়া পরিবারের মানুষরা এই দানের ব্যাপারটার একেবারে আক্ষরিক অর্থ করেন। কন্যার বাড়িতে তাঁরা কখনও রাত্রিবাস করেন না। সেখানে কোনও আহার্যও গ্রহণ করেন না। ছেলের ক্ষেত্রে কিন্তু উল্টো নিয়ম। ছেলে হচ্ছে নিজস্ব জিনিস; সুতরাং বাবা-মা'র অধিকার আছে ছেলের বাড়িতে থাকবার। বস্তুত, ছেলের বাড়িকে তাঁরা নিজেদেরই বাড়ি বলে গণ্য করেন। নানীর তো ছেলে নেই, তাই তাঁর থাকবার কোনও আশ্রয় নেই। তিনি প্রাচীনপন্থী মানুষ, তাই মেয়ের বাড়িতে থাকতে তাঁর বিষম আপত্তি। টাকা দিয়ে থাকলে অবশ্য নিজেকে কারও আশ্রিত বলে মনে হয় না, এদিকে নানীর কাছে টাকা নিতে বাবা আর মায়ের অস্বস্তিবোধ হয়। অথচ উপায়ই বা কী। শেষপর্যন্ত সাব্যস্ত হল, একেবারে উদ্বাস্তুর মতো নানী গিয়ে একা-একা মথুরায় পড়ে থাকবেন, তার চাইতে তিনি বরং তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী কিছু খরচা ধরে দিয়ে আমাদের বাড়িতেই থাকুন। নানী অতএব পেয়িং গেস্ট হয়ে আমাদের বাড়িতে রইলেন। তাতেও তাঁর অস্বস্তি। চিরটাকাল মেয়ের বাড়িতে কাটাবেন, তাও কি হয়? টাকা দিয়ে রয়েছেন, তবু নানীর অস্বস্তি যায় না। মাসকয়েক পরে-পরেই অন্য কোথাও গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসবার জন্যে তিনি ছটফট করতে থাকেন। নানীর ভাই তখন আর বেঁচে নেই। কিন্তু ভ্রাতৃবধূ বেঁচে আছেন। তাঁর কাছে গিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসবার জন্যে নানীকে তিনি খুব পীড়াপীড়ি করছিলেন। নানী তাই ঠিক করলেন, এলাহাবাদে তাঁর ভাইয়ের

বউয়ের কাছে বেড়াতে যাবেন। নানীর যেদিন এলাহাবাদ রওনা হবার কথা, সেদিন থেকে বড়দিনের ছুটির শুরু। আমিও তাই নানীর সঙ্গে এলাহাবাদ যাব বলে ঠিক করলুম। প্রায় চার বছর হল আমরা এলাহাবাদ ছেড়েছি। তারপর আর যাওয়া হয়নি। যাবার জন্যে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। নানীও আমাকে সঙ্গী পেয়ে খুব খুশী।

চলাফেরার ব্যাপারে লখনউয়ে আমার বেশ-কিছুটা স্বাধীনতা ছিল। কোথায় যাচ্ছি, বাবা-মা'র সেটা জানা থাকলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত, একা-একা আমার কোথাও যাওয়া নিয়ে তাঁদের কোনও আপত্তি হত না। সেক্ষেত্রে এলাহাবাদে আমার যে মামা-মামী থাকতেন, তাঁদের কোনও ছেলেপুলে না-থাকায় তাঁরা ঠিক বুঝে উঠতে পারতেন না যে, আমার বয়সী একটি মেয়ের ঠিক কতটা স্বাধীনতা পাওয়া উচিত। আমি তাঁদের বলেছিলুম যে, আমার বয়স আঠারো পেরিয়ে গেছে, সুতরাং আমাকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করবার কিছু নেই, কিন্তু মামী তাতে বললেন যে, এইটেই তো বিপজ্জনক বয়স, এই বয়সের মেয়েদের এত হুটপাট করে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়। তাঁর ধারণা, আমার বয়সে তাঁর যেটুকু স্বাধীনতা ছিল, আমারও ঠিক ততটাই থাকা উচিত। যে-মেয়ের বিয়ের বয়স হয়েছে, হঠাৎ তার দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ায় তাঁরা যেন একটু মুশকিলে পড়ে গিয়েছিলেন। উপরন্তু তাঁদের ধারণা, আমি একটু স্বেচ্ছাচারী ও চটুল স্বভাবের মেয়ে; ফলে, একা-একা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে যাব, এতে তাঁরা কিছুতেই রাজী হতে চান না। যাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাব, তারা সবাই মেয়ে-বন্ধু। কিন্তু, তাতে কী, মামা-মামী তবু গোঁ ধরে রইলেন যে, আমার একা-একা কোথাও যাওয়া চলবে না। শেষপর্যন্ত তাঁরা এই শর্তে রাজী হলেন যে, একা-একা যদি কোথাও যাই তো সন্ধের আগেই আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। নিতান্তই কোনও কারণে যদি সন্ধের আগে ফিরতে না পারি, তাহলে বন্ধুর বাবা-মাকে বলতে হবে যে, তাঁরা যেন কাউকে সঙ্গে দিয়ে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দেন।

এলাহাবাদে আমার অনেক বন্ধু। তারা এখনও জায়গা ছেড়ে নড়েনি। আত্মীয়-স্বজনও সেখানে নেহাত কম নেই। তাদের কারও-কারও সঙ্গে আমি নিজেই দেখা করতে ইচ্ছুক, আবার কারও-কারও সঙ্গে মা আমাকে দেখা করতে বলে দিয়েছেন।

পিপোও তখন এলাহাবাদে। সেইখানেই তার শ্বশুর-বাড়ি। একদিন সকালে পিপোর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। গিয়ে দেখি, বাড়ির সামনের বারান্দায় তার শ্বশুর পায়চারি করছেন। মনে হল, তিনি খুব উত্তেজিত। বললেন যে, পিপোর সঙ্গে দেখা করতে হলে বেশ-কিছুক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, তক্ষুনি দেখা হবার উপায় নেই। কথাটার অর্থ আমার বোধগম্য হল না। অসংলগ্নভাবে দু'-চারটে কথা বলেই ভদ্রলোক আবার দুম করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন। বোকার মতো আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম। খানিক বাদে বুঝতে পারা গেল, আসল ব্যাপারটা কী। পিপোর ঠিক তখনই একটি বাচ্চা হয়েছে। পিপো আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অথচ, কী আশ্চর্য, তার যে বাচ্চা হবে, এই খবরটাই আমি জানতুম না। ঠিক করলুম, পরে একদিন এসে পিপোর সঙ্গে দেখা করা যাবে। সেই অনুযায়ী ফিরে যাচ্ছি, এমন সময় ভিতর থেকে কে-একজন বেরিয়ে এসে আমাকে পিপোর কাছে নিয়ে গেলেন। পিপোর ঘরে অবশ্য ঢোকা গেল না, এ'রা তো খুব গোঁড়া, সর্বরকমের আচার-বিচার মান্য করে চলেন, তাই দরজায় দাঁড়িয়ে পিপোর সঙ্গে কথা বলতে হল। মনে হল, পিপো অনেক দূরে সরে গেছে। যা হোক, ওই অবস্থায় তো আর বেশীক্ষণ কথাবার্তা বলা চলে না, তাই মামুলী দু'-চারটে কথা বলেই পালিয়ে এলুম। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল আমার। বুঝতে পারছিলুম, পরস্পরের কাছ থেকে আমরা অনেক

দূরে চলে এসেছি, সেই বন্ধুত্বকে আর কখনও ফিরে পাওয়া যাবে না।

এলাহাবাদের এক বন্ধু একদিন রাত্তিরে তাদের বাড়িতে খাবার জন্যে আমাকে নেমন্তন্ন করে। ফেরার ব্যাপার নিয়ে পাছে সমস্যা দেখা দেয়, এবং সেই কারণে পাছে আমার যাওয়া না হয়, তাই বন্ধুটি প্রস্তাব করেছিল যে, রাত্তিরে যেন তাদের ওখানেই থাকি। পাশাপাশি দুই ভাইয়ের দুটি বাড়ি, মাঝখানে এজমালি লন, দুই ভাইয়ের দুই মেয়ে আমার সঙ্গে ক্রসথোয়েটে পড়ত, দুজনেই আমার বন্ধু। সেদিন খুব মজা হল, সারাটা সন্ধে খুব ফুর্তিতে কাটালুম। শেষপর্যন্ত ঠিক হল, বাড়িতে তাদের আরও তো ভাইবোন ছিল, সবাই মিলে একঘরে শোওয়া হবে। খাটের থেকে গদিগুলোকে মেঝেতে নামিয়ে মস্ত করে বিছানা পাতা হল। সে-রাত্তিরে আর ঘুমই হল না, প্রায় ভোর অব্দি সবাই গল্প করে কাটালুম।

ডিসেমবরের রাত, কনকনে ঠান্ডা পড়েছিল। গদিটাই যথেষ্ট পুরু ছিল না, নাকি আমার শরীর থেকে লেপ-কম্বল সরে গিয়েছিল, কী জানি, হঠাৎ দেখি, আমার পেটের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। বুঝলুম, মারাত্মক ঠান্ডা লেগেছে। যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়তে লাগল। বাড়িতে যখন পৌঁছলুম, তখন আর আমার দাঁড়িয়ে থাকবার শক্তি নেই, পেটের মধ্যে ভীষণ মোচড় দিচ্ছে। সে-রাত্রে বার বার ঘর আর বাথরুম করতে হয়। ঠান্ডা, কনকনে জল। বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে ফিরে আসতে আসতে দেখি, বিছানাও যেন বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছে। এমন দুঃসহ রাত্রি আমার জীবনে ইতিপূর্বে আর কখনও আসেনি। তাও এমন সময়ে এল, যখন আমি মা-বাবার কাছ থেকে দূরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে উঠেছি। কী যে খারাপ লাগছিল, তা আর বলবার নয়। আমার ছুটিও ইতিমধ্যে ফুরিয়ে এসেছিল। নানীর আবও কিছুদিন এলাহাবাদে থাকবার কথা, অথচ, এই অবস্থায়, আমাকে তো আর একা-একা লখনউয়ে যেতে দেওয়া যায় না। পারিবারিক জনাকয় বন্ধুও সেইসময়ে এলাহাবাদে এসেছিলেন। ঠিক হল, তাঁরা তো মোটরে করে লখনউয়ে ফিরবেন, আমিও তাঁদের সঙ্গে ফিরব। তা সেইদিন সকালেই তাঁদের লখনউয়ে রওনা হবার কথা। ভাবছিলুম, শরীরেব এই অবস্থায় তাঁদের সঙ্গে যাব কী করে।

অথচ, না গেলে যে সমস্যা আরও বাড়বে, নানী সেটা বুঝতে পারছিলেন। এঁদের সঙ্গে যাবার সুযোগ যদি ছেড়ে দিই, তো পরে হয়ত কোনও সঙ্গীই পাওয়া যাবে না। এই অবস্থায় তো একা ফেরা সম্ভব নয়। তাহলে? নানী আমার হাতে এক টুকরো কলা তুলে দিয়ে বললেন, আমাশার পক্ষে কলা খুব উপকারী। এ-সব তুকতাকে আমার বিশ্বাস নেই, তবু নানী যখন দিয়েছেন, তখন কী আব করি, কলার টুকরো তো খেয়ে ফেললুম। তার আধ ঘন্টা বাদে নানী বললেন, কেমন, একটু সুস্থ বোধ করছি কিনা। বললুম, একটুও না। তাতে নানী একটু চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কলার টুকবোটা আমি খেয়েছিলুম তো। বললুম, "হ্যাঁ, খেয়েছি। তবে কলার মধ্যে কী যেন একটা ছিল, সেটা খুব তেতো লাগল, সেটা ফেলে দিয়েছি।" তাতে একগাল হেসে নানী বললেন, বাচ্চলে, সেটাই তো ওষুধ। জিনিসটা কী, জিজ্ঞেস করতে একটু ইতস্তত করে নানী বললেন, কলার মধ্যে তিনি একটু আফিং পুরে দিয়েছিলেন। বলে আর-একটু আফিং বার করে আমাকে খাইয়ে দিলেন। তাতে যেন মন্ত্রের মতন কাজ হল। এলাহাবাদ থেকে লখনউ—মোটরে তা প্রায় চার-পাঁচ ঘন্টার পথ। সেই দীর্ঘ পথের মধ্যে একবারও আমি অস্বস্তি বোধ করিনি।

তবে তখনকার মতন উপশম হলেও, রোগটা আমাকে ছেড়ে গেল না। ফিরে-ফিরে আমাকে আক্রমণ করতে লাগল। দশ-পনর দিন ভালভাবে কাটে, তারপরেই হঠাৎ আবার অসুস্থ হয়ে পড়ি। ওষুধের ব্যবস্থা হল, পথ্যেরও খুব কড়াকড়ি চলতে লাগল। তাতে একটু সুস্থও হয়ে উঠলুম। কিন্তু সেও বেশীদিনের জন্য নয়। সারাক্ষণ ভয়ে-ভয়ে

থাকি, এই বুঝি আবার রোগের খপ্পরে পড়তে হয়। সেইসময়ে আমার একটু-একটু জ্বরও হতে থাকে। অথচ বাবা-মা'র দেখলুম তা নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ নেই, ভাল করে রোগ পরীক্ষা করাবার কোনও ব্যবস্থাই তাঁরা করলেন না। আমি কি চেয়েছিলুম যে, সবাই সব কাজকর্ম ফেলে শুধু আমাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকুক? না, তা আমি চাইনি। কিন্তু আমার ফাইনাল পরীক্ষার দিন ওদিকে ক্রমেই এগিয়ে আসছিল, এবং বার বার অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমার পড়াশুনোর খুব বিঘ্ন ঘটছিল। পরীক্ষার মধ্যেও যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি, এই কথা ভেবে আমি ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। এবং মনের দিক থেকে এইভাবে ভেঙে পড়বার ফলেই যে আমার অসুখের প্রকোপ আরও বেড়ে যাচ্ছিল, তাতেও সন্দেহ নেই। দিনে-দিনে আমি খিটখিটে হয়ে উঠছিলুম। সেই অবস্থায়, একদিন আমি মায়ের কাছে যাই। নিজেকে এতই অসহায় লাগছিল যে, আমার মেজাজ তখন মোটেই ভাল নয়। চড়া গলায় মাকে আমি বলি যে, আমার শরীর খুব খারাপ; যাতে আমি সেরে উঠি, তার জন্যে কিছু-একটা তাঁদের করা দরকার। আমার সেই রুক্ষ কণ্ঠস্বরে মা খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন নিশ্চয়। বিরক্তিভরে তিনি বললেন যে, আমি পাগলামি শুরু করেছি।

শুনে আমি ভীষণ আহত বোধ করেছিলুম। সহানুভূতির অভাব আমার কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্তু তাই বলে আমি ভাবতেও পারিনি যে, এই গুরুতর ব্যাপারটাকে মা স্রেফ 'পাগলামি' বলে উড়িয়ে দেবেন। অপমানে আমার কান যেন ঝাঁঝাঁ করতে লাগল। মনে আছে, সেদিন খুব রেগে গিয়েছিলুম। প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, মরে যাই, সেও ভাল, তবু আর কখনো মাকে আমার অসুখের বিষয়ে কিছু বলতে যাব না।

মার্চ মাসের গোড়ার দিকের কথা। পরীক্ষার আগে তো তৈরী হবার জন্যে কিছুদিনের ছুটি পাওয়া যায়। দিদির আর আমার তখন ছুটি চলছিল। ঘরের মধ্যে বসে আমরা পড়ছিলুম। সেদিন সকাল থেকেই আমার শরীর খারাপ। বুঝতে পারছিলুম, অসুখটা আবার ফিরে আসছে। কিন্তু আমি কাউকে কিছু বলিনি। ছোট ভাইটা বার বার ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে, আমাদের পড়ায় বিঘ্ন ঘটায়। হয়ত সেইজন্যেই ঘরের দরজায় খিল দিয়ে আমরা পড়ছিলুম। পড়তে-পড়তে আমি উঠে দাঁড়াই। বাইরে যাব। দরজা খুলতে চেষ্টা করলুম। পারলুম না। মনে হল, আমার হাত দুখানা যেন অশক্ত হয়ে গেছে! খিলটা খুলবার মত শক্তিও আর আমার নেই। দিদিকে ডাকলুম। দরজা খুলে দিতে বললুম। দিদি মুখ তুলে তাকাল। দরজার ঠিক সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। দিদিই বরং দূরে। জানালার কাছে। অবাক হয়ে দিদি বলল, "বা রে, তুই নিজেই কেন দরজাটা খুলে নিচ্ছিস না?"

মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল। হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিলুম। খিলের উপরে হাত রাখলুম। তারপরেই দু' চোখে অন্ধকার নামল আমার। মেঝের উপরে পড়ে গেলুম। দিদি কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। উত্তেজিত হয়ে সে চেঁচাতে লাগল। বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগল, কী হয়েছে, অমন করছিস কেন, তোর কী হয়েছে?

দিদির প্রতিটি কথাই আমি শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু আমার উত্তর দেবার শক্তি নেই। মুখ খুললুম, কিন্তু একটি শব্দও আমার মুখ থেকে বার হল না। হাত নেড়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম যে, আমি জ্ঞান হারাইনি, আমি ঠিকই আছি। দিদি আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল, যাতে আমি উঠে দাঁড়াতে পারি। কিন্তু তখন আর আমার মাথা ঘুরছিল না। বিনা সাহায্যেই আমি উঠে দাঁড়ালুম। বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলুম। ভিতরে-ভিতরে তখনও আমি কাঁপছি। একটু বাদেই আবার মাথা ঘুরে উঠল আমার। ক্লাশের চেনে হাত রেখেছিলুম। সেই অবস্থাতেই আবার আমি বাথরুমের মেঝের পড়ে যাই। দিদিও তক্ষুনি মাকে সঙ্গে নিয়ে বাথরুমে এসে ঢোকে।

দুজনে মিলে ধরাধরি করে আমাকে ঘরে নিয়ে আসে, বিছানায় শুইয়ে দেয়। মা আর দেরি করলেন না। ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন।

তার কয়েক দিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠি। পরীক্ষার জন্যে নতুন করে আবার তৈরী হতে থাকি। কিন্তু সম্পর্কে ইতিমধ্যে ফাটল ধরে গিয়েছিল। আর তা জোড়া লাগল না।

* * *

হঠাৎ ঠিক হল, আমরা বাইরে যাব। চটপট সব গুছিয়ে নেওয়া হল। মা, দিদি আর আমি মুসৌরি রওনা হয়ে গেলুম। এর আগে আর কখনও আমরা বাবাকে সঙ্গে না-নিয়ে কোথাও এইভাবে ছুটি কাটাতে যাইনি। আমার তাই অস্বস্তি হচ্ছিল। বাবা কিন্তু হেসেই আমার অস্বস্তিটাকে উড়িয়ে দিলেন; বললেন, দিন কয়েক যাক, তারপর তিনি ক্যাজুয়াল লীভ্ নিয়ে আমাদের কাছ থেকে ঘুরে আসবেন। বাবাকে সঙ্গে না নিয়ে মা কক্ষনো কোথাও যেতে চাইতেন না। এবারে তার ব্যতিক্রম ঘটতে দেখলুম। মা কোনও আপত্তি তুললেন না। এই ঘটনার অনেক অনেক বছর বাদে জানতে পারি. আসল ব্যাপারটা কী? আমি যে বার বার অসুখে পড়ছি, এইটে দেখে মা আর বাবা নাকি দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের আশঙ্কা হয়েছিল, আমার হয়ত যক্ষ্মা হতে পারে। সেইজন্যেই বাবা আমার হাওয়া-বদলের ব্যবস্থা করেন; চটপট সবকিছু ঠিক করে ফেলে মা আর দিদির সঙ্গে আমাকে পাহাড়ে পাঠিয়ে দেন। এখন ভাবি, তখনই যদি কথাটা তাঁরা আমাকে বলতেন, তাহলে কত ভাল লাগত আমার। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কত সুন্দর হয়ে উঠত। অসুখকে সেক্ষেত্রে আমি একটুও ভয় পেতুম না, বরং বাবা আর মা যে আমার জন্য উদ্বিগ্ন, এইটে জেনে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করতুম। পরস্পরকে ভুল বুঝে আমরা প্রত্যেকেই তো যন্ত্রণা ভোগ করছি। সেই যন্ত্রণায় তাহলে আমাদের ভুগতে হত না।

মুসৌরিতে বাবার এক মামা থাকেন। তিনি কাশ্মীরী হোটেলের মালিক ও পরিচালক। সেই হোটেলের কাছেই আমরা একটা কটেজ ভাড়া নিই। প্রায়ই আমরা হোটেলে যেতুম। হোটেলটা একেবারে শহরের কেন্দ্রে। সেখানে গেলে সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। মুসৌরিতে যত হোটেল আছে, তার মধ্যে এই হোটেলটার অবস্থান একেবারে সেরা জায়গায়। হোটেলের সামনের দিককার ছাতে বসে মনে হত, গোটা মুসৌরি যেন চোখের সামনে মিছিল করে চলেছে। এ যখনকার কথা বলছি, শৈলাবাস হিসেবে মুসৌরির তখন দারুণ খ্যাতি। বড়লোকেরা সবাই সেখানে বেড়াতে যান। গ্রীষ্মকালে রাজা-মহারাজাদের ভিড় লেগে যায়। কায়দা-করে-বানানো সব রিকশা, উর্দি-পরা ছয় কি আট বেহারা তাকে টানে, তার উপরে আয়েস করে বসে থাকেন রানী-মহারানীরা। তাঁদের পরনে চওড়া-পেড়ে শিফনের শাড়ি। তাঁদের অলঙ্কারে হীরে, চুনি আর পান্নার ছড়াছড়ি। বিলাস-বৈভবের চমক ছড়িয়ে তাঁরা চলে যান।

কে যেন বলেছিল, ছাতে বসে-বসে ঐশ্বর্যের এই সমারোহ দেখতে তার ভাল লাগে না, বড্ড হিংসে হয়। শুনে তো আমি অবাক। যারা আমার সম-পর্যায়ের লোক, তাদের হয়তো আমি হিংসে করতে পারি. এদের কেন করব? এদের তো আমার সত্যিকারের রক্ত-মাংসের মানুষ বলেই মনে হয় না। মঞ্চ কিংবা চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা বলে মনে হয়। আর তা ছাড়া, যতই ঐশ্বর্যশালী হোক, এরা নেহাতই সেকেলে। এদের দিন তো ফুরিয়ে গেছে, এদের জগৎ শিগগিরই চুরমার হয়ে ধসে পড়বে। এককালে হয়ত এরাই ছিল সমাজের মুকুট-মণি। কিন্তু সে-দিন আর নেই। খুব শিগগিরই এরা জাদুঘরের সামগ্রী হয়ে উঠবে।

*   *   *

ডাণ্ডিতে চড়ে, প্রায় রোজই, একটি তরুণী সেই হোটেলে আসতেন, মনে পড়ে। তাঁর পাশে-পাশে হেঁটে আসতেন খদ্দর-পরা একজন ভদ্রলোক। কৃশ মুখ, কিন্তু চোখ দুটি সেই তুলনায় খুব বড় আর খুব সুন্দর; মনে পড়ে, তরুণীটিকে বড় পাণ্ডুর ও দুর্বল দেখাত। মনে হত, বড় ভঙ্গুর। তরুণীটি এসে পৌঁছবামাত্র সবাই তাঁর চারপাশে গিয়ে ভিড় করে দাঁড়াত। মনে হত, সবাই তাঁকে ভালবাসে, সবাই তাঁর জন্যে উদ্বিগ্ন। প্রত্যেকের স্নেহ ঝরে পড়ছে তাঁর উপরে। তরুণীটির বয়স তখন বছর তেইশ। কিন্তু দেখে আরও কম বলে মনে হয়। ভাবতুম, সবাই ওঁর এত বাধ্য কেন। কী জানি কেন, আমার মনে হত যে, এটা ঠিক নয়। আমি জানতুম যে, উনি জহরলাল নেহরুর কন্যা, মোতিলাল নেহরুর পৌত্রী। কিন্তু তাতে হয়েছে কী। ভাবতুম, বংশের কথা না ভেবে, প্রত্যেকের নিজস্ব গুণের কথা ভাবা উচিত। সেই অনুযায়ী তাঁর সংগে আচরণ করা উচিত।

সবাই তাঁকে নিয়ে বলাবলি করত। বলত, "বেচারা ইন্দু", "বেচারা কমলার মেয়ে", "আহা, মেয়েটা অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে"। "শুনেছি, ওরও নাকি যক্ষ্মা হয়েছে।" তক্ষুনি কেউ প্রতিবাদ করে বলত, "না না, তা নয়, ওর প্লুরিসি হয়েছিল।" মুসৌরিতে তিনি হাওয়া পালটাতে এসেছিলেন চটপট যাতে আবার স্বাস্থ্য ফিরে পান। প্রত্যেকেই প্রার্থনা করত, তাই হোক, চটপট উনি সুস্থ হয়ে উঠুন, মায়ের ব্যাধি ওঁকে যেন ছুঁতে না পারে। এই যে স্নেহ এই যে উদ্বেগ, এর অর্থ আমি বুঝতে পারতুম। কিন্তু সবাই যে কেন এত বশংবদ ভাব দেখায়, এত আতিশয্যই বা কেন সেটা বুঝতে পারতুম না। দেখে মনে হত, এ-সব ওঁকে স্পর্শ করে না এর প্রভাব থেকে উনি মুক্ত। কথা উনি খুব কম বলতেন, কিন্তু যেটুকু বলতেন, তার মধ্যে একটা গভীর আন্তরিকতার সুর বেজে উঠত। ওঁর বাক্যে আর আচরণে একটা সারল্য ফুটে উঠত। মনে পড়ে, আমি ওঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম, ওঁকে ভারী মধুর লেগেছিল। কিন্তু ওঁর প্রতি অন্যদের ওই বশংবদ ভাবটার কোনও অর্থই আমি বুঝতে পারতুম না। ওঁর সঙ্গে কি তখন আমি কথা বলেছি? কোনও টুকরো-কথাও আমার মনে পড়ে না। তা না-ই পড়ুক, রোজই তো পরস্পরকে দেখতে পেতুম আমরা। সেইসূত্রে আমাদের বেশ চেনা-পরিচয়ও হয়ে গিয়েছিল।

*   *   *

বাবা তো কথা দিয়েছিলেন যে, দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে মুসৌরিতে আসবেন। তা তিনি আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়ির অবস্থা একেবারে পালটে গেল। আমাদের কটেজে এতদিন নেহাতই দুটি খাট, একটি টেবিল আর একজোড়া চেয়ার ছাড়া আসবাবপত্র বলতে আর কিছু ছিল না। মেঝের উপর খানকয় গদি বিছিয়ে তার উপরে মা একটা সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু লখনউয়ে তাতেই বৈঠকখানার কাজ চলতে পারত হয়ত, মুসৌরিতে চলে না। মুসৌরিতে গিয়ে যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল, ইচ্ছে হত বাড়িতে তাদের আসতে বলি। কিন্তু বাড়িতে এনে তাদের বসতে দেব কোথায়? ফলে কাউকে আসতে বলতে পারতুম না। বাবা এসেই একটা সোফাসেট, একটা সেণ্টার টেবিল এবং আরও খানকয় আসবাবের ফরমাশ দিলেন। তার ফলে আমাদের ছোট্ট কটেজের চেহারা একেবারে ফিরে গেল। জায়গাটা আর-একটু বাসযোগ্যও হল। বাড়িতে একজন পুরুষ না থাকলে কি চলে? তার উপরে বাবাই হচ্ছেন গৃহকর্তা। তিনি না থাকায় বাড়িটা যেন ঠিক প্রাণ পাচ্ছিল না। এইবারে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

বাবার থাকায় আর না-থাকার যে কত ফারাক, সেবারে মুসৌরিতে সে-কথা ভাল করে বুঝতে পেরেছিলুম।

আমাদের এক কাকাও সেবারে মুসৌরিতে এসেছিলেন। তবে, আমাদের সঙ্গে না থেকে, তিনি অন্য জায়গায় থাকতেন। তিনি মোটামুটি আমাদেরই বয়সী, তাই তিনি আসায় আমাদের একজন সঙ্গী হল। তবে, বয়সের ব্যবধানের জন্য, আমাদের সঙ্গে মায়ের ঠিক মিশ খেত না। এবারে বাবা আসায় মায়েরও একটু ঘুরে বেড়াবার সুবিধে হল। আমরা আলাদা বেড়াতে বার হতুম। কাকা তার মাস কয়েক আগে একটা ইশকুলের চাকরি নিয়েছিলেন। তবে শিক্ষকের চাকরি তো, মাইনে বিশেষ পেতেন না। ফলে, একসঙ্গে বেড়াতে বার হলেই তো টুকিটাকি নানা খরচা হয়, সেটার ধাক্কা পুরোপুরি তাঁর ঘাড়ে পড়ুক, এটা আমরা চাইতুম না। ওদিকে খাবারের দোকান কি অন্য কোথাও ঢুকে সর্বসমক্ষে আমাদের খরচা যদি আমরা আলাদা-আলাদাভাবে দিই, তাতে তাঁর সম্মানে ঘা লাগে। তাই সাব্যস্ত হল, সর্বসমক্ষে তিনি সকলের হয়ে বিল মেটাবেন। তবে, আমাদের খরচাটা পরে আমরা তাঁকে দিয়ে দেব।

কাকার সঙ্গে সেবারে আমরা অনেক নাচ-ঘরে গিয়েছিলুম। তার মধ্যে 'হাক্‌মন্‌স'-এর তখন খুব নামডাক। নাচের ফাঁকে ফাঁকে ক্যাবারে-শো চলত। সেই প্রথম আমি প্রায়-নগ্ন নারী দেখি। শরীরটাকে এমনভাবে তারা ঘোরাত যে, যেটুকু অংশ আবৃত, তাও যেন অনাবৃত হয়ে পড়বে। স্ট্রিপটীজ ছাড়া বাদবাকী সব-রকমের অঙ্গভঙ্গীই তারা করত। লজ্জা না পেয়ে আমি সেইসব অনুষ্ঠান দেখতে শিখলুম। আমার বদ্ধমূল নানা সংস্কার একে-একে বিদায় নিতে লাগল। তবে এ-সব অনুষ্ঠান যে আমার ভাল লাগত, তা নয়। এর মধ্যে কোনও সৌন্দর্য অথবা শিল্প আমি খুঁজে পেতুম না। মজা লাগত না। বরং আমি অস্বস্তি বোধ করতুম।

তার আগে বেশ-কিছুদিন জ্যাজ্‌-এর ফ্যাশানটা খুব চালু ছিল। সে-বছরে কিন্তু লাতিন আমেরিকার নাচের খুব খাতির। রুম্বা তখন আসর জাঁকিয়ে বসেছে। তার সঙ্গে চলছে কঙ্গা আর লাকোঙ্গা। ছেলেবেলায় আমাদের একটা খেলা ছিল। শেষেরটা নাচ অনেকটা তারই মতো। তা দেখলুম, যে যত বুড়ো, সে-ই এ-নাচের তত ভক্ত। নাচ-ঘরে যারা এসে জমায়েত হত, তাদের মধ্যে অর্ধেক লোকই নাচতে জানে না। কোনক্রমে পা ফেলে তারা ঘুরে বেড়ায়। আমি বুঝতে পারতুম, নাচের আকর্ষণে এরা এখানে আসে না; নাচের ছলায় একজন নৃত্যসঙ্গিনীকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরা যায়, সেটাই এদের আকর্ষণ। আমাদের কটেজের পাশের কটেজে একটি মেয়ে থাকত। মোটামুটি আমাদেরই বয়সী। বেশ সুন্দরী, লাবণ্যময়ী মেয়ে। নাচ-ঘরে তাকে সর্বদাই একটা মোটা, তেল-চুকচুকে চেহারার মধ্যবয়সী লোকের নৃত্যসঙ্গিনী হতে দেখতুম। লোকটা একদম নাচতে জানে না, বলতে গেলে থপ্‌থপ্‌ করে পা ফেলে ফেলে হেঁটে বেড়ায়। কী বিসদৃশ ব্যাপার! কেন যে মেয়েটা রোজই ওই মোটা লোকটাকে সঙ্গী করে, ভেবে অবাক লাগত। পরে শুনি, লোকটা খুব ধনী; মেয়েটির মা তাই ওর সঙ্গে নাচতে মেয়েটিকে বাধ্য করে। শুনে আমি আঁতকে উঠি। মনে হয়, ওর মায়ের তুলনায় আমার মা অনেক ভাল।

সেইসময়ে আমি শুদ্ধ রাগ-সংগীতের খুব ভক্ত হয়ে পড়েছিলুম, এবং জ্যাজ আমার একটুও ভাল লাগত না। এখন মনে হয়, আপত্তির হেতুটা যে পুরোপুরি গুণগত ছিল, তা নয়; বিখ্যাত সব বুদ্ধিজীবীরা জ্যাজকে অতি শস্তা ও চটুল ব্যাপার বলে গণ্য করতেন তো, তা আমিও হয়ত সেই কারণেই জ্যাজকে বাতিল করেছিলুম। প্রাচীন ওয়াল্‌জের মধ্যে আমি একটা শিল্পশোভা খুঁজে পেতুম; তার বাজনা ও নৃত্যছন্দ, দুই-ই আমার খুব ভাল লাগত। রুম্বা সম্পর্কে মনে হত, এর

মধ্যে বেশ-একটা তাল, যতি আর উত্তেজনার ব্যাপার আছে। ফক্সট্রট জাতীয় আভিজাত্য নাচ সেক্ষেত্রে আমার বিরক্তিকর ঠেকত। নিজে না নেচে যদি দূরে থেকে শুধু দেখা যায়, তবে পোলকার তো কোনও তুলনাই হয় না। আমার এই কাকা নাচতে খুব ভালবাসতেন। আমরা সেক্ষেত্রে, কীভাবে নাচতে হয়, তা শিখবার পর্যন্ত চেষ্টা করিনি। তাতে তিনি অত্যন্ত নৈরাশ্য বোধ করতেন। এক-আধবার এমনও হয়েছে যে, জ্যাজের বাজনা শুনে দারুণ উত্তেজিত হয়ে তিনি আমাদের জোর করে নাচের ফ্লোরে টেনে নেবার চেষ্টা করেছেন। তাই দেখে, আমরা তো তাঁর জন্যে একজন নৃত্যসঙ্গিনী জোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। সে এক হাস্যকর ব্যাপার। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে একজন সঙ্গিনী আমরা জুটিয়ে দিতে পারিনি।

মুসৌরিতে অবকাশ-যাপন নিয়ে কাউকে কোনও সমস্যায় পড়তে হয় না। চিত্ত-বিনোদনের হরেক ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে। স্কেটিং দেখতে মাঝেমধ্যে আমরা রিংক-এ যেতুম। দিদির ইচ্ছে হয়েছিল, স্কেট করবে। কিন্তু একবার চেষ্টা করেই সে হাল ছেড়ে দেয়। স্কেট পায়ে হকি খেলা, আমার মনে হত, দারুণ মজার ব্যাপার। রেস্তোরাঁয় গিয়ে একদিন একটা কাণ্ড হয়েছিল। সেই কথা বলি। স্টেক যে কী বস্তু, আগে কখনও খেয়ে দেখা হয়নি, তাই মেনুর মধ্যে স্টেকের উল্লেখ দেখে আমি একটা অর্ডার দিয়ে বসলুম। তাই দেখে কাকা একটু অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকালেন, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। তারপর খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে যখন বেরিয়ে এসেছি, তখন বললেন, একটু আগে যে গোমাংস খেয়েছি, তা আমি জানি তো? সত্যি বলতে কী, স্টেক যে গোমাংস দিয়ে তৈরী করা হয়, তা আমি জানতুম না। আগে জানলে স্টেকের ফরমাশ দিতুম কিনা, সেটা সন্দেহের বিষয়। খুবসম্ভব দিতুম না। কিন্তু খেয়েই যখন ফেলেছি, তখন আর তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে লাভ কী। খুব একটা যে দুর্ভাবনায় পড়েছিলুম, এমন আমার মনে হয় না। কাকা তাই দেখে একটু হতাশ হলেন। তিনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন যে, গোমাংস খেয়েছি, এইটে জানবার পরে আমি ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে যাব। আগের দিন গোমাংস খেয়ে তারপর পরের দিন সে-কথা জেনে বমি করেছে, এমন লোকের কথাও আমি জানতুম। আমি সেক্ষেত্রে গোমাংসের সঙ্গে অন্য প্রাণীর মাংসের কোনও পার্থক্য বুঝি না। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে যখন পড়তুম, তখনকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। অর্থনীতির অধ্যাপক প্রসঙ্গত একদিন বলেছিলেন যে, বুড়ো ও রুগ্ণ গরুগুলোকে বাঁচিয়ে রেখে কোনও লাভ হয় না, সেটা নেহাতই লোকসানের ব্যাপার, তার চেয়ে সেগুলোকে মেরে ফেলাই ভাল। ক্লাসে তাই নিয়ে তুমুল আলোচনা হয়। অধ্যাপকের কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম, মনে পড়ে। গোহত্যার কথা বলা হচ্ছে বলেই যে আমি স্তম্ভিত হয়েছিলুম, তা কিন্তু নয়। আসলে আদৌ যে কোনও প্রাণীকে হত্যা করবার সুপারিশ করা হচ্ছে, তাতেই আমার বিস্ময়। সর্বরকমের যুক্তি শুনে এবং নিজেও এ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমার এই প্রত্যয় হয় যে, রুগ্ণ, অথর্ব জীবজন্তুকে বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে বরং মানুষকে বাঁচানো ভাল। যাই হোক, গোহত্যা আর অন্য-কোনও প্রাণী হত্যার মধ্যে কোনও তফাত আছে বলে কখনও আমার মনে হয়নি। হিন্দুদের পক্ষে অবশ্য নাস্তিক হবার চেয়েও বড় পাপ গোমাংসভক্ষণ। কিন্তু আমার এ-ব্যাপারে কোনও সংস্কার ছিল না। অর্থনীতির ক্লাসে সেই আলোচনার পরেই গোমাংস সম্পর্কে আমার সংস্কার কেটে যায়।

মুসৌরিতে থাকতে এখানে-ওখানে কয়েকবার আমরা চড়ুইভাতি করতে যাই। এক জায়গায় গিয়ে পড়েছিলুম জোঁকের খপ্পরে। ওঃ, সেখানে কী যে ফ্যাসাদে পড়েছিলুম, এখনও মনে পড়ে। টেনে ছাড়ানো যায় না, পেট পুরে রক্ত খেয়ে তারপর

আপনা থেকে জোঁকগুলো খসে-খসে পড়ে। চড়ুইভাতির জন্যে বনের মধ্যে খুব সুন্দর একটা জায়গা আমরা বাছাই করেছিলুম। পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে। নদীর শেষে জলপ্রপাত। কিন্তু জায়গাটা যে জোঁকে ভর্তি, তা আমরা জানতুম না। জোঁক আর জোঁক। গাছের ডালেও জোঁক। ডালপালা থেকে তারা আমাদের উপরে ঝরে পড়তে লাগল। নৈসর্গিক শোভা দেখে মুগ্ধ হব কী, তখন আমাদের অবস্থা অতি কাহিল। খাবারের প্যাকেটগুলো পর্যন্ত খোলা হল না, প্রাণপণে আমরা দৌড়তে লাগলুম। দৌড়তে দৌড়তে একটা বাড়ি দেখলুম। অনুমতি না নিয়েই সেই বাড়িতে আমরা ঢুকে পড়ি ও নুন চাই। বাড়ির বাসিন্দারা দেখলুম অতি সজ্জন। তবে তখন আমাদের যা অবস্থা, তাতে অতি বড় নিষ্ঠুর মানুষের মনেও বোধহয় দয়ার উদ্রেক হয়। যাই হোক্, বাড়ির লোকেরা তো চটপট আমাদের নুন এনে দিলেন। জোঁকের মুখে সেই নুন পড়তেই তারা আমাদের শরীর থেকে আল্‌গা হয়ে খসে পড়তে লাগল। যেমন প্রাচ্যে, তেমনি পাশ্চাত্যে অনেক সময় জোঁক লাগিয়ে নানা অসুখের চিকিৎসা করা হয়। এটা অনেককালের প্রথা। তা এই ভেবে আমরা সেদিন সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেছিলুম যে, জোঁক লাগবার ফলে আমাদের শরীরের দূষিত রক্ত বেরিয়ে গেছে, আমরা শুদ্ধ হয়ে উঠেছি।

মুসৌরিতে সেই সময়ে একটা ব্যাডমিণ্টন-চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন বেশ পাকা খেলোয়াড়। মিক্সড ডাবলসের জন্যে তিনি একজন সঙ্গিনী খুঁজছিলেন। আমাদের অনুরোধ জানাতে দিদি রাজী হয়ে গেল। কাকা এদিকে মিক্সড ডাবলসের খেলায় আমাকে সঙ্গিনী হতে বললেন। কিন্তু আমি রাজী হলুম না। আমার অত দম কোথায়। একটা গেম খেলেই আমি হাঁফিয়ে পড়ি। ভীষণ অবসন্ন লাগে। কাকার অনুরোধ তাই রক্ষা করা গেল না। রোজ অবশ্য খেলা দেখতে যেতুম। দিদি কাপ পেল। যাঁর সঙ্গিনী হয়ে সে খেলেছিল, তিনি তো ত্রিমুকুট জয় করলেন। সিংগ্‌লস, ডাবল্‌স, মিক্সড ডাব্‌ল্‌স, সমস্ত প্রতিযোগিতায় তিনি জয়ী। তা, এই উপলক্ষে আনন্দ করতে হবে তো। ঠিক হল, সবাই মিলে হাক্‌মন্‌স-এ যাওয়া হবে। পথে নামল তুমুল বৃষ্টি। শাড়ি জামা ভিজে একেবারে একশা। আপাদমস্তক ভিজে গেছি, চুল বেয়ে জল গড়াচ্ছে, হাতে মস্ত রুপোর কাপ, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে আমরা হাক্‌মন্‌স-এ গিয়ে ঢুকলুম। তা সেই রুপোর কাপে লেমোনেড ঢেলে সেদিন খাওয়া হয়েছিল। এমন আনন্দ করে খাচ্ছিলুম যেন শ্যামপেন খাওয়া হচ্ছে।

আমার এক মাসী এইসময়ে আমাদের কাছে কয়েকটা দিন কাটাবার জন্যে মুসৌরিতে আসেন। প্রায় সেই একই সময়ে হঠাৎ আগুন লেগে আমাদের রাঁধুনী খুব জখম হয়। রান্না, বাজার করা এবং অন্যান্য নানা গৃহকর্মের দায়িত্ব অতএব আমাদের উপরেই এসে পড়ল। ফলে, আগে তো প্রায়ই এখানে-ওখানে বেড়াতে যেতুম, এখন আর তা সম্ভব হয় না। তাই দেখে আমি একটা প্রস্তাব করলুম। বললুম যে, পর্যায়ক্রমে বেড়াতে বার হলেই তো হয়। চারজনের মধ্যে দুজনে ঘরের কাজ করবে, অন্য দুজন বেড়াতে যাবে। মায়ের কিন্তু তা পছন্দ নয়। তিনি বললেন, কেউ কাজ করছে আর কেউ বেড়াচ্ছে, এটা ঠিক হবে না। তার চেয়ে বরং সবাই মিলে চটপট ঘরের কাজ চুকিয়ে তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে বার হওয়া ভাল। তার ফলে দাঁড়াল এই যে, করবার মতো যথেষ্ট কাজ না থাকা সত্ত্বেও সবাইকে নাহক আটকা থাকতে হয়। তা ছাড়া, আমার এই মাসী তো কাজে খুব পটু। দারুণ চটপট কাজ করতে পারেন। রান্নাই হোক কিংবা অন্য-কোনও কাজই হোক, আমাদের সাহায্যের কোনও দরকারই তাঁর হয় না। তবু আমাকে বেকার বসে থাকতে হয়। বাইরে যাবার অনুমতি মেলে না। তাতে অবশ্য

আমার বিশেষ ক্ষতি হত না। তার কারণ, বার্নার্ড শয়ের সমগ্র রচনাবলীর দুটি ভল্যুম আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম। এর আগে তাঁর খানকয় নাটক ছাড়া অন্য-কিছু পড়িনি। এবারে সমস্ত রচনা পড়ে ফেলার সুযোগ পাওয়া গেল। একমাত্র আক্ষেপ, আরও বই কেন নিয়ে আসিনি।

* * *

মনের মধ্যে খুব ভয় নিয়ে আমি অধ্যাপক মেননের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। কিন্তু এমনভাবে তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন, যাতে মনে হল, বি.এ. ফাইন্যালে তৃতীয় শ্রেণী পাওয়া সত্ত্বেও আমার সম্পর্কে তাঁর ধারণা মোটামুটি ভালই আছে। সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় চিন্তা ছিল ঐচ্ছিক পেপার। অর্থাৎ তার বদলে অন্য-কিছুও নেওয়া যায়। কিন্তু আমি ওই বিষয়টাই নিতে চাইছিলুম। বিষয়টাতে আমার আগ্রহ তো আছেই; তার চেয়েও বড় কথা, অধ্যাপক মেনন এই পেপারটা পড়ান। প্রসঙ্গত তিনি বললেন যে, এম.এ.র সঙ্গে আমার আইনও পড়া উচিত। আইন পড়ে ব্যবহারজীবী হব, তার জন্যে নয়; আসলে এইজন্যে পড়তে হবে যে, আইন পড়লে চিন্তায় শৃঙ্খলা আসে, তা ছাড়া আইনের পাঠ না নিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান-সংক্রান্ত ধারণায় একটা ফাঁক থেকে যায়। বিষয় হিসেবে ওটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিপূরক। তা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী একইসঙ্গে আমি এম.এ. আর এলএল.বি. পড়তে পারি। আইন পড়ার জন্য আলাদা কয়েকটা বছর সময় দেবার দরকার হবে না।

আইনের ক্লাস বসে সন্ধের সময়। ছাত্ররা যাতে একইসঙ্গে এম.এ আর আইন পড়তে পারে, তারই জন্যে এই ব্যবস্থা। এলএল.বি. পরীক্ষা নিয়ে তখন কেউ বিশেষ মাথা ঘামাত না। অধিকাংশ ছাত্রই দেখেছি এম.এ.র পড়াটাই মন দিয়ে পড়ত। এম.এ. পরীক্ষা হত মার্চের শেষ সপ্তাহে। আর আইনের পরীক্ষা সেক্ষেত্রে মে মাসের আগে শুরু হত না। অর্থাৎ এম.এ পরীক্ষা দিয়ে তারপর আইনের পরীক্ষার জন্যে মোটামুটি পাঁচ সপ্তাহ সময় পাওয়া যেত। তা পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে তৈরী হয়ে যে পরীক্ষায় পাশ করা যায়, তা যে বিশেষ কঠিন পরীক্ষা এমন আমার মনে হয়নি। বস্তুত, আইনের পরীক্ষায় কাউকে ফেল করতেও দেখতুম না। কিন্তু আমি পড়লুম অন্য সমস্যায়। আইন পড়লে দিনে দুবার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতে হবে। সকালে এসে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাস করব, তারপর আইনের ক্লাস করতে ফের সন্ধ্যায় আর-একবার আসতে হবে। লেকচার শোনা হয়ত খুব জরুরী নয়, কিন্তু পার্সেন্টেজ তো ঠিক থাকা চাই। ছেলেরা প্রক্সির ব্যবস্থা করে, কিন্তু আমি মেয়ে, আমার পক্ষে তো আর প্রক্সির ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাহলে? অধ্যাপক মেননের মতামত সম্পর্কে আমার অসীম শ্রদ্ধা; তবু ভেবে দেখলুম, আইন পড়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। অসুখে আমার শরীর এতই ভেঙে গিয়েছিল যে, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম যে বিশেষ স্বীকার করতে পারব, নিজের উপরে এতটা আস্থা আর আমার ছিল না।

* * *

সেকালে শুধু পড়তে, লিখতে আর কিছুটা অঙ্ক করতে পারলেই মেয়েদের চলে যেত। কিন্তু দেশে তখন যে জাতীয় আন্দোলন চলছিল, শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের মনোভাব তার ফলে অনেক পালটে যায়। ইশকুলে-ইশকুলে ছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার মূল প্রেরণা ছিল ডিগ্রীলাভ। ডিগ্রী ছাড়া চাকরি মেলে না, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে উপায় নেই। কিন্তু মেয়েদের তো আর

চাকরি করবার দরকার নেই, তবে আর তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে কেন? অভিভাবকদের মনোভাব তখন ছিল মোটামুটি এইরকম। অন্তত মধ্যবিত্ত সমাজের বাবা-মা তখনও ভাবতেন যে, ঘরের মেয়েদের চাকরি করতে দেওয়াটা খুবই অমর্যাদার ব্যাপার। ঘরের মেয়ে চাকরি করে পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করছে, ভাবতেই যেন লজ্জায় তাঁদের মাথা কাটা যেত। অমন অমর্যাদা কোনও মধ্যবিত্ত পিতা সহ্য করতে রাজী ছিলেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া তবু যে মেয়ে-মহলে একটা ফ্যাশনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল, তার কারণ ভিন্ন। ভারতে ব্রিটেনের শাসন-নীতি ক্রমে পালটাচ্ছিল; বিশেষ করে ১৯১৯ সনের মণ্টেগু-চেম্সফোর্ড সংস্কারের পরে সেই পরিবর্তন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ-দেশের সামরিক ও অসামরিক চাকুরিগুলিতে ভারতীয়দের নিয়োগের পরিমাণ বাড়তে থাকে। বেশী-মাইনের পদগুলি তো ইতিপূর্বে ছিল সাহেবদেরই প্রায় একচেটিয়া। এখন তাতে ভারতীয়দের সংখ্যা ক্রমে বাড়ছিল। ফলে ভারতীয় আমলাদের মধ্যেও একটা আলাদা শ্রেণীর সৃষ্টি হল। আগে যে-সব ক্লাবে শুধু সাহেবদেরই প্রবেশাধিকার ছিল, এখন এই কুলীন-শ্রেণীর ভারতীয় আমলারাও সেখানে ঢুকতে পারে। ব্রিটিশ অফিসারদের সঙ্গে তাদের সামাজিক মেলামেশা চলতে লাগল। ফলে তাদের জীবন-রীতিও ক্রমেই পাশ্চাত্য-ঘেঁষা হয়ে উঠতে লাগল। এবং স্বভাবতই তখন তারা বিবাহের জন্য এমন মেয়ে খুঁজতে লাগল, তাদের এই পাশ্চাত্ত্য-ঘেঁষা জীবনের সঙ্গে যারা খাপ খাইয়ে নিতে পাবে। খোঁজ পড়ল সেই সব পাত্রীর, পুরুষদের সঙ্গে যারা সহজভাবে মেলামেশা করতে পারে, ক্লাবে গিয়ে তাস আর টেনিস খেলতে পারে, পাশ্চাত্ত্য রীতিতে পার্টির আয়োজন করতে পারে এবং গড়গড় করে ইংরেজী বলতে পারে। এখন এই নতুন ধরনের পাত্রীর খোঁজ পড়ায়, বিয়ের বাজারে শিক্ষিত মেয়েদের কদর অনেক বেড়ে গেল। মেয়ের জন্যে যাতে সুপাত্র জোটে, বাবারা তার জন্যে মেয়েদের কনভেণ্ট স্কুলে আর কলেজে পাঠাতে লাগলেন। মেয়েরা ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড় করতে লাগল। জ্ঞানার্জনের স্পৃহা নিয়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসত না; চাকরির যোগ্যতা অর্জনের জন্যেও না। লেখাপড়াতেও মেয়েরা যে ক্রমে-ক্রমে ভাল ফল দেখাতে লাগল, তার হেতুটা ভিন্ন। ছেলেদের মতো হরেক ব্যাপারে তারা মাথা ঘামায় না: যখন পড়তে আসে, তখন পড়াটাকেই মুখ্য ব্যাপার মনে করে। ফলে তাদের ফলও ভাল হয়। ডিগ্রী পাবার পরে তাদের কেউ-কেউ যে চাকরিতে ঢোকে না, তাও নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা দাঁড়ায় ওয়েটিং-রুমে বসে সময় কাটাবার মতো। বিয়ের গাড়িটা এলেই অমনি চাকরি-জীবনেরও ইতি হয়ে গেল।

দিদির অবস্থা দাঁড়িয়েছিল খাঁটি মধ্যবিত্ত ঘরের সেই মেয়েদের মতো, এস্কেলেটরে উঠে পড়বার পরে যারা আর নামতে পারে না, ক্রমাগত উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠে যেতে থাকে। এই করে করে সে তখন একেবারে চূড়োয় পৌঁছে গিয়েছে। এম.এ. পাশ করেছে। আর তো উঁচুতে উঠবার উপায় নেই। এখন তাহলে কী করবে? অন্য কোনও বিষয় নিয়ে আবার এম.এ. পড়বে? ডাব্ল এম.এ. হবে? সেটা নেহাতই অর্থহীন ব্যাপার। মা অতএব গোপনে-গোপনে দিদির জন্যে পাত্রের সন্ধান করতে লেগে গেলেন।

কিন্তু সামাজিক অবস্থা ধীরে-ধীরে পালটে যাচ্ছিল। সেইসঙ্গে পালটে যাচ্ছিল মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে, সম্বন্ধ করে বিয়ের ব্যবস্থা করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছিল। পাত্রদের এতকাল আলাদা মতামত বলতে কিছুই ছিল না। মা-বাবা যে-মেয়ে পছন্দ করতেন, বিনাবাক্যে তাকেই জীবনসঙ্গিনী বলে মেনে নেওয়া হত। কিন্তু এ-কালের ছেলেরা তো আর অত বাধ্য নয়, তারা নিজেরাই পাত্রী দেখতে চায়, আলাপ-আলোচনা করে জেনে নিতে চায় কাকে সে জীবনসঙ্গিনী করে নিতে চলেছে। ফলে পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ করিয়ে দেবার জন্যে চায়ের আসর চালু হল। তবে

অভিভাবকরাও সেখানে উপস্থিত থাকেন, তাঁদের সম্মুখে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে কথাবার্তা হয়। বেশির ভাগ ছেলেরা দেখল, বিয়ের আগে পাত্রীকে আদৌ দেখা যাবে না, তার চেয়ে এ বরং মন্দের ভাল। তবে স্বল্প-সময়ের এই কথাবার্তায় কার কতটুকুই বা জানা যায়। তাই ছেলেদের কেউ-কেউ বলতে লাগল, এটুকু যথেষ্ট নয়, বস্তুত এর কোনও অর্থই হয় না। এই নিরর্থক দেখাসাক্ষাতের চেয়ে বরং পাত্রী-নির্বাচনের ভার পুরোপুরি অভিভাবকদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া ভাল। তা ছাড়া পাত্র-পাত্রীর মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ করিয়ে দেবার পরে পাত্রীকে নাকচ করা অতি অস্বস্তিকর ব্যাপারও বটে। একবার যখন ইণ্টারভিউয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, তখন 'না' বলা কি সহজ? খোলাখুলিভাবে পাত্র যদি বলে যে, পাত্রী তার পছন্দ নয়, তবে পাত্রীর পক্ষে সেটা অসম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অন্তত আমাদের সমাজে এইভাবে কাউকে প্রত্যাখ্যান করা ঘোর অভদ্রতা বলে গণ্য হয়ে থাকে। কোনও মেয়েকে এইভাবে নাকচ করলে তার ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তোলা হয়। সবাইকে ভাববার সুযোগ দেওয়া হয় যে, মেয়েটার নিশ্চয় কোনও খুঁত আছে। তা ছাড়া, পাত্রেরও তো বোন থাকে। তাকেও তো পাত্রস্থ করতে হবে। কোনও ছেলে যদি পাত্রী দেখে ক্রমাগত নাকচ করতে থাকে, তো তার নিজের বোনের বিয়ের সম্ভাবনাও তাতে নষ্ট হবার আশঙ্কা। ফলে কোনও পাত্রীকে দেখে পাত্র কিংবা তার অভিভাবকদের যদি পছন্দ না হয়, তবে—সরাসরি যেহেতু 'না' বলতে পারে না, তাই—সম্ভব-অসম্ভব হরেক রকমের অজুহাত দেখিয়ে পিছিয়ে যায় তারা। এর থেকেই বোঝা যাবে যে, পাত্রী দেখার ব্যাপারটা কী জটিল ও অস্বস্তিজনক। কিন্তু এর বিকল্পই বা কোথায়। আমি অবশ্য সহজ একটা বিকল্প খুঁজে নিয়েছিলুম। ঠিক করেছিলুম যে, বিয়েই করব না।

বাড়িতে একদিন একটা টেলিগ্রাম এসে পৌঁছল। পড়ে জানা গেল, পরদিন সকালেই এক যুবক আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছচ্ছেন। আসলে এই ছেলেটির সঙ্গে দিদির বিয়েব কথাবার্তা চলছিল। সম্বন্ধটা এমন এক ভদ্রলোক এনেছিলেন, যিনি দু' পক্ষেরই আত্মীয়। তখনও অবশ্য পাকা কথাবার্তা হয়নি। টেলিগ্রাম পেয়ে মা বিরক্ত হলেন। ছেলে নিজেই মেয়ে দেখতে আমাদের বাড়িতে আসছে, এই একেলে ফ্যাশনটা মায়ের মনঃপুত হল না। তিনি আশা করেছিলেন, সোরগোল না তুলে চুপচাপ কোনও তৃতীয় পক্ষের বাড়িতে পাত্রকে মেয়ে দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু তখন আর টেলিগ্রাম করে ছেলেকে আটকাবার সময় নেই। তা ছাড়া সেটা খুব বুদ্ধির কাজও হত না। পরেব দিন রবিবার। সেই রবিবারে আবার আমাদের বাড়িতে বিস্তর আত্মীয়স্বজনের বেড়াতে আসবার কথা। তার মধ্যে যদি পাত্র এসে পড়ে, তবে ব্যাপারটা সবাই জেনে যাবে। মা এই জানাজানিটাই পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু উপায়ই বা কী? মা তো মহা অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন।

যাই হোক, সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হল না। পাত্রপক্ষ যে চাল চেলেছে, তার পাল্টা-চাল দিতে হবে; দেখাতে হবে, আমরাও কিছু কম আধুনিক নই। তাই বাবা আর মা করলেন কী, পাত্রকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে দিদিকে আর আমাকে রেল-স্টেশনে পাঠিয়ে দিলেন।

দাড়ি কামিয়ে, পোশাক পালটে রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁকে দেখে আমার ভালই লাগল। ছিপছিপে সুপুরুষ। গায়ের রঙ খুব ফরসা। চোখ আর চুলের রঙ বাদামী। চাউনিতে বেশ একটা প্রাণবন্ত ভাব রয়েছে। দেখে বেশ সপ্রতিভ বলে মনে হয়। গাড়িতে বসে দিব্যি কথাবার্তা বলতে লাগলেন। দিদি খুব লাজুক স্বভাবের মেয়ে, কিন্তু আমি তো তা নই। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমিও সেদিন একটু আড়ষ্ট বোধ করছিলুম। অথচ ভদ্রলোক খুব সহজভাবেই কথা বলছিলেন,

তাঁর চালচলনে একটুও আড়ষ্টতা ছিল না। তাই দেখে আমি তো একেবারে মুগ্ধ।

দুপুরের খাওয়ার পাট সেদিন চটপট চুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপরেই, লখনউয়ের সব দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো দেখিয়ে দেব বলে, ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। আসলে মা চাইছিলেন না যে, আমরা বাড়িতে থাকি। আত্মীয়স্বজনরা খানিক বাদেই এসে পড়বে, তারা এসে ব্যাপারটা বুঝে ফেলুক, তা তিনি চাইছিলেন না। তবে আমরা রওনা হবার আগেই কিছু-কিছু আত্মীয় আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ফলে কয়েকজন জ্ঞাতি-বোনও আমাদের সঙ্গে জুটে যায়। ঠিক কোথায়-কোথায় যে সেদিন গিয়েছিলুম, আজ আর তা স্পষ্ট মনে পড়ে না। তবে এইটুকু বেশ ভালই মনে আছে যে, আমরা যখন একটা পাথরের চাঁই কিংবা স্তম্ভের ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখন ভদ্রলোক প্রস্তাব করলেন, সেইখানে আমাদের প্রত্যেকের নাম লিখে রেখে আসতে হবে, যাতে পরে আবার কখনও সেখানে বেড়াতে গেলে সেই দিনটার কথা সকলের মনে পড়ে যায়। তা দেখলুম, দিদির নামের ঠিক নীচেই তিনি তাঁর নাম লিখলেন। মনে হয়, দিদির সঙ্গে তাঁর বিয়েটাকে তিনি একেবারে অবধারিত বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তাঁর তরফে আপত্তি না থাকলেও আমাদের তরফে যে আপত্তি উঠতে পারে, তা বোধহয় তিনি ভাবতেই পারেননি।

সেই রাত্রেই তিনি লখনউ থেকে বিদায় নেন। তা তিনিও বিদায় নিলেন, আর আমাদের বাড়িতেও অমনি 'গোল-টেবিল বৈঠক' শুরু হয়ে গেল। মা একেবারে স্পষ্ট করে বলে বসলেন যে, ছেলেটিকে তাঁর ভাল লাগেনি, চালচলনে বড্ড ফিরিঙ্গী। তাই শুনে আমি তো হতভম্ব; সত্যি বলতে কী, ভদ্রলোককে আমার খুব ভালই লেগেছিল। আমি তো তাঁর হয়ে ওকালতি করতে লেগে গেলুম। দিদি সারাক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। তবে আমার ধারণা, ছেলেটিকে তার খারাপ লাগেনি। যাই হোক, আমি যে ছেলেটির হয়ে খুব ওকালতি করছি, এইটে দেখে মা হঠাৎ মুচকি হেসে বললেন, "তোর দেখছি ছেলেটিকে খুব পছন্দ; তা বলিস তো না হয় তোর সঙ্গেই ওর সম্বন্ধ করি।" এমনভাবে ফাঁদে পড়ব, বুঝতে পারিনি। বাস্, সেই যে আমি মুখ বন্ধ করলুম, আর খুললুম না।

8

প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, বিয়ে করব না, নিজের জীবিকার ব্যবস্থা নিজেই করে নেব। অর্থনৈতিক ব্যাপারে অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, এইটেই ছিল আমার স্বাধীনতার মূল কথা। অধীর হয়ে সেই সুদিনের জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলুম, যখন আমার ডানা গজাবে আর মুক্ত বিহঙ্গের মতো আমি নীল নির্মল আকাশের বুকে উড়ে বেড়াব। কিন্তু সেই সুদিন কবে আসবে? এখনও অন্তত তিন বছর আমার পরাধীন হয়ে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাহলে এই তিনটে বছর আমি কী করব? অনন্যোপায় হয়ে তথাকথিত এই সামাজিক দায়-দায়িত্বের জের টেনে চলব? বিয়ে, বাগ্‌দান আর অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠানে হাজিরা দিয়ে যাব? আত্মীয়স্বজনদের সমাবেশে গিয়ে গল্পগুজব করে সময় কাটাব? দেওয়ালীর রাত্রে প্রথম যেবার বয়স্কদের সঙ্গে বাজি রেখে আমাকে কড়ি খেলতে দেওয়া হয়, সেদিন আমার বড় আনন্দ হয়েছিল। অবাক হয়ে ভাবি, কার সেদিন আনন্দ হয়েছিল? এই আমার? দু' বছর আগের এক রাত্রির কথা মনে পড়ে। বয়স্করা তখন আর আমাকে ছেলেমানুষ ভাবেন না। রাত তিনটে পর্যন্ত সেদিন জেগে ছিলুম, কিন্তু কেউ সেজন্যে আপত্তি করেননি। বড় ভাল লেগেছিল সেদিন। ভাবি, সত্যিই সে কি মাত্র দু' বছর আগেকার ঘটনা? আজ আমার আড্ডা দিতে ভাল লাগে না; রবিবারে-রবিবারে তাসের আসর বসে, কিন্তু তাস খেলতেও আমার বিরক্তি বোধ হয়। ভাবি, এই আমি আর সেই আমি কি একই মেয়ে? নিজের পরিবর্তনে নিজেই বিস্ময় বোধ করি। এইসব পার্টি আর সামাজিক মেলামেশা সম্পর্কে সত্যিই আমার আর বিন্দুমাত্র মোহ ছিল না।

* * *

দিনের পর দিন যুদ্ধ চলতে থাকে। সেইসঙ্গে ধাপে-ধাপে, লাফে-লাফে চড়তে থাকে জিনিসপত্রের দাম। মজা এই যে, একদিকে যখন তাই নিয়ে সকলের অসন্তোষের অন্ত নেই, অন্যদিকে তখন সেই মাগ্‌গীগণ্ডার বাজারেই যেন পার্টি আর খানাপিনার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। আফ্রিকার রণাঙ্গন থেকে আমাদের এক আত্মীয় সেইসময়ে ফিরে এসেছিলেন। বাস্, তাঁকে কেন্দ্র করে পার্টির পর পার্টি চলতে লাগল। ভদ্রলোক আমার কাকীমার বোনের ছেলে। যুদ্ধ বাধবার পরে সমরবিষয়ক সংবাদদাতা হিসেবে তিনি নাম লেখান। তিনি যখন উত্তর আফ্রিকায় ছিলেন, তখন সেখানে তুমুল যুদ্ধ চলছে। তা নিরাপদে তিনি দেশে ফিরে আসায় তাঁর বাপ-মা স্বভাবতই খুব খুশী হলেন। পুত্রের প্রত্যাবর্তনে আনন্দ প্রকাশের জন্যে একটা পার্টি দিলেন তাঁরা। অমনি শুরু হল পার্টির পর পার্টি। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সবাই জানাতে চায় যে, তিনি ফিরে আসায় তারা খুব আনন্দিত। সেই আনন্দটাকে বিজ্ঞাপিত করবার জন্যে একটার-পর-একটা পার্টির আয়োজন করা হতে লাগল। তা অন্তত গোটা ছয়েক পার্টি তখন দেওয়া হয়েছিল। তার কিছু দিন বাদে আমার এক দূর-সম্পর্কের কাকার বিয়ে হয়। বাস্, বর আর কনেকে সংবর্ধনা করবার জন্য আবার পার্টির ধুম লেগে গেল। আমার এক আপন কাকা বেকার বসে ছিলেন। কিছুতেই চাকরি পান না, শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে তিনি অস্থায়ী কমিশনে যুদ্ধের চাকরি নিলেন। বাস্, শুরু হয়ে গেল তাঁর, বিদায়-সংবর্ধনা। অর্থাৎ আবার সেই পার্টি আর পার্টি। খানাপিনা আর শেষ হয় না। চলছে তো চলছেই।

এইভাবে পার্টিতে যাঁরা জমায়েত হতেন, তাঁরা একই সমাজের লোক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরস্পরের আত্মীয়, সুতরাং পরস্পরকে চেনেন। বিভিন্ন বয়সের মানুষ তাঁরা। কেউ-কেউ আমার বয়সী। জীবনের অন্য কোনও ক্ষেত্র, কিংবা সমাজের অন্য কোনও স্তর থেকে তাঁরা আসেননি। সকলের অবস্থা ও পরিবেশ মোটামুটি একই রকমের। বস্তুত, আমি নিজেও সেই একই পরিবেশের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছি। অথচ, মজা এই যে, যতই আমার বয়স বাড়ছিল, ততই যেন এদের সঙ্গে কোনও সাযুজ্য আমি খুঁজে পাচ্ছিলুম না। এ-সব পার্টিতে যেতে আমার একটুও ভাল লাগত না, অথচ না গিয়েও উপায় নেই। তার জন্যে আমি ভীষণ বিরক্ত বোধ করতুম। পার্টিগুলো যে ক্লান্তিকর, তা অবশ্য নয়। কিন্তু সেখানে যাবার পরে সবকিছুকেই অর্থহীন বলে মনে হতে থাকে, কেমন একটা নৈরাশ্যের ছায়া আমার উপরে ব্যাপ্ত হয়ে যায়।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও এইসব সামাজিক সম্মেলনে আমাকে যেতে হত। যেতুম সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত মন নিয়ে। যাবার পরে কিন্তু নির্লিপ্ত ভাবটা কেটে যায়। মানুষ সম্পর্কে বরাবরই আমি আগ্রহী, সেই আগ্রহটা তখন প্রবল হয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি মানুষকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে থাকি; তাদের আচার-আচরণ, কথাবার্তা ইত্যাদি সমস্ত-কিছু লক্ষ করি; প্রতিটি অনুপুঙ্খ আমার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে যায়। আমাদের সমাজের মানুষরা কীভাবে জীবনযাপন করে, তার ছবিটা আমার মনের মধ্যে অনপনেয়ভাবে ফুটে ওঠে।

কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিলগ্নে আগ্রায় একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে, বড় হয়ে আমি মায়ের মতো হব না। এখন আর-একটু বড় হয়ে আমি বুঝতে পারি, অন্যদের থেকে মায়ের কোনও মৌলিক তফাত নেই। মাও অন্যদের মতোই। প্রত্যেকেই অবশ্য বিশিষ্ট, এবং সেই বৈশিষ্ট্যই অন্যদের থেকে তাকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়; আবার একইসঙ্গে এও বুঝতে পারি যে, মূলত এরা সকলেই এক। সকলেই এরা তর্ক করে, একে অন্যকে ছিঁড়ে খায়, পরচর্চা করে, আড়ালে অন্যের নিন্দে রটায়। প্রতিটি বিষয় কিংবা প্রতিটি মানুষের সম্পর্কে এদের মতামতে কিছু-কিছু পার্থক্য আছে বটে, তবু... তবু কোথায় যেন এদের মধ্যে একটা মিলও রয়েছে। ঠিক কোথায় যে সেই মিল, তা আমি বর্ণনা করে বোঝাতে পারব না। কিন্তু মিলটা আছে, তাতে সন্দেহ নেই। এবং আছে বলেই আমার চোখে এরা একাকার হয়ে যায়। আমার মনে হয়, কালির রংটা এক-এক জনের ক্ষেত্রে এক-এক রকম বটে, কিন্তু একই শিলমোহরের ছাপ রয়েছে এদের উপরে। মনে হয়, এরা সবাই একই ছাঁচে গড়া। পার্টিতে গিয়ে এদের আমি দেখতুম। নতুন করে আবার প্রতিজ্ঞা করতুম, আর যা-ই হই, এদের মতো আমি হব না। আমি আলাদা রকমের মানুষ হব। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে কী করে?

গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে কি এমন-কিছু আছে, দিনে-দিনে মানুষকে যা নষ্ট করে দেয়? সেইজন্যেই কি এরা এইরকমের চেহারা প্রাপ্ত হয়েছে? জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু—মাত্র এই তিনটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এরা আবর্তিত হচ্ছে। জন্মবার্ষিকী, বাগ্‌দান আর অসুখ-বিসুখ তো সেই তিনটি মূল ঘটনারই ছোট সংস্করণ। তাই নিয়েই কেমন মেতে আছে এরা। ঠাকুমার কথা মনে পড়ে। চুপচাপ বসে তিনি একদিন কাঁথা সেলাই করছিলেন। বাচ্চার কাঁথা। মনে হচ্ছিল, ঠাকুমা খুব তৃপ্ত। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, "বাড়িতে যখন বাচ্চা জন্মায়, তখন তাতে এত খুশী হবার কী আছে?"

যেমন সেলাই করছিলেন, তেমনি সেলাই করে যেতে লাগলেন ঠাকুমা। মুখ না তুলেই বললেন, "বাঃ, বাচ্চা একদিন বড় হয়ে উঠবে যে।"

"বড় হয়ে সে কী করবে?"

"কেন, বিয়ে করবে। তারপর..."

ঠাকুমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তেতো গলায় আমি বললুম, "তারপর সেই বাচ্চার আবার বাচ্চা হবে, কেমন?"

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন ঠাকুমা। বললেন, "বাঃ, তা হবেই তো।"

"তারপর সেই বাচ্চারাও বড় হয়ে বিয়ে করবে, তারপর তাদেরও আবার বাচ্চা হবে, তাই না?"

"হ্যাঁ, তা তো হবেই। হবে না কেন?"

বললুম, "তাতে লাভ কী?"

তীব্র চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ঠাকুমা বললেন, "দিদি, এই হচ্ছে জীবনের রীতি।"

"মানুষ বড় হয়ে বিয়ে করবে, বাচ্চার জন্ম দেবে, তারপর মারা যাবে, কেমন?"

"হ্যাঁ," শান্ত গলায় ঠাকুমা বললেন, "হ্যাঁ, তারপর মারা যাবে। জন্ম নিলেই মরতে হয়, মৃত্যুকে কেউ ফাঁকি দিতে পারে না। কিন্তু জীবনের স্রোত তবু বয়েই চলে। সংসারকে এইজন্যেই বলা হয়েছে 'সংসার চক্র'। জীবনের সেই চক্র ঘুরছে তো ঘুরছেই। তার বিরতি নেই।"

ঠাকুমার কথা শুনে বুঝতে পেরেছিলুম, জীবনের বিরুদ্ধে তাঁর কোনও নালিশ নেই। যা তাঁর কাছে অমোঘ, অনিবার্য, তাকে তিনি শান্তভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমি অত শান্তভাবে জীবনকে নিতে পারি না। আমি অধৈর্য বোধ করি। আমার মনে হয়, এই চক্রে কেন আমি তুচ্ছ একটা বল্টুর ভূমিকা গ্রহণ করব? কিসের বাধ্যবাধকতা আমার? চাকাটা ভেঙে পড়ুক, চিরকালের মতো থেমে যাক, আমার তাতে কিচ্ছু যায়-আসে না। আমার কথা, জন্ম দিয়ে জীবনস্রোতকে জিইয়ে রাখা, নিতান্ত এইটুকু নিশ্চয় জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। জীবনের নিশ্চয়ই অন্য কোনও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আছে।

জাতি! সম্প্রদায়! সমাজ!

কী হবে আমার এ-সব দিয়ে! ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ হয়ে উঠবার ব্যাপারে এরা কি আমাকে সাহায্য করতে পারবে? না পারে তো এরা চুলোয় যাক। মনে-মনে আমি তখন ভীষণভাবে আলোড়িত হচ্ছি। আমার মধ্যে তখন বিদ্রোহ জেগে উঠছে। আমি যুদ্ধ করতে চাই। কিন্তু কার কিংবা কিসের বিরুদ্ধে, তা আমি জানি না।

আমার অস্থির মন, আমার নির্যাতিত আত্মা তখন এই জরুরী প্রশ্নের উত্তর চাইছে। 'শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি' তখন আর আমি সহ্য করতে পারছি না। আর-কিছু নয়, আমি তখন একলা থাকতে চাইছি। যাতে এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমি খুঁজে নিতে পারি। কিন্তু এমনই আমাদের বাড়ি যে, সেখানে এক দণ্ড একলা থাকবার উপায় নেই। ফলে কী আর করি, পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে, এই অছিলায় আমি ফের কৈলাস হোস্টেলে গিয়ে উঠলুম।

* * *

আমার পাশের ঘরে থাকত হাওয়াবাঈ। যে পারিবারিক পরিবেশ থেকে সে এসেছে, আমাদের পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র মিল নেই। কিন্তু তবু আমাদের ব্যক্তিত্বের মিলটা ছিল লক্ষণীয়। একই সমস্যায় জর্জর হচ্ছিলুম আমরা। আমাদের দুজনেরই বিশ্বাস, জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার যোগ্যতা আমাদের নেই। জীবনের বিন্যাসটা যাই হোক, সেই বিন্যাসের মধ্যে আমাদের ঠাঁই হয় না। কেন হয় না? দোষ কি আমাদের? আমাদের মধ্যেই কি এমন-কোনও মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে, যার ফলে এই

সমাজের সঙ্গে আমরা মানিয়ে চলতে পারি না? নাকি যে-সমাজের মধ্যে আমরা জন্ম নিয়েছি এবং যার মধ্যে না-থেকে আমাদের উপায় নেই, দোষ সেই সমাজের?

হাওয়াবাঈ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রী। সে তখন এম.এ. ফাইন্যাল ক্লাসে পড়ে। আর আমি সদ্য এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। এতদিন আমরা দুজনেই পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়েছি; তাই এবারে একটু মন দিয়ে পড়া দরকার, নয়ত ক্লাসের সঙ্গে তাল রাখতে পারব না। পাশ করলেই যে ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল, তা অবশ্য নয়, কিন্তু একটা বছর নষ্ট হলে তো অবস্থা আরও শোকাবহ হয়ে দাঁড়াবে। ফলে দুজনেই তখন তেড়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নোট মুখস্থ করছি। কিন্তু রাত একটু বেশী হলেই আর বিচ্ছিরি এইসব নোট আমাদের মাথায় ঢুকতে চায় না, তখন ঐ ওর ঘরে গিয়ে পরস্পরের কাছে নিজেদের দুঃখের কথা উজাড় করে দিই। আমাদের কথা আর তখন ফুরোতে চায় না। বিয়ে, প্রেম, যৌন সম্পর্ক, চাকরি, বেশ্যাবৃত্তি, গর্ভপাত, হেন বিষয় নেই, যা নিয়ে আমাদের কথা হয় না। কথা বলে মনটা একটু হাল্কা হয়, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হয়, তখন ঘরে গিয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। তবে সব সময়েই এই একটা বোধ আমার মধ্যে জেগে থাকে যে, আমি 'বেমানান'। কেন 'বেমানান', অনেক ভেবেও তা বুঝতে পারি না। সামাজিক যে গোষ্ঠীর মধ্যে আমি জন্মেছি, তারই মধ্যে আমার ভবিষ্যৎ-জীবন কাটবে, এই কথাটা ভেবে আমার এত ভয় করে কেন?

একদিন এক বন্ধু আমাকে ধরে বসল যে, তার সঙ্গে একটা ফিল্ম দেখতে যেতে হবে। বলা বাহুল্য, ফিল্ম দেখতে না গিয়ে তখন আমার পড়াশুনো করা উচিত। তাই মনের মধ্যে একটু অস্বস্তি নিয়েই আমি ছবি দেখতে গিয়েছিলুম। ছবির নাম "দি পেট্রিফায়েড ফরেস্ট"। অর্থাৎ 'প্রস্তরীভূত অরণ্য'। তা ছবি দেখে আমি তো অভিভূত। পরের দিন আবার গিয়ে আদ্যন্ত ছবিটি দেখলুম। এর আগে আর কখনও আমি এতটা আলোড়িত হইনি। এই ছবিটি যেভাবে আমার চিত্তকে দখল করে নিয়েছিল, আর কখনও কোনও বই কিংবা ছবি তেমনভাবে আমার চিত্তকে দখল করতে পারেনি। মনে হচ্ছিল, আমার চোখের সামনে এতকাল একটা পর্দা ঝুলছিল তাই পরিষ্কারভাবে কিছুই আমি দেখতে পাইনি। সহসা সেই পর্দাটা যেন সরে গেছে, আর তাই সবকিছুকেই এখন আমি স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমার চারপাশে যে-সব মানুষকে আমি দেখি, তারা সবাই পাথর হয়ে গেছে। সেইসঙ্গে আমিও যদি পাথর হয়ে যেতুম, তাহলে কোনও অস্বস্তিই আমার থাকত না। কিন্তু আমি তো পাথর হয়ে যাইনি। আমি জীবন্ত মানুষ। কী করে তাহলে ওই মৃত মানুষদের অরণ্যে আমি পা বাড়িয়ে দেব?

* * *

ভারতবর্ষের যাবতীয় উৎসবের মধ্যে হোলিকেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। সবকিছুকেই সেদিন বড় প্রফুল্ল মনে হয়। চতুর্দিকে সেদিন রঙের ছড়াছড়ি। কিন্তু রঙের চেয়েও আমার ভাল লাগে ওই আত্মহারা আনন্দের ভাবটা। হোলির দিনে কারও কোনও বাঁধন থাকে না। সবকিছুকে সেদিন ভুলে যাওয়া যায়। চেহারা, পরিচ্ছদ, মুখশ্রী—সব। কাকে কেমন দেখাচ্ছে, সেদিন আর তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। অথচ, যে হোলিকে আমি এত ভালবাসি, তাকে নিয়ে আমার যে কিছুটা ভয় ছিল না, তাও নয়। ভয় ছিল, তার কারণ, বাবা এই উৎসবের মাতামাতিটা পছন্দ করতেন না। ফলে নানা অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হত, এবং শেষপর্যন্ত দেখা যেত যে, বাবার সঙ্গে মায়ের একটা কুচ্ছিত রকমের ঝগড়া বেধে গেছে। সেবারে হোলির দিনে তাই নিজেদের বাড়িতে না গিয়ে বিমলাদের বাড়িতে চলে গেলুম। গিয়ে দেখি, ভীষণ

ভিড়। লোকজনের আসা-যাওয়ার বিরাম নেই। রঙের বালতি নিয়ে আমরা ছাতে গিয়ে লুকিয়ে ছিলুম। রাস্তা দিয়ে লোক যায়, আর উপর থেকে আমরা রঙের বালতি উপুড় করে দিই। হরেক রঙে মানুষগুলো নেয়ে ওঠে। তার আগে আর কখনও হোলিতে এত আমোদ জমেনি। চলে আসবার সময়ে তো বলতে গেলে মারপিটই লেগে গেল। কেউ আমাকে আসতে দিতে চায় না। জোর করে চলে আসতে গিয়ে আমার পা হড়কে যায়। গোড়ালিতে একটু চোটও পাই। ওই অবস্থাতেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে হোস্টেলে ফিরলুম। ভেবেছিলুম, জখমটা বিশেষ মারাত্মক নয়, অল্পেই সেরে যাবে। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলুম, ব্যাপার গুরুতর, গোড়ালিটা ভীষণভাবে ফুলে গেছে, যন্ত্রণায় পা পাততে পারি না। সন্ধে নাগাদ অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল। অসহ্য যন্ত্রণা। কী আর করি, একটা টোঙ্গা করে হোস্টেল থেকে বাড়িতে চলে এলুম। চিকিৎসা করানো হল, ওষুধ পড়ল, তখন পা আবার স্বাভাবিক। আমিও অমনি বাড়ি থেকে হোস্টেলে ফিরলুম। সেই প্রথম বুঝতে পারি, বাড়ির কাছে ভিতরে-ভিতরে একটা প্রত্যাশা আমার আছেই, এবং আমি ধরেই নিয়েছি যে, সেটা পূরণ হবেই। তা নইলে, যে-বাড়ির প্রতি এমনিতে আমার টান নেই, এবং প্রতিনিয়ত যেখান থেকে আমি পালাবার ফিকির খুঁজি, সেবাযত্ন কিংবা আরামের দরকার হলেই সেখানে আমি ফিরে যাই কেন? কেন আশা করি যে, আমার জন্যে ব্যাকুল হয়ে তারা বসে থাকবে? স্নেহমায়ার জন্যে কেন তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াই? সেই প্রথম আমার মনের মধ্যে কিছুটা আরামবোধ দেখা দেয়। আমার মনে হতে থাকে, এই যত্ন, এই স্নেহ আমার প্রাপ্য ছিল না। হোস্টেলেই আমার থাকা উচিত ছিল। যন্ত্রণা আর অসুবিধেটা নিঃশব্দে সহ্য করা উচিত ছিল।

* * *

বিশেষ করে মেয়েদের জন্য যে-সব পত্রিকা প্রকাশ করা হয়, সেগুলো আমার ভাল লাগে না। হাওয়াবাঈয়ের কিন্তু সে-সব পত্রিকা খুব পছন্দ। তা সেইরকমের একটি পত্রিকার পাতা ওলটাতে ওলটাতে একদিন একটি চিঠি আমার চোখে পড়ে। অল্পবয়সী একটি মেয়ের লেখা। মেয়েটি স্কুলে পড়ে। কাগজে চিঠি লিখে সে তার সমস্যার কথা জানাচ্ছে এবং পরামর্শ চাইছে। মেয়েটির বিপত্নীক বাবা নাকি তারই (অর্থাৎ মেয়েটিরই) এক সহপাঠিনীর প্রেমে পড়েছেন এবং তাকে বিয়ে করতে চাইছেন। এক্ষেত্রে সে (অর্থাৎ পত্রলেখিকা) কী করবে? চিঠি পড়ে মনে হল, মেয়েটি খুব বিভ্রান্ত বোধ করছে। সেটাই স্বাভাবিক। বুঝতে পারছিলুম, মেয়েটি কী ভয়ংকর সমস্যায় পড়েছে। কিন্তু হাওয়াকে যখন চিঠিখানা পড়ে শোনালুম, সে কিন্তু এতটুকু বিচলিত হল না। বলল, "এতে এত অবাক হবার কী আছে? আমার বাবা যদি আমার কোনও বন্ধুকে বিয়ে করেন, আমি তাতে কিচ্ছু মনে করব না।"

আমার বাবা যদি আমার কোনও বন্ধুকে বিয়ে করতে চান, তাহলে আমার মনের অবস্থাটা কী দাঁড়াবে, কল্পনা করতে চেষ্টা করলুম। কিন্তু, সত্যি বলতে কী, বাবাকে অমন একটা ভূমিকায় কল্পনাই করা গেল না। প্রেম আমার চোখে বরাবরই সেই দুর্লভ বস্তু, নিতান্ত সাধারণ মানুষরা যার নাগাল পায় না। প্রেমে পড়ার গল্প শুনি বটে, কিন্তু তাকে আমার প্রকৃত প্রেম বলে মনে হয় না। মনের মধ্যে একটা সন্দেহের ভাব জেগেই থাকে। এমন অনেক ছেলে আর মেয়েকে আমি জানি, গোপনে যারা পরস্পরের সঙ্গে দেখা করত; শুনতুম, পরস্পরকে তারা পাগলের মত ভালবাসে। তা তখন তাদের পাগলপারা দেখাত বটে, কিন্তু বিয়ের বছর পাঁচেক বাদেও তো তাদের দেখেছি, যে-কোনও মামুলী দম্পতির সঙ্গে তখন আর তাদের কোনও পার্থক্যই

চোখে পড়ে না। সবাই যেন কেমন একই ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায়। প্রেমে পড়ার ব্যাপারটাকে তাই সন্দেহের চোখে দেখতুম। মনে হত, এ আর কিছুই নয়, এক ধরনের ভাববিলাস। প্রেম নামক ব্যাপারটাকেই যে তাই বলে আমি সর্বৈব খারিজ করে দিয়েছিলুম, তা অবশ্য নয়। ভাবতুম, দৈবাৎ কেউ-কেউ মনের-মত সঙ্গী পেয়ে যায়। সত্যিকারের ভালবাসা দুটি নরনারীকে একেবারে এক করে দেয়। ভাবতে ভাল লাগত, এমন সঙ্গীর সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব, যার সঙ্গে কখনও মনের অমিল ঘটবে না, গোটা জীবন যার সঙ্গে মনের মিল থাকবে অব্যাহত। মুখ ফুটে যাকে মনের কথা জানাতে হবে না। অন্যদিকে, অকপটে—কোনও-রকমের ভুল-বোঝাবুঝির ভয় না করে—যাকে সমস্ত কথা বলা যাবে। সর্বাবস্থায় পরস্পরের সুখদুঃখের কথা বুঝতে পারা, চিন্তা অনুভূতি বাক্য সবকিছুতে সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া—কল্পনা করতেই তো কত ভাল লাগে। কিন্তু তা কি সম্ভব? না, বাস্তবে অমন প্রেমের সন্ধান মেলে না। কিংবা মিললেও দৈবাৎ মেলে। কিন্তু দৈবে, কিংবা ভাগ্যে আমার বিশ্বাস নেই। আমি কর্মযোগে বিশ্বাসী। আমাদের ভাগ্য আগে থাকতেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে, এমন তত্ত্বে আমি আস্থা রাখি না। না, পক্ষীরাজে চড়ে রাজপুত্র আসবে, এমন দিবাস্বপ্ন দেখার সময় আমার নেই। সুখশান্তি আমার মতো মানুষদের জন্য নয়। সুখশান্তির কথা ভাবতেও আমার ভরসা হয় না। সর্বজনের ছাঁচে ঢালাই না হয়ে গিয়ে আমি যাতে আমার বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি, তার জন্যে আমাকে সংগ্রাম করতে হবে। আর সেই সংগ্রামের জন্য সংহত করতে হবে আমার সর্বশক্তি।

*   *   *

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেছে। শুরু হয়েছে গ্রীষ্মের ছুটি। অগত্যা আমাকে বাড়িতে ফিরতে হল। দিদি আর আমি একই ঘরে থাকি, সামাজিক নানা অনুষ্ঠানে একসঙ্গে যোগ দিতে যাই। কিন্তু বুঝতে পারি, পরস্পরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি আমরা। আমি আমার নিজের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। নিজস্ব উপায়ে আমি তার সমাধান খুঁজে বেড়াই। দিদি সেক্ষেত্রে নমনীয়, নম্র স্বভাবের মেয়ে। যে-পরিবেশে তার জন্ম, তাকে সে মেনে নিয়েছে। আমি মেনে নিতে পারিনি। আমি সেই পরিবেশের বিরুদ্ধে, কার্যত না হোক, মনে-মনে লড়াই করে যাচ্ছি। আমি যেন এমন প্রাণী, মনই যার সর্বস্ব; যার শরীর বলতে কিছু নেই। নিজের চেহারা সম্পর্কে আমি উদাসীন। একমাত্র চুল আঁচড়াবার সময় ছাড়া আয়নায় আমি আমার মুখটা পর্যন্ত দেখি না। মা আমার জন্যে যে শাড়ি বেছে দেন, তাই পরেই আমি খুশী। শস্তা একজোড়া চটি; বাড়িতেও তা-ই পরি, পার্টিতেও তা-ই পরেই যাই। কিছুই আমি চাই না। যাবতীয় বিলাস থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতেই আমার আনন্দ। এ কোনও বিকৃত মানসিকতার ব্যাপার নয়; আসলে কত অল্পে আমার চলে, তারই একটা পরীক্ষায় তখন আমি মেতেছিলুম। নয়তো, লিপস্টিক কি নেল-পলিশ কি ওই ধরনের কিছুর জন্যে যদি আমি বায়না ধরতুম, আমার বাপ-মা কি আর তা মেটাতেন না? মেটাতেন নিশ্চয়। কোনও ছেলের সঙ্গে যদি বন্ধুত্ব করতুম, তাহলেই বা কী করে আমাকে বাধা দিতেন তাঁরা? কিন্তু এ-সব কোনও-কিছুর প্রতিই আমার আসক্তি নেই। আমার একমাত্র কামনা, আমাকে আমার আপন মূল্যে সবাই বুঝুক, আমাকে ভালবাসুক। কিন্তু উপলব্ধি, ভালবাসা—এ-সব বস্তু যতই আমি চেয়েছি, ততই বঞ্চিত হয়েছি।

কথায়-কথায় দিদি একদিন বলে যে, আমি বড্ড আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছি। শুনে আমি খুব আহত হই। তার কারণ, আত্ম নামক বস্তুটি সম্পর্কে আমার ঔদাসীন্যের তখন অন্ত ছিল না। দিদি কিন্তু জানায় যে, সবসময়েই আমি "আমার মতে" "আমার

ধারণা" এইরকমের কথা বলি। অর্থাৎ আমার সব কথাতেই খালি 'আমি' 'আমি' আর 'আমি'। শুনে আমি ভাবতে থাকি যে, সত্যিই কি তা-ই। আমি বই পড়ি, আমি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করি। বই আর মানুষ সম্পর্কে আমার একটা প্রতিক্রিয়াও হয়। সেই প্রতিক্রিয়ার কথা, অর্থাৎ তাদের সম্পর্কে আমার মতামত আমি জানাই মাত্র। তাকে কি আত্মকেন্দ্রিকতা বলে? কী জানি!

* * *

মনের মধ্যে যতই দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলুক, বাইরের ব্যাঘাত বিশেষ ছিল না বলে সেবারকার গ্রীষ্মটা খুব শান্তিতে কেটেছিল। বস্তুত অমন নিরুপদ্রব শান্তি আর কোনও গ্রীষ্মের ছুটিতে পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের অধিকাংশই পাহাড়ে কিংবা অন্য-কোথাও ছুটি কাটাতে চলে গিয়েছিলেন। ফলে একটু নিরিবিলি থাকবার সুযোগ পাই। সেই দিনগুলিতে মোটা মোটা তিন ভল্যুমের 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইংলিশ লিট্রেচার' আমার সঙ্গী হয়েছিল। আমাদের পরিবারে দিদির তো খুব মেধাবী বলে সুনাম ছিল, আমার এক কাকা তাই এই তিন ভল্যুম তাকে উপহার দেন। তবে উপহারটা কাকে দেওয়া হল, দিদিকে না আমাকে, তাতে কিছু যায় আসে না, আমি যে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলুম তাতেই আমি খুশী। তা সেই গ্রীষ্মের ছুটিতে তিন ভল্যুমের দু' ভল্যুম আমি প্রায় শেষ করে ফেলি। প্রথম ভল্যুমে ছিল প্রাচীন যুগের ইংরেজ সাহিত্যিকদের কথা, সেটায় আমি বিশেষ মজা পাইনি। সাহিত্য-সংক্রান্ত কোষগ্রন্থের পাতা ওলটাতে আমার খুব ভাল লাগত। বই পড়ে মানুষ কিংবা তার পরিবেশ সম্পর্কে যে ধারণা হয়, এ-সব গ্রন্থ থেকে আহৃত ধারণার সঙ্গে দেখলুম অনেকক্ষেত্রেই তা ঠিক মেলে না। এও বুঝতে পারলুম যে, আমার পড়ার মধ্যে কোনও শৃঙ্খলা ছিল না, এলোমেলোভাবে কিছু বই পড়েছি মাত্র। এমন অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিকের কথা সেখানে পড়লুম, ইতিপূর্বে যাঁদের বই পড়া তো দূরের কথা, নামও আমি শুনিনি।

বাড়িতে যে-ঘরে আমরা থাকতুম, তার একদিকে একটা মস্ত জানলা। রাত্তিরবেলা সেই জানলার সামনে একটা চেয়ারে বসে চুপচাপ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতুম। দেখতুম, চাঁদ কীভাবে ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, তারপর দিনে-দিনে কেমন করে আবার ক্ষীণ হয়ে যায়। আমিও তো ঠিক চাঁদেরই মতো। কখনো আনন্দে ভরে উঠি, কখনো বিষাদে চুপসে যাই। জানলায় বসে-বসে যখন দেখতুম যে, আকাশ জুড়ে পূর্ণ চাঁদের আলো ঝরছে, তখন বড় ভাল লাগত। ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হত না। মনে হত, শেষপর্যন্ত সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রস্তরীভূত যে অরণ্যকে আজ দুর্গম বলে মনে হচ্ছে, তাকে ভেদ করে আমি ঠিক বেরিয়ে যেতে পারব। আবার কখনও-কখনও দেখতুম, আকাশ অন্ধকার, মেঘাবৃত। তখন আমার মনও হতাশায় ছেয়ে যেত। দম বন্ধ হয়ে আসত। মনে হত, আমিও যেন একটু-একটু করে প্রস্তরীভূত হয়ে যাচ্ছি। তখন বড় ভয় পেতুম আমি। মরে গেলে আর ভয় কী; একটু-একটু করে মরে যাচ্ছি, এই ভাবনাটাই তো ভয়ংকর। ঠিক চাঁদেরই মতো আমার মনেরও যেন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটত। চাঁদ যতক্ষণ আকাশে আছে, ততক্ষণ আমি নির্ভয়। পড়াশুনো শেষ হতে আরও এক বছর বাকী। এই একটা বছর আমি বন্দিনী হয়ে থাকব ঠিকই। কিন্তু বন্দী-জীবনে আর-কিছু না থাক, অবসর থাকে।

* * *

এক বছর হল দিদির পড়াশুনোর পাট শেষ হয়েছে। এখন শুধু বিয়ের অপেক্ষায়

বসে থাকা। বসে থাকতে দিদির নিশ্চয় বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। হয়ত সেইজন্যেই শিক্ষক-শিক্ষণের পাঠ নিতে সে এলাহাবাদে চলে যায়। দিদি চলে গেছে, অথচ সেজন্যে আমার কোনও দুঃখ নেই, এইটে আবিষ্কার করে খুব বিস্ময়বোধ করেছিলুম। এমন একটা সময় ছিল, পরস্পরকে ছেড়ে যখন আমরা একটা দিনও থাকতে পারতুম না। আর আজ? এখনও দিদিকে আমি ভালবাসি; চাই যে, সে সুখী হোক। আমি তো কোনও সুখের আশা করি না, আমার সুখ দিদি পাক। আমি তখন ধরেই নিয়েছি যে, আমার ভবিষ্যৎ হবে কঠিন আর রুক্ষ। তারই জন্যে তখন আমি নিজেকে তৈরী করে তুলছি। তুলতে গিয়ে এতই আমি নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে ছিলুম যে, আমার বিষয়ে কে কী ভাবল অথবা না-ভাবল, সেদিকে আমার কোনও ভ্রুক্ষেপই নেই। ঠাট্টা করে সবাই আমাকে 'দেমাকী' বলত। ঠিক কবে যে এর সূচনা, তা আমার মনে পড়ে না। প্রথম-প্রথম কথাটা আমি গায়ে মাখিনি। কিন্তু পরে দেখলুম, লেবেলটা একেবারে গায়ের সঙ্গে এঁটে গেছে। ওটাকে ঘষে তুলে ফেলবার জন্যে তখন অনেক চেষ্টা করতে হয়েছিল।

* * *

১৯৪২ সনের ১০ই আগস্ট। দিনটার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় বাবা আমাকে আটকে দিলেন। বললেন, ক্লাস তো আর হবে না, তাহলে গিয়ে লাভ কী? নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে বিশিষ্ট সব কংগ্রেস-নেতারা বোম্বাইয়ে গিয়েছিলেন। আগের দিন সকালে তাঁদের সবাইকে সেখানে গ্রেফতার করা হয়। খবর পেয়ে জনসাধারণ তো স্তম্ভিত। এমন কাণ্ড হবে, জনসাধারণ তা ভাবতে পারেননি। এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে দেশ জুড়ে মিছিল বার হবে, সভা-সমিতি হবে, তাতে কারও সংশয় ছিল না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়নও নিশ্চয়ই এর প্রতিবাদ করবে। এই সবই আমি জানতুম। কিন্তু ব্যাপারটার গুরুত্ব যে কতখানি, তখনও তা আমি স্পষ্ট করে বুঝতে পারিনি। সেদিনকার সকালের কাগজও আমার পড়া হয়নি। যাই হোক, এ নিয়ে আর কিছু না ভেবে, বাবার কথাই মেনে নিলুম। বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলুম না।

নিজের ঘরে বসে পড়াশুনো করছি, এমন সময় আমাদের ভৃত্য মোতি হঠাৎ দৌড়ে এসে খবর দেয় যে, পুলিশ গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়-ভবন ঘেরাও করে রেখেছে। কী যেন কিনবার জন্যে মোতিকে দোকানে পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে সে দেখতে পায় যে, সব জায়গায় হরতাল চলছে, একটাও দোকান খোলা নেই। আরও শুনলুম, প্রতিটি সেতুর উপরে অশ্বারোহী পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ছাত্রদের উপরে কয়েক রাউন্ড গুলিও নাকি চলেছে। শুনে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠি। কোনও-কিছুই যেন স্থিরভাবে চিন্তা করতে পারছিলুম না। ইচ্ছে হচ্ছিল, রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে হাঁটতে হাঁটতে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাই। কিন্তু এও বুঝতে পারছিলুম যে, তাতে লাভ নেই, পুলিশের বেষ্টনী পার হয়ে নিশ্চয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকা যাবে না। ঠিক করলুম, বিকেলে বরং একবার কৈলাস হোস্টেলে যাব। সকালে কী ঘটেছে, তখনই তা জানা যাবে।

কৈলাস হোস্টেলে পৌঁছে সরাসরি এক বন্ধুর কাছে চলে যাই। বন্ধুটি রাজনীতি করত। রাজনীতি সম্পর্কে আমার আগ্রহ সেক্ষেত্রে কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক। দূর থেকে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করতুম, এই মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক জীবনে আমি যাতে সক্রিয় অংশ নিই, আমার এই বন্ধুটির তার জন্যে চেষ্টার অন্ত ছিল না। কিন্তু তার চেষ্টা সফল হয়নি। আমাকে দেখে সে ব্যঙ্গভরে হেসে বলল, "যাক্, এসেছ তাহলে।

আগেই জানতুম যে, সন্ধ্যা হলে তবে তোমার দেখা মিলবে!"

কথাটার তাৎপর্য খুবই পরিষ্কার। কিন্তু কী ঘটেছে তা জানতে তখন আমি এতই উৎসুক যে, বিদ্রুপটা গায়ে মাখলুম না। দেখলুম, মোতির খবরটা ভুল নয়। মোতি যা-যা বলেছিল, বন্ধুটি তা-ই আরও সবিস্তারে বলল। লখনউ শহরের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে গোমতী নদী। তার উপরে কয়েকটি সেতু। ওই সেতুগুলোই শহরের দুই অংশের মধ্যে যোগ রক্ষা করে। নদীর এক দিকে বিশ্ববিদ্যালয়। অন্য দিকে মেডিক্যাল কলেজ এবং অন্যান্য কয়েকটি কলেজ। বলতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন প্রায় সব কলেজই অন্য দিকে। সেই সব কলেজের ছেলেরা নদী পার হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হতে চেয়েছিল। কিন্তু সেতুর উপরে মোতায়েন অশ্বারোহী পুলিশ বাহিনী তাদের আসতে দেয়নি। মরিয়া হয়ে ছেলেরা তখন পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করতে চেষ্টা করে। পুলিশও একেবারে সামনা-সামনি গুলি চালায়। পরের দিন কাগজে খবর বার হল যে, পুলিশ শূন্যের দিকে তাক করে গুলি চালিয়েছিল। কিন্তু সেটা সত্যি কথা নয়। ইউনিয়ন-বিল্ডিংয়ে, মাটির থেকে মাত্র দু' ফুট উঁচুতেও, বুলেটের দাগ দেখতে পাওয়া গেছে।

কর্তৃপক্ষ চটপট ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল। হোস্টেলগুলোও বন্ধ হল। ছাত্রদের জানিয়ে দেওয়া হল যে, তিন দিনের মধ্যে তাদের হোস্টেল ছেড়ে চলে যেতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, ক্লাসে যাবার তাড়া নেই, পরদিন সকালে তাই দেরি করে ব্রেকফাস্ট করছি, এমন সময় হঠাৎ ডঃ অটল এসে হাজির। ডঃ অটল আমাদের পারিবারিক বন্ধু, ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে আমি চিনি। লখনউয়ে আসবার পর প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা করতুম। তাঁর সঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমি তাঁকে অটল বলেই ডাকতুম। তাই শুনে বাবা আমাকে খুব বকেছিলেন। কিন্তু অটল বললেন, এটাই তাঁর পছন্দ। অটল আসলে আমার বাবার চেয়েও বছর দুয়েকের বড়। কিন্তু তাঁকে আমি পিতৃবন্ধু বলে ভাবতুম না; ভাবতুম যে, তিনি আমারই বন্ধু।

আমাদের পরিবারের সঙ্গে অটলের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু তাই বলে যে তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন, তা নয়। খেতে কিংবা তাস খেলতে নেমন্তন্ন করলে তবেই আসতেন। তা নইলে আসতেন না। তাস খেলতে তাঁর খুব ভাল লাগত।

সেদিন সকালে ডঃ অটল আমাদের বাড়িতে আসায় মা আর আমি দুজনেই খুব অবাক হয়েছিলুম। বাবা যে ওই সময়ে অফিসে চলে যান, অটল তা জানেন। তাহলে তাঁর আসবার কারণ কী? অটল বললেন, আগের রাত্রে তিনি বোম্বাই থেকে ফিরেছেন। আরও বললেন যে, তিনি খুব ব্যস্ত, বেশ-কিছু লোকের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে হবে। তাই শুনে আমরা আরও বিস্ময় বোধ করি; ভাবি যে, এতই যদি ব্যস্ত, তাহলে আমাদের বাড়িতে তিনি এলেন কেন। বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে কী কী হয়েছিল, কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেফতার করায় কী প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, ডঃ অটল সব বললেন। তারপর বর্তমান আন্দোলনের তাৎপর্য কী, তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে আমাদের বোঝালেন যে, এর আগে গান্ধীজী যে-সব আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন, এই আন্দোলনের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়। কথাপ্রসঙ্গে তিনি এক ভদ্রমহিলার নাম করে বললেন যে, বোম্বাইয়ে তাঁর সঙ্গে সেই ভদ্রমহিলার দেখা হয়েছিল, এবং তিনিও গত রাত্রে লখনউয়ে এসেছেন। অটল বললেন, আমি যেন সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। তাঁর সঙ্গে দেখা করে কী হবে, জিজ্ঞেস করতে অটল কোনও স্পষ্ট জবাব দিলেন না। আবছাভাবে মাত্র এইটুকু বললেন যে,

ভদ্রমহিলা বোম্বাই থেকে এসেছেন তো, আমাকে অনেক খবর তিনি দিতে পারবেন। কীভাবে কত জায়গায় টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হচ্ছে, অটলের কাছে সব শোনা গেল। তিনি বললেন যে, ডাকঘরে হানা দেওয়া হচ্ছে অথচ টাকাপয়সা ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে না, এটা খুবই বোকামির ব্যাপার। এই ধরনের সততার কোনও অর্থই হয় না। আন্দোলন চালাবার জন্যে টাকা চাই। তাই, এমন কোথাও যদি হানা দেওয়া হয়, যেখানে বিস্তর টাকাকড়ি রয়েছে, তাহলে আন্দোলনকে চালু রাখবার জন্যে সে-টাকা কেড়ে নেওয়াই উচিত। নিজের জন্যে টাকা নিলে সেটা চুরির পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে নেওয়া হবে একটা আদর্শের জন্য। সুতরাং সেটা চুরির পর্যায়ে পড়তে পারে না। কেন যে অটল হঠাৎ এইভাবে আমাদের বাড়িতে এসেছেন, এবং এত ব্যস্ততার মধ্যেও আন্দোলনের কথা এত সবিস্তারে আমাকে বুঝিয়ে বলছেনই বা কেন, তখনও তা আমি ঠাহর করতে পারছিলুম না। এক ঘণ্টারও বেশী সময় আমাদের সঙ্গে কথা বললেন তিনি। যাবার আগে আবার বললেন, আমি যেন সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করি। বিকেল চারটে নাগাদ যদি কৈলাস হোস্টেলে যাই তো সেখানেই তাঁর দেখা পাওয়া যাবে।

অটলের আগমনের মধ্যে বেশ-কিছুটা নাটকীয়তা ছিল। তাঁর আসবার উদ্দেশ্যটা আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু মা পেরেছিলেন। মা বললেন, উদ্দেশ্য তো খুবই স্পষ্ট, অটল আমাকে আন্দোলনে টানতে চান। তা আমার আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় মায়ের দেখলুম কোনও আপত্তি নেই। বরং ডঃ অটলের কথামতো বিকেলবেলায় কৈলাস হোস্টেলে গিয়ে সেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে মা আমাকে উৎসাহিতই করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন যে, অটল যখন যেতে বলেছেন, তখন যাওয়াই উচিত, গিয়ে বুঝে আসা উচিত ব্যাপারটা কী, তাতে কোনও ক্ষতি নেই।

সারাটা দিন ঘুরেফিরে কেবল অটলের কথাই মনে পড়তে লাগল। কত গল্প শুনেছি তাঁর সম্পর্কে। শুনেছি, তিনি স্পেনে গিয়ে সেখানকার গৃহযুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।* পরে মেডিক্যাল মিশনের নেতা হয়ে তিনি চীনে যান। সেখানকার কমিউনিস্ট-অধিকৃত এলাকাতেও তিনি গিয়েছিলেন। চিয়াং কাই-শেক আর মাও সে-তুং, দুজনকেই ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন তিনি। আমাদের সামাজিক নানা উৎসবে-অনুষ্ঠানে ডঃ অটল আসতেন। তখন আমার অনুরোধে তাঁকে সেই সময়কার নানা অভিজ্ঞতার কথা বলতে হত। তাঁর একটা কথা আমার মনের মধ্যে একেবারে গেঁথে আছে। কথায়-কথায় তিনি বলেছিলেন যে, কোন্ অবস্থায় কার কী প্রতিক্রিয়া হবে, কে কী করবে, আগের থেকে তা নিশ্চিত করে জানবার উপায় নেই। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি তাঁর জীবনের একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন। তিনি তখন চীন সফর করছেন। সেইসময়ে একদিন একদল খ্যাপা কুকুর তাঁকে আক্রমণ করে। অনেক কষ্টে সেই কুকুরের খপ্পর থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু প্রাণে বেঁচে গেলেও তিনি খুব জখম হয়েছিলেন। কুকুরগুলো তাঁর কাঁধের কাছের খানিকটা জায়গা কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছিল। সেখান থেকে খুব রক্ত পড়ছিল। অটলের তখন মরণ-বাঁচন অবস্থা। ওই অবস্থায় তাঁকে নিয়ে অপারেশন-টেবিলে তোলা হয়। ক্লোরোফর্ম দেবার আগে একজন ডাক্তার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁর কোনও বিশেষ প্রার্থনা আছে কি না। কথাটার তাৎপর্য কী, অটল তা বুঝতে পারলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য চিন্তার উদয় হল; ইচ্ছা হল, ডাক্তারকে তিনি বলেন যে, মৃত্যুর পরে তাঁর চিতাভস্ম যেন ভারতবর্ষে

*বস্তুত তিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে লড়াই করেননি। তবে স্পেনে যখন গৃহযুদ্ধ চলছে, তখন শুভেচ্ছা-মিশনের সদস্য হিসেবে সেখানে গিয়েছিলেন বটে।

পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সেই চিতাভস্ম গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তাঁর পূর্বপুরুষদের চিতাভস্ম যেমন গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। নিজের চিন্তায় নিজেই তিনি সেদিন অবাক হয়ে যান। কই, মৃত্যুর পরে কী অনুষ্ঠান হবে না হবে, তা নিয়ে তিনি তো কখনও মাথা ঘামাননি, এ-সব আচার-অনুষ্ঠানে কোনও বিশ্বাসও তো তাঁর নেই, তাহলে হঠাৎ তাঁর মনে আজ এই চিন্তার উদয় হল কেন? ডঃ অটল তখন চীনের কমিউনিস্ট-অধিকৃত এলাকায়। তিনি বললেন, সেদিন সেই অনুরোধ করলে, যতই অসুবিধা হোক, চীনারা তা নিশ্চয় রক্ষা করত। কিন্তু ধর্মে যখন আস্থা নেই, তখন অমন অনুরোধ তিনি তাঁদের করতে যাবেন কেন? দৃঢ় গলায় ডাক্তারদের তিনি জানালেন যে, না, কোনও প্রার্থনাই তাঁর নেই। কিন্তু চিন্তা অনুযায়ী কাজ না-ই করুন, চিন্তাটার যে উদয় হয়েছিল, তা তো ঠিক। কেন হয়েছিল? আসলে, বাইরে আমরা যা-ই বলি না কেন, আমাদের অবচেতনে অনেক ইচ্ছা ও সংস্কার একেবারে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। হঠাৎ-হঠাৎ সেগুলো প্রকাশ পায়।

মনে আছে, অটল একবার অকুণ্ঠ-বলপ্রয়োগের সমর্থনে মতপ্রকাশ করেছিলেন। শুনে আমি বিস্মিত হই। তখন তিনি আমাকে বুঝিয়ে বলেন যে, বলপ্রয়োগে কুণ্ঠাহীনতা আর নিষ্ঠুরতা এক বস্তু নয়। তাঁর যুক্তিটা আমার ভাল লেগেছিল। যুদ্ধ আর ঝগড়ার পার্থক্যটাও তিনি আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন। রাজনীতিতে আমি কখনও সক্রিয়ভাবে যোগ দিইনি, তবে 'জনযুদ্ধে'র ব্যাপারটা আমার ভাল লাগত না। সোভিয়েট রাশিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সেই যুদ্ধ অমনি 'জনযুদ্ধ' হয়ে গেল, এই অদ্ভুত তত্ত্ব আমি মেনে নিতে পারিনি। অথচ মজা এই যে, আলি সর্দার প্রমুখ যে-সব ছাত্র-নেতা এই তত্ত্বের কথা বলতেন, তাঁদের সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা ছিল; অন্যদিকে, যাঁরা এর বিরোধিতা করতেন, তাঁদের সম্পর্কে ছিল না। শেষ পর্যন্ত ডঃ অটলই ব্যাপারটা আমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলেন, এবং আমি কিছুটা শান্তি পাই।

* * *

ডঃ অটলের কথায় ছাত্রীদের যে সভায় আমি গিয়েছিলুম, তার ধরন-ধারণ এতই অদ্ভুত ঠেকতে থাকে যে, প্রথম যোগাযোগের সঙ্গে-সঙ্গেই বিয়াল্লিশের আন্দোলন সম্পর্কে আমার উৎসাহ একেবারে নিভে যায়। দরজা খুলে মনে হল, ঘরের মধ্যে যেন একটা ছেলেমানুষী চক্রান্ত চলছে। যারা সেখানে সমবেত হয়েছিল, সন্দিগ্ধ চোখে তারা আমাকে দেখতে থাকে। কেউ কোনও কথা বলে না, শুধু চোখে-চোখে বার্তা-বিনিময় হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত একজন সম্মতিসূচকভাবে ঘাড় নাড়লেন, এবং আমাকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হল। বুঝতে পারা গেল, এই বিশেষ গোষ্ঠীর কাজ হচ্ছে শুধুই টাকা তোলা। তারই জন্যে তখন একটা কর্মসূচী ছকে নেওয়া হচ্ছিল। ঠিক হল যে, আমরা বাড়িতে-বাড়িতে যাব, এবং বোম্বাইয়ে পুলিশ যে নিষ্ঠুর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে, সবাইকে তার বিবরণ দেব। বলব, পুলিশের গুলিতে কীভাবে হাজার-হাজার মানুষ নিহত এবং আরও অসংখ্য হাজার মানুষ আহত হয়েছে। সবকিছু আমাদের বাড়িয়ে বলতে হবে। যাতে জনসাধারণের মনে সমবেদনা জাগে, এবং মুক্তহস্তে তারা আমাদের টাকা দেয়। আর জনসাধারণ যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করে? তাহলে তাদের বলতে হবে, সরকার সব কাগজগুলোকে কিনে নিয়েছে, তাতে তাই হতাহতের আসল সংখ্যা ছাপা হয় না। কয়েকটি দলে আমাদের ভাগ করে দেওয়া হল; বলে দেওয়া হল, কোন্ দল কোন্ মহল্লায় কাজ করবে। জনসাধারণ আমাদের অতিশয়োক্তি বিশ্বাস করবে কিনা, সে-বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমি নিরুপায়। দলের সঙ্গে টাকা জোগাড় করতে বার হলুম। কিন্তু যা ভেবেছিলুম,

তাই ঘটল। কেউ আমাদের পাত্তা দিল না। বাস্, আমার অভিযানেরও ওইখানেই ইতি।

তবে, আমার এই অভিজ্ঞতাই যে সর্বজনীন অভিজ্ঞতা, তা নয়। বিয়াল্লিশের আন্দোলন যে প্রথম দিকে খুবই সফলভাবে চলেছিল, জনসাধারণ যে তাতে অভূত-পূর্বভাবে সাড়া দিয়েছিল, এবং তাদের মধ্যে যে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এক আশ্চর্য আলোড়ন দেখা দিয়েছিল, কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না। এর আগে তো জয়প্রকাশের নাম বিশেষ কেউ জানত না। কিন্তু রাতারাতি তিনি 'হীরো' হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে তিনি যুবসমাজের 'হীরো'। অন্যান্য সব নেতা এমন কী নেহরুও, যেন সেই তুলনায় তখন কিছুটা নিষ্প্রভ। এই আন্দোলনে সবচেয়ে সক্রিয় ও উল্লেখ-যোগ্য ভূমিকা ছিল ছাত্রসমাজের। তারাই ছিল আন্দোলনের পুরোভাগে। তবু স্বীকার করব, এর মধ্যে এমন কিছু ছিল, যার তাৎপর্য আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারতুম না। এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলুম যে, যে-আন্দোলন সহিংস, অন্তত গান্ধীজী যতদিন বেঁচে আছেন, কোনক্রমেই কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের পক্ষে ততদিন সেই আন্দোলনকে সমর্থন করা সম্ভব নয়। এই আন্দোলন এতই সুসংগঠিত যে, একে সর্বতোভাবে স্বতঃস্ফূর্ত বলা যায় না। আমার এক কাকা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে শুনেছিলুম যে, অন্তত তিন-চার মাস আগে-আগেই এই আন্দোলনের সবিস্তার কার্যসূচীর বিষয়ে গোয়েন্দা-বিভাগের রিপোর্ট তাঁরা পেয়ে যেতেন। যে কারণেই হোক, বিয়াল্লিশের আন্দোলনের তাৎপর্য আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। অহিংসায় আমার আস্থা ছিল না, গান্ধীবাদেও এর অনেক আগেই আমি বিশ্বাস হারিয়েছিলুম; তবু মনে হত, বিয়াল্লিশের আন্দোলনের নেতারা যে-ধরনের হিংসাত্মক কর্মসূচীর আশ্রয় নিয়েছেন, তা ঠিক নয়, এর মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতার ভাবটা যেন বড়ই প্রকট। অন্যদিকে, ছাত্রদের নানা অসমসাহসিক কাজের কথা যখন কানে আসত, যখন শুনতুম যে, এখানে-ওখানে তারা সেতু উড়িয়ে দিচ্ছে, রেলের লাইন উপড়ে ফেলে ট্রেন-দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে কিংবা সরকারী দফতরে গিয়ে হানা দিচ্ছে, তখন এই আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীনও থাকতে পারতুম না। যতই হোক, আমার বয়স তখন অল্প। ওই বয়সে দেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে নির্লিপ্ত থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

নেহাতই দু'-এক জন ছাড়া আমাদের মধ্যে কেউ আন্দোলনে যোগ দেয়নি। তবে মনের দিক থেকে আমরা সকলেই এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলুম। কেউ কম, কেউ বেশী। ফলে গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ করা বলতে গেলে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ও অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ, তাই পড়াশুনোতেও আদৌ মন বসতে চায় না। সময় কাটানোই শক্ত হয়ে দাঁড়াল। চতুর্দিকে একটানা হাঙ্গামা চলছে, তার সঙ্গে চলছে গুপ্ত বৈঠক আর কার্যকলাপ। সেইসব খবর শুনে আমরা ছটফট করি, কিন্তু আমাদের উদ্যম কোনও প্রকাশের পথ পায় না। তার উপরে আবার আত্মীয়স্বজন আব বন্ধুবান্ধবদের ভিড় সর্বদা লেগেই রয়েছে, সেই ভিড়ের মধ্যে যেন আরও হাঁফিয়ে উঠি। ভিড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াই; অথচ করবার মতো কোনও কাজ পাই না। সারাক্ষণ তাই আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করে তারই মধ্যে সবাই ডুবে থাকতে চেষ্টা করি। কিন্তু ওইভাবে কি খুশী হওয়া যায়! অবিরাম প্রমোদ যে কী ভীষণ ক্লান্তিকর একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে পারে, সেই প্রথম তা বুঝতে পারলুম। নিজেকে সর্বদা ক্লান্ত লাগত।

জ্ঞাতি-ভাইবোনেরা আছে; আছে জ্ঞাতি-ভাইবোনেদের জ্ঞাতি-ভাইবোনেরা। তা ছাড়া আরও অনেক অল্প-পরিচিত লোকজন তখন লখনউয়ে এসে জড় হয়েছিল। দুপুর আর রাত্রির খাওয়ার মধ্যে তো মস্ত অবসর; সেইসময়ে আমরা এখানে-ওখানে সমবেত হতুম। একবারের কথা মনে পড়ে। কফি-হাউসে গিয়ে দেখি, জোড়ায়-জোড়ায়

সবাই সেখানে এসে জড় হচ্ছে। টেবিলের পর টেবিল জুড়েও জায়গা হতে চায় না। শেষে গুনে দেখা গেল, দলে আমরা তেতাল্লিশ। তা সবসময়ে তেতাল্লিশে না পৌঁছক, সংখ্যাটা কোনও সময়েই নেহাত কম হত না। যে-ধরনের আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হত, তা নির্দোষ ঠিকই, তবে উদ্যমের অপচয় ছাড়া এ তো আর কিছুই নয়, সেই অপচয়ের ছাপ আমাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠতে লাগল। অধিকাংশ সময়েই খেলাধুলো কিংবা গানবাজনার ব্যবস্থা হত। রেকর্ড বাজত, তার সঙ্গে তাল রেখে কেউ-কেউ হয়ত নাচতও।

ঠাট্টা করে আমরা বলতুম 'গ্যাং'। তাদের হুল্লোড়ে আমার বিরক্তি ধরে গিয়েছিল, অথচ নিজেকে তার নাগপাশ থেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যও আমার তরফে কোনও চেষ্টা ছিল না। মনে হত, ইচ্ছাশক্তি বলতে যেন আর কিছুই আমার নেই। দলের সঙ্গেও আমি ছিলুম না, আবার তা থেকে বেরিয়েও আমি আসিনি। কিছুকাল বাদে জানতে পারলুম যে, দলে যারা অল্পবয়সী, তারা একটু বাড়াবাড়ি শুরু করেছে; যে-ধরনের মেলামেশার ব্যবস্থা করছে তারা, তাকে 'পেটিং পার্টি' বললেই ঠিক হয়। এই ধরনের 'ঢলাঢলির' কোনও অভিজ্ঞতাই আমার ছিল না। বলতে কী, আমার ধারণা ছিল যে, এ-সব নেহাতই মার্কিনী ব্যাপার। যাই হোক, আমার বয়স তো তাদের চেয়ে বেশী। মনে হতে লাগল, এ ব্যাপারে আমার একটা দায়িত্ব আছে। ব্যাপারটা এদের বাপ-মাকে জানাব কিনা, ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলুম না। ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের আচরণের আমি ঘোর বিরোধী; এদের চাউনির মধ্যে যে উগ্রতা আর চটুলতা প্রকাশ পেতে দেখি, তাও আমার খুবই খারাপ লাগে। অন্যদিকে আমার মনে হচ্ছিল যে, আসলে নিশ্চয় ব্যাপারটা খুব গুরুতর হয়ে দাঁড়ায়নি। ফলে, চিন্তাভাবনা করে স্থির করলুম যে, এ নিয়ে আমার কিছু বলা ঠিক নয়। মনে পড়ে, আমরা কয়েকজনে তখন জ্যোতিষ নিয়ে খুব মাথা ঘামাতুম। কিরোর লেখা বইগুলো তখন খুব উৎসাহভরে পড়েছি। বন্ধুবান্ধবদের হাত দেখে বলে দিতুম, কার ভাগ্যে কী আছে। আমার এক জ্ঞাতি-বোনের হাত দেখে সেইসময়ে বলেছিলুম যে, তার বিয়ে হতে দেরি হবে। হাতের রেখা দেখে অন্তত সেইরকমই আমার মনে হয়েছিল। তা সেং ভবিষ্যদ্বাণী শুনে সে তো রেগে কাঁই। আমিও অপ্রস্তুতের একশেষ। আসলে সবাই যে আমার মতো নয়, অনেকেই যে বিয়ের জন্যে ব্যাকুল, এই সহজ কথাটাই আমার খেয়াল হয়নি। যাই হোক, একদিকে যখন আমি এইসব ব্যসনে মেতে আছি, অন্যদিকে তখনও আমি হরেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলুম। মাথা ঘামাচ্ছিলুম জীবনের সমস্যা আর উদ্দেশ্য নিয়ে। ভাবছিলুম, প্রস্তরীভূত এই অরণ্যের কবল থেকে কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যায়।

বিস্তর ভাবনাচিন্তা আর আত্মসমীক্ষার শেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গেল যে, উপর-উপর সংস্কার করে লাভ নেই, সমাজটাকে যদি পালটাতে হয়, তবে একেবারে এর ভিতসুদ্ধ নাড়া দিতে হবে। দরকার আমূল পরিবর্তন। এবং সে-কাজ একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই হতে পারে। তখন আমার মনে হতে থাকে যে, কমিউনিজমই একমাত্র পথ, যা অবলম্বন করলে ব্যক্তির মুক্তি সম্ভব। সামাজিক বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে—যথা, এই পথেই দারিদ্র্যমোচন সম্ভব, এমন কথা ভেবে—অনেকে কমিউনিজমে বিশ্বাসী হয়েছেন। আমি সেক্ষেত্রে খুঁজে ফিরছিলুম যে, ব্যক্তির মুক্তি কোন্ পথে। আমার মনে হত, বর্তমান সমাজে কোনও স্বাধীনতা নেই। তাই মরিয়া হয়ে আমি এই নূতন সমাজ-ব্যবস্থার দিকে চোখ ফিরিয়েছিলুম। আশা করেছিলুম, এই নূতন সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তির (এ-ক্ষেত্রে আমার) স্বাধীনতা হবে নিরঙ্কুশ। ডি. পি. মুখার্জীর বাড়িতে একটা আলোচনা-বৈঠক বসত; মোটামুটি এই সময়েই আমি সেই বৈঠকের কথা জানতে পারি। দলের থেকে পালিয়ে আমি সপ্তাহে দুদিন

সেই বৈঠককে যেতে শুরু করি। সেখানে আমার মনের ক্ষুধার খোরাক মিলত। যেন এক আশ্চর্য নিষ্কৃতি পেয়ে গেলুম।

'কনটেম্পোরারি পোলিটিক্যাল থট' অর্থাৎ 'সমসাময়িক রাজনৈতিক ভাবনা' ছিল এম.এ.-তে আমার অন্যতম পাঠ্য বিষয়। তার অনেকটা অংশই জুড়ে ছিল বিশ শতকীয় মার্ক্সবাদ। কিন্তু গোড়াগুড়ি মার্ক্সের বিষয়ে না জেনে তো বিশ শতকীয় মার্ক্সবাদ ভাল করে বোঝা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। অধ্যাপক মেনন মার্ক্সীয় দর্শনের বিভিন্ন সূত্রের বিষয়ে আমাদের ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন। মার্ক্সের কোনও বই কিন্তু আমাদের পড়ানো হত না। পড়ানো হত শুধু সেই সম্পর্কে কোল্, ল্যাসকি প্রমুখ পণ্ডিতদের টীকা আর ভাষ্য। অথচ আমরা নিচু ক্লাসের ছাত্র নই, এম.এ. পরীক্ষা দিতে চলেছি। ক্লাসে একবার এই বিষয়ে একটা তর্ক উঠেছিল। মনে পড়ে, কোল্-এর একটি উক্তির বিষয়ে বলতে গিয়ে অধ্যাপক মেনন তখন বলেছিলেন যে, মার্ক্স যা বলতে চেয়েছেন, কোল্ তা এক্ষেত্রে বোঝেননি; মার্ক্স যা বলেছেন বলে তাঁর ধারণা, কোল্ তাই লিখেছেন। আলোচনা সেদিন ক্রমেই ধোঁয়াটে হয়ে উঠেছিল। তবে 'সমসাময়িক রাজনৈতিক ভাবনা' সম্পর্কে ক্লাসে যে বক্তৃতা দেওয়া হত, তার থেকেই মার্ক্সবাদের মূল সূত্রগুলি আমি বুঝে নিয়েছিলুম। মার্ক্সীয় তত্ত্বের সারবত্তা সম্পর্কে তখনই আমার বিশ্বাস জন্মায়। তবে, অনেক প্রশ্নের উত্তর তখনও আমি পাইনি, অনেক সংশয় তখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। আলোচনা-বৈঠকে সেইসব প্রশ্ন-সংশয়ের মীমাংসা করে নেবার একটা চমৎকার সুযোগ পাওয়া গেল। শিক্ষক হিসেবে ডি. পি. মুখার্জীর তুলনা হয় না। নানান জটিল বিষয় তিনি সহজ করে বুঝিয়ে বলতে পারতেন। শ্রোতাদের সঙ্গে নিজের কোনও ব্যবধান রাখতেন না। তবে আমাদের প্রত্যেকেরই উপলব্ধিতে তো কোথাও-না-কোথাও একটা গাঁট থাকে। আমারও ছিল। কোনও বিষয় একবার সেখানে আটকে গেলেই হল; হাজার যুক্তি আর ব্যাখ্যাতেও সেই গাঁট কিছুতেই পার হওয়া যেত না।

এই একটা কথা ভেবে আমার অবাক লাগত যে, মার্ক্স বস্তুত কী বলতে চেয়েছেন, কোল্ আর অধ্যাপক মেননের মতো দুই পণ্ডিতও যদি সে-বিষয়ে একমত না হতে পারেন, কোনও কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের কোটি কোটি মানুষ তাহলে কোনও বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় কী করে? দ্বান্দ্বিক জড়বাদ অথবা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা তো মানুষের মাথা থেকেই বার হয়েছে, এবং যতই নৈর্ব্যক্তিক হোক, এ-সব তত্ত্বকে তো আর 'দুই আর দুইয়ে চার'-এর মতো একটা ফর্মুলায় ফেলে বিচার করা যায় না। কাচের স্লাইডে যেভাবে রক্ত মাখানো হয়, কোনও স্লাইডে কি সেইসব দ্বন্দ্ববাদ আর ইতিহাসকে মাখিয়ে নিয়ে অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের তলায় ফেলে পরীক্ষা করে দেখা যাবে? সংখ্যায় যারা কম, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সিদ্ধান্তকে, অন্তত তখনকার মতো, তাদের মেনে নিতে হবে, তত্ত্ব হিসেবে এই কথাটা মোটেই মন্দ নয়; কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগের সময় অসংখ্য বিঘ্ন দেখা দেবার আশঙ্কা। উপরন্তু সমাজবাদী রাষ্ট্রের সংখ্যা যখন বাড়বে, অবস্থাটা তখন কী দাঁড়াবে? দুটি রাষ্ট্রই কমিউনিস্ট এবং মার্ক্সে বিশ্বাসী, স্রেফ এই কারণেই কি তাদের মধ্যেকার যাবতীয় ব্যবধান লোপ পেয়ে যাবে? তা কিছুতেই সম্ভব নয়। ব্যাখ্যার ব্যাপারে দুই রাষ্ট্রের জনসাধারণ যদি দুই ভিন্ন-ভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছয় এবং প্রত্যেকেই যদি দাবি করে যে তার ব্যাখ্যাটাই নির্ভুল, তাহলে? ১৯৪২ সনের কথা। দ্বিতীয় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের অভ্যুদয় তখনও আসন্ন বলে কারও মনে হয়নি। ফলত, যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় সত্ত্বেও, কমিউনিজমকে তখন আমি পৃথিবীর সর্বসমস্যার, এমন কী আমার ব্যক্তিগত সমস্যারও, সমাধান বলে মনে করতুম।

* * *

দশহরার পরে আবার বিশ্ববিদ্যালয় খুলল। কিন্তু ইতিমধ্যে তিন-তিনটি মাস অতিবাহিত হয়েছে, এবং সেই তিন মাসে সবকিছুই পালটে গেছে। দেখেই বুঝলুম, এই বিশ্ববিদ্যালয় আর সেই বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এবং এই ছাত্ররাও আর সেই ছাত্র নয়। যে-বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে, স্বাদটাকে কি কখনও সে ভুলতে পারে? ছাত্ররা কি আবার হতে পারে শান্ত, স্বাভাবিক? আমরা তো আন্দোলনে যোগ দিইনি, দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখেছিলুম মাত্র; কিন্তু দৃষ্টির অগোচরে আমরাও যেন পালটে গেছি। আমরা আর সেই আমরা নই। কোনও-কিছুতেই আর আগের মতো মনোনিবেশ করতে পারি না, ক্লাসে বসে থাকতে পারি না, শান্ত হয়ে বক্তৃতা শুনতে পারি না। শরীর আর মন দুই-ই এতকাল একটা নিয়মের নিগড়ে বাঁধা ছিল। সেই নিগড় যেন একেবারেই খসে গেছে। তা ছাড়া পড়াশুনোও যেন তার তাৎপর্য হারিয়েছে। একদিন অন্তর একদিন ধর্মঘট হয়, ছাত্র-সমাজ যেন কিছুতেই আর সেই পুরনো রুটিনে মন বসাতে পারছে না। ছাত্রদের মেজাজ যে তখন কীরকমের চড়া সুরে বাঁধা, ছোট্ট একটা বিরোধের দৃষ্টান্ত থেকেই সে-কথা বোঝা যাবে। পরে এটার নামই হয়ে গিয়েছিল পতাকা-বিরোধ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পার হয়ে সেদিন ভিতরে ঢুকেছি। দেখি, মূল ভবনের চারিদিকে এক মস্ত জনতা। সবাই চেঁচাচ্ছে। সকলের দৃষ্টিই ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ। তাই দেখে আমিও উপর-দিকে তাকালুম। দেখি, ক্যানিং কলেজের চূড়ায় একটা ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে। আগে কখনও পতাকা উড়ত কিনা জানি না। আমি অন্তত গত তিন বছরের মধ্যে ওখানে কোনও পতাকা উড়তে দেখিনি। একটি ছেলে তো খাড়া সেই চূড়ো বেয়ে উঠে গেল, তারপর দড়ি কেটে ইউনিয়ন জ্যাকটাকে নামিয়ে তার বদলে সেখানে কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়িয়ে দিল। বুঝতে পারলুম না, কে ওখানে ইউনিয়ন জ্যাক উড়িয়েছিল। পরদিন এসে দেখি, আর এক কাণ্ড। আগের রাত্তিরেই কেউ ত্রিবর্ণ পতাকাটিকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা লাল পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। নভেম্বর মাস, রোদ্দুরের মধ্যে লাল পতাকা উড়ছে, দেখতে দেখতে আবার সেখানে ভিড় জমে গেল। আবার হট্টগোল, আবার স্লোগান। ছেলেদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ধস্তাধস্তিও চলতে লাগল। তারই মধ্যে নামিয়ে ফেলা হল লাল পতাকা। পরদিন আর-এক দিক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে ছাত্রীদের কমনরুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময়ে শুনতে পেলুম যে, জোর শংখঘণ্টা বাজছে। বুঝতে পারলুম না, কোথায় বাজছে, কারা বাজাচ্ছে। কাছে তো কোনও মন্দির নেই। শিগগিরই অবশ্য ব্যাপারটা বোঝা গেল। দেখলুম, নীল আকাশে গৈরিক পতাকা উড়ছে, তার নীচে হিন্দু-মহাসভাপন্থীদের ভিড়। কেউ ঘণ্টা বাজাচ্ছে, কেউ শাঁখে ফুঁ দিচ্ছে, কেউ কেউ আবার 'থালি' হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। থালিতে কুমকুম আর চন্দন। হাতের কাছে যাকে পাচ্ছে, তাকেই কুমকুম আর চন্দনের তিলক এঁকে দিচ্ছে তারা। 'থালি' হাতে একজন তো আমার দিকে এগিয়ে এল। চেষ্টা করল আমার কপালে একটা তিলক এঁকে দিতে। কিন্তু ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে আমি গিয়ে মেয়েদের কমনরুমের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। ভীষণ খারাপ লাগছিল আমার। কান্না পাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশটা যেন দূষিত হয়ে গেছে।

পতাকা-বিরোধের উপসংহারটা হয়েছিল উল্লেখযোগ্য। পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে দেখি, গৈরিক পতাকাও অদৃশ্য। তার জায়গায় ঘোর বাদামী রঙের একটা পতাকা উড়ছে। তার উপরে জ্বলজ্বলে সোনালী হরফে লেখা "Eat, Drink and be Merry"। খাও-দাও, ফুর্তি করো।

* * *

বছর ফুরিয়ে আসছিল। সেইসঙ্গে ফুরিয়ে আসছিল আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-জীবন। এর পরে কী করব? সামনে তো ধূধূ মরুভূমি ছাড়া আর কিছুই নেই। তার মধ্যে মরূদ্যানের কোনও চিহ্নও তো চোখে পড়ে না। ব্যাঙ কাটতে হবে বলে ডাক্তারি পড়তে পারিনি; আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল বলে আইনজীবী হওয়া গেল না; স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল বলে বি.এ. পরীক্ষায় একটা তৃতীয় শ্রেণী জুটেছে, ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার চাকরি কখনো মিলবে না। কী বৃত্তি নেব তাহলে? কী রকমের চাকরি আমি আশা করতে পারি? ইশকুলের চাকরি ছাড়া তো আর কিছুই আমার জুটবে না। শিক্ষিকার বৃত্তি নিতে কোনওদিনই আমার বিশেষ উৎসাহ নেই, কিন্তু কী আর করা যাবে, নেই মামার চেয়ে কানা মামাও ভাল, এই কথা ভেবে নিজেকে প্রবোধ দিতে লাগলুম, এবং এমন একটা ভাব দেখাতে লাগলুম যে, ইশকুলের চাকরিই বা মন্দ কী। তবে, সেক্ষেত্রেও তো যোগ্যতা অর্জনের একটা প্রশ্ন আছে। তাই এই সময়েই এলাহাবাদের সরকারী টীচার্স' ট্রেনিং কলেজে একটা আসনের জন্য আমি দরখাস্ত পাঠিয়ে দিই।

সহজে কিছুই মেলে না। এমন কী, টীচার্স' ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হওয়াও দেখলুম শক্ত ব্যাপার। তার জন্যেও সুপারিশ চাই। আমার এক মামা এলাহাবাদের সরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যক্ষ। জনশিক্ষা দপ্তরের ডিরেক্টরকে তিনি চেনেন। তা ডি পি. আই. যদি আমাকে সুপারিশ করেন, তবে আর আমার ভাবনা থাকে না। ঠিক করলুম, এলাহাবাদে গিয়ে ডি. পি. আই.-এর সঙ্গে দেখা করব। মাকে ধরে বসলুম, আমার সঙ্গে তাঁকে এলাহাবাদে যেতে হবে। দিদি তো তখন এলাহাবাদের বেসিক ট্রেনিং কলেজে পড়ছিল। এর আগে এক চিঠিতে সে জানিয়েছিল যে, বড়দিনের ছুটিতে লখনউয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। দিদিকে অনেক দিন দেখেননি, মায়ের তাই লখনউয়ে ভাল লাগছিল না, আমার সঙ্গে এলাহাবাদে যাবার কথা বলতেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

এলাহাবাদে মামার বাড়িতে পৌঁছে শুনি, দিদি তার কলেজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দল বেঁধে বাইরে গেছে। বারাণসী, সারনাথ ইত্যাদি সব জায়গায় তারা ঘুরবে। শুনে তো আমি অবাক। দল বেঁধে বেড়াতে গেছে, অথচ বাবা-মা'র অনুমতি নেওয়া তো দূরের কথা, ব্যাপারটা তাঁদের জানায়নি পর্যন্ত। ভেবেছিলুম, দিদির কাণ্ড দেখে মা খুব রেগে যাবেন। কিন্তু, মায়ের কাছে কথাটা তুলতে তিনি খুব শান্তভাবেই বললেন, "কিছু যদি করতেই হয়, তবে তোর মতন এত রাগারাগি-ঝগড়াঝাঁটি না করে, এইরকম নিঃশব্দে করাই ভাল।" নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। এই তাহলে ব্যাপার? কোথায় যাচ্ছি, কী করছি, এতকাল তাহলে আমারও তা চেপে যাওয়াই উচিত ছিল? দেখলুম, যা-ই করি, তাতেই আমার দোষ।

পোশাক কিংবা চেহারা নিয়ে কখনও আমি মাথা ঘামাইনি। ডি. পি. আই.-এর সঙ্গে দেখা করতে যাবার দিন কিন্তু এ-সব ব্যাপারে খুব যত্ন নিয়েছিলুম। ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হবার জন্যে আমি তখন মরিয়া। তাই, কী বলব, কীভাবে বলব, সর্ব-ব্যাপারে সেদিন আমি হুঁশিয়ার। ডি. পি. আই. জিজ্ঞেস করলেন, আমার বয়স তো মাত্র কুড়ি বছর, তাহলে ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হবার জন্যে আমার এত তাড়া কিসের? বললুম, এই বছরই আমি এম. এ. দিচ্ছি। চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে না, তাই কিছু-একটা নিয়ে থাকতে চাই। তাই শুনে তিনি বললেন, এম. এ. পাশ মেয়ে এ-দেশে এখনও অতি দুর্লভ, তাহলে আমি মাস্টারির চেয়ে আর-একটু ভাল চাকরির কথা ভাবছি না কেন? জবাবে অম্লানবদনে বললুম, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতেই

আমার ভাল লাগে, তাতেই আমার আনন্দ। সাক্ষাৎ শেষ হল। তিনি যে আমাকে কোনও পাকা কথা দিলেন, তা নয়, তবে তাঁর ভাব দেখে মনে হল, আসল একটা মিলবেই। আমার মন থেকে যেন মস্ত একটা ভার নেমে গেল। অদৃষ্টের কী পরিহাস! যে-বৃত্তিকে বরাবর অপছন্দ করেছি আমি, এখন তারই জন্যে আমার এত চেষ্টা।

* * *

শীতের দুপুর। একটু আগে মধ্যাহ্নভোজের পাট চুকেছে। বাড়ির সামনের লনে আমরা জানুয়ারির মিঠে রোদ্দুরে বসে আছি। আমি আর আমার এক কাকা। আমার এই কাকাটি একজন খ্যাতিমান উর্দু কবি। দরাজ মনের, মধুর স্বভাবের মানুষ। গতানুগতিকতার ধার ধারেন না।

কথায়-কথায় তাঁকে বললুম, "নিজের সম্পর্কে আমি একটা বই লিখতে চাই।"

শুনে তিনি বললেন, "তোমার জীবনে এমন কী আছে, যাতে তোমার কথা শুনতে অন্যের আগ্রহ হতে পারে?"

প্রশ্নটার কোনও উত্তর দিতে পারলুম না। তাই তো, আমি লিখতে চাই ঠিকই, কিন্তু 'অন্য'দের অর্থাৎ পাঠকদের কথা তো আমি কখনও ভেবে দেখিনি।

লিখবার ইচ্ছা আমার নতুন নয়। বরাবরই এই ইচ্ছা আমি লালন করেছি। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে কোনও-না-কোনও বিষয়বস্তুর কথা ভেবেছি; যা নিয়ে লেখা যায়। কিন্তু এমন কথা তো কখনও মনে হয়নি যে, কিছু লেখা মানেই অন্যকে তা শোনাবার ব্যাপার। না, তা কখনও মনে হয়নি। যখনই কোনও কিছুর সম্পর্কে আমার আগ্রহ জেগেছে, কিংবা কোনও-কিছু দেখে বিস্ময়বোধ করেছি, তখনই ইচ্ছা হয়েছে, কাগজের উপরে আমার অভিজ্ঞতার কথাটা আমি ধরে রাখি। যেন লেখাটা একটা জাদুমন্ত্রের ব্যাপার। লিখলেই অমনি ব্যাপারটাব তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। মনে-মনে হয়ত আমি নিঃসঙ্গ ছিলুম। হয়ত মনে হত, কেউ আমাকে বুঝতে পারবে না, কারও কাছে সহানুভূতি পাওয়া যাবে না। কে জানে, হয়ত সেই কারণেই লেখার ব্যাপারটাকেই আমি সঙ্গী কবে নিয়েছিলুম। লেখা আমাব কাছে নিজের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপার; অন্যকে কিছু শোনাবার ব্যাপার নয়।

শৈশবে বাবা-মাকে দেখে বড় অবাক লাগত। দেখতুম, সারাক্ষণ তাঁদের মধ্যে ঝগড়া আর খিটিমিটি লেগে আছে। ঝগড়া করতে করতে মা হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলতেন। কেন কাঁদতেন, আমি বুঝতে পারতুম না। একসময়ে ইচ্ছে হয়েছিল, এইসব দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে একটা উপন্যাস লিখব। হয়ত ভেবেছিলুম, লিখতে-লিখতেই এইসব ব্যাপারের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এই ঝগড়া আর এই কান্নাকাটির যোগ-সম্পর্কটা বুঝতে পারব।

ঠিক করেছিলুম, এই প্রথম উপন্যাসের নাম দেব 'ব্রিজ'। বইয়ের মলাটের ছবি কী হবে, তাও ভেবে রেখেছিলুম। ছবির ঠিক মাঝখানে ছড়িয়ে থাকবে এক প্যাকেট তাস। উপরের দিকে একটা টেবিল ঘিরে বসে থাকবে চারজন লোক। তারা তাস খেলছে। তলায় দেখা যাবে পাশাপাশি চারটে বিছানা। একটায় আমার মা। বসে বসে তিনি কাঁদছেন। একটায় আমার দিদি। সে ঘুমোচ্ছে। একটায় আমি। ঘুমের ভান করে শুয়ে আছি। আর চতুর্থ বিছানাটি, বলাই বাহুল্য, শূন্য।

বড় হয়ে তো অনেক বই পড়ি। তখন সেই বইয়ের পৃষ্ঠার মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দেখতে পাই যে, কারও সঙ্গেও আমার ঠিক মেলে না। ইংরেজ, রুশ, ফরাসী, মার্কিন—কত লেখকের কত উপন্যাসই তো পড়লুম। যা একটু অস্থির, কিংবা অপ্রত্যাশিত—শুধু সেইরকমের বিষয়বস্তু নিয়েই যে উপন্যাস লেখা

হয়ে থাকে, তা তো নয়। বরং বলতে পারি, যে-সব চরিত্রের আবেদন সর্বজনীন, অর্থাৎ অনেকে যার মধ্যে তাদের পরিচিত জগতের আদল খংজে পায়, সেইসব চরিত্রকে অবলম্বন করে লেখা উপন্যাসেরই অনেককাল টি'কে থাকবার সম্ভাবনা। মেনে নিচ্ছি, ইউরোপীয় জীবনের পটভূমি আর ভারতীয় জীবনের পটভূমি এক নয়; কিন্তু তা না-ই হোক, আমার অভিজ্ঞতা আর আমার অনুভূতির সঙ্গে ভিনদেশী একটি মেয়েরও অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভূতির কোনও মিল থাকবে না? এই বিপুল বিশ্বে আমার মতো মেয়ে আর-একটিও খংজে পাওয়া যাবে না? এ কি সম্ভব? তবে কেন কোনও বইয়ের কোনও মেয়ের মধ্যেই আমার প্রতিচ্ছবি আমি ফুটে উঠতে দেখি না? ওয়েল্‌স্‌-এর 'অ্যান ভেরোনিকা'র মধ্যে যেন আমারই কথার একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছিলুম। কিন্তু বড়ই ক্ষীণ সেই প্রতিধ্বনি। আর তাই, কোনও বইয়ের মধ্যেই যেহেতু নিজেকে আমি ঠিকমতো খংজে পাচ্ছি না, ঠিক করেছিলুম যে, নিজেকে নিয়েই একটা উপন্যাস লিখব। আমার মতো কতশত মেয়ে রয়েছে, তাদেরই প্রতিনিধি হিসেবে —একটা টাইপ হিসেবে—নিজেকে সেখানে চিত্রিত করব আমি। যে সময়ের, যে যুগের মধ্যে আমি নিশ্বাস নিয়েছি, তারই প্রতিনিধি হিসেবে চিত্রিত করব। বাস্‌, এইটুকুই আমার বাসনা। কিন্তু মামাকে ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পরিকল্পনার কথাটা আমি বুঝিয়ে বলতে পারিনি।

নিজের বিষয়ে লিখতে চেয়েছিলুম। কিন্তু সেই লেখা যে অন্যেরা পড়বে, তা আমার ভেবে দেখা হয়নি। মামার মন্তব্য শুনে অতঃপর তাই নিয়েও ভাবতে লাগলুম। কীজন্যে আমি লিখতে চাই? কাদের জন্যে লিখতে চাই? মনের মধ্যে উ'কি মারতে লাগল এই রকমের নানান প্রশ্ন। তার ফল দাঁড়াল এই যে, প্রশ্নের জালেই আমি জড়িয়ে যেতে থাকি, লেখা আর হয় না।

* * *

পড়াশুনোর ব্যাপারটা ইতিমধ্যে একেবারে অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিনের জন্য বন্ধ থাকায় ক্লাস হতে পারেনি, এখন নতুন করে ক্লাস শুরু হবার পরে ঊর্ধ্বশ্বাসে কোর্স শেষ করবার চেষ্টা চলছিল, সে এক উন্মত্ত পরিস্থিতি। যাবতীয় পাঠ্যবইয়ের মধ্যে মাত্র দুখানা আমরা পড়ছিলুম। প্লেটোর 'রিপাবলিক' আর রুশোর 'সোশ্যাল কনট্রাক্‌ট'। বাদবাকী বইয়ের ব্যাপারে শুধু নোটই আমাদের ভরসা। বাজার-চলতি নোটের সঙ্গে ক্লাসের নোটের যে বিশেষ পার্থক্য ছিল, তাও নয়। পঁচিশটি টাকার বিনিময়ে তার পুরো এক সেট কেনা যেত। অর্থাৎ 'আন্তর্জাতিক আইন' অথবা 'রাষ্ট্রনৈতিক তত্ত্ব' সম্পর্কে ছাত্ররা যে জ্ঞান অর্জন করত, তার দাম নেহাতই পঁচিশ টাকা! ডিগ্রী পাবার ব্যাপারে যদি সাহায্য হয়, তবে বাজার-চলতি নোটবইকেই বা আমি বর্জন করব কেন? 'প্লেটো থেকে বর্তমান কাল' পর্যন্ত প্রসারিত যাবতীয় পাণ্ডিত্য মাত্র পঁচিশ টাকায় পর্যবসিত হয়েছে। এই অবস্থায় এম.এ. ডিগ্রীর মূল্য সম্পর্কে যে আমি সম্পূর্ণ আস্থাহীন হয়ে পড়ব, তাতে আর বিচিত্র কী।

বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা আর অনাচারের একটা ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। বাইরে থেকে যে-সব বিশিষ্ট ব্যক্তি আসতেন, বক্তৃতা দেবার কোনও সুযোগই তাঁরা পেতেন না। কে বলছেন, কী বলছেন, সেদিকে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই, কেউ বক্তৃতা দিতে উঠবামাত্র তাঁকে থামিয়ে দেবার জন্যে ছেলেরা বেড়াল ডাকত, মেঝেতে পা ঘষত, ঘন-ঘন হাততালি দিত। এই যখন অবস্থা, তখন একদিন সরোজিনী নাইডু ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিতে এলেন। এর আগে তাঁকে আমি দেখেছি, কিন্তু তাঁর বক্তৃতা শুনিনি। তাঁর

সম্পর্কে আমার খুব শ্রদ্ধা ছিল। তাই এই ভেবে বড় অস্বস্তি হতে লাগল যে, তাঁর সভাতেও ছাত্ররা না অশোভন কিছু করে বসে। সমস্ত মর্যাদাবোধই তো তারা হারিয়েছিল। উদ্বেগটা সেইজন্যেই। কিন্তু না, পরে দেখলুম, এক্ষেত্রে আমার উদ্বিগ্ন না হলেও চলত।

আমার স্মৃতি যেন চলচ্চিত্রের ক্যামেরার মতো। প্রতিটি ছবিই সে একেবারে নিখুঁতভাবে ধরে রাখে। স্মৃতির সঙ্গে একটা শব্দগ্রহণ-যন্ত্র লাগানো থাকলে ব্যাপারটা একেবারে সবাক চলচ্চিত্র হয়ে দাঁড়াত। শ্রীমতী নাইডু মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, এই দৃশ্যটা এখনও মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাই। শুধু মুখেই তিনি কথা বলতেন না, তাঁর হাতের ভঙ্গিগুলোও যেন কথা বলে উঠত। কথাগুলো অবশ্য মনে নেই। কী বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাও না। কিন্তু কীরকম মহিমান্বিত ভঙ্গিতে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবং কীভাবে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তা স্পষ্ট মনে পড়ে। হল্ সেদিন ঠাস্-বোঝাই; কিন্তু নিঃশব্দ। একটা পিন্ পড়লেও যেন তার শব্দ শোনা যেত। শ্রোতাদের কারও মুখে একটি কথা নেই। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁরা বক্তৃতা শুনছিল। শ্রীমতী নাইডু তো এমনিতে খুব সুন্দরী নন। কিন্তু তাঁর তেজ, তাঁর প্রাণোচ্ছলতা, তাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্তি—সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিল, তিনি অপরূপ সুন্দরী। এমন আর একজনও মহিলা কিংবা পুরুষ আমি দেখিনি, যাঁর চাল-চলন অত তেজস্বী, কিংবা যাঁকে দেখবামাত্র অতটা শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে হয়, ভালবাসতে ইচ্ছে করে। চোখ বুজলে এখনও আমি দেখতে পাই, বক্তৃতা-মঞ্চে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। সুমধুর গলায় অনর্গল বক্তৃতা দিচ্ছেন।

সেদিনকার সভায় একজন উর্দু কবি একটি কবিতা পড়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর গভীর, কবিতাটিও ভাল। তবে কবিতাটির বক্তব্য আমার মনঃপূত হয়নি। বাড়ি ফিরেই সেদিন তার জবাবে আমি একটি কবিতা লিখি। সেই আমার শেষ কবিতা। •

*　*　*

দিনের পর দিন কত মুখস্থ করতে পারে মানুষ? কতটা ধরে তার মাথার মধ্যে? ঘেন্না ধরে যেত; ইচ্ছে করত, নোটগুলোকে আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করি। যখন আর পেরে উঠতুম না, তখন—মাথাটাকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্যে—একটা কোনও উপন্যাস টেনে নিয়ে পড়তে বসতুম। পরীক্ষার আগে তখন আমাদের ছুটি চলছে। মনে পড়ে, তারই মধ্যে আমি দস্তয়েফ্স্কির 'দি পজেজড্'-এর দু' ভল্যুম শেষ করেছিলুম। একবার শুরু করবার পরে আর শেষ না করে ছাড়তে পারিনি। কী মারাত্মক নৈরাশ্যের উপাখ্যান! নায়ক মুক্তি চেয়েছিল। কিন্তু, এমন কী, ভালবাসাও তার নির্যাতিত আত্মাকে মুক্তির বার্তা শোনাতে পারেনি। আমার মনের তখন যে অবস্থা, তাতে বইখানা আমার খুবই ভাল লেগে যায়। সত্যি বলতে কী, এমনভাবে কোনও বই আর কখনও আমার চিত্তকে গ্রাস করতে পারেনি। কিন্তু উপন্যাস পড়বার তখন সময় নয়। তাই ফের নোটবইয়ের জগতে ফিরে আসি। ঠিক সেই অবস্থাতেই—যেন দৈব আশীর্বাদের মতো—আমার এক জ্ঞাতি-ভাই এসে উপস্থিত হলেন। ইনিই তিনি, এলাহাবাদে থাকতে আমি যাঁর খুব ভক্ত হয়ে উঠেছিলুম। ১৯৩৫ সনে তিনি ইংল্যান্ডে চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি আমাকে চিঠি লিখতেন। আমিও তার উত্তর দিতুম। কিন্তু ক্রমে-ক্রমে চিঠির সংখ্যা কমে আসতে থাকে, তারপরে আমাদের পত্র-বিনিময় একসময়ে বন্ধও হয়ে যায়। আট বছরের ব্যবধান। এই আট বছরে তাঁর স্মৃতি একটু ধূসর হয়ে এসেছিল। তবু ছেলেবেলার সেই প্রীতি আমার মনের মধ্যে কোথায় যেন সুপ্ত হয়ে ছিল, একেবারে হারিয়ে যায়নি।

দশ দিন আমাদের বাড়িতে তিনি রইলেন। কী সুন্দর সেই দশটি দিন। তিনি যেন বাইরের জগতের এক ঝলক তাজা হাওয়াকে তাঁর সঙ্গে করে এনেছিলেন। বয়ে এনেছিলেন দূর দেশের কাহিনী আর কিংবদন্তীর আমেজ। সেই প্রথম বিদেশযাত্রার একটা ইচ্ছা আমার মনের মধ্যে জন্ম নেয়। মনে হতে থাকে, সেখানে গেলে আমি স্বাধীনতা পাব, আমার সমস্যার একটা সমাধান খুঁজে নিতে পারব। কত বিষয়ে যে কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। লক্ষ্য করেছিলুম, প্রতিটি বিষয়েই তাঁর এমন-কিছু কথা রয়েছে, যা একেবারে আনকোরা নতুন।

তিনি এলেন। তিনি চলে গেলেন। দশটা দিন যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ছিলুম। স্বপ্ন ভেঙে গেল। আবার ডুব দিলুম পড়াশুনোর মধ্যে। পরীক্ষার তখন আর মাত্র দশ দিন বাকী।

* * *

দৃশ্যটা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। বাক্স-তোরঙ্গ রাখবার জন্যে আমাদের বাড়িতে একটা ঘর ছিল। জামা-কাপড় পালটাবার ঘর হিসেবেও সেটাই ব্যবহৃত হত। মা সেই ঘরের মধ্যে পর-পর-রাখা বাক্সের গায়ে হেলান দিয়ে একটা টুলে বসে ছিলেন। মা আর আমি কেন যে ওই ঘরে ঢুকেছিলুম, মনে পড়ে না। শুধু মনে আছে, প্রসঙ্গটা মা সেইখানেই প্রথম তোলেন। সদ্য তখন আমার দিদির বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছে। এ-সব ব্যাপারে আমার আদৌ আগ্রহ ছিল না। ফলে সম্বন্ধটা কী করে ঠিক হল, তাও তার আজ আমার মনে নেই। যা-ই হোক, মা বললেন, আমাদের দুই বোনের যদি একই দিনে বিয়ে হয়, তো খুব ভাল হয়। একই দিনে দুই মেয়ের বিয়ে দেবার রীতিটা বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল। তাতে লাভ এই হয় যে, খরচ অনেক বেঁচে যায়। আমার তো মনে হয়, রীতিটা চালু হয়েছে মূলত সেইজন্যেই। কিন্তু সে-কথা থাক। মা জানতেন, আমি স্বাধীনচেতা; তাই তাঁর ভয় ছিল যে, সেকেলে ধাঁচের পরিবারে বিয়ে হলে হয়তো আমি ঠিক মানিয়ে নিতে পারব না। তাই অনেক ভাবনাচিন্তা করে আমার জন্যে তিনি এমন একটি পাত্র ঠিক করে রেখেছিলেন, যার সঙ্গে বিয়ে হলে আর তেমন কোনও উদ্বেগের কারণ থাকে না। মা বললেন, বিদেশে পড়াশুনো করে ছেলেটি সম্প্রতি দেশে ফিরেছে, মা-বাপ নেই, খুব ধনী। সুতরাং, এর সঙ্গে বিয়ে হলে আমি বেশ স্বাধীনভাবেই থাকতে পারব। পাত্রের নাম কী, তাও আমার শুনবার ইচ্ছে ছিল না। তবে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে-আসতে নামটা শুনেছিলুম বটে। বিয়ের প্রস্তাব শুনেই আমি চেঁচিয়ে বলে উঠি, "না, না, আমি বিয়ে করতে চাই না।" এবং ওই কথাটা বলতে-বলতেই আমি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসি। পিছন থেকে মা বলেছিলেন, "বেশ তো, বিয়ে করতে যদি ইচ্ছে না হয় তো না-ই করবি, কিন্তু বিয়ের কথা শুনবামাত্র অমন পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠবার কী আছে?"

খুব দুঃখ হয়েছিল সেদিন। ভেবেছিলুম, ও, আমার সম্পর্কে মায়ের তাহলে এই ধারণা? আমার স্বাধীনতা-কামনার এই তাহলে অর্থ করেছেন তিনি? নাঃ, এই বাড়ি থেকে আমাকে পালাতেই হবে। ট্রেনিং কলেজে একটা আসন আমি পেয়ে গিয়েছিলুম। ইতিমধ্যে অন্য-কিছুর জন্যে চেষ্টা করলে ক্ষতি কী। একটা ইশকুলের কথা শুনেছিলুম, সেখানে শর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিং শেখানো হয়। ঠিক করলুম, সেখানে ভর্তি হয়ে যাব। ইশকুলটা আমাদের বাড়ির থেকে অনেক দূরে। হেঁটে যাতায়াত করা সম্ভব নয়। বাবাকে বললুম, একটা সাইকেল কিনব। তিনি রাজী হয়ে গেলেন। বাস্, আর দেরি না-করে একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড লেডিজ সাইকেল কিনে ফেললুম। কাকার বাড়িতে যখন ছিলুম, তখনই সাইকেল-চালানো শিখে নিই আমি; তবে ভিড়ের রাস্তায় এর আগে

কখনও সাইকেল চালাতে সাহস হয়নি। চালাতে গিয়ে দেখলুম, ভীষণ নার্ভাস লাগে। কিন্তু তাই বলে পিছপা হলুম না। সাইকেলে চেপেই, শহরের বড়রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে লাগলুম।

* * *

জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিদির বিয়ে হবে। কনের জামাকাপড় ইত্যাদি সব কেনাকাটা নিয়ে বাড়ির লোক তখন দারুণ ব্যস্ত। আমার কিন্তু ওদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। বিয়ের সময়ে দিদি কী শাড়ি পরবে, কী রঙ হবে তার, লাল না গোলাপী না সোনালী, তা নিয়ে মাথাই ঘামাচ্ছিলুম না আমি। জুন মাস। ছায়াতেও তাপাঙ্ক তখন ১১৫ ডিগ্রী ফারেনহাইটের উপরে। সেই নিদারুণ গ্রীষ্মে, কাঠফাটা রোদ্দুর মাথায় করে, সাইকেল চালিয়ে আমি ইশকুলে যাই, বাড়ি ফিরি। আমি যে এমন-কিছু শিখছি, যার ফলে বাড়ির বাঁধন কাটা আমার পক্ষে হয়ত সহজ হবে, এই কথা ভেবে তখন আমার আনন্দের সীমা নেই। ইশকুলে যা শিখি, বাড়ি ফিরে বার বার তা প্র্যাকটিস করি। স্বাবলম্বী হবার জন্যে সত্যিই তখন আমি খুব খাটছিলুম। কিন্তু আমার ভাগ্য দেখি সব ব্যাপারেই মন্দ। ইশকুলের যিনি অধ্যক্ষ, তাঁর মেয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে, ফলে তিনি কলকাতায় চলে যান। ইশকুলও তাই অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল।

* * *

"সব কিছুরই একটা সীমা আছে," মা আমাকে বকুনি দিয়ে বললেন, "তোমার নিজের বোনের বিয়ে, আর সেদিকে তোমার কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড!"

চুপ করে রইলুম। কিছু বললুম না। কী নৈরাশ্যে যে আমি নিমজ্জিত হয়ে রয়েছি, মাকে তা আমি কী করে বোঝাব? দিদির সম্পর্কে আমি উদাসীন নই। কিন্তু তার বিয়েকে কেন্দ্র করে এই যে একটা সেকেলে, সামন্ততান্ত্রিক উদ্যোগ-আয়োজন চলেছে, এতে বিশেষ উৎসাহী হওয়া তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমনিতেই মায়ের কথার আমি প্রতিবাদ বড়-একটা করি না। আজও করলুম না। চুপ করে সব শুনে গেলুম। কিন্তু আমার এই চুপ করে থাকাটাও তাঁর পছন্দ নয়। একদিন বললেন যে, কেনাকাটার জন্যে সবাই আমিনাবাদে যাচ্ছে আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। শর্টহ্যান্ড-টাইপরাইটিংয়ের ইশকুল তখন বন্ধ, না-যাবার কোনও অজুহাত নেই; ফলে কী আর করি, যেতেই হল। তর্ক করার, ঝগড়া করার কোনও উৎসাহই আমার ছিল না। এমনিতেই আমাদের বাড়িতে তর্কাতর্কি ঝগড়া-বিবাদ লেগেই আছে। আমি আর তাতে ইন্ধন যোগাই কেন?

সংস্কার! সংস্কার! সারাক্ষণই বাবাকে বলতে শুনতুম যে, আমাদের রীতিনীতি প্রথাকানুন সবকিছুরই সংস্কার দরকার। কিন্তু, হায়, তাঁর নিজের মেয়ের বিয়ের সময় সে-সব তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন। দেখলুম, ভিতরে-ভিতরে তিনি মায়ের চেয়েও সনাতনপন্থী। কে কী বলবে, মা তা নিয়ে অনেক কম মাথা ঘামান। প্রথা ভাঙার ব্যাপারে বাবার সাহস দেখলুম মায়ের চেয়ে অনেক কম।

১৯৩৫ সনে আমার এক মাসীর বিয়েতে গিয়েছিলুম, তারপরে আর কোনও বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া হয়নি। নিতান্ত নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া কি বরাতের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তো ঠিক এই ব্যাপার নয়। দিদির বিয়ে হল পুরোপুরি প্রথা মেনে; লোক-লৌকিকতার রীতিনীতি পুরোপুরি বজায় রেখে। তবু আমার কাছে সে-এক নতুন অভিজ্ঞতা।

বাবার এক বন্ধু গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে পাহাড়ে গিয়েছিলেন। লখনউয়ে তাঁর বাড়ি তখন ফাঁকা। দিদির বিয়ে উপলক্ষে আমরা সেই বাড়িতে গিয়ে উঠলুম। বিশাল বাড়ি। বলতে গেলে রাজবাড়ির মতো। অনেকে তো লাট-প্রাসাদের সঙ্গেও এই বাড়ির তুলনা করত। দুটোর মধ্যে কোন্‌টা যে বড়, তা কখনও সঠিক জানা যায়নি। যাই হোক, বিয়ের কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই তো বাইরের আত্মীয়স্বজনেরা একে-একে সেই বাড়িতে এসে উপস্থিত হতে লাগলেন। সব মিলিয়ে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়াল আশিরও বেশী। এর মধ্যে লখনউয়ের আত্মীয়স্বজনদের ধরছি না। লখনউয়ের আত্মীয়স্বজনেরাও সারাটা দিন এসে সেখানে কাটাতেন, তবে রাত্তিরে যে-যার বাড়িতে চলে যেতেন। সকালে-বিকেলে তাঁদের চা পরিবেষণের দায়িত্ব যখন নিই তখন বুঝতে পারিনি যে, তার ঝক্কিটা আসলে কী মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। চা মানে তো শুধুই এক পেয়ালা চা নয়। প্রথমে দিতে হবে বেড-টি, তারপর দিতে হবে জলখাবার আর চা, তারপর এগারোটা নাগাদ আবার চা। বিকেলেও সেই একই ব্যাপার। কিন্তু দোকানে যেমন খরিদ্দারমাত্রেই লক্ষ্মী, বাড়িতে তেমনি অতিথিমাত্রেই নারায়ণ। লক্ষ্য রাখতে হবে, কোনক্রমে তাঁর অসন্তোষের কারণ না ঘটে। পান থেকে চুন খসা চলবে না। তা সকাল ছ'টা থেকে এগারোটা পর্যন্ত তাঁদের সেবাযত্ন করি, আবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত তাঁদের পরিচর্যাতেই আমার সময় কাটে। শুধু কি তাই? আমাদের সমাজে এই একটা প্রথা আছে যে, নেমন্তন্ন-বাড়িতে চাকর-বাকর কিংবা সমাজের বাইরের কাউকে দিয়ে পরিবেষণ করানো চলবে না। ফলে এই আশিজন মানুষকে দিনের-পর-দিন যাবতীয় খাবার আমাদেরই পরিবেষণ করতে হয়। সে এক এলাহী ব্যাপার। অভ্যাগতদের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধা। তাঁদের এক-এক জনের এক-এক রকম খাদ্য-রুচি। কেউ আমিষ খান। কেউ নিরামিষ। এবং আমিষের হেঁসেলে সেই নিরামিষ রান্না করা চলবে না। কেউ-বা চাকর-বাকররা যদি ভাজাভুজি করে দেয় তাহলে খাবেন, কিন্তু তাদের রান্না ভাত কিংবা ডাল খাবেন না। তার কারণ, সেটা সিদ্ধ করতে হয়। এই রকমের অসংখ্য সব বায়নাক্কা। কিন্তু তার একটাকেও উপেক্ষা করবার উপায় নেই। প্রত্যেকের প্রতিটি ইচ্ছা-অনিচ্ছার দিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে। তা আমার ঠাকুমা আর দিদিমার কাছে এ-সব ব্যাপারে আমি তালিম পেয়ে গিয়েছিলুম। তাই আমার কোনও অসুবিধে হত না। মুশকিল হত আমার দুই জ্ঞাতি-বোনের। পরিবেষণের ব্যাপারে তারা আমাকে সাহায্য করত। কিন্তু এর আগে কখনও এত হরেক রকমের দাবি-দাওয়ার পাল্লায় তারা পড়েনি। ব্যাপার দেখে তারা তো পাগল হবার জোগাড়। কেন ইনি এটা খাবেন তো ওটা খাবেন না, সেটা খাবেন তো এটায় কেন আপত্তি, তারা তা বুঝে উঠতে পারে না। অবাক হয়ে কথায়-কথায় প্রশ্ন করে, "কেন?" কিন্তু কোনও ধর্মেই কি এ-সব 'কেন'র কোনও উত্তর মেলে? ইহুদীরা কেন একইসঙ্গে মাংস এবং মাখন খান না? ক্যাথলিকরাই বা কেন শুক্রবারে মাংস খেতে পারেন না কিন্তু মাছ খেতে পারেন?

বরযাত্রীরা বিকেলে এসে পৌঁছলেন। যে-বাড়িতে তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল, আমরা সেখানে গিয়ে চা আর রাত্তিরের খাবার পরিবেষণ করলুম। পরদিন এল 'বরাত'। দারুণ জাঁকজমকের ব্যাপার। বরযাত্রীদের অধিকাংশই সে-রাত্রে লখনউয়ে রইলেন। সকালে সাধারণত বিয়ে হয় না। কিন্তু আমার দিদির বিয়ে হয়েছিল সকালে। নিজেদের লোকজন, জনা পঞ্চাশেক বরযাত্রী, তার উপরে দুই পক্ষের আত্মীয়স্বজন, অতিথি-অভ্যাগত, তাঁদের প্রত্যেকের চা আর জলখাবারের ব্যবস্থা করতে করতে আমাদের তো দম বেরিয়ে যাবার অবস্থা। বিকেল চারটে নাগাদ দিদি তার শ্বশুর-বাড়িতে রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকল। আমরা তখন এত

পরিশ্রান্ত যে, দাঁড়িয়ে থাকবারও শক্তি ছিল না। যে যেখানে পারলুম, শুয়ে পড়লুম। তার পরেও তিন দিন ধরে চলল খাওয়াদাওয়া। বরযাত্রীরা পুরো ছ' দিন আমাদের বাড়িতে ছিলেন। আমাদের বিবাহ-অনুষ্ঠান যে কী প্রাণান্তকর ব্যাপার, এর আগে এত স্পষ্ট করে তা বুঝিনি। সেই প্রথম বুঝলুম, এবং প্রতিজ্ঞা করলুম যে, আদৌ যদি বিয়ে করি তো রেজিস্ট্রি-বিয়ে করব। এই হাড়ভাঙা পরিশ্রমের কোনও অর্থ হয়? কিংবা এই আড়ম্বরের? এ তো নেহাতই অপচয়। আলো, বাজনা আর ভুরিভোজে যে টাকা খরচ হল, সেই টাকাটা বরং নবদম্পতিকে দিয়ে দেওয়া যেত। যাতে তারা ভালভাবে তাদের জীবন শুরু করতে পারে।

রাত তখন আটটা। দিদিকে বিদায় দেবার জন্যে আমরা স্টেশনে গিয়েছিলুম। ট্রেনের জানলায় দিদি বসে ছিল। কাঁদছিল। কোথায় যাচ্ছে, সে জানে না। যার সঙ্গে যাচ্ছে, বিয়ের আগে মাত্র একবারই দিদি তাকে দেখেছিল। ট্রেন চলে গেল। অবসাদে আমার শরীর তখন ভেঙে পড়ছে। কিন্তু বিশ্রাম নেব, তার উপায় নেই। তার কারণ, আমিও আজই এখান থেকে রওনা হয়ে যাচ্ছি। আর মাত্র এক ঘণ্টা বাদে আমার ট্রেন ছাড়বে।

খুব আগ্রহভরে মনে অনেক আশা নিয়ে যে ভবিষ্যতের দিকে তাকাচ্ছিলুম, তা নয়। মনে পড়ে, কেমন যেন আচ্ছন্ন অবস্থায়, চুপি-চুপি আমি বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসেছিলুম। বিয়েবাড়ির আলোকসজ্জা আমার পিছনে পড়ে রইল। আমি এলাহাবাদে রওনা হলুম। অভ্যাগতেরা তখনও বিদায় নেননি। কিন্তু কনে চলে যাবার পরে বিয়েবাড়ি কেমন যেন শূন্য হয়ে যায়। সবাই বড় বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। হয়ত সেই কারণেই কেউ বুঝতে পারেনি যে, আর-একটি মেয়েও বাড়ি থেকে চলে গেল। শান্ত পায়ে পথে বেরিয়ে এলুম আমি। যাত্রা করলুম আমার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।
